দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকরণ

[দ্বিতীয় খন্ড]

বিমলেন্দু হালদার

রত্নাবলী
১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ সরদার

প্রকাশক :
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শান্তি মুদ্রণ
৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

আমার পিতামহ ৺প্রিয়নাথ হালদারের স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব কথ্য ভাষা ও লোক সংস্কৃতিব উপকবণ [প্রথম খণ্ড]
- আকাশ মাটি মন।

ভূমিকা

শ্রীবিমলেন্দু হালদারের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ' (প্রথম খণ্ড) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ড এবারের বইমেলায় প্রকাশিত হল। শ্রীহালদার পেশায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জগত থেকে দূরে। তা সত্ত্বেও তিনি সারস্বত চর্চার একান্ত আগ্রহে নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা থেকে গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থটি বহু পরিশ্রম অনুসন্ধান ও ক্ষেত্র গবেষণার সাহায্যে রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি রচনা করে শ্রী হালদার একই সঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ ও লোক সংস্কৃতিবিদের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রান্তে এসেও বাংলার গ্রামীণ জীবন বহু পূর্ব লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণধারাকে কিভাবে বহন করে চলেছে সময়ের স্তরে স্তরে জীবন যাপনের নানা বৈচিত্র্য কিভাবে একটি জেলা সামগ্রিক সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে তারই একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই গ্রন্থটি স্বীকৃতি পাবে।

জেলার কথ্য ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির সঙ্গে জড়িত শব্দের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস সব শ্রেণীর পাঠকের কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করতে সক্ষম। এই সমস্ত শব্দগুচ্ছ থেকেও এই বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিটি প্রায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচীন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে তার সঙ্গে পরবর্তী সময়ের বিমিশ্র সভ্যতার সংশ্লেষ সুআলোচিত।

বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু সম্পর্কিত নানা প্রথা রীতিনীতি ও শব্দ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পদবী থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতসূত্রও লেখক অনুসন্ধান করেছেন ও আবিষ্কার করেছেন। সাধারণের অজ্ঞাত বেশ কিছু সম্পূর্ণ নতুন তথ্যও এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। গড়, গুড়, খান, ঘণ্টা, ঢেঁকি, হড় প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের অনেক পদবী প্রচলিত ছিল। এই পদবীগুলো শ্রুতিসুখকর নয় বলেই অনেকে এগুলি পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। তার ফলে ধীরে ধীরে এই পদবীগুলোও ঐসব অঞ্চল থেকে লুপ্ত হতে চলেছে। শ্রীহালদার পরবর্তী সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদের জন্য এই তথ্যগুলিকে সযত্নে পরিবেশন করেছেন তাঁর গ্রন্থে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলে ব্যবহৃত যে সমস্ত শব্দগুলির তালিকা তাদের নানা ধরনের অর্থসহ সংগ্রহ করেছেন তিনি, তাও ভাষা তাত্ত্বিকদের উৎসাহিত করবে।

কিন্তু এ সমস্ত প্রসঙ্গের বাইরেও বলা যায় সেল্‌ফ আইডেনটিটি-র চেষ্টা প্রত্যেক সচেতন মানুষের মধ্যেই থাকে। সেই চেষ্টার নানা দিক আছে। নিজের চারপাশ ঘিরে থাকা পরিবেশ আর জীবন, সেই পরিবেশ ও জীবনের কালপ্রবাহিত উৎস সন্ধান এই প্রচেষ্টারই একটা দিক। একটি সীমাবদ্ধ স্থানকে কেন্দ্র করে নিবিড় ক্ষেত্র সমীক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক ফাঁকফোকর পূরণ করতে পারে, অনেক অনালোকিত দিককে আলোকিত করতে পারে। শ্রীহালদারের ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষাজাত পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থটি সেই দায়িত্ব পালন করেছে। তাঁর দৃষ্টান্ত অন্য আরো অনেককেও উৎসাহিত করবে।

শ্রীহালদারের ভাষায় কোন জটিলতা নেই। প্রকাশভঙ্গ স্বচ্ছ। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দিতে সক্ষম। ফলে উৎসাহী গবেষক ছাড়া সাধারণ পাঠকরেও এই গ্রন্থটি আকৃষ্ট করবে। এইখানেই এর চূড়ান্ত সিদ্ধি।

আশ্রয় **ড. সত্যবতী গিরি**

৭৮এ বিবেকানন্দ সরণি

কলকাতা ৭০০ ০৭৮

লেখকের কথা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে-গঞ্জে, বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে। ঘুরতে গিয়ে এই জেলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপটি প্রত্যক্ষ করেছি। কি নিদারুণ দারিদ্র্য, দুঃখ আর অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটায় এখানকার সাধারণ মানুষ। এরা অধিকাংশ শ্রমজীবী—কৃষক, কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতি, মুচি, মেথর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, পটুয়া, ধোপা, নাপিত, বারুই, শোলা-শিল্পী, শিউলী, মালী, ঘরামী, মউলে, বাউলে প্রভৃতি মানুষ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এরা দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়, অভাব-অনটনে পীড়িত হয় আবার সুযোগ পেলে প্রাণ ভরে আনন্দ করে আর এই দুঃখ কষ্টের জন্য তাদের ক্ষোভ নেই। কারোর বিরুদ্ধে সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এমনকি ভগবানের বিরুদ্ধেও তাদের অভিযোগ নেই। সব কিছুকে এরা ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। অথচ এরা অবহেলিত, বঞ্চিত, দলিত। এদের সহজ সরল চিন্তাভাবনার সঙ্গে গভীর ধর্মপ্রাণতা যুক্ত হয়ে এদের জীবনবোধকে এক অনাবিল সুন্দর ভাবময়তায় উন্নীত করেছে।

এইসব মানুষেরা যে কথা বলে, যে ভাষা ব্যবহার করে, রীতিনীতি আচার পালন করে, যে সংস্কার-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয় তাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। সেগুলি কোথাও থেকে শেখা কিংবা ধার করা নয়। সেগুলি জন্মসূত্রে অর্জিত, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত এবং তাদের সহজ, সরল অনাড়ম্বর গভীর জীবনবোধ সঞ্জাত। তাছাড়া এই সব রীতি-নীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি তাদের মুখের ভাষা ও পদবীর মধ্যে বহুকাল থেকে বয়ে চলে আসা এক প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও প্রাচীন সভ্যতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এই সব মানুষের মধ্যে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার বিকার নেই, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান চেতনার প্রতিফলন নেই—তাই এরা এত সহজ সরল। তাই এরা আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, দৈব ও ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে, ওঝা-গুণিনের মন্ত্র-তন্ত্রে নির্ভর করে। সব মিলিয়ে কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির যথার্থ রূপটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিদ্যমান।

একটা কথা সর্বাগ্রে স্বীকার করা প্রয়োজন—এই বিরাট জেলার সর্বত্র ঘোরা সম্ভব হয়নি। শব্দ, তথ্য ও মন্ত্র-তন্ত্র সংগ্রহে তাই কিছু অপূর্ণতা থাকতে পারে। বহু ওঝা-গুণিন, তান্ত্রিক, গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীর সঙ্গে যোগযোগ করেছি। সকলের তালিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। অনিবার্যকারণে তা প্রকাশ করা গেল না। অনেকে আবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। বাগদহের কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী, ধোপাগাছির জীতেন্দ্রনাথ সরকার, চকরবেড়িয়ার ভোলা সরদার, কুন্দরালি সোনাগাছির পালান নস্কর, কাকদ্বীপ-পাকুড়তলার পরান হালদার, বিদ্যাধরপুরের নিতাই সিং প্রভৃতি ওঝা-গুণিন মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। মহেশপুরের মন্টু হাজারী ও তপন হালদারের বাড়ী থেকে অনেক মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। যে সমস্ত তান্ত্রিক ও গুপ্ত ক্রিয়াকুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথাভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 'লটারি সংবাদ' পত্রিকায় প্রায় দুই বৎসর ধরে শ্রীউজ্জ্বল সান্যালের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীসান্যালের কাছে আমি ঋণী। যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও গুণীজনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় ও উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে—তাদের মধ্যে সর্বশ্রী নরোত্তম হালদার, ধূর্জটি নস্কর, কৃষ্ণকলি মণ্ডল, তপন হালদার, তারকনাথ নস্কর, কালিপদ মণি, দেবব্রত নস্কর, হরিচরণ নস্কর, পাঁচুগোপাল সাহা এবং ড. সনৎ কুমার নস্করের নাম উল্লেখযোগ্য। শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে আমার স্ত্রী অনিন্দিতা হালদার যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচনায় যে সমস্ত পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করছি—

১। ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।

২। গঙ্গারিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ—নরোত্তম হালদার

৩। Occultism in Fringe Bengal—Probodh Kumar Bhowmick

৪। পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস—খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

৫। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৬। চর্যাগীতি পরিক্রমা—নির্মলকুমার দাশ।

সর্বশেষে বলা যায় 'রত্নাবলী' এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে ঋণী করেছে। 'রত্নাবলী'র শ্রীসুনীল ভট্টচার্য ও শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি ভূমিকা রচনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইমেলা উপলক্ষ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে তড়িঘড়ি সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। সেজন্য কিছু ছাপার ভুল থেকে যেতে পারে। এছাড়া তথ্য সরবরাহের অপূর্ণতা ও অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পাঠকবর্গ ও সমালোচকবর্গের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বিমলেন্দু হালদার

বিবেকানন্দ পার্ক,
বিবেকানন্দ রোড বাইলেন-১
সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা
২৯.১.১৯৯৭

সূচীপত্র

কোন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, মানুষের দৈহিক গঠন, প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। লেখকের, '*দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকরণ*' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস, কথ্যভাষার সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির সম্পর্ক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন ইতিহাস, বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশা সম্পর্কিত শব্দ সংগ্রহ ও আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উৎসব আমোদ-প্রমোদ, গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা সম্পর্কিত শব্দসংগ্রহ ও আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলি আলোচনা করা হবে।

জেলা হিসেবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নেহাৎ ছোট নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার চেয়ে আয়তনে বড়। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন জীবিকার মানুষের বসবাস এখানে। এদের মধ্যে কেউ উচ্চ শিক্ষিত কেউ স্বল্প শিক্ষিত আবার কেউবা অশিক্ষিত। কেউ ধনী, কেউ উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত, কেউ নিঃস্ব-গরীব। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের দেশ। এই শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু কলকারখানার শ্রমিক অর্থে শ্রমজীবী নয়, এখানকার অধিকাংশ মানুষ জাতিগত বৃত্তিনির্ভর, পেশাভিত্তিক শ্রমকার্য করেন। এদের মধ্যে কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি প্রভৃতি মানুষও যেমন আছে তেমনি আছে অরণ্যজীবী মানুষ। চাকুরীজীবী ও আধুনিক বৃত্তিধারী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। এ ছাড়া অর্ধ-উন্নত, অনুন্নত গ্রাম, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, ক্ষেত, খামার, বনাঞ্চল, নদী-নালা খাল-বিলে ভর্তি এখানকার পরিবেশ পরিমণ্ডল। প্রাচীন অরণ্যভূমির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকা আদি বাসিন্দাও যেমন আছে, তেমনি আছে বহিরাগত মানুষ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভয়াল সুন্দরবনে আজও আছে অজস্র হিংস্র প্রাণী। সাপ, বাঘ, হরিণ, কুমীর, কামোট প্রভৃতির সঙ্গে আছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি যা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। তবে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। মানুষগুলি অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ ও আধুনিক জীবনযুদ্ধের কুটিলতা-বিহীন। বড় বড় কলকারখানা বেশি নেই, তবে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প আছে বেশ। এই সব কিছু নিয়েই এখানকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এখানকার ভাষায় ও লোক সংস্কৃতিতে সেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাব গভীরভাবে বিদ্যমান। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাতন সভ্যতার প্রভাব। এসম্বন্ধে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস, ক্রোধ-কলহ, পদবী, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে তাও দেওয়া হচ্ছে। একটা কথা বলে রাখা দরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয় মানুষদের আচরিত সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি ও সেই সম্পর্কে প্রচলিত শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক-রীতিনীতি প্রথা-সংস্কার-বিশ্বাস ক্রোধ-কলহ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করতে গেলে কতকগুলি নিয়মকানুন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস মেনে চলতে হয়। সুষ্ঠ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ এইগুলি তৈরী করেছে। আবার জীবনযাত্রার নানা পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য ঐ পরিস্থিতি এবং পরিবেশ অনুযায়ী কিছু কিছু সমাধানও সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে তারা সমাজের অলিখিত আইনের মর্যাদা পেয়েছে। এইভাবে সামাজিক রীতি-নীতি কিংবা প্রথার জন্ম হয়েছে। আবার জীবনের চলার পথে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিজেদের সম্মানের জন্যে, কল্যাণের জন্যে কিছু কিছু আচার-আচরণকে মেনে নিয়েছে ও ধীরে ধীরে সেগুলি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারনা গড়ে উঠেছে এবং বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। এইভাবে আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। বহুদিন থেকে সমাজে লোকসাধারণের পালিত এই আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসকে লোকাচার, লোকসংস্কার ও লোক-বিশ্বাস বলা যেতে পারে। কালে কালে এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মবোধ ও গোষ্ঠীচেতনা।

কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদির রূপ সর্বত্র এক নয়। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এদের পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে যে প্রথা, আচার, সংস্কার কিংবা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, বর্তমানে তা নাও থাকতে পারে। আবার বর্তমানে যে আচার-সংস্কার প্রথা-বিশ্বাসের জন্ম হচ্ছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে অতীতে তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আবার এক অঞ্চলের মানুষ যেগুলি পালন করে অন্য অঞ্চলের মানুষ সেগুলি পালন নাও করতে পারে কিংবা এক বয়সের মানুষের কাছে যেগুলি আচরণীয়, অন্য বয়সের মানুষ সেগুলি আদৌ মেনে চলে না। নারীরা যেগুলি মানে, পুরুষরা সে গুলি মানে না।

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত দিক দিয়ে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, সংস্কার-বিশ্বাসের রূপভেদ ঘটে থাকে। হিন্দুরা যে রীতি নীতি এবং আচার-সংস্কার বিশ্বাসের অনুগামী, মুসলমানগণের কাছে সেগুলি অনেকাংশে বর্জনীয়। তেমনি খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, প্রথা এবং আচার-সংস্কার সাধারণতঃ পৃথক পৃথক হয়েই থাকে। আবার বৈষ্ণবগণের কাছে যেগুলি পালনীয় কিংবা আচরণীয় শাক্তগণের কাছে সেগুলি আচরণীয় নাও হতে পারে। একই অঞ্চলের বসবাসকারী হলেও জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী-ভাবনা অনুযায়ী সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, সংস্কারের বিভিন্নতা ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং স্থান, কাল, পাত্র, জাতি-ধর্ম, গোষ্ঠী ইত্যাদি অনুযায়ী সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার সংস্কার ও বিশ্বাসের সামগ্রিক রূপের জন্ম হয়েছে, হয়ে চলেছে— পরিবর্তিত পরিবর্ধিত পরিমার্জিত হতে হতে অনাগত কালের দিকে এগিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, সংস্কার, বিশ্বাসের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এগুলি মূলতঃ প্রাচীন ধারার অনুবর্তন কিংবা বিবর্তন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ যেমন এক প্রাচীন পরাক্রমশালী জাতির বংশধর, তেমনি তাদের আচরিত রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-সংস্কার ইত্যাদি মূলতঃ প্রাচীন কালের রীতি-নীতি প্রথা-আচার ইত্যাদির অনুবর্তন। সে গুলি ভাল বা মন্দ কিংবা বর্তমান কালের জীবনধারার পক্ষে কতখানি উপযোগী

সে প্রশ্ন আলাদা। শুধু বলা যায় কেবলমাত্র অভ্যাস বসে পুরুষানুক্রমে বা বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়ে আসার জন্যে কিছু কিছু রীতি নীতি আচার সংস্কার বিশ্বাস এই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে যা অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না এবং এগুলিকে যথার্থ ভাবে লোকরীতি, লোকাচার, লোকসংস্কার কিংবা লোকবিশ্বাস বলা যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে দক্ষিণ চাব্বিশ পরগনা মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের দেশ। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। উচ্চশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত মানুষের অভাব এখানে। স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এখানে বেশি। এখনও এখানকার অঞ্চলে অক্ষরপরিচয়হীন মানুষ খুঁজলে প্রচুর মেলে। এইসব অঞ্চলে আধুনিক জীবনযন্ত্রণার স্পর্শ বড় একটা ঘটেনি। ফলে এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা প্রাচীনপন্থী হওয়াই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় যে-সব প্রথা, আচার-সংস্কার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাঁরা সেগুলিকেই আঁকড়ে থাকবেন একথা বলাই বাহুল্য। সেগুলি সদাচার না কদাচার, সুসংস্কার না কুসংস্কার— তা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন না, বাবা ঠাকুর্দা-পূর্বপুরুষগণ মেনে এসেছেন ও আসছেন তাই তাঁরাও সেগুলি মেনে চলেছেন।

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য প্রথা, আচার-সংস্কার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ইত্যাদি মেনে চলে। গুহা মানব থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স যুগের আধুনিক মানুষ পর্যন্ত এইসব প্রথা-আচার সংস্কার বিশ্বাস মেনে আসছে এবং ভবিষ্যতেও মেনে চলবে। তবে কালে কালে এদের রূপ বদল হয়ে চলেছে। জীবনের খুঁটিনাটি নানান বিষয় এইসব সংস্কার বিশ্বাসের মূল স্বরূপ। কিন্তু সবকিছুর মূলে মানুষের জৈবী প্রেরণা। আবার এই জৈবী প্রেরণার পার্থক্য ঘটে সমাজ পরিবেশ ও ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী। ফলে স্থান অনুযায়ী, কাল অনুযায়ী, পরিবেশ অনুযায়ী প্রথা, আচার সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তার সহজাত প্রবৃত্তি (Instinctive behaviour) দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যেহেতু তাকে সমাজে বাস করতে হয়, তাই সামাজিক মূল্যবোধ এবং আপন স্বার্থরক্ষার (যেগুলির মূল জৈবী প্রেরণা) তাগিদে তাকে নানা রকম প্রথা, আচার, সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। অনেক সময় বুঝে কিংবা না বুঝে মানতে হয়। আবার পরবর্তীকালে প্রয়োজন না হওয়ায় সে গুলি বর্জন করতে পারে। সুতরাং এই সব প্রথা আচার-বিচারগুলি পরিবর্তন শীল, সময় এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলাই এদের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন-অতিথিকে আপ্যায়ন করা, ভিক্ষুককে যথা সাধ্য ভিক্ষা দেওয়া, তৃষ্ণার্ত কেউ জল চাইলে শুধু জল না দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা পাপ এই ধারণা— এগুলি প্রথা, আচার, সংস্কার-বিশ্বাসের উদাহরণ। প্রাচীন কালে এগুলির যথেষ্ট মূল্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মূল্যবোধ ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে।

কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস একটু আলাদা। আজও এই অঞ্চলের মানুষ প্রাচীন মূল্যবোধগুলি সযত্নে বহন করে চলেছে। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়— যথা সাধ্য ভাবে অতিথি সৎকার, ভিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি করা হয়। এখনও কেউ জল চাইলে তাকে জলের সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে একটা বাতাসা কিংবা একটুকরো ভেলিগুড় দেওয়া হয়। আর পাপপুণ্যের ধারণা সম্পর্কিত পুরানো সংস্কার বিশ্বাস এই অঞ্চল সযত্নে আঁকড়ে ধরে আছে। সুতরাং প্রথা (Folkways), আচার (Customs), অনুশাসন (Morés). কৃত্য (Ritual), বিশ্বাস/লোক বিশ্বাস (Folk beliel), সংস্কার/লোক সংস্কার/কুসংস্কার (Superstition) ইত্যাদির বিশিষ্টরূপ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে লক্ষ্য করা যায়।

মানুষকে নিয়ে সমাজ, মানুষের জন্যেই সমাজ। এই মানুষ কিভাবে ভাল থাকবে, কি করে তার মঙ্গল হবে, কি উপায়ে নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘজীবন লাভ করবে ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবনাই প্রথা, আচার, বিশ্বাস, সংস্কারের জন্ম দিয়েছে। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের মঙ্গলার্থে সমাজের কর্ণধারগণ এই সব প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সৃষ্টি করে এসেছেন। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার আচার-বিশ্বাস, প্রথার মধ্যে দিয়ে মানবজীবনকে অতিবাহিত হতে হচ্ছে। যে শিশুটি মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ট হয়ে পৃথিবীর আলো দেখবে কিভাবে সে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকবে এবং সুস্থ সুন্দর উন্নত জীবন যাপন করবে তার জন্য চিন্তার অন্ত নেই। সেই জন্য মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থা থেকেই পরিচর্যা শুরু হয়ে যায়। এই পর্যায়ের আচার বিশ্বাস সম্পর্কিত তথ্য ও শব্দাবলীর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন প্রথা, আচার-বিশ্বাস, ইত্যাদি যে সময়ে যে পরিবেশে সৃষ্টি হোক না কেন, বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তি ও ধ্যান ধারনা সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িয়ে থাকে। বিশেষতঃ মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সম্পর্কিত আচার-বিশ্বাস অধিকাংশই বিজ্ঞান-নির্ভর।

পঞ্চাম্নেত্ত— পঞ্চামৃত সেবন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চ অমৃত গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে খাওয়ানো বিধি, কারণ যে ভ্রূণ মাতৃ জঠরে জন্ম নিয়েছে তাকে পুষ্টি দেওয়া ও গর্ভিণীর শরীর সবল ও সুস্থ রাখাই এর উদ্দেশ্য।

পুসবন/পুসবেন—পুংসবন। প্রচীন কালে নারীর গর্ভের তৃতীয় মাসে সন্তান লাভ (বিশেষ করে পুত্রসন্তান লাভ)- এর জন্য প্রার্থনা করা হত। স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে পূজার্চনা করে এই প্রার্থনা করা হতো। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোথাও কোথাও এই আচার দেখা যায়।

সেমন্তন/সেমন্তন্ন— সীমন্তোন্নয়ন। অষ্টম মাসে গর্ভিণীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে একটি আচার পালন করা হয়।

সাধ— সাধভক্ষণ। সাধারণতঃ নয় মাসে নতুন কাপড় পরিয়ে, গহনাতে সজ্জিত করে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে কমপক্ষে নয় রকম সুখাদ্য গর্ভিণীকে খেতে দেওয়া হয়। এই আচার-অনুষ্ঠানে গর্ভিণীকে বাড়ীর গুরুজনদের নমস্কার করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের পেছনে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমত, প্রাচীনকালে প্রসব হওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অনেক সময় গর্ভিণীর মৃত্যু হত। সেজন্য প্রসবের পূর্বে গর্ভিণীকে নতুন বস্ত্র-অলংকারে সজ্জিত করে সুখাদ্য দিয়ে জীবনের সাধ পূর্ণ করার চেষ্টা করা হত। দ্বিতীয়ত, গর্ভিণীর শরীরের পুষ্টির দিকটাও লক্ষ্য করা হতো, যাতে প্রসবের ধকল সইতে পারে।

ব্যথা ওঠা— গর্ভ যন্ত্রণা— প্রসবের পূর্বে যে যন্ত্রণা হয়।

আতারি-কাতারি— গর্ভিণী যন্ত্রনায় ছটফট করলে।

জলভাঙা— প্রসবকালে যে জল/রস নিসৃত হয়।

ফুলপড়া— প্রসবের পর ফুল অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানকে ঘিরে যে ঝিল্লির আবরণী থাকে তা বের হয়ে আসে।

ধাই/দাই— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এখনও এক শ্রেণীর রমণী দেখা যায়। প্রসব করানো যাদের পেশা।

নাড়কাটা— এখনও এই দাই-শ্রেণীর নারীরা কাঁচা বাঁশের চেটি দিয়ে নাড়ী কাটে।

দাই-বিদেয়— পরিশ্রমিক স্বরূপ এই দাই-দের টাকা, কাপড়, তেল, আনাজ ইত্যাদি সিধা দিয়ে বিদায় করা হয়।

ধরুনী/ধরনী—প্রসবে সাহায্যকারিণী মহিলা। এরা দাই-কে সাহায্য করে।

আঁতুড় ঘর— প্রসবের জন্যে আলাদা নির্দিষ্ট গৃহ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এখনও এই নিয়মটি মানা হয়। আলাদা ঘরের ব্যবস্থা না করতে পারলে অন্ততঃ বারান্দার এক ধারে হোগলা দিয়ে ঘিরে আঁতুড় ঘর বানানো হয়।

দোয়াত-কলম দেওয়া— প্রসবের পর আঁতুড় ঘরে মাটির দোয়াত ও কঞ্চির কলম রাখা হয়। একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে সন্তান জন্মের তিন দিনের মধ্যে কিংবা তিন দিনের মাথায় (কোথাও কোথাও ছয়/সাত দিনের মধ্যে) বিধাতা চুপি চুপি নবজাত সন্তানের কপালে তার ভাগ্যে কি ঘটবে তা লিখে দিয়ে যান। সে জন্য দোয়াত-কলম রাখা হয়।

ধাতুর জিনিস রাখা— আঁতুড় ঘরে লোহার কোন জিনিস (সাধারণতঃ দা কিংবা কাস্তে) রাখা হয়। এতে ভূতপ্রেত কোন অশরীরী আত্মা আসতে পারে না।

ন পোয়াতি— নব প্রসূতি।

পাঁচোট কামান— পাঁচ দিনে নবজাত শিশুকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। ঠাকুরকে পূজা দেওয়া হয়। এইভাবে পাঁচদিনের অশৌচ ত্যাগ হয়।

ষষ্ঠী পূজো— তিরিশ দিনে ষষ্ঠী ঠাকুরুণকে পূজা দিয়ে অশৌচ ত্যাগ করা হয়। হাঁসের ডিম দিয়ে পূজা দেওয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিধি।

মুখে ভাত— অন্নপ্রাশন। শিশু ছয়মাস হলে, কোথাও কোথাও পাঁচ মাসে ও সাত মাসে শিশুকে ভাত খাওয়ান হয়। অর্থাৎ এখন থেকে কঠিন খাদ্য, দেওয়া হয়। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজ হয় তাকে বলে মুখে ভাত।

কান বিঁদুনি— কর্ণভেদ। এটা প্রাচীন প্রথা। বর্তমানে কিছু কিছু দেখা যায়। কানে ছিদ্র করে ধাতুর সাধারণতঃ সোনার দুল (Ring) পরান হয়।

[প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতি আলোচনা করতে গিয়ে মূলতঃ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অনুন্নত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবর্ণীয় হিন্দু শ্রমজীবী মানুষদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় যে লোক সাধারণের আধিক্য তাদেরই মুখের ভাষা, আচার, প্রথা, সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদিকে আলোচনার অন্তর্গত করা হয়েছে। এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও উচ্চবর্ণের মানুষের ভাষা, প্রথা, আচার, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি কিছুটা বাদ পড়তে পারে।]

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ— এই তিনটি বন্ধনের দ্বারা মানুষ জগৎ সংসারে আবদ্ধ। মানব জীবনের এই তিন পর্যায়কে ঘিরে কত আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল কত আচার নিয়ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে বরণ করা হল। শিশুটি বড় হল— এল কৈশোর যৌবন। আবদ্ধ হল বিবাহ-বন্ধনে। সৃষ্টি করল আর এক নূতন সংসার। শেষে জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। আমরা আশাবাদী মানুষ। আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। মানুষের নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটে কিন্তু বেঁচে থাকে আত্মা— সে যে চির অমর। মানুষ অমৃতের সন্তান। আমাদের হিন্দু ধর্মে দর্শন আর বিশ্বাস জড়িয়ে মানুষের জীবনকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্যেই হাজারো প্রথা, সংস্কার, আচারের প্রবর্তনা। জীবন যেন সুখী হয়, সুন্দর হয়— এই আমাদের কামনা। এমন কি মৃত্যুর পর আত্মা যেন শান্তি পায়—এই আমাদের বিশ্বাস।

মানুষের জীবন অসংখ্য ঘটনার সমষ্টি। প্রতিমুহূর্তে প্রতি পদে ঘটনা ঘটেই চলেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে দুটি বড় ঘটনা হল— মানুষের জন্ম আর মানুষের মৃত্যু। বস্তুতঃ মানুষের জীবনের দুই প্রান্তে এই দুটি বিশিষ্ট ঘটনাই জীবনকে ধরে রেখেছে— একটি শুরু ও আর একটি শেষ।

আর এই দুই প্রান্তবর্তী ঘটনাকে যুক্ত করে রেখেছে অন্য আর একটি ঘটনা— তা হল বিবাহ। যেখানে জীবনের চরম পূর্ণতা। মানুষ অমৃতের সন্তান। মানবজীবনও অমৃতময়। এই অমৃতময়তার পরম অনুভূতি ঘটে বিবাহ নামক ঘটনার মধ্য দিয়ে। দুটি হৃদয় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা একাত্ম হয়ে যায় এই একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে এবং নতুন জীবনের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সূচিত হয়। সুতরাং বিবাহ নামক ঘটনাটি জন্ম ও মৃত্যু-উভয়কেই প্রতিফলিত করে।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'— পুত্রলাভের জন্যে বিবাহ কিংবা বলা যায় বংশ রক্ষার তাগিদে বিবাহ এবং পুত্রের পিণ্ডলাভে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি ও ইহকালের মুক্তিলাভ— এই সব সংস্কার ও বিশ্বাস প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল। আজও এই সংস্কার বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং বিবাহ লোক সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তিলাভের একটি বড় উপায় ও আশ্বাস। কিন্তু বিবাহের পর পুত্রলাভ না হলে সেই মানুষের জীবন বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। স্বর্গের পথ তো বন্ধ হয়ে যায়, এমন কি প্রতিটি মানুষের কাছে সে হয়ে ওঠে অলক্ষুনে। অপুত্রক মানুষকে সমাজে বলে 'আঁটকুড়ো'। মানুষ জনের বিশ্বাস আঁটকুড়ো লোকের মুখ দেখলে পাপ হয়।

মানবজীবনের এই বিবাহ নামক ব্যাপারটিকে ঘিরে আছে বহু আচার, সংস্কার, প্রথা ও বিশ্বাস। পাত্র পাত্রী নির্বাচন, তাদের বয়স, কুল, গোত্র, আকৃতি, পণ, দিন-ক্ষণ ঠিক করা, নিমন্ত্রণ, বরকণের সাজসজ্জা, আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গ রস এবং বিবাহ-পূর্ববর্তী, বিবাহের সময় ও বিবাহ-পরবর্তী নানাপ্রকার লোকাচার, প্রথা, সংস্কার বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। বহু প্রাচীন কাল থেকে এইগুলি অমোদের সমাজে চলে আসছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবাহ সম্পর্কিত নানা লোকাচার, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও প্রচলিত আছে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে আজও প্রাচীন সমাজব্যবস্থার কিছু রেশ বর্তমান আছে। সুতরাং বিবাহ-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি, আচার বিশ্বাসের ছাপ কিছু কিছু বজায় আছে। সেই জন্য অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এখানকার আচার বিশ্বাসের কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়।

আবড়ো— আইবুড়ো।

অকুমারী— অনূঢ়া অর্থে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরের অবিবাহিতা কুমারী মেয়েকে বলা হয়। ৯-১০ বৎসরের মেয়েকে অকুমারী বলে। সাধারণত ৯ বৎসর পর্যন্ত মেয়েকে প্রকৃত কুমারী বলা হত প্রাচীন কালে।

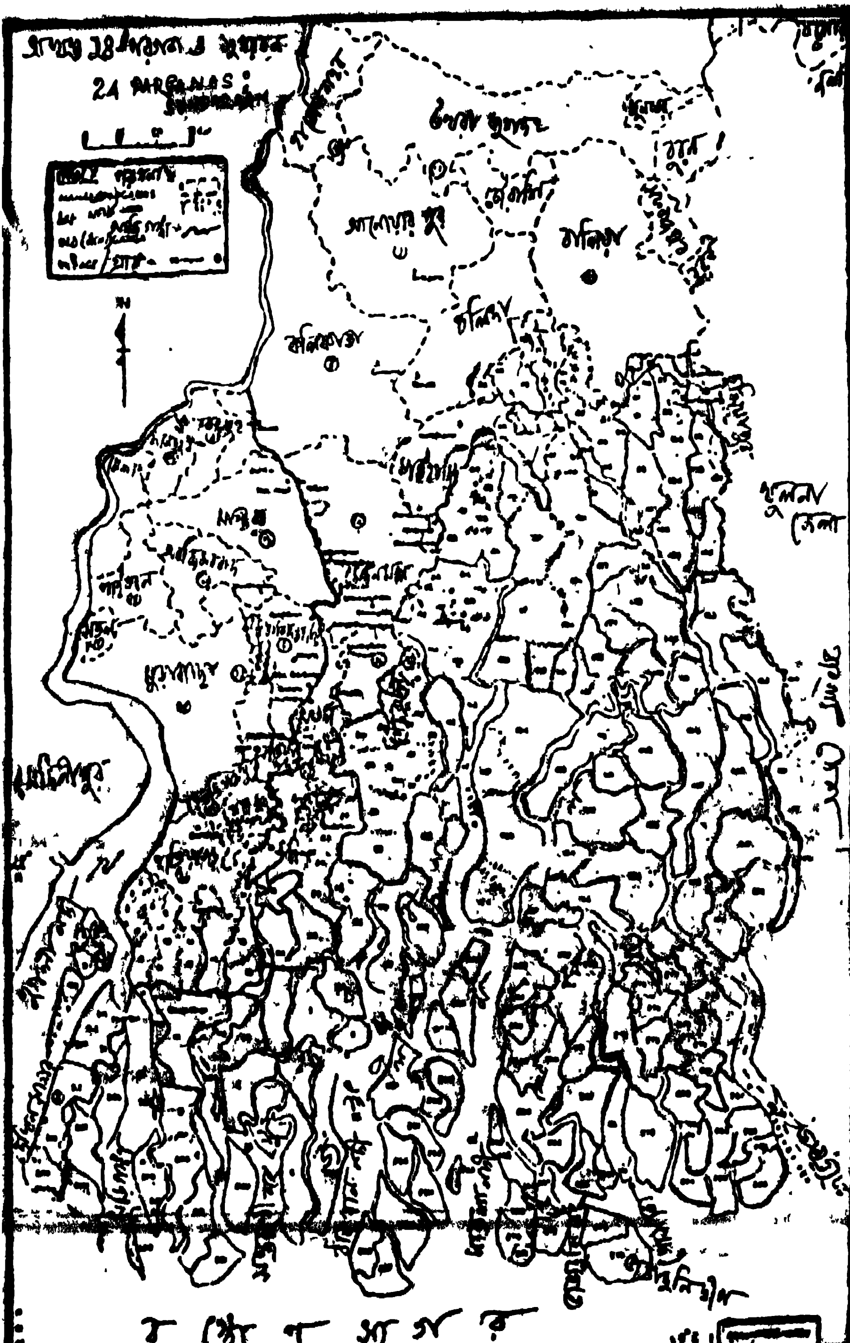
উঁচকপালী— যে মেয়ের কপাল উঁচু সেই মেয়ে সুলক্ষণযুক্ত নয়। ফলে বিবাহের যোগ্য পাত্রী নয়।

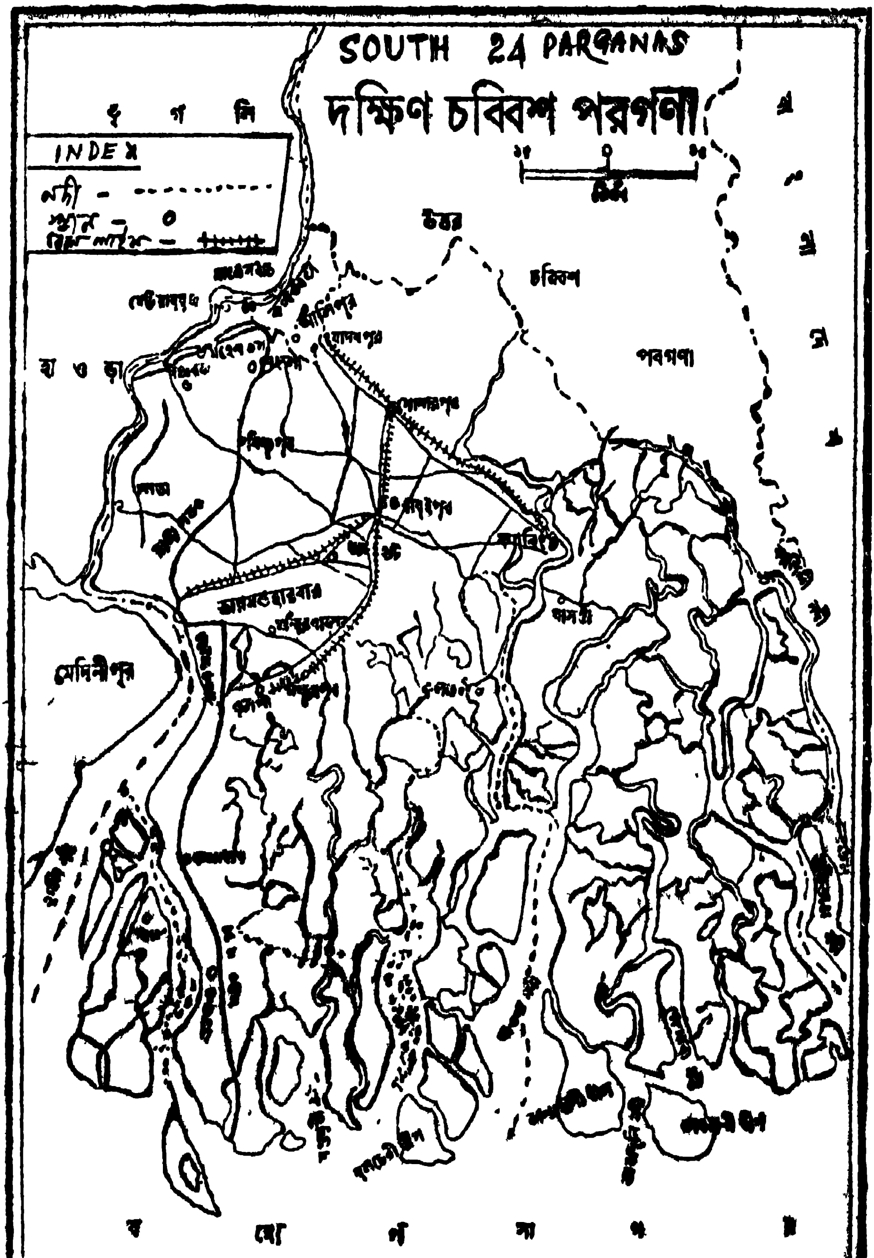
চিরুণদাঁতি— চিরুনীর মত দাঁত যে মেয়ের— সে কুলক্ষণা। বিবাহের পক্ষে সুযোগ্য পাত্রী নয়।

বিড়াল চোখী—বিড়ালের চোখের মত কটা চোখ যে মেয়ের— সে মেয়ে সুলক্ষণা নয়।

খড়ম পেয়ে— খড়মের মত পা— সুলক্ষণা কন্যা নয়। এখানে খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটার মত চলার কথা বোঝানো হয়েছে।

অধিবাস— বিবাহের দিনের এক ধরনের অনুষ্ঠান। বলা যায় বিবাহ অনুষ্ঠানের সূচনা। বিভিন্ন দ্রব্যের বরণডালা সাজিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হয়।


24 PARGANAS
খুলনা জেলা



SOUTH 24 PARGANAS
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
INDEX
নদী
মেদিনীপুর

মঙ্গল সূতো— অধিবাসের পর হলুদ মাখানো সূতোতে দূর্বা বেঁধে বর কনের হাতে বাঁধা হয়।

আইবুড়োভাত— নতুন কাপড় পরে এয়ো স্ত্রী পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্না করে বর/কনেকে খাওয়ায়। এটি বিবাহের মূল অনুষ্ঠানের পূর্বের কাজ।

নানিমুখ— নান্দী মুখ। বিবাহের পূর্বে পিতৃপুরুষকে স্মরণ ও অন্নজল উৎসর্গ করা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

আভ্যুতি— আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ। নান্দীমুখের মধ্যেকার অনুষ্ঠান।

কামানো— বরকামানো/কনে কামানো। নাপিত ডেকে বর/কনের ক্ষৌর কার্য সম্পাদন।

নখকাটা— নাপিত ডেকে নখ কাটবার অনুষ্ঠান।

ছাঁদনা তলা—বিবাহের নির্দিষ্টস্থান। এখানে বর ও কনেকে দাঁড় করিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাঁদনাতলাই বিবাহ-অনুষ্ঠানের মূল মণ্ডপ/স্থান।

বর বড়/কনে বড়— বিবাহের সময় পিড়িতে কনেকে বসিয়ে বরের সামনে উঁচু করে তুলে ধরা হয় যাতে দেখানো যায় কনে বরের চেয়ে বড় অর্থাৎ বেশি লম্বা। কনেকে এই ভাবে উঁচু করে তুলে ধরে কনের ভগ্নিপতিরা— এটাই প্রথা।

হুলাহুলি— উলুধ্বনি দিয়ে আমোদ/আহ্লাদ করা এক প্রকারের লোকাচার।

সাতপাক ঘোরা— ছাঁদনা তলায় বরকে দাঁড় করিয়ে কনেকে পিঁড়িতে করে বরের চতুর্দিকে সাতপাকে ঘোরানো। এতে কনে বরকে সাতপাকে বেঁধে ফেলে— এই বিশ্বাস।

মালাবদল ও শুভদৃষ্টি— সাত পাক ঘোরার পর বর কনের মালাবদল হয় এবং বর ও কনের মাথার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বর ও কনের চারিচক্ষের মিলন ঘটে।

বে— বিবাহ

পুনুব্যে— পুনর্বিবাহ। কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে বিবাহ হত। এর পর কন্যা ঋতুমতী হলে দ্বিতীয়বার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। এই অনুষ্ঠানে মূলতঃ যৌন শিক্ষা দেওয়া হতো। রাত্রে নিভৃতে বর-বধূকে যৌন শিক্ষা দিতেন কিছু বয়স্কা মহিলা। বর্তমানে এই প্রথা ও আচার দক্ষিণ পরগনায় খুবই কম দেখা যায়।

কথা চালাচালি— ঘটক মারফৎ কিংবা অন্য কোনরকম ভাবে বিবাহের কথা চালনা করা হলে।

পাকা দেখা— বিবাহের কথা পাকা করা হয় যে অনুষ্ঠানের মধ্যে।

সম্বন্ধ পত্র— বিবাহের কথা পাকা হলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ নূতন সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কিত পত্র পাঠায়। কন্যাপক্ষ নূতন সম্বন্ধ স্বীকার করে অনুমতি প্রার্থনা করে ও বরপক্ষ নূতন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বীকার করে অনুমতি দেয়।

আবরো ডুব— বিবাহের দিন ভোরে— বর ও কন্যার স্নান করাকে বলে।

নিরামিষি— বিবাহের পূর্বের দিন নিরামিষ খাওয়াকে বলে।

গায়ে হলুদ— বিবাহের দিন এয়ো স্ত্রী গণ মিলে বর ও কন্যাকে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করায়।

আখবৃত্তি— পিতলের রেকাবে চালগুঁড়ো/পিটুলির ঠাকুর তৈরী করা হয়। বিভিন্ন রঙ দিয়ে কারুকার্য করা হয়। এটা বরণ করার সময় প্রয়োজন হয়।

পিঁড়িচলা— বড় বড় কাঠের পিঁড়ির উপর আলপনা আঁকা হয়। এই পিঁড়ির উপর বর ও বধূ দাঁড়ায় এবং বসে।

জলসওয়া/জলসহা— বিবাহের দিন এয়োরা মিলে বাজনা বাজিয়ে শঙ্খধ্বনি করে জল আনতে যায়।

কনকাঁচলি— কনকাঞ্জলি। বিবাহে যাত্রার পূর্বে বর মাকে কনকাঞ্জলি দিয়ে মায়ের কাছে অনুমতি ভিক্ষা করে। এই অনুষ্ঠানে বর তার মাকে বলে — "মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।" প্রাচীন সমাজে স্ত্রীকে দাসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হত না। এখানে তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

কোলবর— নিতবর। বরের সহযাত্রী ছোট ছেলে।

বর আগান— কন্যাপক্ষ থেকে বরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মিষ্টি মুখ— বর কন্যার বাড়ীতে এলে মাতৃস্থানীয়া কেউ বরকে মুখে মিষ্টি দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করায়।

কলাপুকুর— মাটিতে বড় গর্ত করে চারদিকে কলা গাছ পুঁতে সাময়িক পুকুর তৈরী করা হয়। এখানে বর বউ স্নান করে।

ছাউনি ফেরা— একশত আটটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বর বউকে বরণ করার এক প্রকার অনুষ্ঠান। এক প্রকার স্ত্রী আচার।

শুভদৃষ্টি— বর ও কনের চারি চক্ষুর মিলন।

গাঁটছড়া— বর ও কনের কাপড়ে গিঁট বাঁধার অনুষ্ঠান।

সঁপে দেওয়া— কন্যাকে বরের হাতে সমর্পণ/সম্প্রদান করা।

তারা দেখা— সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে আর একটি নক্ষত্র আছে— যার নাম অরুন্ধতী। এই বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর কাহিনী পুরাণে দাম্পত্য জীবনের অক্ষয় উদাহরণ। বিবাহের শেষের দিকে তাই এই দুই নক্ষত্রকে দেখান হয়— অর্থাৎ নব বর বধূর জীবন যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর জীবনের মত অক্ষয় দাম্পত্য সুখে ভরে ওঠে।

দোর ধরা— বর ঘরে ঢুকতে গেলে দরজা আটকে দেওয়া হয়। কিছু টাকা পয়সা পেলে তবে দরজা খুলে দেওয়া হয়।

শান্তি জল— বিবাহের শেষে ব্রাহ্মণ শান্তি জল দেন। যাতে সব কিছুতে শান্তি হয়।

টিল মারা— বিবাহের সময় আনন্দ করার জন্যে ফুল টিল ছোঁড়া হয়। মূল লক্ষ্য বর ও কিছু পয়সা আদায় করা।

চালের বাতা না ধরা— বিবাহের সময় চালের বাতা ধরতে নিষেধ করা হয়। এতে বর বধূর অকল্যাণ হয় বলে বিশ্বাস।

জামাই বরণ, মাতুল বরণ, প্রতিবেশী বরণ— বর ছাড়া অন্য জামাইদের, মাতুলকে ও প্রতিবেশীকে কাপড়, পান, সুপারি ও টাকা পয়সা দিয়ে বরণ করা হয়।

বাসিবে/বাসি বিয়ে— বিবাহের পরদিন বরকনের বরের বাড়ী যাওয়ার আগের অনুষ্ঠান।

টক পান্তা— বিবাহের পরদিন প্রতিবেশির বাড়ীতে টক পান্তা খাওয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি প্রথা।

পুকুর কাটা— বরের বাড়ীতে জামাইরা বর ও কনের স্নানের জন্য সাময়িক পুকুর কাটে।

কড়িখেলা/জাঁতি খেলা— স্নানের সময় বর ও কনে কলা পুকুরে বসে জলের মধ্যে কড়ি দিয়ে ও জাঁতি নিয়ে খেলা করে। এয়োরা উৎসাহ দেয়।

ধান ছড়ান— স্নানের পর কনে পালিজোতি ধান মাথায় করে নিয়ে যায় ও বর জাঁতি দিয়ে পিছনে পিছনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। পরে দুজনে মিলে খুঁটে নেয়।

অন্নবস্ত্র— অন্ন ও বস্ত্র দেওয়া অনুষ্ঠান। ববেব বাড়ীতে বব কনেকে অন্ন ও বস্ত্র দিযে নূতন সংসাবে আবাহন কবে।

পাক স্পর্শ— ববেব বাড়ীতে বধূ বন্ধন কবে সকলকে খাওযায অর্থাৎ বধূ নূতন সংসাবে প্রথম পাক স্পর্শ কবে।

ধূলপায়ে লগ্ন— বিবাহেব কযেকদিন পবে বব কনেকে নিয়ে কনেব বাপেব বাড়ীতে যায এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিবে আসে। ধূলাপাযে কনেব বাপেব বাড়ী থেকে যাত্রা কবাব মুহূর্তকে বলা হয।

হলুদ ছাড়ান— বিবাহেব দিন গাযে যে হলুদ দেওযা হয বিবাহেব পবে এক অনুষ্ঠানে সেই হলুদ ত্যাগ কবা হয়।

দ্বিরাগমন— বিবাহেব পব বধূব দ্বিতীযবাব শ্বশুববাড়ীতে গমন।

চোত পালন, পোষ পালন, ভাদ্দর পালন— চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে বধূ শ্বশুব বাড়ীতে থাকে না। বাপেব বাড়ীতে কাটায।

ঝিউড়ি— বিবাহিতা মেযেদেব বাপেব বাড়ীতে 'ঝিউড়ি' বলে।

কনেপণ— কন্যাপণ। আমাদেব দেশে ববপণ প্রথা প্রচলিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কনেপণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ বিবাহ উপলক্ষে ববপক্ষেব তবফ থেকে কনেপক্ষকে পণ দিতে হত। সাধাবণতঃ নিম্নশ্রেণী ও গবীব মানুষদেব মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

জোড়ে বিদায়— বিবাহেব পব বব ও কনেকে কনেব বাপেব বাড়ী থেকে এক সঙ্গে বিদায় দেওযাকে বলা হয।

ধরাবর, ধবা বিয়ে— এই ধবনেব বিবাহ প্রচলিত সামাজিক বীতি মেনে হয না। বিবাহেব আগেব দিন ববকে জোব কবে ধবে আনা হয কনেব বাড়ীতে। সেখানেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয। যে সব ক্ষেত্রে ববপক্ষেব অমত থাকে সেখানে এই ভাবে লুকিযে (চুবি কবে) বিবাহ কার্য সম্পন্ন কবা হয। বর্তমানে এই প্রকাবেব বিবাহও মোটামুটি সামাজিক বীতি হিসাবে পবিগণিত হচ্ছে। এই ভাবে বিযেব বব হল ধবা বব।

বদল বিয়ে— সাধাবণতঃ এক পক্ষেব ভাই ও বোন অপবপক্ষেব ভাই ও বোনেব সঙ্গে বিবাহ হলে বদল বিযে হয।

গোধূলি লগ্ন— পাঁজি অনুযাযী বিবাহেব লগ্নেব প্রযোজন নেই। যে-কোন দিন গোধূলি বেলায় বিযে হতে পাবে।

কোল সরা (মা)— বিবাহ কার্যে কনেব মা ব্যতীত অন্য কোন মেযে কনেব মাযেব ভূমিকা পালন কবলে সেই মেযেব সঙ্গে কনে 'কোল সবা' সম্বন্ধ পাতায।

কোলসরা (বাপ)— কোল সবা মা-এব মত সম্বন্ধ।

তালি মশাই— তালুই মশাই। বোনেব শ্বশুবকে বলা হয়।

আঐ মা— বোনেব শাশুড়ীকে বলা হয।

বেই— বেহাই অর্থে।

দোজ বর— কোন লোকেব প্রথম বাবেব স্ত্রী মাবা গেলে দ্বিতীয়বাব বব হিসাবে বিবাহ করতে গেলে।

ভাতার— ভর্তা অর্থে। স্বামীকে বলা হয়।

[illegible]— বাপের বাড়ীতে বিবাহিতা মেয়েকে বলা হয়।

গাছ বিয়ে— কোন লোকের দ্বিতীয়বার স্ত্রী মারা গেলে তৃতীয়বার বিবাহ করার পূর্বে কোন গাছকে বিবাহ করতে হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এটি প্রাচিন রীতি। বর্তমানে এই প্রকার বিবাহের প্রচলন নেই। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের অজ বিবাহের কথা মনে পড়ে।

ইঁদুর মাটি— বিবাহের পরদিন কনের বাপের বাড়ী থেকে বর কনের বিদায় নেওয়ার সময় কনে বাবা ও মায়ের হাতে ইঁদুর মাটি দেয়। এতে লালন-পালনের ঋণ শোধ ও এতদিন যেখানে সে আবাল্য অতিবাহিত করেছে সেই বাপের বাড়ীর মায়া ত্যাগ করে। এই প্রথাটি মর্মস্পর্শী।

শয্যাতুলুনি— বিবাহের পরদিন বর কনের বিছানা যে তোলে তাকে কিছু টাকা পয়সা দেওয়াই একপ্রকার প্রথা।

মুখদেখা— নববধূর মুখ দেখতে গেলে কিছু উপহার দেওয়াই রীতি/প্রথা।

নমস্কারি— নববধূ গুরুজনদের নমস্কার করে কিছু উপহার দেয় যেমন— কাপড় বাসন ইত্যাদি। একে বলে নমস্কারি। বিনিময়ে গুরুজন নববধূকে উপহার দেন।

কাল রাত— বিবাহের পরের দিনের রাত্রি বা রাত হল কালরাত। এই রাতে বর ও বধূর দেখা সাক্ষাৎ এবং মিলন নিষিদ্ধ।

এইভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিবাহ সম্পর্কিত বহু আচার অনুষ্ঠানের এবং প্রথা-বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও অনেক খুঁটিনাটি ও সাধারণ লোকাচারের উল্লেখ করা হলনা— যেগুলি কথ্যভাষার আলোচনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মৃত্যুই মানবজীবনের শেষ ও চরম পরিণতি। নানা বর্ণে রঞ্জিত যে জীবন এতদিন সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে— সেই জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু হিন্দু দর্শন অনুযায়ী দেহের মৃত্যু ঘটে দেহীর মৃত্যু হয়না। এখানে দেহী অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার পুনর্জন্মও হয়ে থাকে। তাই মৃত্যুতে দেহের পতন ঘটলেও আত্মার নবজীবনের শুরু বলা যায়। সুতরাং হিন্দুদর্শন অনুযায়ী মৃত্যুর অর্থ হল দেহান্তর প্রাপ্তি। আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জন্ম— এই দুটি প্রধান তত্ত্বের উপর হিন্দুধর্মের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা দণ্ডায়মান। একে জন্মান্তর বলা হয়। তবে আত্মা অবিনাশী হলেও দেহ নাশের পর তার বিভিন্ন প্রকার অবস্থা তথা গতি প্রাপ্তি ঘটে। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে আত্মার বিভিন্ন ভোগ ঘটে— পুণ্যকর্মের জন্যে স্বর্গভোগ এবং পাপকর্মের জন্যে নরকভোগ ঘটে থাকে। আবার স্বর্গ জীবের চরম গতি নয়— পরম ব্রহ্মে লীন হওয়াই জীব তথা আত্মার পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। তাই মৃত্যুর পর মৃতের আত্মার যাতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিংবা পুনর্জন্ম ঘটলে তা যেন সুন্দর হয়— এই সব কামনা করে মৃত্যুর পর বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই আচার অনুষ্ঠানগুলি কোথাও কোথাও শাস্ত্রসম্মত আবার কোথাও লৌকিক কোন সংস্কার ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মার পুনর্জন্ম বিষয়ে কিছু যোনিরূপ কল্পনা করা হয়। যেমন— অশ্ব-যোনি, মনুষ্য-যোনি, দেবযোনি প্রভৃতি। এই ধারণা যতটা না শাস্ত্রসম্মত, তার চেয়ে বেশি সংস্কার ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর থেকে নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করান হয়— যার মূল লক্ষ্য হল আত্মার সদ্গতি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মৃত্যু এবং মৃতদেহ-সৎকার সম্পর্কিত বহু আচার বিশ্বাস সংস্কার, ও ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব আচার বিশ্বাস, সংস্কার, ক্রিয়াকলাপগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এগুলিতে প্রাচিন কালের সামাজিক বিধি নিয়মের অনুবর্তন ঘটেছে কিছু কিছু

ক্ষেত্রে। এক প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ছায়াপাত ঘটেছে কোথাও কোথাও। কোথাও আবার অস্ট্রোলয়েড কিংবা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থার ছাপ আছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সামাজিক রীতি নীতি সংস্কার বিশ্বাসের প্রচলন আছে তা অনেকাংশে মিশ্র প্রকৃতির।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এক সময় এই অঞ্চলে কেবলমাত্র নিষাদ কিংবা কিরাত-বর্গীয় মানুষের বসবাস ছিল। তাদের নির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত সুগঠিত কোন সমাজব্যবস্থাই ছিল না। শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্যে তারা যথেচ্ছ বসবাস করত। পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রদেশ থেকে আগত পৌণ্ড্র যোদ্ধাগণ, কিছু পরাজিত নৃপতি, নির্জন স্থানাকাঙ্ক্ষী সাধক প্রভৃতি মানুষের সমাগম ঘটে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় লালিত বিভিন্ন প্রকার মানুষের মিলনে নূতন এবং মিশ্র আচার ব্যবস্থা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা দক্ষিণবঙ্গের সুবর্ণ যুগে যখন গঙ্গরিডি জাতির চরম উন্নতি ঘটেছিল এই অঞ্চলে তখনও এই অঞ্চলে সমাজব্যবস্থার মিশ্র রূপ বর্তমান ছিল। সেখানে আবার ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটেছিল। সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রাচীন কাল থেকেই মিশ্র সামাজিক ব্যবস্থার ধারা বয়ে চলে আসছে।

আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদ'- এর ৫০ সংখ্যক পদে শবদাহের উল্লেখ আছে। এতে আছে— চারিটি বাঁশে চাঁচাড়ি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শবদাহ ব্যবস্থায় এই প্রকার রীতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে সদ্য কাঁচা বাঁশ কেটে চারদিকে চারটে খুঁটির উপর 'চ্যাড়া' (বাখারি) দিয়ে খাটিয়া তথা 'খাটরি' প্রস্তুত করে তার ওপর মৃতদেহকে শুইয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মোট কথা এই মৃত্যু-পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ-প্রথা-সংস্কার, বিশ্বাস-রীতি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

এখন মৃত্যু, মৃতদেহ সৎকার, মৃতের আত্মার সদগতি প্রভৃতি বিষয়ক শব্দাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

মড়া— মৃতদেহ।

বাসিমড়া— একদিনের বেশি সৎকার না করা মৃতদেহ।

দোষ পাওয়া— তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী মৃতে দোষ ঘটে। এক পাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ দোষ ইত্যাদি ঘটে থাকে। দোষগ্রস্থ হলে আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

খাবিটানা— মুমূর্ষু বা অন্তিম অবস্থায় মানুষ যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য আকুলি বিকুলি করে।

চোখ ওল্টানো— মৃত্যুর সময় মানুষের চোখের পাতা উল্টে যায়।

নাম শোনানো— মৃত্যুর সময় মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির কানের কাছে হরিনাম তথা ভগবানের নাম শোনানো হয়।

খাটরি— মৃতদেহ বহন করার জন্য কাঁচা বাঁশের তৈরী খাটিয়া।

শামুই— শ্মশানযাত্রী। মৃত দেহ সৎকার করার জন্যে শ্মশানে অনেক লোক যায়।

দায়ী ব্যক্তি— মৃতের সন্তান বা মুখাগ্নি করার অধিকারী বা সৎকার করায় অধিকারী ব্যক্তি।

কাঁধ ধরা— মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় বা অতি আপন লোকেরা সাধারণতঃ মৃতদেহকে কাঁধে করে নিয়ে যায়। কাঁধে বেশি ভার বোধ হলে অন্যজন কাঁধ বদল করে তার লাঘব করে। একে কাঁধ ধরা বলে।

খই-পয়সা ছড়ান— মৃতদেহ যে যে পথ দিয়ে যায় সেই পথে আগে আগে খই আর পয়সা ছাউয়ে ছড়িয়ে যাওয়া হয়। এটা এক ধরনের প্রথা।

মড়াকান্না— মড়ের জন্য কান্না। কিন্তু শব্দটি এখন ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়।

হরিধ্বনি— মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় থেকে সৎকার পর্যন্ত 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি দেওয়া হয়। এটাও এক ধরনের লোকাচার।

চিতে সাজান— মৃতদেহকে দাহ করার জন্য চিতা প্রস্তুত করা হয় কাঠের উপর কাঠ সাজিয়ে।

উত্তর শিউরি— উত্তর শিয়রী। দাহ করার পূর্বে মৃতদেহকে উত্তর দিকে মাথা করে রাখা হয়। বোধ হয় যমদ্বারের কল্পনা করে এই লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখে আগুন— মুখাগ্নি। চিতায় মৃত দেহকে দাহ করার পূর্বে জ্যেষ্ঠপুত্র অবর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠপুত্র অবর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগণ মৃতদেহের মুখে অগ্নিসংযোগ করে। এটা লোকাচার।

পোড়ালি— পোড়ালি ব্রাহ্মণ। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্মশানে মুখে আগুন দেওয়ার পূর্বে মন্ত্র পড়ায়। মৃতের আত্মার সদগতি কমনা করে এই মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ করলে মৃতের আত্মা স্বর্গে গমন করে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে লোকাচার ও লোক বিশ্বাসের মিলন।

পাটুনী— পারঘাটার মাঝি। এরা মৃতের আত্মাকে ভবসিন্ধু পার করে অমৃতলোকে নিয়ে যায়। পাটনিকে পারকরার জন্যে মূল্য দিতে হয়। প্রাচীন কালে লোকে 'কড়ি' দিয়ে পার হত। বর্তমানে অনেক টাকা-পয়সা দিতে হয়। সাধারণ অর্থে পাটনিকে খেয়ামাঝি বা পার ঘাটার মাঝি বলা হয়ে থাকে। ছোট নদী বড় খাল বা জলাশয়ে যারা এ পার থেকে ওপারে পার করে দেয় তাদের পাটনি বলে। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক শ্রেণীর জীবিকাধারী মানুষ আছে যাদের কাজ হল মৃতের সদ্‌গতিতে সাহায্য করা। এরাও 'পাটুনী' বা 'পাটনি' নামে পরিচিত। এরা মৃতের ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি গ্রহণ করে। ''পাটনী' কে পয়সা না দিলে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয় না বলে আমাদের বিশ্বাস।

সৎ— মৃতদেহের অবশিষ্ট অংশ। মৃত দেহের যে অংশটিকে কিছুতেই পোড়ানো যায় না—দাহ করার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাকে 'সৎ' বলা হয়। 'সৎ' শব্দের বহু অর্থ। কিন্তু এখানে সম্ভবত 'সত্তা' অর্থ প্রযুক্ত। এখানে সৎকার, সৎ গতি = সদ্‌গতি প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষনীয়।

চিতে নেভানো— কলসি করে জল এনে প্রজ্বলিত চিতার আগুন নেভানো।

চিতে ভাসানো— চিতার আগুন নেভানোর পর চিতা ভাসানো। যাত্রী সকলেই এই কাজে সাহায্য করে। এতে পুন্য সঞ্চয় হয় বলে বিশ্বাস। জল ঢেলে চিতা ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সৎ পোঁতা বা মাটি দেওয়া— সৎ-কার্যের শেষ পর্যায় হল সৎ-পোঁতা বা মাটি দেওয়া। 'সৎ'-কে ভাল করে ধুয়ে নতুন কাপড়ে ঢেকে তার সঙ্গে কড়ি, পয়সা, ধাতু দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পোঁতা হয়। শবযাত্রী সকলেই এই মাটি দেওয়ার কাজে যোগ দেয়। প্রথমে মৃতের পুত্র কন্যারা কিংবা দাযী ব্যক্তি পরে অন্যান্য শবযাত্রী সবাই মাটি দেয়। 'মাটি দেওয়া' কথাটির একটি সাধারণ অর্থ আছে। কিন্তু মৃতদেহের সৎকার প্রসঙ্গে 'মাটি দেওয়া' শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কলসি ভাঙা— সৎকার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে যে কলসি (সাধারণতঃ মাটির কলসি ব্যবহৃত হয়) করে জল আনা হয় তা ভেঙে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'কলসি ভাঙা'। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে লোক সংস্কার জড়িয়ে আছে। 'কলসি ভাঙা' প্রতীক ক্রিয়াকে ব্যবহৃত হয়।

এত দিনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না ভরা জীবনের প্রকৃত সমাপ্তি ঘোষণা করা হল— জীবন রূপ ঘট আজ ভেঙে গেল।

গলায় কাছা— পুত্র বা নিকট আত্মীয় শোক চিহ্ন স্বরূপ নতুন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে। সাধারণতঃ থান কাপড় দুই খণ্ড করে এক খণ্ড পরে এক খণ্ড উত্তরীয় হিসেবে ব্যবহার করে ও এর যাল ছিঁড়ে নিয়ে পৈতার মত গলায় রাখে। একে বলে গলায় কাছা।

আগুন সেক— শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ীতে ঢোকার সময় সময় আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিয়ে অর্থাৎ অগ্নি শুদ্ধ হয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হয়।

শাঁখা ভাঙা, নোয়া খোলা, সিঁদুর মোছা— মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে এবং স্ত্রী জীবিত থাকলে এই অনুষ্ঠানগুলি হয়।

আলতা ছাপ— মৃত বা মৃতার পায়ে আলতা লাগিয়ে সাদা কাগজে ছাপ নেওয়া হয়। অনেকে এগুলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে, রোজ পূজা করে, নমস্কার করে।

গামুই ভোজন — শবযাত্রীদের খাওয়ানো হয়। একে গামুই ভোজন বলে।

কাকবলি বা কাগবলি— মাটির চারকোনা বেদী তৈরী করে তার উপর একখণ্ড কলার পাতায় কিছু আতপ চাল, মিষ্টি (সাধারণতঃ বাতাসা বা সন্দেশ) এবং মাটির পাত্রে জল রেখে কাককে খেতে দেওয়া হয়। আমাদের সংস্কার মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কাকের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়। তাই কাককে খাওয়ালে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে খাওয়ানো হয় বলে মনে করা হয়।

মালসা ভাত— মৃত বা মৃতার পরিবার নতুন মালসাতে হবিষ্যান্ন রান্না করে খায়, দিনে মাত্র একবার— একে বলে মালসা ভাত।

দশা— মৃত্যুর নবম দিনে মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে কিছু পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয়। একে দশা বলে। সাধারণতঃ পুকুরঘাটে— যেখানে কাগবলির জল দেওয়া হয়— সেখানে এই পারলৌকিক ক্রিয়া (পিণ্ডদান মূলক কাজ) করা হয়।

পিণ্ডি/পিণ্ড দেওয়া— আতপ চাল, পাকা কলা, তিল ইত্যাদি মিশিয়ে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় কিছু মন্ত্রপাঠের সাহায্যে।

ঘাট/ঘাট শ্রাদ্ধ— মৃত্যুর পর বিশিষ্ট পারলৌকিক ক্রিয়া হল শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের পূর্বদিন ঘাট বা ঘাটশ্রাদ্ধ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই অনুষ্ঠানটি কেবল 'ঘাট' নামে পরিচিত। সাধারণতঃ পুকুর ঘাটে এই অনুষ্ঠানটি হয় এবং মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান এর মূল কাজ।

গোয়ালশ্রাদ্ধ— গোয়ালে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

শ্রাদ্ধ— 'শ্রাদ্ধ' শব্দটির অর্থ হল— শ্রদ্ধা পূর্বক দান। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধা পূর্বক দান। শ্রাদ্ধ বিভিন্ন রকম আছে। বিভিন্ন পারলৌকিক ক্রিয়া, পিণ্ডদান প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের কাজ। মৃত্যুর পর একমাস কিংবা ত্রয়োদশ দিনে এইঅনুষ্ঠান হয়।

তেরাত্তির শ্রাদ্ধ/চতুর্থ— মৃত্যুর তৃতীয় দিনে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ অপঘাতে মৃত্যুর জন্য এই বিধান।

তেরোদশা— ত্রয়োদশা।

ভুজ্যি— মৃতের উদ্দেশ্যে ভোজ্যদান। এও এক ধরনের লোকাচার।

আগুন ছাড়ান— মৃত্যুর এক বৎসর পর মৃতের নিকট আত্মীয় যারা শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল— পুনরায় শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন সংক্ষিপ্ত ভাবে। একে বলে আগুন ছাড়ান।

আঁষ পান্না— নিয়মভঙ্গ। শ্রাদ্ধের পরদিন মৃতের পরিবারবর্গ আমিষ আহার গ্রহণ করে যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে বলে 'আঁষপান্না'।

অন্যান্য লোকাচার, লোকপ্রথা, লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার

সই পাতানো— দু'জন নারীর মধ্যে অনুষ্ঠান করে বন্ধুত্ব স্থাপন। সাধারণতঃ তিল তুলসী ও গঙ্গা জল হাতে নিয়ে 'সই পাতানো' হয়। এটা এক ধরনের প্রথা।

মিতে পাতানো— দুজন পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন। এও সই পাতানোর মত অনুষ্ঠান করে হয়।

শাঁখা বাঁধা, সিঁদুর বাঁধা, নোয়া বাঁধা— বিবাহিতা নারীরা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতার কাছে শাঁখা সিঁদুর বাঁধা বেখে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

বার করা— ব্রত পালন করা। বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ কৃত্য সম্পাদন করা। সাধারণতঃ উপোস থেকে, কিংবা নিরামিষ আহার করে পূজা-পাঠ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। আবার বিশিষ্ট দিন (Day) পালন করা হয়। যেমন— দেবী মঙ্গল চণ্ডীর জন্য মঙ্গলবার, শনিদেবতার জন্য শনিবার ইত্যাদি পালন করা হয়।

বেরতো— ব্রত। দেবতার অশীর্বাদ প্রার্থনা করে বিশেষ কৃত্য সম্পাদন করা। ব্রত বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন শিবচতুর্দশী ব্রত।

উপোস— না খেয়ে কোন ব্রত পালন করা। উপবাস। যেমন— বড় ঠাকুরের (শনি দেবতা) উপোস।

মকর পাতানো ও গঙ্গাজল পাতানো— 'সই' পাতানো'-র প্রকার ভেদ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'সই'কে মকর বা গঙ্গাজল বলা হয়।

মানত— মানসিক। কোনো প্রাপ্তি, রোগমুক্তি বা কোনো কিছু সুরাহার জন্যে ভগবানের কাছে শর্তসাপেক্ষে অঙ্গীকার করা।

মাগুন— মানত পূর্ণ করার জন্যে দরজায় দরজায় ভিক্ষা করা। এটা এক প্রকার প্রথা ও আচার। বিভিন্ন দেবদেবীর জন্যে বিভিন্ন প্রকার মাগুনের ব্যবস্থা। যেমন— মা মনসার মাগুন, মা শীতলার মাগুন, পীরগাজির মাগুন ইত্যাদি। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই মাগুনগুলি পালন করা হয়।

বিল মাগুন— বিশেষ ধরনের মাগুন। সাধারণতঃ পীরগাজির পূজোর জন্যে এই মাগুন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'বিল মাগুন' অনুষ্ঠানটি অদ্ভুতভাবে পালিত হয়। সারাদিন মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করা হয়। ভিক্ষায় সংগৃহীত চাল ও টাকা-পয়সা দিয়ে পূজার দ্রব্য কেনা হয়। সন্ধ্যায় পীরের স্থানে পূজা হয়। মুসলমান ফকির এই পূজা করেন। এই বিল মাগুনের ছড়া আছে। যেমন— 'ঘরে কেনরে আলো ?— গিন্নি গেছে বিলমাগুনে সবাই আছে ভালো।'

বড় ঠাকুর— বিশেষ সম্মান দেবার জন্যে বড় কাউকে নাম ধরা হয় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই সংস্কারটি অদ্ভুতভাবে প্রচলিত। তাই বড় দেবতা অর্থে শনি দেবতাকে বড় ঠাকুর বলা হয়। তেমনি সাংসারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে 'ভাসুর' কে বড় ঠাকুর বলা হয়।

মানুষের জীবন অসংখ্য প্রথা, আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসে পূর্ণ। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত নানা প্রকার কর্মের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হয়।

এই কর্মগুলি আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা দিয়ে মোড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনজীবনে এ গুলির বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায়। ঘুম থেকে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সেগুলি—

ঠাকুরের নাম গান— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু মানুষের অভ্যাস ভোর বেলা চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেবতার নাম স্মরণ করা। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষরা 'জয়গৌর জয় নিতাই' বলে শয্যাত্যাগ করেন। অনেকে আবার খোল করতাল বাজিয়ে নামগান করেন। এটা এক প্রকার আচার।

নিত্যকর্ম— 'নিত্যকর্ম' শব্দটির অর্থ দৈনন্দিন কাজ। আচারনিষ্ঠ হিন্দু সমাজে 'নিত্যকর্ম' অন্য ব্যাপার। উচ্চবর্ণের হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সন্ধ্যা-আহ্নিক, তর্পণ ইত্যাদি কিছু আচার পালন করেন। এ গুলিকে নিত্যকর্ম বলে।

তর্পণ— পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জল দান। একপ্রকার আচার।

পা ধোওয়া/পাদ্য অর্ঘ্য— বাড়ীতে বিশিষ্ট অথিতি, কুটুম্ব, গুরুস্থানীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মানুষের আগমন ঘটলে পা ধোওয়ানো হয় কিংবা পা ধোয়ার জল দেওয়া হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই রীতি/প্রথাটি আজও বজায় আছে।

অতিথি সেবা— বাড়ীতে অনাহুত অতিথির সেবা করার প্রথাটি আজও বিদ্যমান।

জলদান— জলদান করার প্রথাটি আজও বিদ্যমান। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে কোনো মেলা/তীর্থের যাত্রীদের জন্য পথের পাশে জলসত্র খোলা হয়। সেখানে জল, ভিজে ছোলা, গুড় কিবা বাতাসা রাখা হয় তীর্থ যাত্রীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। তেমনি বাড়ীতে কেউ জলপান করতে চাইলে তাকে শুধু জল দেওয়া হয়না। জলের সঙ্গে বাতাসা/গুড় মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু দেওয়া হয়।

সম্মান দেখানো— গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, বিশিষ্ট অতিথি, আত্মীয়-কুটুম্ব, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রভৃতি মানুষদের সম্মান দেখানো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি বিশিষ্ট রীতি। হাতজোড় করে নমস্কার, পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ, ভূমিতে লুটিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম, গলায় কাপড় দিয়ে নত হয়ে প্রণাম, পান সুপারি টাকা পয়সা দিয়ে বরণ করে সম্মান প্রদর্শন করার রীতি এই অঞ্চলে প্রচলিত।

শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া দান— বিবাহিতা রমনীকে কোন উৎসবে, বিশেষ অনুষ্ঠানে শাঁখা সিঁদুর ও লোহা দান করা একটা বিশিষ্ট প্রথা। এখানে লোহা অর্থে লোহার তৈরী চুড়ি জাতীয় অলংকার দেওয়া হয়।

নিষেধাজ্ঞা— সমাজে বাস করতে হলে অনেক রকম বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই বিধি নিষেধের বহর খুব। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকম ভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। যেমন— বিবাহের পর কালরাত্রি, বধূর মুখ দর্শন নিষেধ; ভাসুর-ভাদ্রবৌ-এর মধ্যে স্পর্শ, কথা বলা মুখ দেখানো নিষেধ; স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণ করা নিষেধ; কিছু কিছু জাতির মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ; মৃত্যু-অশৌচের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ নিষেধ, ঋতুমতী অবস্থায় নারীদের পূজা-উপাসনা ব্রত পালন প্রভৃতি কাজ করা নিষেধ; ঋতুমতী অবস্থায় পতি-সংসর্গ নিষেধ; গুরুবারে ভাজা-পোড়া করা নিষেধ; পূর্ণিমা অমাবস্যাতে ভাজা-পোড়া করা বা খাওয়া নিষেধ; শনি-মঙ্গলবারে বাঁশ কাটা নিষেধ; গুরুবারে নখ-চুল কাটা নিষেধ; 'অরন্ধন'এর দিন রান্না করা নিষেধ; রাত্রি পেটে বীজ বপন/রোপণ প্রভৃতি কাজ নিষেধ; বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বাড়ী থেকে নির্গত হয়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ; বালিশের উপর বসা

নিষেধ; সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া নিষেধ; ওল-কচু পোড়ানো নিষেধ:— এই রকম বহু বিধি-নিষেধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাড়ি দেওয়া বা ধার দেওয়া— ধান বা ঐজাতীয় শস্যদানা ধার দেওয়া একটা প্রথা ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। বর্তমানে এই প্রথা অবলুপ্ত প্রায়। একে বাড়ি দেওয়া বলে। ধান ফেরৎ দেওয়ার সময় সুদ হিসেবে কিছু বেশি ধান দিতে হয়।

উৎসব সমাজ জীবনের অঙ্গ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে লোক-উৎসবের প্রচলন আছে। এই সমস্ত উৎসবে বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি-সংস্কার মানা হয়। এগুলির মধ্যে প্রাচীন কালের সমাজ ব্যবস্থার ছায়াপাত ঘটেছে। [প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।]

লোক উৎসবের পিছনে কিছু কিছু সংস্কার-বিশ্বাস, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদি জড়িয়ে থাকে। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের লোক উৎসবগুলি ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু আচার বিশ্বাস কিংবা সংস্কারের পালন নয়, গ্রামের সরল মানুষরা মনে করেন— এগুলি ঠিক ঠাক পালন না করতে পারলে তাদের অমঙ্গল হবে, আবার ভালভাবে পালন করলে তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হবে। এখন এই বিষয়ের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

অম্বুবাচী পালন— ৭ই আষাঢ় থেকে তিনি দিন অম্বুবাচী। ধারণা এই —এই কয়দিন ধরণী রজঃস্বলা হন। তাই এই সময় ভূমিকে আঘাত করতে নেই। তাই ভূমিকর্ষণ, চাষবাস ইত্যাদি কৃষিকর্ম বন্ধ থাকে। হিন্দু বিধবারা এই তিনদিন বিভিন্ন ব্রত-আচার পালন করেন। এই তিনদিন আম-কাঁঠাল এবং দুধ খাওয়ার প্রথা আছে।

দশহরা— সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে দশহরা পূজা হয়। এদিন মনসা গাছ পোঁতা হয়। দশ রকম ফল দিয়ে পূজা হয়। দশহরার দিন বৃষ্টি হবেই— এই মানুষের বিশ্বাস। অনেকস্থানে অরন্ধন ও পান্তাভাত, সিদ্ধ প্রভৃতি খেয়ে দশহরা পালন করা হয়। দশহরার দিন থেকে সাপের বিষ তীব্র হয় বলে আমাদের বিশ্বাস— তাই মনসা পূজার আয়োজন। আসলে এটি গঙ্গা পূজা।

আকাশ প্রদীপ দেওয়া— কার্তিক মাস বাঙালী হিন্দুদের কাছে পবিত্র ও পুণ্য মাস। এই সময় দেবতাগণ ও মৃত ব্যক্তির আত্মা পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাঁদের আলো দেখানোর জন্যে যাতে অন্ধকারে তাঁদের পৃথিবীতে নেমে আসতে অসুবিধা না হয়— তার জন্যে আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা।

তালনবমী ব্রত পালন— ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে তাল নবমী ব্রত পালন করা হয়। তাল দিয়ে পূজো দেওয়া এবং তালবড়া খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

বিপত্তারিণী ব্রত পালন— সমস্ত রকম বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এই ব্রত পালন করা হয়। লাল কার (ঘুনসী) দিয়ে দূর্বাঘাস বেঁধে তাই হাতে বাঁধা হয়। ঘুনসীতে ৫/৭ গাঁট ফেলতে হয়। আষাঢ় মাসে এই ব্রত হয়।

ধর্মের জাত— বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়। অনেকখানি চৈত্র মাসের শেষে শিব পূজার সন্ন্যাসী হওয়ার মতো। এখানেও গলায় উত্তরী নিয়ে সন্ন্যাসী ব্রত পালন করা হয়।

বর্তমানে মানুষ যুক্তি, জ্ঞান, বিচার-বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠলেও অনেকক্ষেত্রে প্রকৃতির কাছে এখনও অসহায়। প্রাকৃতিক বহু ঘটনার কার্যকারণসূত্র যথাযথভাবে মানুষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। এই অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিকে আজও মানুষ বিশ্বাস করে। এই অপরিজ্ঞাত বিষয় এবং অজানা রহস্যের সূত্র ধরে নির্বিচার ভাবে কিছু

কিছু ক্রিয়া প্রক্রিয়া ধ্যান ধারণা প্রচলিত নিয়ম কানুন মানায় মেনে চলে। যে সব ঐতিহ্যগত কর্ম, পূর্ব সূরীদের/পূর্বপুরুষদের অনুসৃত প্রক্রিয়া ও ধ্যান ধারণা অন্ধভাবে আমরা মেনে চলি লোক বিশ্বাস তাদের মধ্যে জড়িয়ে থাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই লোক বিশ্বাসের বহুল প্রচলন। কারণ বহুবছর ধরে পুরুষানুক্রমে বয়ে চলা ঐতিহ্যের রেশ এখানেই বর্তমান। তাই লোকবিশ্বাস গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়ারই উত্তরাধিকার রূপে এখানে ক্রিয়াশীল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সরল গ্রাম্যমানুষ যুক্তি নির্ভরতাহীন এই লৌকিক বিশ্বাসগুলি সযত্নে পালন করে শান্তিতে, স্বস্তিতে দিনাতিপাত করছে। এগুলি তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অঙ্গ। ধর্মবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

হোঁচট খাওয়া— যাত্রাকালে হোঁচট খেলে বাধা পড়ে। যাত্রা অশুভ হয় বলে বিশ্বাস।

মাথায় চাল ঠেকা— যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা অশুভ।

হাঁচি— যাত্রা কালে কেউ হাঁচি দিলে যাত্রা অশুভ। মানুষ কিংবা কোনো জন্তু-জানোয়ারের হাঁচি, যেমন গরুর হাঁচি— অশুভ বলে ধরা হয়।

শূন্য কলসী— যাত্রা কালে শূন্য কলসী দেখা অশুভ লক্ষণ।

বাঁয়ে সাপ, ডাইনে শিয়াল— যাত্রাকালে বাঁয়ে সাপ ও ডাইনে শিয়াল দেখা অশুভ লক্ষণ।

পিছুডাকা— যাত্রাকালে পিছন থেকে ডাকা অশুভ লক্ষণ। তবে মা ডাকলে শুভ হয়।

চক্ষু কম্পন/চোখ নাচা— ছেলেদের অর্থাৎ পুরুষের বাঁ চোখ, নারীর ডান চোখ নাচা অশুভ। আবার পুরুষের ডান চোখ, নারীর বাঁ চোখ নাচা শুভ।

মস্তকে বাধা— কোথাও যাবার সময়, ঘর থেকে বার হতে গেলে বা অন্য কোন কাজে অগ্রসর হবার সময় মাথায় বাধা পেলে কার্য সিদ্ধ হয় না বলে বিশ্বাস।

কাকের ডাক— কাছে পিঠে কাক তারস্বরে চীৎকার করলে অশুভ লক্ষণ বলে ধরা হয়। বিশ্বাস এই যে কাক মৃত্যুর খবর বয়ে আনে।

পেঁচার ডাক— এইভাবে পেঁচার ডাক অশুভ বলে ধরা হয়।

লোকের মুখ দেখা— সকালে অপুত্রক অর্থাৎ আঁটকুড়া লোকের মুখ দেখা ও খুব কৃপণ বলে পরিচিত লোকের মুখ দেখা অশুভ। শুধু তাই নয়— এদের মুখ দেখা পাপ বলে গণ্য হয়।

এক শালিক দেখা— একটি শালিক পাখিকে দেখা খারাপ, ঝগড়া কোন্দল হয় বলে বিশ্বাস। কিন্তু দুটি শালিক পাখিকে এক সঙ্গে দেখা ভাল লক্ষণ, ভাব-সম্প্রীতি ঘটে, মিলন ঘটে।

ডিম ও কাঁচাকলা দেখা— যাত্রার সময় ডিম ও কাঁচকলার নাম করলে অশুভ হয়, তবে দেখলে খারাপ হয় না।

টিকটিকির ডাক— কোন কিছু বলার সময় টিকটিকি ডেকে উঠলে বক্তব্য বিষয় ফলে যায়— তা সে ভাল বিষয় কিংবা খারাপ বিষয় যাই হোক না কেন— এই আমাদের বিশ্বাস।

হাত থেকে চিরুনি পড়া— চুল আঁচড়াতে গিয়ে হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বাড়ীতে অতিথি/কুটুম্বের আগমন হয় বলে বিশ্বাস।

জিহ্বাতে কামড় খাওয়া— খাওয়ার সময় জিহ্বাতে কামড় খেলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময় কেউ তার নাম করছে।

বিষম লাগা— খাওয়া সময় বিষম লাগলে ধরে নেওয়া হয় কেউ তার নাম করছে।

হাঁচি হওয়া— খাওয়ার সময় কিংবা মলত্যাগের সময় হাঁচি হলে তার অসুখ হবে বলে বিশ্বাস।

শুভযাত্রা— যাত্রা কালে জলপূর্ণ কলসী, শিয়াল, ডাইনে সাপ, বাছুর সমেত গাই, ব্রাহ্মণ, মৃতদেহ দর্শন শুভ বলে বিবেচিত হয়।

বাঁশীর সুর— এক ছেলের মায়ের বাঁশীর সুর শোনা অশুভ।

ভাগিনার গায়ে হাত দেওয়া— মামাকে ভাগিনার গায়ে হাত তোলা অর্থাৎ মারা নিষিদ্ধ।

মামাকে প্রণাম করা— ভাগিনার মামাকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ।

পয়া/অপয়া বিচার— কারো মুখ দেখে যাত্রা করার পর কার্য সিদ্ধ হলে সে পয়া, না হলে সে অপয়া। দোকানদার প্রথম খরিদ্দারকে বউনি করলে যদি ভাল বিক্রি হয়— তাহলে সে খরিদ্দার পয়া।

কাঠিঘা— সাপ, বিছা ইত্যাদি হিংস্র সরীসৃপকে 'কাঠিঘা' (অর্থাৎ একেবারে মেরে না ফেলে একটু আঘাত করা) করতে নেই। সেই প্রাণী কোনো এক সময় অলক্ষ্যে এসে আঘাতকারীকে কামড়ায়। এটাই এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস।

ঘরের চালে শকুন বসা— ঘরের চালে শকুন বসলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস।

শনি মঙ্গলবারে ঝাঁটা/কুঁন্তে গায়ে লাগা— শনি মঙ্গলবারে ঝাঁটা কুঁন্তে গায়ে লাগতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।

ঝাঁটা-কুঁন্তের জন্য ফরমাশ— ঝাঁটা কুঁন্তে দিতে বললে না করতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।

উত্তরে মাথা করা— উত্তর দিকে মাথা করে শয়ন করতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।

গুরুবারে ক্ষৌর কার্যকরা ও ভাজা-পোড়া করা— গুরুবারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ক্ষৌর কার্য করতে নেই ও ভাজা-পোড়া করতে নেই, এতে অমঙ্গল হয়।

শনিবারে শোলমাছ পোড়া খেতে হয়— শনিবারে শোল মাছ পোড়া খেলে ভালো হয়। এই ব্যাপারের সঙ্গে শ্রীবৎস রাজার কাহিনীর ইঙ্গিত আছে।

ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা—ভাঙা-আয়নায় মুখ দেখতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।

ছেঁড়া পাখায় (তাল পাতার পাখা) হাওয়া খাওয়া— ছেঁড়া পাখায় হাওয়া খেতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।

গামছা সেলাই করা— ছেঁড়া গামছা সেলাই করতে নেই। এতে দৈন্যদশা ঘটে।

গামছা হারাতে নেই— গামছা হারালে অমঙ্গল হয়।

বৃহস্পতিবার যাত্রা করতে নেই— বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ী থেকে যাত্রা করতে নেই। এতে বিপদ ঘটে।

রাত্রে শাক খেতে নেই— রাত্রে শাক খেতে নেই। এতে অসুখ করে।

ঘরের চৌকাঠে বসতে নেই— ঘরের চৌকাঠ অর্থাৎ চৌবন্দীতে বসতে নেই। আসলে যাতায়াতে অসুবিধার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা।

কুকুরের কান্না— কুকুর কাঁদলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস।

বেগুন কোটা— বেগুন কেটে জলে দিতে হয়। না হলে আঁটকুড়ো হয় বলে বিশ্বাস।

মনসা পূজার দিন সাপ মারতে নেই— মনসা পূজার দিন সাপ মারলে অমঙ্গল হয়।

বিড়াল মারতে নেই— বিড়াল মারলে মা ষষ্ঠী রাগ করেন।

দুই কথা এক— কথা বলার সময় দুজনে একই কথা একই সঙ্গে বললে— এই দুই কথা এক হওয়ার জন্য বাড়ীতে কুটুম্ব আসবে বলে মনে করা হয়। এটা এক প্রকার লোকবিশ্বাস।

অলক্ষুণে বিচার— কোন শুভকাজে বাধা-বিপত্তি ঘটলে সেই শুভকাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অলক্ষুণে বলে ধরা হয়। যেমন— বিবাহের কোন বিপর্যয় ঘটলে কনেকে অলক্ষুণে বলে ধরা হয়। নতুন বৌ বাড়ীতে এলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে নতুন বৌকে অলক্ষুণে বলা হয়। এটা এক প্রকারের লোক বিশ্বাস।

পাশা খেলা— পাশা খেলা সর্বনাশা খেলা। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার দিন পাশা খেলে রাত্রি জাগরণ করলে মঙ্গল হয় বলে ধারণা।

খরাছাতি—চাঁদের চতুর্দিকে একটা জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায়। এটা লালচে রঙের হলে বলে খরাছাতি। খরা ছাতি হলে বৃষ্টি হয় না বলে ধারণা।

চাঁদের মার সুতো— বর্ষার পূর্বে মাঠে ঘাটে সাদা সুতোর মত, পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় একে বলে চাঁদের মার সুতো। এই জিনিস দেখা গেলে বর্ষা নামবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

বঁটি ডিঙাতে নেই— বঁটি ডিঙিয়ে গেলে— সেই বঁটিতে কেউ কিছু কাটতে বসলে তার হাত কেটে যাবে— এই বিশ্বাস।

ঝাঁটা গায়ে লাগলে— ঝাঁটা গায়ে লাগলে অসুখ করে বলে বিশ্বাস। আবার ঝাঁটা গায়ে লাগার পর যদি তিনবার ঝাঁটা মাড়িয়ে দেওয়া যায় কিংবা ঝাঁটার আগা ছিঁড়ে নিয়ে থুতু দিলে দোষ কেটে যায়।

ক্রোধ কলহ

ক্রোধ ষড় রিপুর দ্বিতীয় রিপু। সাংসারিক মানুষ রিপুর বশ। সুতরাং মানুষ অনিবার্যভাবে ক্রোধেরও বশবর্তী হয়ে থাকে। প্রথম রিপু কাম তথা কামনা রিপুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে ভরা এই পার্থিব জগৎ বড় মোহময়, লোভনীয়। রূপ রসাদি ইন্দ্রিয় বিষয় পূর্ণ এই জগতের প্রতি মানুষের ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাই হল কাম। আর এই কাম বা কামনার পরিপুষ্টি ঘটে বাসনার মধ্যে দিয়ে। তাই যে কোন রূপ ভোগ বাসনাই হল 'কাম' বা কামনা। আর এই কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধের জন্ম হয়। সাংসারিক জীবনে মানুষের যেমন বাসনার শেষ নেই, তেমনি ক্রোধেরও হ্রাস নেই। সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, হাসি-কান্নায় ভরা এই পৃথিবীতে মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত। এই অভাব-অনটন, অপ্রাপ্তি, আশা পূরণ না হওয়ার মধ্য দিয়েই ক্রোধের জন্ম হয়— আর তারই সহযোগী হিসাবে আসে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি।

ক্রোধ থেকে কলহের জন্ম যা মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে, দুঃখ-অশান্তিতে ভরে দেয়। মোট কথা অর্থনৈতিক কারণই ক্রোধ এবং কলহের মূল ভিত্তি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আর্থ সামাজিক অবস্থা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবুও প্রসঙ্গক্রমে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক নিম্নাবস্থা থেকে ক্রোধ ও কলহের সূত্রপাত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ মানুষ সেই স্তরেই বর্তমান। পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের দেশ। কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করে যারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

আবার এই অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সঙ্গে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধ প্রথানুগতা, অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি যুক্ত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের করে তুলেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে এবং স্বাভাবিক কারণে তারা শিক্ষার আলো লাভ করতে পারেনি। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভাগ তথা দক্ষিণ অংশ (যা বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা হিসেবে স্বীকৃত) শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, স্বল্প শিক্ষার অন্ধকারে অভাব অনটনের মধ্যে বাস করে। তাই দারিদ্র্য যেমন তাদের নিত্য সঙ্গী তেমন ক্রোধ, কলহ তাদের দোসর। আর শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির অভাব এই ক্রোধ ও কলহের ভাষাকে দারুণভাবে করে তুলেছে অশ্রাব্য।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ক্রোধ ও কলহের ভাষা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এখানকার মানুষ অকারণে সামান্য কারণে ঝগড়া করে, তুচ্ছ কারণে মামলা মোকদ্দমা করে এবং এই সব ব্যাপারে তাদের ভাষা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এর মূল কারণ হিসাবে পাওয়া গিয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অবহেলা, বঞ্চনা ইত্যাদি। তবে একটা ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, এই ক্রোধ কলহের সঙ্গে ধূর্ততা কিংবা অতিশয় ক্রূরতার সংস্পর্শ নেই। সরল গ্রাম্য মানুষ মনের রাগকে মুখে প্রকাশ করে ফেলে আবার অল্প সময়ের ব্যাবধানে তা ভুলে যায়। আর এই ক্রোধ ও কলহের ভাষা সময়ে সময়ে যেমন তীব্র হয়েছে, অশ্রাব্য হয়েছে, তেমনি বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কিংবা অসংলগ্ন ও অর্থহীন হয়েছে।

এখন ক্রোধ ও কলহ বিষয়ে যে সমস্ত শব্দ সংগৃহীত হয়েছে সেগুলির উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভাল যে একেবারে অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথাগুলি এখানে দেওয়া হচ্ছে না; তবুও প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে যদি কিছু অশ্লীলতা থেকে যায়— পাঠক ও সমালোচক বর্গের কাছে সে জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। একেবারে গ্রাম অঞ্চল, সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চল, চরম দক্ষিণসীমা থেকে যে ভাষা সংগৃহীত হয়েছে তা অনেকাংশে অশ্লীল এবং ছাপার অনুপযোগী। আবার কলকাতা ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলের ভাষার মধ্যে ইংরেজি ও আধুনিকতার স্পর্শ আছে। এগুলি বাদ দিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে।

আঁটকুড়ি— যার ছেলে পিলে নেই— নিঃসন্তান (স্ত্রী)।

আঁটকুড়ো— যার ছেলে নেই। (পুং)

আঁটকুড়োর ব্যাটা— এই গালিটি অর্থহীন।

ওলাউটো— ওলাউঠা— কলেরা।

খেয়াকেশে— ক্ষয়কাশি আছে এমন লোক।

সংস্কৃত 'ভর্তা' শব্দের অর্থ 'স্বামী' 'পতি' 'প্রভু' ইত্যাদি। এই শব্দটি বিবর্তিত হয়ে বাংলায় হয়েছে 'ভাতার'— অর্থ হল স্বামী। কিন্তু শব্দটি— গালি বা অশ্লীল অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে 'ভাতার' শব্দটির খুব প্রচলন আছে।

ভাতার খাকী— স্বামীহন্ত্রী।

ভাতার-পুত খাকী— স্বামীপুত্র হন্ত্রী।

বাবা ভাতারি— বাবা যার স্বামী— খারাপ গালি।

বারো ভাতারি— বারোজন অর্থাৎ বহুজন যার ভর্তা— বেশ্যা।

চাবড়া ওঠা— যার বুকে মাটির চাবড়া ওঠে, অর্থাৎ যেন মৃত্যু হয়।

আবাগে— অবাধ্য, একগুঁয়ে প্রভৃতি।

আবাগের বেটা/বেটি— ঐ ধরনের গালি। অবাধ্য লোকের ছেলে/মেয়ে।

ঢেমন— জারজ অর্থে। যার জন্ম আইন সঙ্গত কিংবা সমাজিক বিধি অনুযায়ী নয়।

ঢেমনি— ঐ/স্ত্রী অর্থে।

শালা/শালি— স্ত্রীর ভাই/বোন। কলহের সময় এই 'শালা' বা 'শালি' শব্দ গালি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বোনাই— ভগ্নিপতি অর্থে। কিন্তু কলহের সময় গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাগী— নিম্নমানের স্ত্রীলোক অর্থে গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খানকি, বেশ্যা/বেবুশ্যে— বারবনিতা, দেহপসারিণী, দেহোপোজীবিনী অর্থে।

রাঁড়/রাঁঢ়— সাধারণ অর্থে রক্ষিতা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলে বহু পূর্বে এই 'রাঁড়' রাখার নিয়মের প্রচলন ছিল। বয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তিগণ আচার সম্মত ভাবে বিবাহ না করে বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েকে রক্ষিতা হিসাবে রাখতে পারতেন। তৎকালীন সমাজে এটাও একটা বিধি ছিল।

কড়ে রাঁড়ি— অল্প বয়সী বিধবা রক্ষিতা বা রাঁড়।

সুমুন্দি— শালাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সুমুন্দি বলা হয়।

উদো— হাঁদা, বা বোকা অর্থে।

উদোগেঁড়ে— ভীষণ বোকা।

ঠাপাঠাপি— চাপা চাপি অর্থে।

খণ্ডানো— উত্তেজিত হওয়া (যৌবনের আবেগে)।

ছেনালি (মাগী)— ছলাকলাপটিয়সী নারী।

বার ঢ্যামনা— বেজন্মা বা জারজ— আরও খারাপ অর্থে।

বাইওঠা— যৌবনের আবেগে উত্তেজিত হওয়া।

ভার মাগ— ভাইয়ের মাগ অর্থাৎ ভাইয়ের স্ত্রী।

পোড়ার মুখী— লজ্জায় যার মুখ পুড়ে গেছে এমন স্ত্রীলোক।

চুবড়ি মুখী— চুবড়ির মত মুখ যে স্ত্রীলোকের।

উনুন মুখী— উনুনের মত মুখ যে স্ত্রীলোকের।

ঘোড়া মুখী— ঘোড়ার মুখের মত মুখ যে স্ত্রীলোকের।

উঠোন চষি— উঠোনে যে চষে অর্থাৎ সুবিধাভোগী যে স্ত্রী।

এককুল খাকী— এক কুল খেয়েছে যে স্ত্রীলোক।

দু কুল খাকী— দুই কুল খেয়েছে যে স্ত্রীলোক।

তিন কুল খাকী— তিন কুল খেয়েছে যে স্ত্রী লোক।

শতেক খাকী— শতশত লোকের সর্বনাশ করেছে এমন স্ত্রীলোক।

মড়াখাকী— মড়া খায় এমন স্ত্রী অর্থাৎ পিশাচিনী।

শতেক খোয়ারী— শত শত খোয়ার অজ্ঞা স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিলাসী ও আয়েসী।

নেয়েরা খাকী— ধ্বংস কারিণী স্ত্রীলোক।

সাত জেলা কাব্লনী— সাত জেলা অর্থাৎ সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ভীষণ desparatc স্ত্রীলোক।

পেঁচী— পেঁচার মুখের মত মুখ যে স্ত্রীলোকের।

কটাশ চোখী, বিড়াল চোখী— বিড়ালের চোখের মত কটা চোখের অধিকারিণী স্ত্রীলোক।

হাভাতি, হাড়-হাভাতি— অলক্ষুণে স্ত্রীলোক যে অভাব ডেকে আনে।

হাড়-মাস-খাকী— যন্ত্রনাদায়িনী স্ত্রীলোক, বদমায়েশ।

পেট খসানি— পেটখসানো অর্থাৎ গর্ভপাত কবিয়েছে যে স্ত্রীলোক।

ঢলানি— ঢলিয়ে অর্থাৎ রঙ্গ করে বেড়ায় যে স্ত্রীলোক।

গতরখাকী— গতর নেই অর্থাৎ কুড়ে বা অলস প্রকৃতির।

নিপুত্তুরী— যার পুত্র নেই এমন স্ত্রীলোক অর্থাৎ আঁটকুড়ি।

রাঙামুলো—দেখতে সুন্দর কিন্তু কোন কাজের নয়।

খড়ম পেয়ে— অস্বাভাবিক চলন— উড়ে উড়ে চলা ভাব।

মেগের ভেড়া— স্ত্রীর বশ এমন পুরুষ।

নাঙ— অবৈধ পুরুষ। সাধারণত বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

নাঙ মারানো বা নাঙ করা— অবৈধ দেহ মিলন।

ক্রোধ কিংবা কলহের ভাষা অর্থাৎ গালাগাল সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতি, লোক-মানসিকতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। ড. পবিত্র সরকারের মতে "গালাগাল ভাষা নির্ভর নয়, সংস্কৃতি নির্ভর। অর্থাৎ কোন্ কথাটা গালাগাল আর কোন কথাটা গালাগাল নয় তা বিশেষ সংস্কৃতি দ্বারা এমন কি বিশেষ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশ বা Context -এর দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই গালাগালগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পরিবেশ তুলনামূলকভাবে অনুন্নত।

এখন এই কলহের ভাষা তথা গালাগালগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়—

(১) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু গালি আছে যেগুলি গালি হিসাবে গন্য করা হয়না বা বহু ব্যবহারে এই গালিগুলির গুরুত্ব, তীক্ষ্ণতা, আঘাত করার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এগুলি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জ্বালা ধরায় না। এমন কি এগুলি যখন তখন যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। লোক সাধারণের কাছে এগুলি অন্যান্য শব্দ, কথা বা ভাষার মতই উত্তাপহীন। এই শ্রেণীর গালাগালির উদাহরণ—

শালা, মাগি/মাগী, ঢেমনা, ড্যাদড়, আবাগে, সুমুন্দি, আঁটকুড়ি, পাজি, খচরা, আবাগী, বোনাই, খানকি, ছুঁচো, খচরি, উদো ইত্যাদি।

কিছু কিছু গালি আছে যেগুলি আদর করে, সোহাগ করে ও কৌতুককর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে অশ্লীল শব্দও প্রচুর আছে। কিন্তু এই অশ্লীলতা এমনই যে এগুলির উচ্চারণে কেউ কিছু মনে করেনা। এগুলি যে অশ্লীল তা বোধ হয় সংশ্লিষ্ট লোক সাধারণ ভুলেই গিয়েছে। যেমন—

শয়তান   ভাব মাগ (ভাইয়ের স্ত্রী)   ঢেমনা

বাঁদর   ভাই —,   খোকা —,   উদোপোঁদো,

হনুমান,   খানকি,   কাটা —,   [illegible],

হাঁদা,	যন্তর,	— মারানি,	মাগের ভেড়া,
ভোঁদা,	বেজন্মা,	কানা —,	কেলানে,
ভুঁদি	বেইমান,	— মারা,	— ডা,
		বাই ওঠা ইত্যাদি।	

— স্থানে অশ্লীল শব্দ আছে।

(৩) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু গালি আছে, যে গুলি অভিশাপ জাতীয়। এগুলি প্রকৃত পক্ষে ক্রোধ থেকে জন্ম। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা এদের লক্ষ্য।

নিব্বুংশে— নির্বংশ হয়ে গিয়েছে যারা।

খোলাকাটা— মানুষ মরে গেলে তার শ্রাদ্ধের জন্য খোলা কাটা হয়।

ওলাউঠো— কলেরা রোগগ্রস্ত।

খেয়াকেশে, যক্ষ্মাকেশে— ক্ষয়কাশি, বা যক্ষ্মাকাশি গ্রস্ত মানুষ।

বিভিন্ন প্রকারের 'খাকী' শব্দ সমন্বিত। যেমন ভাতারখাকী, ভাইখাকী ইত্যাদি।

ভিটেয় ঘুঘুচরা— সংসারের সবাই মারা গেলে, ভিটেতে বাস করার মত কেউ থাকবে না।

নিপুত্তুরী— পুত্র সন্তান বলতে কেউ থাকবে না।

ঘরে মামলা ঢুকুক— মামলাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা বলা।

জিব খসে পড়ুক— বাকশক্তি রহিত হওয়া।

পক্ষঘেতে— পক্ষাঘাত গ্রস্ত।

কুড়ি কুষ্ঠ হোক— কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হওয়া।

মুখে পোকা পড়ুক—ভীষণ ভাবে রোগগ্রস্ত— যাতে শরীর পচে পোকা হয়।

মা তোর মাগ হোক, বাপ তোর ভাতার হোক— অবৈধ সম্পর্কগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা।

মুখে নুড়ো জ্বেলে দি— মৃতের মুখাগ্নি করার উপমা।

চোখের মাথা খাবি— অন্ধ হয়ে যেতে বলা। ইত্যাদি।

(৪) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ক্রোধ কিংবা কলহের যে ভাষা অর্থাৎ গালি গালাজ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অনেক গালি অশ্লীল। এই অশ্লীল গালিগুলি মূলতঃ যৌন ক্রিয়া, যৌনাঙ্গ, অবৈধ সম্পর্ক, কুকাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত। এগুলির আঘাত করার শক্তি এত বেশি যে মুহূর্তে প্রতিপক্ষ তীব্রভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে এবং প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি হয়। অশ্লীলতার কারণে এই শব্দগুলির উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

(৫) কতকগুলি গালি আছে যেগুলি মানুষকে তুচ্ছ, হীন প্রতিপন্ন করতে কিংবা নিম্নমানের, মন্দ বা খারাপ স্বভাবের, কুৎসিত আকার আকৃতির বা কদাকার চেহারার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত করতে ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে জন্তু-জানোয়ার, পাখি, মাছ, পোকা ইত্যাদির নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন নির্বোধ বা মোটাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে 'গাধা', কুচকুচে কালো লোককে 'কোকিল', স্থূল চেহারার মানুষকে 'কোলাব্যাঙ', বেইমান লোককে 'বাদুড়', হিংস্র স্বভাবের মানুষকে 'কাল কেউটে' ইত্যাদি বলা হয়। এগুলি অনেক সময় কৌতুক করে, কোনসময় ক্রোধ জানাতে, কোন সময় ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় শব্দের উদাহরণ—

গাধা, কোয়ো, ছাগল, হাড়র, পাঁঠা, শুকান/শকুন, কোকল, পেঁচা, বাদুড়, কাগ/কাক, চামচিকে, ভেড়া/মেড়া, ছুঁচো, গরু, সড়েল, কেউটে/কালকেউটে, শিয়াল/খেঁকশিয়াল, খট্যাশ, বলদ, ভোঁদড়, ষাঁড়, বানর/বাঁদর, মোষ, গুয়ে হাঁড়কেল, উল্লুক, খচ্চর, কোলাব্যাঙ, ডাঁশ, পোকা/গুয়ে পোকা ইত্যাদি।

(৬) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বহু নিম্নজাতির মানুষের বাস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সমস্ত জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। তাই সমাজে এদেরকে নীচু চোখে দেখা যায়। মজার কথা এই যে, এই সমস্ত জাতিগুলির নাম উল্লেখ করে এই অঞ্চলের কলহের ভাষা ব্যবহৃত হয়। কোন মানুষকে তুচ্ছ কিংবা হীন বোঝাতে কলহের সময় তাকে এই জাতির মানুষ (সে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতির হলেও) বলে গালি দেওয়া হয়। যেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষকে বলা হয় 'কসাই', হৃদয়হীন মানুষকে বলা হয় 'চামার' নোংরা অপরিচ্ছন্ন মানুষকে বলা হয় 'মেলাচ্ছ' (ম্লেচ্ছ)। মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করতে নিচু জাতির উপমা দেওয়া অন্যায়, অমানবিক কাজ, তবুও এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে। এই রকম কিছু উদাহরণ—

কেওট, চামার, মেলাচ্ছ, কসাই, বামনা (বামুন), মুদ্দোফরাস, মুচি, চণ্ডাল, মোচনমান, ধাঙড়, কাওরা।

(৭) ক্রোধ মানুষকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দেয় যে, মানুষের বোধ, বুদ্ধি, বিবেক নষ্ট করে দেয়। প্রতিপক্ষকে যতরকমভাবে পারা যায় হীন, তুচ্ছ মন্দ প্রতিপন্ন করে তাকে জ্বালা ধরালে তবে কলহকারীর তৃপ্তি। তাই ক্রোধের সময় মানুষকে জীবন্ত মানুষের পর্যায় ছেড়ে ভূতপ্রেত বলে গালি দেওয়া হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ধরনের গালি খুব চলে। এই ধরনের উদাহরণ—

শাঁকচুন্নি, শাঁঙ্কিনী, গুয়ে পেত্নি, ডাইনী, মামদো, গোমড়ি।

তবে সমস্ত রকম গালাগালি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যৌনাঙ্গ, যৌনক্রিয়া, কিংবা গোপন অঙ্গ ও অবৈধ সম্পর্ক যুক্ত গালাগালি অধিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদবী ও ডাকনাম

পদবী

'পদবি' বা 'পদবী' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল— উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম। [পদবী— সং.√পদ্ + অবি (ণে) + ঈ]। 'উপাধি' শব্দটির অন্য অর্থ আছে। বিদ্যা, সম্মান প্রভৃতির পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ যা সাধারণতঃ নামের শেষে বসে। [উপাধি— সং উপ + আ + √ ধা + ই]। 'উপনাম' হল তাই, যা প্রকৃত নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'পদবী' প্রকৃত নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না। [উপনাম— উপ + নাম]। তবে 'পদবী' শব্দটির অর্থ যদি ধরা হয় 'বংশ সূচক নাম' তাহলে কিছুটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মজার কথা এই যে, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি পরবর্তীকালে পদবী হয়ে দাঁড়িয়েছে আর বংশসূচক নাম বলতে যে পদবী বোঝায় তা হারিয়ে গিয়েছে। পদবী হলো নামের শেষে যুক্ত শব্দ, যা বিশ্লেষণ করলে সংশ্লিষ্ট মানুষটির জাতি, বংশ, বৃত্তি, গুণ ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝাতে পারে।

অতি প্রাচীন কালে পদবীর ব্যবহার লক্ষিত হয় না। আদি বৈদিক যুগে নামের সঙ্গে পদবীর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সংহিতা, পুরাণাদির যুগ থেকে নামের পরে পদবীর ব্যবহার লক্ষিত হয়েছে। মোট কথা পদবীর ব্যবহার অর্বাচীন কালের ঘটনা। তবে পদবী ব্যবহারের মূল সূত্র খুঁজতে গিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যগণের গুণকর্ম ভিত্তিক বর্ণবিভাগ এবং বর্ণকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। বর্ণকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা যখন বংশকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, পদবী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দিল। সমাজে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হল এবং পদবী সেই সমস্ত জাতির পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। কর্মের উচ্চনীচ অনুযায়ী জাতি ও উচ্চ নীচ রূপে পরিগণিত হতে থাকল। সমাজে বিভেদের সৃষ্টি হল। এই বিভেদের আগুন ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত করে তুলল বল্লাল সেনের ৩৬ জাত বা শ্রেণীর সৃষ্টি। এই জাতিগুলির বিভাজন হল কর্ম অনুযায়ী। জাতিগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য পদবীর বিশেষ ব্যবহার শুরু হল।

পদবীর উৎপত্তি ও ব্যবহারের ইতিহাস যাই হোক না কেন, ব্যবহারের তাৎপর্য ও বৈচিত্র্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পদবী ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, আমরা তাই অলোচনা করব। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বহু বিচিত্র ধর্মের ও জাতির মানুষের বসবাস। সেখানে যেমন হিন্দু আছে, তেমনি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি ও আছে। আমাদের আলোচনা কেবলমাত্র হিন্দু সমাজের মানুষের পদবী নিয়েই হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পদবীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানে বহু জাতির মানুষের বসবাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হৈহয়ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কর্মকার, কুম্ভকার, মুচি, কাওরা, গোয়ালা, সদগোপ, মালাকার, মোদক, মালী, তিলি, ডোম, তন্তুবায়, তিওর, স্বর্ণকার, যোগী, সূত্রধর, বারুই, বাউরী, শাঁখারি, প্রভৃতি জাতির মানুষ বাস করেন। এই সমস্ত মানুষ নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করে কাজকর্ম করেন। আবার নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিগত কর্মও করেন।

কিন্তু পদবী দ্বারা এই সমস্ত মানুষের জাতি সঠিকভাবে চেনা যায় না। একই পদবী বিভিন্ন জাতির মানুষ ব্যবহার করেন আবার একই জাতির মানুষ বিভিন্ন পদবী ব্যবহার করেন। সুতরাং পদবী দ্বারা জাতি চেনা এবং জাতির প্রতীক হিসাবে পদবী ব্যবহারের তত্ত্বটি এখানে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু পদবী আছে যেগুলি দ্বারা বৃত্তির পরিচয়ও জানা যায় না। জীবজন্তুর নাম থেকে যে পদবী সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা কোন বস্তুর নাম থেকে যে পদবী সৃষ্টি হয়েছে কিংবা গ্রামের নাম পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে— তাতে সংশ্লিষ্ট মানুষটির জাতি, বংশ, বর্ণ কিংবা বৃত্তি কি ভাবে জানা যাবে?

প্রসঙ্গ ক্রমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই অঞ্চল বার বার জনশূন্য হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু নিম্নবঙ্গ বারবার মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। গবেষকগণের মতে রামায়ণের যুগে এই অঞ্চল জনশূন্য ছিল। এছাড়া এখানে কিছু কিরাত কিংবা নিষাদ জাতীয় অস্ট্রোএশিয়াটিক গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বাল্মীকির রামায়ণে পাতাল বলে যে স্থানের বর্ণনা আছে, গবেষকগণের মতে তাহল এই দক্ষিণ দেশ—নিম্নবঙ্গ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই নিম্নবঙ্গের অন্তর্গত। সাগরকূলে মহামুনি কপিল তপস্যারত ছিলেন— এই স্থান বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপ অঞ্চল। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সময় থেকে অর্থাৎ গঙ্গার আদিখাত খননের সময় থেকে এখানকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। মহাভারতের যুগে এখানে জনসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে শৌর্যবীর্যবান পরাক্রমশালী 'গঙ্গারিডি' জাতির বাস ছিল। এদের বংশধররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, হৈহয়ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে আজও বিদ্যমান। প্রাকৃতিক কারণে এই গঙ্গারিডি রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু 'গঙ্গারিডি' জাতির মানুষরা নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্ভবতঃ তারা বিবর্তিত আকারে উপরোক্ত জাতিগুলির মধ্যে আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং উপরোক্ত জাতিগুলি নিম্নবঙ্গ তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আদি জাতি। কিন্তু কালে কালে এখানে বহিরাগত বহু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা এখানকার মূল অধিবাসীদের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে ও এখনো করছে। এখানকার মানুষের বহুবিধ বিচিত্র পদবীর মধ্যদিয়ে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের দেশ। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিতত্ত্ব অনুযায়ী এই শ্রমজীবী মানুষের অধিক অংশ শূদ্র। তারা নানারকম বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। যেগুলি মানুষের জীবনধারণের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু অভিজাত মানুষের কাছে নিন্দনীয়। তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে নীচু চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু পদবী বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কারণ এখানে এমন অনেক পদবী আছে যা অভিজাত অনভিজাত উভয় শ্রেণী ব্যবহার করেন। ফলে আভিজাত্য-অভিমানীদের পদবী পরিবর্তনের ঘটনাও ঘটেছে এখানে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জাতি ও পদবীর পরিচয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক অদ্ভুত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেতর যে জাতি সমূহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এখানে তাদের মধ্যে পৌণ্ড্র জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির মানুষ অনেক পরবর্তীকালের ও বহিরাগত। গবেষকগণের মতে প্রাচীন জাতির মূল অংশ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন থেকে আগত পৌণ্ড্রজাতি। যদিও উল্লিখিত আরও অনেক জাতির মানুষ 'গঙ্গারিডি'-দের বংশধর, তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ— মূলতঃ সাঁওতালরাই। তেমনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আদি অধিবাসী মূলতঃ পৌণ্ড্ররা। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে পৌণ্ড্র ছাড়া আর প্রায় সব জাতির মানুষরা আশে পাশের জেলা থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসেছে। ১৮৭২ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় অখণ্ড চব্বিশ পরগনায় এই পৌণ্ড্র জাতির মানুষের সংখ্যা মোট জন গোষ্ঠীর নব্বুই শতাংশেরও বেশি। আরও প্রাচীন কাল থেকে চব্বিশ পরগনায় এই পৌণ্ড্রজাতির আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও পৌণ্ড্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

পৌণ্ড্রজাতির নির্দিষ্ট কোন পদবী নেই। এই জাতি বিভিন্ন পদবী গ্রহণ করেছে। অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে প্রায় একশত ত্রিশ রকমের পদবী এরা গ্রহণ করেছে। সেগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি পদবী আছে সেগুলি ব্রাহ্মণদের পদবী। যেমন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়', 'শর্মা' প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের পদবী, কিন্তু পৌণ্ড্র জাতির ও এই পদবী আছে। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ব্যাপারটি বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায়, এমন একটা সময় ছিল যখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে পৌণ্ড্র জাতি ছাড়া অন্য জাতির মানুষ ছিল না। তখন সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কর্মের প্রয়োজনে এই জাতি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে এই বৃত্তি অনুযায়ী পদবীর সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এই ভাবে বৃত্তি সূচক পদবীর সৃষ্টি হয়েছে।

বৃত্তিসূচক পদবীর উদাহরণ— পৌণ্ড্র জাতি

বায়েন— বাদ্যকর। যারা বাজনা বাজায়।

বৈদ্য— চিকিৎসক। যারা চিকিৎসা করে মানুষের রোগ নিরাময় করে।

বিজলী—ধনুর্ধর/রণজয়ী ব্যক্তি।

বৈরাগী— বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ। যাঁরা শ্রী বিষ্ণু/ হরির নামগান করে থাকেন।

মাঝি— নৌকার চালক। নৌকা চালানোই যাদের পেশা।

মাল— মল্ল। কুস্তিগীর।

মালী/মালি— উদ্যানকার বা উদ্যান রক্ষক। বাগানে ফুল ফোটানোই যাদের বৃত্তি।

মালিক— 'মল্ল' শব্দ থেকে এসেছে।

মির্ধা— নৌচালক।

মিদ্যা/মিদ্দা— নাবিক। নৌ চালক।

মিস্ত্রি—·কারিগর।

শাঁখারি/শাঁখারী— শাঁখার কাজ করে যারা।

শিউলি/শিউলী— গুড় প্রস্তুতকারী ব্যক্তি। যারা খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে।

শিকারী/শিকারি— শিকার করা যাদের পেশা।

শিকদার— রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের কাজ করে যারা।

হাজরা— হাজার সৈন্যের অধিনায়ক।

হালদার— হাবিলদার। সৈনাধ্যক্ষ।

উকিল— আইন ব্যবসায়ী।

কয়াল— মাপদার। আগেকার দিনে এক শ্রেণী মানুষ কেবল ওজন মাপার কাজ করত। বিশেষ করে ধান মাপার কাজ করত।

কবিরাজ— চিকিৎসক। মূলতঃ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসককে কবিরাজ বলা যায়। তখনকার দিনের 'কবিরাজী' পেশার মানুষ আজও আছেন।

কাঁটাল— কাঁটাল ব্যবসায়ী মানুষ।

কান্ডার— নৌকার মাঝি।

কামার— লোহার কাজ করে যারা।

গায়েন/গাইন— গায়ক। গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করা যাদের পেশা।

গোলদার— শস্য ভান্ডারের মালিক।

ঘটক— ঘটকালি করা যাদের পেশা।

ঘরামি/ঘরামী— ঘর ছাওয়া যাদের পেশা। গ্রামবাংলায় খড়ের ঘরের ছাওয়ার কাজ করে যারা।

জ্বালানি— এক ধরনের লোক যারা অগ্নি প্রদানের কাজ করে। ইট পোড়ানোর জন্য কিছু লোক অগ্নিসংযোগের কাজ করত। এটাই তাদের পেশা ছিল।

ঢালি— ঢালধারী সৈন্য। এটাই পেশা।

তাঁতি— তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করা যাদের পেশা।

দাশ— ধীবর। মাছ ধরা যাদের বৃত্তি।

দাস— ভৃত্য/সেবক। সেবা করা যাদের কাজ।

দালাল— দালালি করা যাদের বৃত্তি।

নস্কর— হাবিলদার। শব্দটি সম্ভবতঃ 'লস্কর' শব্দ থেকে এসেছে।

নাইয়া— নাবিক/মাঝি। নৌকা চালানো যাদের বৃত্তি।

পাইক— পাহারাদার। সেনানী। পদাতিক সৈন্য।

পাটোয়ারী— খাজনা আদায় করা এবং তার হিসাব রাখা যাদের পেশা।

পুরকাইত— আগেকার দিনে রাজাদের কিছু 'লেখক' অর্থাৎ চিঠিপত্র লেখা, জমি জরিপ করে চিঠা লেখা ইত্যাদির কাজ করতেন কিছু মানুষ।

পুরকায়স্থ— নগর রক্ষা করা যাঁদের কাজ ছিল। অনেকে বলেন 'পুরকাইত' শব্দটি 'পুরকায়স্থ' শব্দ থেকে এসেছে।

প্রামাণিক— [সং. প্রমাণ + ইক্] প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি। কিন্তু বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে কিছু মানুষকে প্রমাণকারী হিসাবে রাখা হত। পরবর্তী কালে 'নাপিত' শ্রেণীর মানুষ এই কাজ করত। কিন্তু নাপিত জাতির লোকের অভাবে পৌণ্ড্ররা নাপিতের কাজ করত।

বাগানী— কিছু কিছু মানুষ বাগান চাষ করার পেশায় নিযুক্ত থাকত। তাদের বাগানী বলা হত।

বারুই— 'বারুজীবী'। পান চাষকারী। বারুই শ্রেণীর মানুষের অভাবে পৌণ্ড্ররা পান চাষের কাজ করত।

মোদক— মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী। পৌণ্ড্ররা মোদকের কাজ করত।

দেখা যাচ্ছে পৌণ্ড্রগণ একসময় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজকর্ম করেছেন, তাই তাঁদের সেই সব বৃত্তিসূচক পদবী সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

শ্রমজীবী মানুষের দেশ। সুতরাং শ্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সমস্ত মানুষজন বৃত্তিগ্রহণ করেছে পরবর্তীকালে সেই বৃত্তিগুলি পদবী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। জাতিতে পৌণ্ড্র হয়েও তারা ধীবর, কর্মকার, বারুই প্রভৃতি জাতির বৃত্তি গ্রহণ করে ঐ বৃত্তিসূচক পদবী প্রাপ্ত হয়েছে।

শুধু পৌণ্ড্র জাতি নয়, অন্যান্য জাতির মানুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে সমাজে নানারকম বৃত্তি গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে সেই সেই বৃত্তিমূলক শব্দাবলী তাদের পদবী হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পদবীর উৎপত্তির এও এক সূত্র। সুতরাং এখানে পদবী যতটা না জাতিবাচক তার চেয়ে বেশি বৃত্তিবাচক। এই পদবীর ইতিহাস অনুসরণ করলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার এক পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

পদবীর বহু বিচিত্র ইতিহাস আছে। পদবী মানুষের পরিচয় স্থাপন করে, পারিবারিক পরিচয় তথা বংশপরিচয় দেয় এবং জাতি ও নির্দেশ করে। কিন্তু কালে কালে পদবীর এত রূপান্তর ঘটেছে যে পদবী দেখে জাতি/বংশ বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। দারিদ্রের জন্যে অভাববশত মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়েছে, বৃত্তিও পরিবর্তন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শিরোমণিগণ তাদের জাতিও বদলে দিয়েছেন। বাংলা দেশ থেকে বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তাঁরা প্রয়োজনে জাতি বদল করেছেন, বৃত্তি গ্রহণ করেছেন সুযোগ অনুযায়ী এবং সেইসঙ্গে পদবীও বদল করেছেন। সমাজে কৌলীন্য পাবার জন্যে শুনতে খারাপ বহু পদবী মানুষ বদল করেছেন— এই সব কারণে পদবী দিয়ে জাতি বা বংশ কিছুই বোঝা যায় না আজকাল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই অদলবদলের ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কম। সাধারণভাবে দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষ তাদের পদবী বংশ পরম্পরায় কিংবা পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করে আসছে। সুতরাং বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্যবহৃত পদবীগুলি সমাজের আদিস্তরের সন্ধান দিতে পরে। পূর্বে বৃত্তিবাচক পদবীগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদবীগুলি যেমন পৌণ্ড্রজাতির পদবী তেমনি অন্যান্য জাতির মানুষেরা এই পদবীও ব্যবহার করে। মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাগদী, কাওরা, হাড়ি, সদগোপ, মুচি, কর্মকার, জেলে, কুমোর, মালাকার, ছুতোর, গোয়ালা, তাঁতি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মানুষজনের মধ্যে ও এইসব পদবীর সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে বলা যায় এক সময় এই সব জাতির মানুষেরা ঐ সব কর্মে নিযুক্ত থাকত। সমাজ বিভাজনের সময়ে ঐগুলি তাদের পদবী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন— 'মাঝি' পদবীটি বিভিন্ন জাতির মানুষ ব্যবহার করে। কৈবর্ত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, সদগোপ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, তাঁতি প্রভৃতি জাতির মানুষ ব্যবহার করে। তাহলে দেখা যায় সমাজের প্রাচীন স্তরে ব্রাহ্মণরাও মাঝিগিরি করতো, তারাও নৌকা চালানোর বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকত। অন্যান্য জাতিরাও তো করত। 'গোলদার' পদবীটি ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তিলি, সদগোপ প্রভৃতি মানুষের পদবী। অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও গোলদারী করত। এই রকমভাবে কবিরাজ, ঘটক, হালদার, হাজারী, হাজরা, পুরকায়স্থ প্রভৃতি বৃত্তিবাচক পদবী আছে, যেগুলি সমাজের শীর্ষস্থানীয় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাও ব্যবহার করে থাকেন। একথা বলা যায় সমাজের এমন এক দিন ছিল যখন বর্ণভেদ মানা হলেও কর্মভেদ মানা হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে ব্রাহ্মণ শুদ্রের কাজ করেছে। 'লাঙলা বামুন', 'হেলে কায়েত'— শব্দগুলি প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণরাও কৃষকের কাজ করত, কায়স্থরাও কৃষিজীবী ছিল— এগুলি তার উদাহরণ। তেমনি বিপরীত চিত্র ও পাওয়া যায়— শূদ্ররাও সময় অনুযায়ী ব্রাহ্মণের কাজ করেছে— সেজন্য কিছু কিছু ব্রাহ্মণের পদবীও তারা গ্রহণ করেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু পদবী আছে জন্তু জানোয়ারের নামে। কেমন করে এই পদবীগুলির উৎপত্তি হল তার ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। হয়ত জন্তু বিশেষের বৈশিষ্ট্যগুলিই কোন এক ব্যক্তির চরিত্রে দৃষ্ট হয়েছিল, সেই থেকে তার খ্যাতি/অখ্যাতি রটে। পরবর্তী কালে তা পদবী হয়ে দাঁড়ায়। এই জাতীয় পদবীর উদাহরণ—

বাঘ— বাঘের মত বলশালী, তেজস্বী কিংবা বাঘ-নিধনকারী। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির মানুষ এই পদবী ব্যবহার করে।

সিংহ— সিংহের মত বলবান বা মহা প্রতাপশালী। সিংহ শক্তির প্রতীক। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন চিত্রে, খোদাইকার্যে, ভাস্কর্যে সিংহকে এই ভাবে দেখানো হয়েছে। শক্তিমান, বলবীর্যশালী হিসাবে মানুষ সিংহ পদবী গ্রহণ করে থাকতে পারে। কায়স্থ, কৈবর্ত, ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি বহু জাতির মানুষের এই পদবী দেখা যায়।

কুমির/কুমীর: কুমীর যেমন জলে বাস করে, তেমনি কিছু মানুষ আছে জলেই যাদের জীবন কাটে। জীবিকার প্রয়োজনে তারা একসময় জলে নেমেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জল তাদের জীবন ও জীবিকা হয়ে গিয়েছে। এইসব কারণেই কিংবা কুমীরের মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে অথবা কুমীর নিধনকারী হিসাবে তারা 'কুমীর' পদবী পেয়েছে। তিওর ও রাজবংশীদের মধ্যে এই পদবীর ব্যবহার দেখা যায়।

হাতি: হাতির মত স্থূল বপু সম্পন্ন ও শক্তিশালী মানুষের পদবী হয়েছে 'হাতি'। তবে 'হাতি' পদবীটি মূলতঃ মেদিনীপুর অঞ্চলের মানুষের পদবী। মেদিনীপুর থেকে কিছু মানুষ ছিটকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসেছে তাদের মধ্যে কিছু 'হাতি' পদবী লক্ষ্য করা যায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য তিওর প্রভৃতি জাতির মানুষের মধ্যে এই পদবী প্রচলিত।

কর্মের জন্যে কিংবা কিছু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে কোন মানুষের বা গোষ্ঠীর কোন কোন খ্যাতি/অখ্যাতি রটে যায় তাতেই তারা পরিচিত হয়। সেগুলি কোথাও পদবী আবার কোথাও পদবী সদৃশ। হয়তো পরবর্তীকালে পদবী সদৃশ শব্দগুলি তাদের পদবী হয়ে দাঁড়াবে, আসল পদবী হারিয়ে যাবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই জাতীয় শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় শব্দের উদাহরণ—

কোকিল— কোকিলের মত গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট কোন মানুষের জন্যে এই অখ্যাতি-সূচক শব্দটি রটে গেছে।

জালা— স্থূলাকার মাটির জলপাত্র। এরই সদৃশে অখ্যাতি রটে গিয়েছে।

গুলি— গুলিখোর কিংবা গুলির মত গোলগাল চেহারার জন্যে অখ্যাতি।

ঘুঘু— ঘুঘুর মত চতুর। এগুলি কোন কোন জাতির পদবী। তবে এই পদবী খুব বেশি দেখা যায় না। এগুলি কিছু মানুষের আবার অখ্যাতি সূচক শব্দ।

ঢেঁকি— ঢেঁকি শব্দটি এক সময় কিছু কিছু ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল। পরবর্তীকালে তাঁরা এই পদবী বর্জন করেছেন। তবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই পদবী লক্ষ্য করা যায়। ঢেঁকি তুলে ডাকাত তাড়িয়েছিলেন বলে ডুমুরদহের আশানন্দ মুখোপাধ্যায় আশানন্দ ঢেঁকি হয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঢেঁকির সঙ্গে কর্মসংস্থানে যুক্ত কিছু মানুষের 'ঢেঁকি' খ্যাতি রটে গিয়েছে।

কুড়ে— কুড়ে শব্দের সরলার্থ অলস কিংবা পরিশ্রম-বিমুখী, এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে একটা পরিবারের অখ্যাতি হয়েছে 'কুড়ে'। তার থেকে কুড়ে পাড়া।

ডাঁটা— ডাঁটা অর্থাৎ লাঠির মত কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যে নাম হয়েছে ডাঁটা

মোনাকাটা— 'মোনা' শব্দটির অর্থ চৌকর মুষল। এক শ্রেণার মানুষ এই কাজ কারবার করে বলে তাদের বলা হয় মোনাকাটা। এটা পদবী নয়।

ফোঁটাকাটা— ফোঁটা তিলকধারী কিছু মানুষ বৈষ্ণব বেশ ধরে ভিক্ষা করে। এটা তাদের এক ধরনের ব্যবসা। এদেরকে ফোঁটা কাটা বলে।

হাঁড়ি চাঁচা/হাঁড়িচাটা— ভীষণ কৃপন। যারা হাঁড়ি চেঁচে কিংবা চেটে খায় ধরনের মানুষ। এদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই অখ্যাতি বাচক শব্দ।

বরিঝেটে— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি পরগনা হল বারিদহাটি। বারিদহাটি পরগনার মানুষদের অখ্যাতি ছিল— ঝগড়াটে কিংবা কোন্দলকারী বলে। সেই থেকে ওই অঞ্চলের মানুষদের অখ্যাতি হয়েছে — 'বরিঝেটে' বলে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু পদবী আছে যেগুলি দেখলে মনে হয় এক সময় এই শ্রেণীর মানুষরা রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা রাজ্যসরকারে চাকরি করত, কিংবা সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে যে দীর্ঘদিন ধরে পুরুষানুক্রমে তারা এই সমস্ত পদবী উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে আসছে। বিভিন্ন জাতির এই পদবী দেখা যায়। যেমন—

অধিকারী— অধ্যক্ষ, দলপতি— পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদগোপ, প্রভৃতি জাতি এই পদবী ব্যবহার করে।

চাকলাদার— চাকলার অধ্যক্ষ। মুসলমান যুগে সরকারি চাকরিতে এই শ্রেণীর পদ ছিল।

চৌধুরী— চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর অধিকারী। শব্দটি 'চতুর্ধুরীণ' শব্দ থেকে এসেছে। এছাড়া সামন্ত রাজাদেরও চৌধুরী বলা হত। কায়স্থ, কৈবর্ত, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

চৌকিদার— পাহারাদার। শব্দটি সম্ভবতঃ 'চৌরোদ্ধরণিক' শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু ভারতে নগর কোতোয়ালদের বলা হত। নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

ঢালী— ঢালধারী সৈন্য। পৌণ্ড্র, গোয়ালা, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

দফাদার— চৌকিদারের উপরের রাজকর্মচারী। অশ্বারোহী সৈন্যদের নায়ক। আরবী 'দফাহদার' শব্দ থেকে এসেছে। রাজবংশী, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

দেওয়ান— রাজস্বমন্ত্রী বা সরকারী রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। সদগোপ, বারুই, যোগী, ব্যগ্রক্ষত্রিয় নমঃশূদ্র প্রভৃত জাতি ব্যবহার করে।

নায়ক— সৈন্যবাহিনীর নায়ক বা সেনাপতি। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, ডোম, রাজবংশী, সদগোপ প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

নস্কর— সৈন্যবাহিনীর হাবিলদার। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

পাইক— পদাতিক সৈন্য। [সং পদাতিক > প্রা. পাইক্ক > বা. পাইক] পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

পুরকাইত/পুরকায়স্থ— নগর সম্বন্ধীয় রাজকর্মচারী। রাজাদের লেখক। জমি জমা, মাপ জোক সম্বন্ধে লেখাজোখা করত। কায়স্থ, পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

বক্সী/বকশী/বক্শি— মুসলমান আমলের নগর বা গ্রামের বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

বর্গী— অশ্বারোহী সৈনা। মারাঠা দস্যুদেরও বলা হত। এরা ঘোড়ায় চড়ে এসে লুট পাট করত। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

বর্মন—রক্ষাকারী ব্যক্তি। সম্ভবতঃ সেনাবাহিনীর এক বিশেষ পদ। শব্দটি 'বর্ম' শব্দ থেকে আগত মনে হয়। পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, রাজবংশী, তিওর প্রভৃতি জাতিরা ব্যবহার করে।

বারিক— সৈন্য দলের বাসগৃহের অধিকর্তা। শব্দটি ইং Barrack শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পন্ন, কিংবা প্রাচীন 'দৌবারিক' শব্দ থেকেও আসতে পারে। কৈবর্ত, তন্তুবায, তিলি, মাহিষ্য, সদ্গোপ প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

বিজলী-- ধনুক চালানোয় পারদর্শী। হয়ত প্রাচীন যুগের তীরন্দাজ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী। পৌণ্ড্র, রাজবংশী, হৈহয ক্ষত্রিয, ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে।

মণ্ডল-- মণ্ডলাধিপতি। গোষ্ঠী বা গ্রাম-নাযক। এঁরা রাজসরকারে যুক্ত থাকতেন। পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, মাহিষ্য, গোপ, ডোম, সদগোপ, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, হৈহযক্ষত্রিয সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির পদবী।

মজুমদার— মুসলমান আমলের রাজস্বসম্বন্ধীয হিসাবরক্ষক। পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, হৈহযক্ষত্রিয রাজবংশী, কাযস্থ প্রভৃতি জাতির পদবী।

মাল— 'মল্ল' শব্দ থেকে এসেছে। রাজাদের অধীনে এই সব 'মল্ল'বীররা থাকতেন। সং √ মল্ল + অ (র্তৃ)। প্রাচীন কালের মল্লযোদ্ধাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পৌণ্ড্র, তিলি, মাহিষ্য, রাজবংশী, হৈহযক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতির পদবী।

মালিক— 'মল্ল' শব্দের অপভ্রংশ। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, ডোম, তিওর, রাজবংশী, সদ্গোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

সরকার— রাজাদের রাজস্বআদায সংক্রান্ত কর্মচারী। মুসলমান আমলে এই শ্রেণীর রাজকর্মচারীর প্রচলন ছিল। শব্দটি ফারসী 'সরকার' শব্দ থেকে এসেছে। এই শ্রেণীর কর্মচারী শাসন বিভাগ, অর্থআদায ও ব্যযসংক্রান্ত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। মুসলমান আমলে হিন্দু ও মুসলমান রাজকর্মচারীকে এই 'খেতাব' দেওয়া হত। পৌণ্ড্র, কাযস্থ, কৈবর্ত, মাহিষ্য, তিলি, সদগোপ, সাহা, কাওরা, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতির পদবী।

সরখেল— সেনাবাহিনীর অধিপতি। নমঃশূদ্রও ব্রাহ্মণদের পদবী।

সানা— সেনানী। সাঁজোযা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। শব্দটি 'শানা'র বানান ভেদ। সংশানী—শানা—সানা। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, কৈবর্ত, প্রভৃতি জাতির পদবী।

সরদার/সর্দার— দলপতি/পরিচালক। পৌণ্ড্র, কাওরা, ডোম, তিওর, রাজবংশী প্রভৃতি জাতির পদবী।

সাঁতরা— শব্দটি 'সামন্তরাজ' শব্দ থেকে এসেছে। মাহিষ্য, রাজবংশী, ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতির পদবী।

হাজারী— মোগল আমলের পদবী। হাজার (সহস্র) সৈন্যের মনসবদার। পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

হালদার— মোগল আমলের পদবী। শব্দটি সম্ভবতঃ 'হাবিলদার' শব্দ থেকে এসেছে, 'হাল' অর্থাৎ 'লাঙল'-এর সঙ্গে শব্দটির কোন সম্পর্ক নেই। সৈন্যবাহিনীর নাযক অর্থে 'হাবিলদার' শব্দটি প্রযুক্ত। ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, হাড়ি, পৌণ্ড্র, ডোম, তিওর সূত্রধর প্রভৃতি জাতির পদবী।

শিকদার/সিকদার— মুসলমান আমলে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, মাহিষ্য, রাজবংশী, সদগোপ, তিলি প্রভৃতি জাতির পদবী।

পদবীর ইতিহাস বিচিত্র। তার বিবর্তনের ইতিহাস আরও বিচিত্র। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের পদবীর মধ্যে কত বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেগুলি যদি উদ্ধার করা যায় তাহলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত/ব্যবহৃত পদবীগুলির মধ্যে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে এমন ধারণা অসঙ্গত নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আর্থ সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। এক কথায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গরীব মানুষের দেশ। কিন্তু এই অঞ্চল যে একসময় সমৃদ্ধশালী ছিল, প্রচুর ধনবান, বিত্তবান মানুষের বাস ছিল গবেষকগণের ইতিহাস অনুসরণ করে তা প্রমাণ করা যায়।বারে বারে বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চল জনশূন্য হয়েছে, কিন্তু সেই সেই সময়ের বসবাসকারী মানুষের অস্তিত্ব তো একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। তারা আশে পাশের জনবসতিতে আশ্রয় নিয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষকগণের মতে আজও তারা বিবর্তিত আকারে বাস করছে। পদবী এগুলিরও সাক্ষ্য দেয়। ঠিক তেমনি এখানে যে সাধু, সজ্জন, সংস্কৃতিবান, বীর যোদ্ধা রণনায়ক, ধার্মিক/ধর্মগুরু প্রভৃতি মানুষের বসবাস ছিল এখানকার পদবী দেখে তা অনুমান করা যায়। এখন এই জাতীয় পদবীর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

আড়ি— আঢ্য—আড্ডি—আড়ি। ধনবান, সমৃদ্ধ ব্যক্তি। কৈবর্ত, ডোম, পৌণ্ড্র, হাড়ি, রাজবংশী প্রভৃতি জাতির পদবী।

আউলে/আউলিয়া— সহজপন্থী আউল সম্প্রদায়ের সাধকদের 'আউল' বলা হয়। আউল—আউলিয়া। গোপ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি জাতি এই পদবী ব্যবহার করে।

খাঁ/খান— মুসলমান আমলের সম্ভ্রান্ত মানুষদের উপাধি। পরবর্তীকালে এগুলি পদবী হয়ে গিয়েছে। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, তিলি, বারুই প্রভৃতি জাতির পদবী।

খামারু— শস্য মাড়ান ও গোলাজাত করার পূর্বে যেখানে সংরক্ষিত হয়—তাকে খামার বলে। এই খামারের মালিক। অর্থাৎ সম্পন্ন কৃষক। পৌণ্ড্র, কাওরা, মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

গুড়ে— গুড়ব্যবসায়ী। মাহিষ্য, কৈবর্ত, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

গোলদার— গোলার অধিকারী। সাধারণতঃ গোলা তথা শস্যভাণ্ডারের মালিকদের গোলদার বলা হত। পৌণ্ড্র, তিলি, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

ঘোষ— ঘোষক অর্থে। আগেকার দিনে রাজদরবারে ঘোষক শ্রেণীর মানুষ থাকতেন। কায়স্থ, কাওরা, গোয়ালা, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

জাতুয়া— সদ্‌বংশজাত ব্যক্তি অর্থে। সম্মানজনক শব্দ। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির পদবী।

জোয়ারদার— 'জোয়ার' নামক শস্যের ব্যবসায়ী। সম্পন্ন ব্যক্তি। পৌণ্ড্র কর্মকার প্রভৃতি জাতির পদবী।

দত্ত— দাতা অর্থে। কায়স্থ, তাঁতি, রাজবংশী, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

দপ্তরী— মুসলমান আমলে দপ্তরখানা রক্ষকদের দপ্তরী বলা হত। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, প্রভৃতি জাতির পদবী।

পাল— পালক বা রক্ষক অর্থে। প্রাচীনকালের সম্মানজনক উপাধি। পরবর্তী কালে পদবী হয়েছে। কুম্ভকার, কৈবর্ত, তিলি, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির পদবী।

বল— শক্তিমান, বীর্য সম্পন্ন মানুষ অর্থে। তিলি প্রভৃতি জাতির পদবী।

বাহাড়— যে ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় তালগাছের গুঁড়ি তুলে গড়িয়ে দিতে পারে তাকে গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তি বলে সম্মান জানানো হত। এটি পদবী হয়ে গেছে। পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, তিয়র প্রভৃতি জাতির পদবী।

বৈরাগী— বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনকারী। পৌণ্ড্র, কাওরা, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির পদবী।

ভদ্র— ধর্মীয় আচার্যদের উপাধির অনুসরণে। কায়স্থ, তাঁতি, ব্রাহ্মণ, মোদক প্রভৃতি জাতির পদবী।

ভাণ্ডারী—ভাণ্ডারের রক্ষক অর্থে। মাহিষ্য, সদগোপ প্রভৃতি জাতির পদবী।

ভৌমিক— ভূস্বামী/জমিদার। পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, ব্রাহ্মণ, ভুঁইমালী প্রভৃতি জাতির পদবী।

যদিও 'পদবী' বলতে যথার্থভাবে উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম বোঝায়না, তবুও ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায় উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম একসময় 'পদবী' তে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গ্রামের নাম, কোন স্থানের নাম, কোনো নামের শেষ অংশ, জীবজন্তুর নাম, বৃত্তি, পদমর্যাদা, রাজসরকারের চাকরি, সাংসারিক নিত্যব্যবহার্য জিনিস, ফুল-ফল, মাছ, পর্বত, সূর্য, চন্দ্র, ধর্ম/ধর্মগুরু, অর্থবান/বিত্তবান ব্যক্তি, সাধু/সজ্জন ব্যক্তি, গুণীজন/সংস্কৃতিবান মানুষের খেতাব প্রভৃতি 'পদবী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পদবীর অর্থ বহু প্রসারিত। ফলে বাঙালীর পদবীর উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। পদবীর প্রকৃত অর্থ কি তা খোঁজা পণ্ডশ্রম।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বহু বিচিত্র পদবী আছে। পূর্বে তার পরিচয় বিবৃত করা হয়েছে। তবে পদবীর ইতিহাসে অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণী আছে। ভাষাগত কৌলীন্য না থাকার ফলে এবং অজ্ঞতা বশতঃ কিছু কিছু পদবীকে আমরা নিচু বা অন্ত্যজ বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। প্রাচীনকালের সমাজব্যবস্থায় অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীভেদ অন্যরকম ছিল। তখন বৃত্তি দ্বারা বংশ গৌরব বা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হত না। ফলে একই বৃত্তিমূলক পদবী ব্রাহ্মণদের ছিল আবার শূদ্রদেরও ছিল। পূর্বে একথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপের যুগে শূদ্রদের সমাজের নিম্নশ্রেণীতে স্থান দিয়ে এমন সব হীনবৃত্তি নির্দেশিত করা হয়, যাতে তাদের আভিজাত্য গৌরব বিনষ্ট হয় এবং অধিক উপার্জন না করায় দারিদ্র্যে পতিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার।

ইতিহাসের অনুসরণ করলে দেখা যায় রামায়ণের যুগে এই অঞ্চল জনশূন্য ছিল, আবার মহাভারতের যুগে জনসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রী. পূ. তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে গঙ্গারিডি জাতির রাজত্বকালে শৌর্য, বীর্য, সম্পদ, ও অন্যান্য বহুমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। পালযুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের ধন জন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মোগলযুগে শাজাহানের সময় থেকে আবার এই অঞ্চলের জন সমৃদ্ধি হ্রাস পেতে শুরু করে, ঔরঙ্গজেব কিংবা তাঁর পরবর্তী সময়ে আবার এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে জন সমাগম ঘটে আবার পুনরায় জনশূন্য হয়ে যায়, পরবর্তী কালে জন সমাগম ঘটে এবং আজও তা বজায় আছে এবং বৃদ্ধি ঘটেছে। বারবার এই জনশূন্য হওয়ার কারণ হিসেবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দায়ী করা হয়েছে। এককালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক কোটিবর্ষীয়দের প্রবল চাপে পুণ্ড্রবর্ধনীয়গণ এই অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। গড়ে তুলেছিল রাজ্যপাট, কালের কবলে তাদের সে রাজ্য-পাট বিনষ্ট হয়ে গেলেও তাদের বংশধারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তারা বিবর্তিত আকারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজও বর্তমান। বিভিন্ন পদবী তার প্রমাণ দেবে।

প্রাচীনকালে জাতিগত ভেদাভেদ বা বর্ণভেদ বলে কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জাতি বা বর্ণ ভেদ শাস্ত্রকারগণের কীর্তি বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রকারগণ বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছেন। তাই মেগাস্থিনিসের 'ভারত বিবরণে' মৌর্যযুগের সমাজব্যবহার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে বৃত্তিকান্ত

শ্রেণীবিভাগ আছে। সমাজে বৃত্তি অনুযায়ী মানুষের পরিচয়। এই ভাবে রাজকর্মচারী, সৈনিক, শিক্ষক, বণিক, শিল্পী, পশুপালক ও কৃষকের পরিচয় আছে। জাতি হিসাবে এরা কি ছিল তা জানা যায় না। 'পদবী' বিচার করলে এই ব্যাপারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন— প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণও কৃষিকাজ করতেন আবার শূদ্রেরাও শিক্ষক, শিল্পী ইত্যাদি ছিলেন। পরবর্তীকালে তাই একই পদবী একাধিক জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং পদবী দ্বারা জাতি নির্ণয় হাস্যকর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পদবী বৈচিত্র্যের উৎস খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে অতি প্রাচীন কালে। মহাভারতে দেখা যায় মহাবীর ভীমসেন বহুবিধ দেশ জয় করে ও সর্বত্র থেকে ধনরত্ন সংগ্রহ করে শেষে লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হলে সাগরতীর বাসী ম্লেচ্ছ রাজাগণ তাঁকে বিভিন্ন মহামূল্য দ্রব্য কর হিসাবে প্রদান করেন। মহাভারতের যুগের সাগরতীরে সেই দেশ ছিল আজকের নিম্নবঙ্গ, যার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাও রয়েছে। বিভিন্ন গবেষকগণ ও ঐতিহাসিকগণের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ঐ ম্লেচ্ছ রাজগণ ছিলেন 'গঙ্গারিডিসহ' পূর্বভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের নৃপতি, যাঁরা একসময় কোটিবর্ষীয়দের প্রবল চাপে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সাগরতীরে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা সাগরকূলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন।

এই পুণ্ড্রবর্ধনীয় জনগোষ্ঠী কর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলি পরবর্তীকালে পদবী-তে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কালের প্রভাবে, রাজনৈতিক চক্রান্তে এই সমস্ত মানুষ বিত্তহীন হয়ে দুর্দশায় পতিত হয় এবং সমাজে নিম্নস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু এককালে এরা যে শৌর্য-বীর্যবান, সংস্কৃতিবান, ধনবান ও উচ্চপর্যায়ের মানুষ ছিল— পদবীগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে অন্ত্যজ, কৌলীন্যহীন বলে মনে করা হয়, বিচার করলে দেখা যায় সেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল। রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যারা নিজেদের করায়ত্ব রাখতে চায়, তারা তো চাইবেই সমাজের কিছু অংশকে দরিদ্র, সংস্কৃতিবিহীন ও অশিক্ষিত করে রাখতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পদবীগুলি যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এই বৈষম্যের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে পারে।

পদবীর ইতিহাস যেমন বিচিত্র, পদবী পরিবর্তনের ইতিহাস তেমনি চমৎকার। মানুষ বংশপরম্পরায় যে পদবী ধারণ করে আসছে আজকের যুগে তার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। পদবী পরিবর্তন আইনসম্মত-ও বটে। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে পদবী পরিবর্তনের আইনগত অধিকার স্বীকৃত হয়। অ্যাফিডেভিটের সাহায্যে এই পদবী পরিবর্তন করা যায়। বাবা মায়ের দেওয়া নাম আর বংশগত পদবী যতই ঐতিহ্যবাহী কিংবা সুন্দর অর্থযুক্ত হোক না কেন আধুনিক মানুষ যুগের তাগিদে তা পরিবর্তন করে, অনেক সময় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ বাবা মা সন্তানের নামকরণ করে। অজ্ঞতার জন্যে কিংবা রুচিগত তারতম্যের ফলে নাম সেকেলে অসুন্দর হতে পারে। কিন্তু পদবী বাপ মায়ের দেওয়া নয়— বংশগত। প্রাচীনকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ এই পদবী বহন করে আসছে। পদবীর উৎপত্তির ইতিহাসে দেখা গিয়েছে স্থানের নাম, মানুষ যে জায়গায় বসবাস করেছে তার নাম, কোনো নামের শেষ অংশ, মানুষের বৃত্তি, পদমর্যাদা, রাজ সরকারের চাকরি, খেতাব, জীবজন্তুর নাম, ফল ফুল গাছ, দেবতার নাম, দ্রব্যের নাম, শিক্ষিত লোকের দেওয়া অবজ্ঞা সূচক শব্দ প্রভৃতি পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং পদবীর মধ্যে সুন্দর, শ্রুতিসুখকর, সুঅর্থবহ শব্দ যেমন আছে, তেমনি শ্রুতিকটু, অসুন্দর, কদর্য অর্থ বহনকারী শব্দও আছে। বংশপরম্পরায় এগুলি

চলে আসছে বলে চিরকাল এগুলিকে ধরে রাখতে হবে এমন কোনো বাধা বাধকতা নেই। তাছাড়া প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ পদবী পরিবর্তন করে। চাকুরির প্রয়োজনে, সম্মানজনক কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় মানুষ পদবী পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

গড, গুড, খান, ঘন্টা, ঢেঁকি, হড় প্রভৃতি অনেক পদবী আছে ব্রাহ্মণদের। কিন্তু এই পদবীগুলি শ্রুতিসুখকর তো নয়ই উপরন্তু শব্দগুলির অর্থও সুন্দর নয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের এই পদবীগুলি পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এইভাবে পদবীপরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের জন্য পদবী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। অপরিচিত, অসংস্কৃত, শ্রুতিকটু, অসুন্দর, জীবজন্তুর নাম, তুচ্ছ দ্রব্যের নাম ইত্যাদি পদবীতে দেখলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করে ফেলার সহজাত প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। ফলে উক্ত পদবীযুক্ত মানুষটির উপর সামাজিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। সেইজন্যে অনেক সময় পদবী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইংরেজ আমলে অনুন্নত, বঞ্চিত, দরিদ্র, নিপীড়িত কিছু জাতিকে তালিকাভুক্ত করে 'সিডিউলড কাস্ট' বা 'তফসিলী জাতি সমূহ' হিসাবে দেখানো হয়। তাদের উন্নতির জন্যে সরকারীভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। 'সিডিউলড' শব্দের অর্থ 'নির্দিষ্ট'। কিন্তু এই তফসিলী জাতি সমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীচু জাতি ভাবা হয়। এই জাতি সমূহ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব জাতিকে বর্ণহিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ বিচার করলে দেখা যায় বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অনেক জাতিই তালিকাভুক্ত অনেক জাতি অপেক্ষা নিম্নমানের। যেহেতু তার' তালিকাভুক্ত হয়নি তাই তাদেরকে নীচু জাতি বলে ভাবা হয় না। সামাজিক ভাবনার এই অসংগতি, অবিচার তফসিলী জাতি সমূহকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এরা আবার সরকারী কিছু সুবিধা পায় বলে অনেক ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের হিংসা ও ক্রোধের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে সহযোগিতা মেলা মেশা ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, কোথাও কোথাও অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হতে থাকে। এই তফসিলীদের মধ্যে অনেকের পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা প্রকাশ পায়।

এইভাবে পদবী পরিবর্তনের কিছু কারণ নির্ণয় করা যায়—

(১) অসুন্দর, অসংস্কৃত, কদর্থবাচক শব্দাবলী পদবী হিসেবে না রেখে পরিবর্তন করার প্রবণতা।

(২) প্রাচীন, সেকেলে পদবীর পরিবর্তনের প্রবণতা।

(৩) নিজের ভাল লাগেনা এমন পদবীর পরিবর্তনের ঝোঁক।

(৪) যে পদবীর মধ্যে জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রকাশ পায়; সেগুলি উচ্চপর্যায়ের না হলে পরিবর্তনের প্রবণতা।

(৫) সামাজিক অবজ্ঞা, অত্যাচার ইত্যাদির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা উপায় হিসাবে তফসিলীদের পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা।

(৬) অ-তফসিলী জাতিদের অনেকের এমন পদবী আছে যেগুলি তফসিলীদের আছে। পাছে লোকে তাদের তফসিলী ভাবে এ জন্য পদবী পরিবর্তন করা হয়।

(৭) শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, ধনে মানে উন্নত হচ্ছেন, অথচ পদবী শুনলে লোকে নাক সিঁটকায়— এই ধরনের মানুষদের মধ্যে পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায়।

(৮) জীব জন্তুর এবং তুচ্ছ দ্রব্যের নামের পদবীগুলির পরিবর্তনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

(৯) দেশ বিভাগের ফলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্থানান্তরিত হলে সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যে লোকে পদবী বদল করে।

(১০) কোনো অন্যায়, অসামাজিক কিংবা খারাপ কাজ করে গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে নামের সঙ্গে সঙ্গেও পদবী বদল করে।

(১১) দুই/তিনটি শব্দযুক্ত বড় বড় পদবীগুলি পরিবর্তিত করে ছোট্ট করা হয়।

(১২) অ-বাঙালী পদবী পরিবর্তন করে বাঙালী পদবী নেওয়া হয়।

(১৩) মহিলাদের বিবাহের পর, ধর্মান্তরিত হলে পদবী পরিবর্তন করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই পদবী-পরিবর্তনের ঘটনা দেখা যায়। এখানে নিম্নমানের মানুষদের এবং তফসিলীদের মধ্যে পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা বেশি। অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, অ-জলচল ইত্যাদি অখ্যাতি দ্বারা চিহ্নিত পদবীধারী মানুষজন সামাজিক অত্যাচার, অবজ্ঞা, ঘৃণার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পদবী পরিবর্তন করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তফসিলী এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ সাধারণতঃ শ্রমজীবী। এদের মধ্যে চাষী, কামার, কুমোর, মুচি, মেথর, ধোপা, জেলে গোয়ালা, তাঁতী, ইত্যাদি বৃত্তিধারী মানুষজন বর্তমান। আধুনিক কালে এরা সরকারী কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়ে এবং নিজেদের আন্তর প্রেরণায় লেখাপড়া শিখে চাকুরি গ্রহণ করছে এবং বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করছে। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্যে তারা বৃত্তি-পরিচায়ক, বংশ-পরিচায়ক কিংবা অবহেলিত পদবী পরিবর্তন করছে। মোটকথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পদবী পরিবর্তনের প্রধান কারণ হল সামাজিক অবজ্ঞা, ঘৃণা, অন্যায়, অসাম্য, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অত্যাচার ইত্যাদি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত পদবী পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল—

বৃত্তিমূলক পদবী বেশি পরিবর্তিত হয়েছে : যেমন— কয়াল, ঘরামী, মিস্ত্রী, নাইয়া, গায়েন, পরামানিক, মাঝি, বৈদ্য, বায়েন, শিউলী, শিকারী, বাগানী, কর্মকার, জালানি, ঢালি, পাইক, তাঁতী ইত্যাদি। এঁরা হয়েছেন রায়, সরকার, মিত্র, মল্লিক, দাস, হালদার ইত্যাদি।

জীবজন্তুর নামের পদবী : বাঘ, কুমীর, হাতি, ইত্যাদি হয়েছে— রায়, হালদার, সরকার, দাস ইত্যাদি।

অন্যান্য পদবীগুলির মধ্যে :

পূর্বেকার পদবী	**পরিবর্তিত পদবী**
সর্দার/সরদার—	সরকার, হালদার, রায় ইত্যাদি।
কুইদাস—	দাস।
মণ্ডল—	রায়, মল্লিক ইত্যাদি।
কোটাল, মাকাল—	রায়, হালদার ইত্যাদি।
মাল, মিদ্যা, হাজারি, কাঁটাল—	রায়, হালদার ইত্যাদি।
হালদার—	রায় ইত্যাদি।
নস্কর—	রায় ইত্যাদি।
পুরকাইত—	পুরকায়স্থ।
ঢেঁকি—	রায়, হালদার ইত্যাদি।
বেপারী—	রায়, হালদার ইত্যাদি।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীন সমাজে পদবী পরিবর্তনের রেওয়াজ ছিল না। কারণ স্বরূপ বলা যায় প্রাচীন সমাজ ছিল উদার ও গুণ-কর্মের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করত। কর্ম অনুযায়ী, গুণানুযায়ী মানুষ যথোপযুক্ত মর্যাদা পেতেন। ফলে সমাজে পদবী পরিবর্তনের

প্রয়োজন ছিল না। যে পদবী নিয়ে এত বৈষম্য, ভেদাভেদ— সেই পদবী বাদ দিয়ে জ্ঞাত বর্ণহীন সমাজ গঠন করাই শ্রেয়।

বর্তমান কালে শ্রেনীহীন সমাজ গঠনের পক্ষে কিছু কিছু আন্দোলন হতে দেখা যায়। কিছু মানুষ জাতি বর্ণহীন মুক্ত সমাজ গঠনের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ হলো পদবী বিসর্জন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই রকম আন্দোলনকারী কয়েকটি গোষ্ঠী লক্ষ্য করা গিয়েছে।

ডাকনাম

বাবা-মা গুরু-পুরোহিত, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি জন্মের পর মানুষের নামকরণ করে থাকেন। অনেক সময় পাঁজি দেখে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিচার করে এই নামকরণ হয়। অন্নপ্রাশনের সময়ও জাতকের নামকরণ হয়ে থাকে। এই ধরনের নাম ভাল নাম বা পোষাকী নাম। কিন্তু ডাকনামের বেলায় এই ঘটা বা সমারোহের বালাই থাকেনা। ডাক নাম ঠিক করতে হয় না, তা অজান্তে বাড়ীর লোকজন পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে মুখে তৈরী হয়ে যায়। ডাক নাম পথ চলতে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মত জীবনের চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া নাম।

বিভিন্নভাবে ডাক নাম তৈরী হয়। বাবা-মা ভালবেসে আদর করে কোন নাম দিলে ডাক নাম হয় আবার ক্রোধ করে অশ্রদ্ধা করে গালি কিংবা অভিশাপ দিলে-তাও ডাক নাম হয়ে যায়। শরীরের আকৃতি অনুযায়ী, গুণ-দোষের রকম অনুযায়ীও ডাক নাম তৈরী হয়। কৃষ্ণকে কেষ্ট/কেষ্টা; বুদ্ধদেবকে বুধো; উদ্ধব কে উদো; কালিপদ কে কেলো, বিশ্বনাথকে বিশে, নিমাইকে নিমে প্রভৃতি নামে ডাকা প্রায় সচরাচর দেখা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি উদ্ভট, অর্থহীন, অসুন্দর প্রভৃতি শব্দ ডাক নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা শুনলে হাসি পায় কিংবা বিস্মিত হতে হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই রকম অর্থহীন উদ্ভট নামের সংখ্যা প্রচুর।

এখন বিভিন্ন ধরনের ডাকা নাম এবং তাদের উৎপত্তির সম্ভাব্য ইতিহাস দেওয়া হল—

বাবা মা, বাড়ীর লোক জন ইত্যাদি যে ডাক নাম দেয় :

খোকা	**বুড়ো**	**দাসি**
বড়খোকা	**বুড়ি**	**কচ্ছানি (কচি ছানি)**
খুকি	**খোকন**	**ন্যাড়া/নেড়া**
বড় খুকি	**কচি খোকা**	
মামনি	**ছানা**	
	কচ্ছানা (কচিছানা)	

শারীরিক আকৃতি অনুযায়ী ডাক নাম :

খাঁদা/খাঁদি— যে ছেলে বা মেয়ের পুরুষ বা স্ত্রী লোকের নাকটা হয়ত একটু চাপা। ছোট বেলায় এই লক্ষণ ছিল, পরে তারা হয়ত সুন্দর নাসিকার অধিকারী/অধিকারিণী। কিন্তু ডাকনাম হয়ে গিয়েছে খাঁদা/খাঁদি।

বোঁচা/বুঁচি— ঐ রকম।

ভুঁটে—কোন সময় হয়ত তার নাক ডাকত— পরে তার কোন দোষ নেই। কিন্তু ডাক নাম রয়ে গিয়েছে।

ভুঁড়ে— যার ভুঁড়ি ছিল বা আছে।

পচা— কোন এক সময় হাত পা পচে যেত অর্থাৎ হয়ত খুব চর্মরোগ হত।

খোঁড়া/খুঁড়ি— পায়ে গলদ ছিল বা আছে।

কানা/কানি— চোখ কানা বা চোখে গলদ।

ভেটকি— গালটা হয়ত কিছুটা বড় অর্থাৎ ভেটকি মাছের মত দেখতে।

আলু, পটল, লেবু— গোলগাল, পেটমোটা চেহারার। পরবর্তী কালে সুন্দর দেহের অধিকারী হলেও ডাক নাম থেকে যায়।

কুরুণ্ডে— রোগ ভোগা শরীর/পাকানো চেহারার হলে।

কাঁসুরে— পেট মোটা, প্লীহাতে ভোগা শরীর।

হাঁসা— খুব ফরসা হলে।

কটাশ— চোখ কটা কিংবা খটাশের মত চেহারা।

কুশো—কৃশ। শরীর হয়ত কৃশ ছিল।

লেলো— এক সময় হয়ত খুব লাল পড়ত।

গড়াই— হয়ত গড়াই মাছের মত চেহারা ছিল।

জটে/জটাই—মাথায় হয়ত জট ছিল।

গুলে—গাঁট্টা-গোট্টা চেহারার।

হেড়ো/হেড়িনী— পাগলাটে ধরনের মানুষ।

চিটে— রোগা ধরনের মানুষ হলে।

ধইচে— লম্বা লোক হলে।

বাঁটি/ভাঁটি— বেঁটে মহিলা।

বাঁটুল— বেঁটে-পুরুষ।'

নন— ছোট ছেলে। কিন্তু বড় হলে সেই ডাক নাম থেকে যায়।

নাটা— গোল গাল চেহারার লোক। পেট মোটা, ভুঁড়িওয়ালা ধরনের হলে।

লেংটি— ছোটবেলায় বেশি ল্যাংটো থাকত হয়ত।

গোগা/গুগি— বোবা কিংবা ওই ধরনের হলে পরবর্তীকালে কথা বলতে পারলেও নামটি থেকে যায়।

এই ধরনের বহু ডাক নাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শুনতে পাওয়া যায়। এমন কতকগুলি ডাক নাম আছে যেগুলি অনেকাংশে উদ্ভট। চেহারা, স্বভাব, দোষ গুণ ইত্যাদি কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তবুও কখনও কোন এক ঘটনা কিংবা কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ পেয়ে ডাকনাম হয়ে গিয়েছে। শুনতে খারাপ হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সারাজীবন তা বহন করে চলে। ঘরের জিনিসপত্র, কোন দ্রব্য, ফল, ফুল, পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির নাম নিয়ে ডাক নাম হয়। নামের বিকৃতি তো আছেই। এক এক অঞ্চলে এই ডাক নামের এক এক ধরন পাওয়া যায়।

নামের বিকৃতি থেকে যে ডাকনাম জন্মায় তা সর্বত্র পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় বলে আমাদের আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হল।

এখন বিভিন্ন ধরনের ডাকনামের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

খন্তি	ভোঁটা	ফইমে	ঝোড়ো	ফলতি	যাঁতা
গোঁড়া	ভোঁদা	চিমে	ঝড়ি	কুড়ো	কুচো
ভটকো	গুজা	খলসে	ডেমর	কুয়া	টেঁপি
বুচকি	ডেনো	ফিতে	গুয়ে	চোঙা	পুঁটি

চিমটে	ঘণ্টা	কোটো	পালানী	ঝুবো	ঘোনা
দেবকো	কাঁসব	বল্টু	চাকু	হিম্‌চে	জিবা
জঞ্জাল	গাঁট্টা	কিযো	চিংড়ি	গিমে	ফডিং
পযমেলে	বেটো	গ্যাঁদা	বেলে	ট্যাংবা	পেঁকো
লাট্টু	নন্তে	মডি	নোনা	ঘুনসি	মূলো
ঝুপসি	ভুন্ডে	কামানে	আতা	মাদুলি	বালতি
ঝুপি	ফড়ে				
নকল'	বলদে	ইত্যাদি			

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ

ভাষা বয়ে চলা নদীর মত প্রবাহশীলা হলেও নিয়ত গতিপথ পরিবর্তন করে এগিয়ে চলে। এই পরিবর্তনের রূপ বড় বিচিত্র আবার কখনও কখনও দুর্বোধ্য। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কত বিচিত্র রূপে, বিভিন্ন ভাবে ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। গুহা মানবের মুখের উচ্চারিত ধ্বনিগুলি ধীরে ধীরে কালে কালে রূপান্তর গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট ভাষায় পরিণত হয়েছে। তা আবার নব নবরূপে পরিবর্তিত হতে হতে অনাগত কালের দিকে এগিয়ে যাবে। ভাষা তাই নদীর মত—বিরামহীন বিশ্রামহীন তার চলা।

চলমান ভাষা-নদীর গতি তার পথ খুঁজে বেড়ায় রূপান্তর গ্রহণের মধ্যে। ভাষার এই পরিবর্তনগুলির মূল বা প্রধান ব্যাপার হল ধ্বনি পরিবর্তন। একে আন্তর পরিবর্তন বললে অযথার্থ হয় না। অর্থবহ উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টিকে ব্যাপক অর্থে ভাষা বলা যেতে পারে। সুতরাং ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। আবার এটাও বলা যায় যে উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটলে ধ্বনিও পরিবর্তিত হয় এবং ভাষার পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং ধ্বনির উচ্চারণ হল ভাষার মূল কথা। মানব শরীরে এই ধ্বনি সমষ্টির উচ্চারণের কয়েকটি স্থান আছে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আবার তা আলোচনা করা হচ্ছে। ভাষা বিজ্ঞানীগণ মানব শরীরে মোটামুটিভাবে ১৪টি উচ্চারণস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে যে উচ্চারণ স্থানগুলি নির্দেশ করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—(১) ওষ্ঠ (২) অধর (৩) দন্তমূল (৪) জিহ্বামুখ (৫) অগ্রজিহ্বা (৬) পশ্চজিহ্বা (৭) জিহ্বামূল (৮) তালু (৯) নিম্ন তালু (১০) অলি জিহ্বা (১১) কণ্ঠমূল (১২) উর্ধ্ব কণ্ঠ (১৩) কণ্ঠতন্ত্রী (১৪) কণ্ঠনালী।

এই উচ্চারণস্থানগুলি কোন কারণে অসুবিধাগ্রস্ত হলে উচ্চারণ বিঘ্নিত হয় ফলে বিকৃতি দেখা দিতে পারে। শারীরিক গঠন এবং জলবায়ু ধ্বনি সমষ্টির উচ্চারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। শিশুর উচ্চারণে যুবকের উচ্চারণে আর বৃদ্ধের উচ্চারণে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। শারীরিক গঠনের জন্য এটি হয়। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হলে গলা ধরে গেলে উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে। আবার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উচ্চারণের সঙ্গে আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জিহ্বার জড়তা, শ্রবণশক্তির স্বল্পতা প্রভৃতিও ধ্বনির উচ্চারণে বিকৃতি ঘটাতে পারে।

ভাষার রূপান্তর গ্রহণ ও নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ হল ধ্বনির উচ্চারণে বিকৃতি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আর্যগণের ভারতে আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষায় যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মূলেও এই উচ্চারণ-বিকৃতি। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসেন আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ নাগাদ। মধ্য এশিয়া থেকে আগত এই পশুপালক যাযাবর জাতির ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী ভাষা। মধ্য এশিয়ার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত আর্দ্র জলবায়ুতে এসে আর্যগণের জিহ্বার জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল। ফলে উচ্চারণে বিকৃতি দেখা দিল এবং জন্ম হল অসংখ্য নূতন শব্দের। উদাহরণ নিলে দেখা যায়—প্রাচীনকালে আর্যভাষায় [illegible] ধ্বনি দুটি যথাযথভাবে উচ্চারিত হত। পরবর্তীকালে উচ্চারণে জড়ত্বের

জন্য '৯' ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে এবং 'ঋ' ধ্বনির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে বিভিন্ন ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ ঘটেছে। পদমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ একটা বিরাট ঘটনা যার ফলে বহু নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা তদ্ভব শব্দের উৎপত্তির মূলেও ছিল কিন্তু এই উচ্চারণ বিকৃতি। যেমন—সং খাদ্য > খজ্জ > খজ্জ > খাজা।
সং নপ্তৃক > নাত্তিঅ > নাতি; সং রাজ্ঞিকা > রন্নিআ > রানি/রানী।

এই উচ্চারণ বিকৃতির পথ ধরেই বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু সংস্কৃত কিংবা বৈদিক ভাষাই নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European), দ্রাবিড় (Dravidian), অস্ট্রিক (Austric), সেমীয়-হামীয় (Semitico-Hamitic), ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan) প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষা বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এসেছে। উচ্চারণ বিকৃতি এই আগমনকে সাহায্য করেছে।

বাংলা ভাষায় উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টির মূলেও আছে এই উচ্চারণ বিকৃতি।

মানুষের মুখ নিঃসৃত ধ্বনি সমষ্টি অর্থ সমন্বিত হয়ে যে ভাষার সৃষ্টি করে তার রূপ ও প্রকৃতি সর্বত্র এক হতে পারে না। সব মানুষের দৈহিক গঠন সমান নয়, তেমনি সমস্ত অঞ্চলের মানুষ একইরকমভাবে কথা বলতে পারে না। এছাড়া জলবায়ুর প্রভাব, শারীরিক ত্রুটি, বয়সের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদির জন্য মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে উচ্চারণের পার্থক্য ঘটতে বাধ্য। এই পার্থক্য কথ্য ভাষায় সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয়। মুখের ভাষা তথা কথ্যভাষা যেখানে আসল ভাষা, সেখানে দেখা যায় প্রত্যেক জাতির, দলের, সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষায়/উপভাষায়/আঞ্চলিক ভাষায়/ কথ্যভাষায় কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই বিশিষ্টতাই কথ্য ভাষার প্রাণ। উচ্চারণভঙ্গি এই বিশিষ্টতার অন্তর্গত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের উচ্চারণভঙ্গির বিশিষ্টতা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের মানুষের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলার মানুষদের উচ্চারণের থেকে অনেকখানি আলাদা। [ধ্বনি-বিশ্লেষণ-পর্যায়ে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হবে।] বিশেষ করে সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষ ও নিরক্ষর মানুষের উচ্চারণ এমনই যে অনেক স্থলে সাধারণ প্রচলিত শব্দাবলী যেন নূতন রূপ গ্রহণ করে। এই উচ্চারণ বিকৃতির জন্য অনেক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

জিহ্বার জড়তার জন্য হোক, কিংবা উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্য হোক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিরক্ষর মানুষ কিংবা খুব সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষ 'র'-ধ্বনিটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে যে সব শব্দের আদিতে 'র' আছে সেগুলি উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে। যেমন—

রাজা—আজা	রগড়—অগড়	রসিক—অসিক
রাম—আম	রঙ্গ—অঙ্গ	রাংতা—আংতা
রুটি—উটি	রঞ্জন—অঞ্জন	রাঁড়—আঁড়
রবি—অবি	রঙ—অঙ	রাঁড়ী—আঁড়ি
রণ—অন	রত্তন—অতন	রাঁধুনী—আঁধুনি
রাক্ষস—আক্কস	রত্ন—অত্ন	রাখতে—আকতে
রাক্ষুসে—আক্‌খুটে	রপ্ত—অপ্ত	রাগ—আগ
রানী—আনী	রমনী—অমনী	রাগারাগি—আগাআগি
রকম—অকম	রশি—অশি	[illegible]
রক্ত—অক্ত	রস—অস	[illegible]

রাজত্ব — আজত্ব
রাত্রি ---আত্তির
রুগী— উগি
রূপসী—উপসী
রোজগার—ওজগার
রোদ্দুর—অদ্দুর
রোজা—ওজা
রেউী—এডুই
ঋষি ইসি
ঋতু—ইতু
রান্না—আন্না
রান্নাঘর—আন্নাঘর
রঞ্জন--- অঞ্জন
রোম—ওম
রূপকথা—উপকথা/উবকথা
রূপ—উব
রওনা—অওনা
রক্ষাকালী—অক্কেকালী
রঙ্গিল—অঙিল
রটন্তী—অটন্তী
রড—অড
রব—অব
রমা—অমা
রমেশ—অমেশ
রম্ভা—অম্বা
রল—অল
রসুন—অসুন/ওসুন
রহস্য—অহস্য
রাই—আই
রাধা—আধা/বা আদা
রাজনীতি—আজনীতি
রাজমিস্ত্রি—আজমিস্ত্রি
রাজহাঁস—আজহাঁস
রামধনু—আমধনু
রাবড়ি—আবড়ি
রাবণ—আবণ
রাহু—আহু>আউ
রিকশা—ইসকা
রিঠা—ইটে
রীতি—ইতি
রুইমাছ—উইমাছ
রুচি—উচি
রুজি—উজি
রেকাব—একাব
রেখা—একা
রেবতী—এবতী
রেলিং—এলিং
রেহাই—এহাই
রোদ—ওদ
রোখা—ওকা
রোপণ— ওপন

এইভাবে ‘ল’ হয়ে যায় ‘ন’। তবে সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষর ‘ল’ থাকলে তা ‘ন’ হয়।

লক্ষ্মী—নক্খী
লোহা—নোযা
লক্ষণ—নক্ষণ
লগন—নগন
লগ্ন—নগ্ন
লজ্জা—নজ্জা
লতি—নতি
লম্ফ—নম্প
লহর—নহর—নওর
লাউ—নাউ
লাঙ্গল—নাঙল
লাটাই—নাটাই
লাথি—নাতি
লায়েক—নায়েক
লাল—নাল
লালচ—নালচ
লিচু—নিচু
লেবু—নেবু
লুট—নুট (হরির নুট)
লৌকিকতা—নৌকিকতা
লেংটি—নেংটি (নেংটি ইঁদুর)
লেখাজোখা—নেকাজোকা
লালস—নালচ
লাট—নাট
লাটাই—নাটাই
লিখন—নেকন লেচি—নেচি
লেজ—ন্যাজ
লোক—নোক
লোকসান—নোকসান/নোসকান
লোটন—নোটন
লোনা—নোনা
লোল—নোল
লক্ষ—নক্ষ
লখাই—নকাই
লঙ্কা—নোঙ্কা
লড়ালড়ি—নড়ানড়ি
লণ্ঠন—নণ্ঠন
লণ্ডভণ্ড—নণ্ডভণ্ড
লবঙ্গ—নবঙ্গ/নোবঙ্গ
ল্যাঠামাছ—ন্যাটামাছ
লবণ—নবন/নুন
লম্বা—নোম্বা
ললিত—নলিত
লাইট—নাইট
লাগা—নাগা
লাগাতার—নাগাতার
লাজ—নাজ
লাঞ্ছনা—নান্ছোনা
লাঠি—নাটি
লাভ—নাব
লেখা—নেকা
লুকোচুরি—নুকোচুরি
লুঙ্গি—নুঙি
লুচি—নুচি
লুট/লুঠ—নুট
লেকচার—নেকচার
লেনদেন—নেনদেন
লেপ—নেপ
লোহা—নোয়া

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় ধ্বনির উচ্চারণে একটি বিশিষ্ট লক্ষণের সঙ্গে রাঢ়ী উপভাষার উচ্চারণের একটি লক্ষণের মিল দেখা যায়। উচ্চারণে অ-কারেব ও-কাব প্রবণতা রাঢ়ী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই উচ্চারণগত লক্ষণটি লক্ষ্য করা যায়। এইরকম উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ

কোড়া< কড়া
খোড়া< খড়া
গোড়া/গোড়ানো< গড়া/গড়ানো
ঘোড়া< ঘড়া
কোচি< কচি
কোটা < কটা
কোটাল < কটাল
কোড়তা < কড়তা
কোড়ার < কড়ার
কোদু < কদু
কোপাট < কপাট
কোপাল < কপাল
কোপিকল < কপিকল
কোবজা < কবজা
কোবলা < কবলা
কোমল < কমল
কোয়লা < কয়লা
কোত্তাল/কোরতাল < করত্তাল
কোরাত < করাত
কোরালী < করালী
কোপ্পুর < কর্পূব
কোলা < কলা
কোলাই < কলাই
খোটকা < খটকা
খোটাশ < খটাশ
গোজা < গজা
গোঙ্গা < গঙ্গা
গোণ্ডার < গণ্ডার
গোলা < গলা
গোলদা < গলদা
ঘোটা < ঘটা
ঘোষা < ঘষা
চোটকা < চটকা

চোটা < চটা
ছোটা < ছটা
ছোক্কা < ছক্কা
ছোটাক < ছটাক
ছোড়া < ছড়া
জোটা < জটা
জোটলা < জটলা
জোবা < জবা
জোমা < জমা
জোমাদার < জমাদার
জোরি < জরি
জোহর < জহর
ঝোগড়া < ঝগড়া
ঝোঞ্ঝাট < ঝঞ্ঝাট
জোঞ্জাল < জঞ্জাল
ঝোটকা < ঝটকা
টোপ্পা < টপ্পা
ঢোলা < ঢলা
তোড়া < তড়া
তোক্তি < তক্তি
তোড়পা < তড়পা
তোড়কা < তড়কা
তোবলা < তবলা
তোরজা < তরজা
তোলানি < তলানি
তোল্লাশি < তল্লাশি
তোল্লাট < তল্লাট
তোসিল < তসিল
দোখিন < দখিন
দোরমা < দরমা
দোফা < দফা
দোফাদার < দফাদার
দোম < দম

দোমকল < দমকল
দোমকা < দমকা
দোম্বল < দম্বল
দোবকার < দরকাব
দোরগা < দরগা
দোরমা < দরমা
দোশা < দশা
দোশানন < দশানন
দোস্তা < দস্তা
দোস্তুরি < দস্তুরি
ধোরা < ধবা
নোকশা < নকশা
নোকুল < নকুল
নোতুন < নতুন
নোদী < নদী
নোধব < নধর
নোনদ < ননদ
নোন্দা < নন্দা
নোন্দাই < নন্দাই
পোচা < পচা
পোট্কা < পট্কা
পোড < পণ
পোড়া < পড়া
পোরান < পরান
পোরাগ < পরাগ
পোরাত < পরাত
পোরিষ্কার < পরিষ্কার
পোরিবার < পবিবার
পোলা < পলা
পোসলা < পসলা
পোসার < পসার
ভোরসা < ভরসা
ভোরপেট < ভরপেট

ভোবা < ভবা	সোতিন < সতিন	সোমস্যা < সমস্যা
মোট্‌কা < মটকা	সোকাল < সকাল	সোমাজ < সমাজ
মোণ্ডা < মণ্ডা	সোংসাব < সংসাব	সোমান < সমান.
মোতি < মতি	সোড়কি < সড়কি	সোবকাবী < সবকাবী
মোদু < মধু	সোন্ধান < সন্ধান	সোবা < সবা
নোঙ্কা < লঙ্কা	সোমথ < সমর্থ	হোলুদ < হলুদ

বৈদিক ভাষায ঋ-ধ্বনি ছিল প্রচণ্ড কম্পনশীল শক্তিশালী ধ্বনি। পববর্তীকালে বৈদিক ভাষা সবল হযে পড়ে এবং খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রাচীন ভাবতীয আর্যভাষায় যে ধ্বনিগত পবিবর্তন দেখা দিযেছিল তাতে 'ঋ'-ধ্বনিব পবিবর্তন ছিল গুকতব। এই ধ্বনি প্রাকৃত ভাষায় হযেছে অ-কাব, ই-কাব, উ-কাব, এ-কাব প্রভৃতি। জিহ্বাব জড়তাজনিত উচ্চাবণ-বিকৃতি ছিল এব মূলে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব কথ্যভাষায এইরূপ ঋ-ধ্বনিগত উচ্চাবণ বিকৃতি প্রচুব লক্ষ্য কবা যায। এই ঋ-কাব কোথাও অ-কাব, এ-কাব, উ-কাব ইত্যাদি হয়ে শব্দকে পবিবর্তিত কবে নূতন নূতন শব্দেব উদ্ভব ঘটিয়েছে। যেমন—

কুশ/কুশো < কৃশ	ঘি/ঘেত < ঘৃত	ছিষ্টি < সৃষ্টি
কিবমি < কৃমি	নেত্য < নৃত্য	সিতিকণ্ঠ < স্মৃতিকণ্ঠ
মিবগেল < মৃগেল	পেথক < পৃথক	চন্নামেত্ত < চরণামৃত
মেবগ < মৃগ	বেত্তান্ত < বৃত্তান্ত	ইসি/বিসি < ঋষি
কিত্তিবাস < কৃত্তিবাস	বেথা < বৃথা	ইতু < ঋতু
বেন্দাবন < বৃন্দাবন	বি < বৃ	কেপ্পন < কৃপণ
কেঙলেশ/ক্যাঙলেশ < কৃকলাশ	বিদ্ধি < বৃদ্ধি	অদেষ্ট < অদৃষ্ট
মিবগি < মৃগী	বেহত < বৃহৎ	কেবেস্তান < কৃশ্চান
বেদ্ধ < বৃদ্ধ	বেস্পতি < বৃহস্পতি	কেতাত্থ < কৃতার্থ
বেৰষ < বৃষ	ভিবমি < ভূমি	হিদয় < হৃদয়
বিষ্টি < বৃষ্টি	মিত্যু < মৃত্যু	ইন < ঋণ
কিষ্ট/কেষ্ট < কৃষ্ণ	মেদঙ্গ < মৃদঙ্গ	তেষ্টা < তৃষ্ণা
গিন্নি < গৃহিনী	শেযাল < শৃগাল	দিষ্টি < দৃষ্টি
ঘেন্না < ঘৃণা	শিং < শৃঙ্গ	পিট/পিঠ < পৃষ্ঠ
	মিদু < মৃদু	

যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে উচ্চাবণ বিকৃতি প্রচুব পবিমাণে দেখা যায দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব কথ্য ভাষায়। এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র। সুতবাং জিহ্বার জড়তা যুক্তবর্ণেব যথাযথ উচ্চাবণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বাধা সৃষ্টি কবে। ফলে যুক্তবর্ণগুলি সরলীকৃত হয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করে। যেমন—

ভাতার < ভর্তা	মদ্দ < মর্দ	ভদ্দর < ভদ্র
কাঁক < কঙ্ক	অকুরো < অক্রুর	গব্‌ভো < গর্ভ
কাঁকুই < কঙ্কতিকা	খেঁউবি < ক্ষৌরি	গত্ত < গর্ত
কুচ্ছো < কুৎসা	খাপরা < খর্পর	গদ্দান < গর্দান

জেন্ন < জীর্ণ
কেত্তন < কীর্তন
ছেবাদ্দ < শ্রাদ্ধ
ঝোব < ঝর্ঝর
সউবো শউব/সউব < শ্বশুর
তবাস < ত্রাস
তিবি < ত্রি
গোত্তব < গোত্র
গেব < গ্রহ
গেবাম < গ্রাম
গেবাস < গ্রাস
গেবাজ্জ < গ্রাহ্য
ঘেবাণ < ঘ্রাণ
চউথ < চতুর্থ
চৌকো < চতুষ্ক
চন্দব < চন্দ্র
চন্নন < চন্দন
চোব্ব < চর্ব্য
চেকন < চিক্কন
চুলো < চুল্লি
চত্তিব < চৈত্র
চোঙা < চোঙ্গা
চৌপব < চতুঃপ্রহব
জাঙাল < জঙ্গাল/জঙ্গাল
তেবস্পর্শ < ত্র্যহস্পর্শ

তিবিশ < ত্রিশ
দপ্প < দর্প
দপ্পন < দর্পন
দুগ্গা < দুর্গা
দুগগতি < দুর্গতি
দুবলা < দুর্বল
অদেষ্ট < অদৃষ্ট
দব্ব < দ্রব্য
গব্ব < গব্য
ধম্ম < ধর্ম
নানীমুখ < নান্দীমুখ
নিজ্জলা < নির্জলা
নিব্বংশ < নির্বংশ
পদ্দ < পদ্ম
পব্ব < পর্ব
পাব্বন < পার্বন
পিছে < পিচ্ছ
পেচ্ছাব < প্রস্রাব
বযসালো < বযস্ক
বলদ/বলদে < বলীবর্দ
ভাদ্দব < ভাদ্র
ভিত < ভিত্তি
ছেদ্দা < শ্রদ্ধা
ছিবি < শ্রী
ছেবাদ্দ < শ্রাদ্ধ
কোঁদল < কোন্দল

থিতু < স্থিত
থান < স্থান
থল < স্থল
চান < স্নান
পেবাচিন < প্রাচীন
কেলেবব < ক্লেভাব
বেম্ভাণ্ড < ব্রহ্মাণ্ড
চন্দব < চন্দ্র
পিবেত·< প্রেত
পবমান < প্রমাণ
পিদিম < প্রদীপ
পদ্দিপ < প্রদীপ
চিনিবাস < শ্রীনিবাস
হিল্লল < হিল্লোল
থালী < স্থালী
সদ < স্বাদ
সদালো < স্বাদালো
সগ্গ < সর্গ
থিতু < স্থিত
অথব্ব < অথর্ব
থানু < স্থানু
থাপন < স্থাপন
তবক < স্তবক
পবামানিক < প্রামাণিক
বেগাবতা < ব্যাগ্রতা

উচ্চারণগত জড়তা বেশ লক্ষ্য কবা যায কিছু কিছু ক্রিয়াপদে। এই উচ্চাবণ-বৈকল্যেব জন্য ক্রিয়াপদে নূতন ধবনি বা বর্ণেব আগম হয এবং অপিনিহিতিব ধবনে একটি স্ববধ্বনিব আগমন কিংবা স্বর-ব্যঞ্জনের বিপর্যাস ঘটে। উচ্চাবণেব এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব কথ্য ভাষায যতটা লক্ষ্য করা যায়, অন্যত্র তা পাওযা যায না। যেমন—

কবতেছে < করছে
বলতেছে < বলছে
দেখতেছে < দেখছে
মেলতেছে < মেলছে
চলতেছে < চলছে
হাঁটতেছে < হাঁটছে
গলতেছে < গলছে

উড়তেছে < উড়ছে
স্খলতেছে < স্খলছে
মাবতেছে < মাবছে
ফলতেছে < ফলছে
চুষতেছে < চুষছে
গিলতেছে < গিলছে
ফুটতেছে < ফুটছে

ফাটতেছে < ফাটছে
বাখতেছে < রাখছে
বকতেছে < বকছে
গাইতেছে < গাইছে
উঠতেছে < উঠছে
নাচতেছে < নাচছে
জুঝতেছে < জুঝছে

কাটতেছে < কাটছে
ক'চতেছে < কাচছে
ছিঁড়তেছে < ছিঁড়ছে
কাঁদতেছে < কাঁদছে
বাটতেছে < বাটছে
পাড়তেছে < পাড়ছে
বাঁধতেছে < বাঁধছে
গালতেছে < গালছে
লিখতেছে < লিখছে
হাসতেছে < হাসছে
গড়তেছে < গড়ছে
দলতেছে < দলছে
বেলতেছে < বেলছে
ভাজতেছে < ভাজছে
বাঁধতেছে < বাঁধছে
মলতেছে < মলছে
ঘাঁটতেছে < ঘাঁটছে
পাকতেছে < পা'কছে

হাঁকতেছে < হাঁকছে
মাপতেছে < মাপছে
শুড়তেছে < শুড়ছে
পুড়তেছে < পুড়ছে
কিনতেছে < কিনছে
দাঁইড়ে < দাঁড়িযে
পেইলে < পালিযে
দেইকে < দেখিযে
কইবে < কবিযে
নেইগে/লেইগে < লাগিযে
চেইলে/চাইলে < চালিযে
পেইবে < পেবিযে
হেঁইটে < হাঁটিযে
ভেইজে < ভেজিযে
মেইড়ে/মাইড়ে < মাড়িযে
কেইড়ে/কাইড়ে < কাড়িযে
গইড়ে < গড়িযে
ভাইজে < ভাজিযে

পিযতেছে < পিযছে
খুলতেছে < খুলছে
বুলতেছে < বুলছে
ঘুরতেছে < ঘুরছে
ঘুইবে < ঘুবিযে
বুইড়ে < বুড়িযে
মাইপে < মাপিযে
হাঁইকে < হাঁকিযে
উইঠে < উঠিযে
পাইড়ে < পাড়িযে
কইবে < কবিযে
বইলে < বলিযে
উইড়ে < উড়িযে
ফইলে < ফলিযে
গিইলে < গিলিযে
ফুইটে < ফুটিযে
ফাইটে < ফাটিযে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

ভাষায় ধ্বনি পবিবর্তন যেমন অনিবার্য ঘটনা তেমনি অর্থ পরিবর্তনও ভাষার আনুষঙ্গিক ধর্ম। অর্থ বহত্বের উপর ভাষাব গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি নির্ভর করে। ভাষাগত বিভিন্ন শব্দাবলী একাধিক বিভিন্ন অর্থ বহন কবে যেমন ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি ভাষাকে করে বিচিত্রগামী ও গতিশীল। মানবমনের বিচিত্র চিন্তার ধাবক ও বাহক হিসাবে এরা ভূমিকা পালন করে।

সাধারণতঃ লেখার ভাষার অর্থ অভিধানগত, নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। মুখের ভাষাব তথা কথ্য ভাষার সে বাধ্যবাধকতা নেই। কথ্য ভাষা বাধাবন্ধনহীন মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী নদীর মত অনায়াস গামিনী ও গতিশালিনী। কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ তাই অনেক সময় অভিধানসম্মত হয় না। এর অর্থ বক্তব্য বিষয়ের উপব কিংবা যে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তার তাৎপর্যেব উপব নির্ভর করে। দেখা যায় একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। কথ্যভাষায় এই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

সাধারণভাবে শব্দের অর্থ দু'প্রকাব। (১) মুখ্য অর্থ (২) গৌণ অর্থ। শব্দেব আভিধানিক অর্থই হল মুখ্যার্থ এবং আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ গৌনার্থ। কিন্তু কখনও কখনও মুখ্য অর্থ অপ্রধান হয়ে পড়ে কিংবা লুপ্ত হয়ে যায়, তখন গৌণ অর্থ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কথ্য ভাষায এই লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যয।

মুখ্য অর্থ লুপ্ত হয়ে গৌণ অর্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শব্দের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন প্রসঙ্গের উপর বক্তব্য বিষয়েব তাৎপর্যের উপর নির্ভব কবতে হয়। অনেক সময় প্রকৃত অর্থ চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। বহু প্রচীন কালে কোন শব্দ হয়ত একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত, দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তনের ফলে শেষে এমন এক অর্থে এসে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে মূল অর্থেব কোন মিল নেই, কিংবা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারার আলোচনা করলে দেশ, জাতির, সমাজের অতীত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

কথ্যভাষার ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের মুখ দিয়ে যে ভাষা অবিরল অবলীলাক্রমে অনায়াসে নির্গত হয় সে ভাষা যত্ন কবে শিখতে হয় না। শিশু পরিবেশ থেকে ভাষা আযত্ত করে, ব্যাকরণের নিয়ম ধরে তাকে শিক্ষা করতে হয না। তাই অশিক্ষিত, অক্ষর পবিচয়হীন মানুষ যে মাতৃভাষায় কথা বলে সেই ভাষা তাব অনায়াসলব্ধ, স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাপ্ত। অশিক্ষিত ব্যক্তির অনাযাসলব্ধ মাতৃভাষা কথ্যভাষার প্রাণ। কথ্যভাষার মধ্যে শব্দের যে অর্থপার্থক্য, অর্থ পরিবর্তন, অর্থের রূপান্তর ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় তা অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে ধরা যায় না। সুতরাং কথ্যভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন একটি বিচিত্র ঘটনা।

ভাষাবিজ্ঞানে পণ্ডিতগণ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন—(১) অর্থ বিস্তার, (১) অর্থ সংকোচ ও (৩) অর্থ সংশ্লেষ। বিভিন্ন কাবণে এগুলি ঘটে থাকে। কথ্য ভাষায় ও এই নিয়মগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় অর্থবিস্তার, অর্থ সংকোচ ও অর্থ সংশ্লেষের উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। [রূপতাত্ত্বিক আলোচনা পর্যায়ে সেগুলি দেখানো হবে।]

বর্তমান পর্যায়ে শুধু দেখানো হবে কিভাবে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করছে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। যেমন—'কল' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কল—'টিউবওয়েল', 'কৌশল', 'অঙ্কুর'—এই তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে উচ্চারণের কোন তারতম্য ঘটে না। কিন্তু 'কলা' শব্দটি 'Banana' এবং 'অঙ্কুর'—এই দুটি অর্থে যখন ব্যবহৃত হয় তখন কিন্তু উচ্চারণের তারতম্য ঘটে। 'কলা' শব্দটি যখন 'অঙ্কুর' অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উচ্চারণে 'ক' অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। এইভাবে দেখা যায় একই শব্দ উচ্চারণের তারতম্য নেই—অথচ বিভিন্ন অর্থ; আবার একই শব্দ উচ্চারণের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন অর্থ আবার উচ্চারণ এক, বানান ভিন্ন—বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এখন এই পর্যায়ের শব্দসংগ্রহ দেখানো হচ্ছে—

নল— সরু, ফাঁপা, লম্বা চোঙাকৃতি জিনিস।

—একপ্রকার ফাঁপা তৃণ। নলখাগড়া

—কৃষিকাজের সময় জমিতে জল নিকাশের সরু লম্বা গর্ত কাটা হয়। সাধারণতঃ বীজতলার জমিতে এই 'নল' কাটা হয়।

—শিশুর দুধ খাওয়ানোর সরঞ্জাম

নলি — মানুষের গলার নলি।

— খেজুরগাছ কেটে রস বার করার জন্য বাঁশের কঞ্চি আধচেলা করে গাছের কাটা অংশে পুঁতে দেওয়া হয়। এটা দিয়ে রস চলে এসে 'ডাবরি' তে জমা হয়।

—সুতোর 'রীল'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় একে নলি বলে।

—চাষের জমিতে সরু লম্বা গর্ত—যাকে 'নল' বলা হয়। তাকে 'নলি'ও বলে।

নাল— জাল বোনার সরঞ্জাম। বাঁশের চেটি দিয়ে তৈরি করা হয়।

—বিষাক্ত পোকামাকড় দংশন করলে সেই স্থান থেকে যে রস নির্গত হয়।

— চাষের জমির সরু লম্বা গর্ত জল নিষ্কাশনের জন্য।

হাল— কৃষিকাজের মূল যন্ত্র। গরু, লাঙ্গল, জোল প্রভৃতি দিয়ে গঠিত।

—বর্তমান সময়।

— অবস্থা। মানুষের অবস্থার প্রকার বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেহাল, অর্থাৎ খারাপ অবস্থা।

—নৌকার সরঞ্জাম।

চাল— ধানের খোসা ছাড়ালে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। যা থেকে অন্ন প্রস্তুত হয়।

— ঘরের চাল।

— মানুষের ব্যবহারের কায়দা। চালচলন।

জোল— কৃষিকাজের সরঞ্জাম। হালের একটা অংশ। কাঠের তৈরি-গরুর কাঁধে লাগানো থাকে।

— চাষের জমিতে সরু লম্বা গর্ত। এগুলি দিয়ে একটা সারি থেকে আর একটা সারি পৃথক করা হয়। জমিতে জল ধরে রাখা, জল সেচ দেওয়ার নালা।

—ধান চারা রোপণের সময় আড়াআড়িভাবে একটা চারা থেকে পাশের চারার মধ্যেকার ফাঁক।

লতি— কানের নীচের পাতা। যেখানে দুল, মাকড়ি প্রভৃতি গহনা পরা হয়।

—কচু গাছের মোটা শিকড়। এগুলি তরকারী হিসাবে খাওয়া যায়।

— লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলের প্রথম কুঁড়ি। স্ত্রীফুলের নীচে প্রথম ফলের আকৃতি।

দুল— চিংড়ির সাঁজা অর্থাৎ চিংড়ির ডিম জলে ভাসমান অবস্থায়।

— কানের গহনা।

— দোলক অর্থে। ভারী কোন জিনিস দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। যেমন জালে কয়েকটি কাঁটি দিয়ে ভারসাম্য ঠিক রাখা হয়। রাজমিস্ত্রীদের চেনে 'লিং' পরিমাপক দোলক।

ঝুল—জামা ইত্যাদির লম্বা অংশের মাপ।

—ঝুলন্ত ময়লা। ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে, কোনে, জানলা, দরজা ইত্যাদি স্থানে যে ধূলো ময়লা মাকড়সার জালে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

চেলা— এক ধরনের মাছ। ছোট বড় দুই প্রকার আকৃতিতে পাওয়া যায়। পুকুরে, নদীতে, খালে, বিলে পাওয়া যায়। খেতে খুব স্বাদু।

— কোন জিনিসকে আধখানা করলে। বাঁশকে আধখানা করলে, কোন ফলকে কেটে দুভাগ করলে, কাঠ কেটে দুভাগ করলে—এক এক ভাগকে চেলা বলে।

—গুরুর শিষ্য।

চাঁই— দলের পাণ্ডা বা মাথা। মূল লোক বা গুরুত্বপূর্ণ লোক। দলের সর্দার।

— মাটির বড় বড় অংশ। বড় বড় পাথর ইত্যাদি।

— অত্যন্ত, প্রচণ্ড, খুব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চাঁই খিদে। চাঁই চাঁই রোদ।

— চাঁদি অর্থে

ফালি— কোন জিনিসের সরু অংশ। কুমড়ো ফালি। লাউ ফালি।

— জমির সরু অংশ।

— চিলতে অর্থে।

ফলতি— জাল বোনার সরঞ্জাম।

— সরু, চিলতে অর্থে। এক ফলতি জমি।

বাতি— প্রদীপ অর্থে। মোমবাতি।

— দলের প্রথম অংশ। ফুল থেকে যখন ফল হয় প্রথম ফলের আকৃতি।

জামির— শোলার কাজে ব্যবহৃত হয় এক প্রকার খুব পাতলা চকচকে পাত। প্রতিমার সাজ সজ্জাতেও ব্যবহৃত হয়।

— গোঁড়া লেবু। এক ধরনের টক লেবু।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামগঞ্জ থেকে এই যে শব্দগুলি তুলে আনা হয়েছে এ গুলিকে যথার্থ গ্রাম্য শব্দ বলা যায়। এর চেহারা আলাদা। তবে অন্য কোথাও এর দেখা পাওয়া যাবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আজকাল শহরের প্রভাব কিংবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাব যেমন গ্রামে পড়ছে, তেমনি গ্রামীণ সম্পদের মত গ্রামীণ ভাষাও বিভিন্ন ভাবে, বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই এই সব গ্রামীণ শব্দাবলী তথা কথ্য ভাষার মধ্যে বিভিন্ন মিশ্র প্রভাব ঘটছে।

তবে এই শব্দগুলি কষ্ট করে শিখতে হয়নি। যে মিশ্র প্রভাব কথ্য ভাষার অঙ্গে অঙ্গে দেখা যাচ্ছে, তা জোর করে প্রয়োজনের তাগিদে আনা হয়নি। পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে এই ব্যাপার ঘটছে ঘটে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এই আঞ্চলিক শব্দগুলি দেশি, বিদেশী কিংবা তদ্ভব হতেও পারে।

একটা কথা বলে রাখা ভাল যে একই শব্দ কিভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে—অর্থের পার্থক্য ঘটছে এটা বোঝাতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু আভিধানিক অর্থও ব্যবহৃত হতে পারে।

কড়া— রান্নার সরঞ্জাম। সর্বজন পরিচিত। 'কড়াই' কে কড়া বলা হয়।

— শক্ত, যেমন সে খুব কড়া লোক। মানুষের প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়।

— তীব্র যেমন ওষুধটা খুব কড়া। তীব্রতা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

—হাতে বা পায়ের শক্ত চামড়া। অনেক সময় দেখা যায় অত্যধিক কাজকর্মের ফলে হাতের কোথাও কোথাও শক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথমে হয়ত সেখানে ফোস্কা পড়েছিল। লাঙ্গল চালাতে গিয়ে চাষীদের হাতে এইরকম শক্ত মাংস বা চামড়া দেখা যায়। পায়ে জুতা পরা বা অন্য কারণে এই ব্যাপার ঘটে।

কালা— ঠাণ্ডা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শব্দটি বেশ ঠাণ্ডা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

—একটি ধান গাছ। বীজতলা থেকে তুলে নিয়ে জমিতে পোঁতার জন্য ধান চারাগুলি 'গুচ্ছ' বা 'গোছা' অথবা 'আটি' হিসাবে বাঁধা হয়। এর একটি ধানগাছকে 'এক কালা' বলে।

—চৌকির একটি ফলা। মাছ ধরা বা অন্য কাজের জন্য ব্যবহৃত পাঁচ বা সাতটি ফলা বিশিষ্ট চৌকির এক একটি ফলাকে 'কালা' বলা হয়।

—কালো রঙের।

—বধির

কাড়া— কেড়ে নেওয়া অর্থে।

—ধান চাষে বা কোন চাষে মাটি সমান করার জন্য যে মই ব্যবহার করা হয়, তার প্রকার বোঝাতে 'কাড়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন 'এক কাড়ার মই, দু কাড়ার মই।

—জাল দিয়ে মাছ ধরার এক বিশেষ কায়দা। কোন পুকুরে জাল টেনে টেনে নিয়ে মাছ ধরার কায়দাকে 'কাড়া' দেওয়া বলে।

—শুষ্ক কিংবা নিঃস্ব-রিক্ত অর্থে। কথায় বলে জমি জমা কাড়ায় উঠেছে। স্বাভাবিক চাষ বাস বা ফলন বন্ধ হয়ে গিয়ে অস্বাভাবিক বিপর্যস্ত অবস্থা।

কানা—এক চক্ষু অন্ধ। যার একটি চক্ষু খারাপ।

—ধার (edge)। কোন জিনিসের ধারকে বোঝায়। যেমন টেবিলের ধার বা কানা, বইয়ের কানা, কাপড়ের কানা।

আবার এই শব্দের মধ্যে 'চ' বা 'চি' যোগ করে হয়েছে কানাচ' বা 'কানাচি'। বাড়িঘরের পিছন বা কাছে পিঠে এক ধার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ধার—'ঋণ' অর্থে টাকা ধার করা। চাল ধার করা। গ্রামে গঞ্জে পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে 'ধার করা' ব্যাপারটি আছে। চাল, তেল, নুন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস এইভাবে ধার করা হয়।

—কানা (edge) অর্থে। জমির ধার। পথের ধার।

—(sharp) শানিত করা অর্থে। 'ছুরি, বঁটি, অস্ত্র, প্রভৃতি জিনিস এইভাবে ধার দিয়ে শানিত করা হয়।

ধল— এক ধরনের নীচু জমি। সাধারণতঃ এইসব জমিতে ফসল কম হয়। কারণ বেশি জল জমে থাকে, তাই চাষের অসুবিধা হয়।

—সাদা অর্থে।

—সাদা বক। এদের গায়ের রঙ দুধ সাদা। এরা ঝাঁক বেঁধে আকাশে ওড়ে।

তল— তলদেশ অর্থে। কোন কিছুব তলদেশ। যেমন পুকুবেব তল।

—গ্রামে ছোট ছোট গুলি খেলাব কিংবা কড়ি খেলাব পযসা খেলাব জন্য মাটিতে ছোট গর্ত কাটা হয। একে তল বলে।

ছানা—শাবক। পাখি ইত্যাদিব কিংবা জন্তুব ছোট বাচ্চাকে ছানা বলা হয। যেমন শালিখ ছানা। কুকুব ছানা।

—ছোট ছেলেকে গ্রাম্যভাষায ছানা বলে।

—মাথা আঁচড়ানো। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায মাথা আঁচড়ানোকে মাথা ছানা বলে।

—দুধ থেকে তৈবি পদার্থ। যা দিযে সন্দেশাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয।

—ছেনে নেওযা অর্থে।

ছানি—ছেনে নেওযা অর্থে।

— 'ছানা'ব মত দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায ছোট মেযেকে ছানি বলে।

—চোখেব ছানি।

পাকা— পেকে যাওযা—ripe অর্থে। যেমন পাকা কলা।

—উনুন। পাকাশয অর্থে। যেখানে পাক কবাহয।

—ধূর্ত বা বেশি চালাক অর্থে। যেমন ছেলেটি খুব পাকা।

—পাক দেওযা বা পাকান অর্থে।

পালা— পর্যায বা বাব। যেমন— এবাব গণেশেব পালা।

— গাছেব ডাল। ডালপালা। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কাছেব কাটা ডালকে পালা বলে।

—পোষা। যেমন গরু পালা (পালন কবা)।

—যাত্রাগান। গীতি নাটক পাঁচালী গান ইত্যাদি। যেমন বেহুলা-লক্ষ্মীন্দব পালা

—মান্য কবা। আদেশ পালা বা পালন কবা।

—পালিযে যেতে বলা।

—দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায পালা কবে বহু কাজ হয। গ্রাম্য সমাজে এই পালা কবা ব্যাপাবটিব খুব প্রচলন। যেমন—পালা কবে হাল চষা হয, দুধ নেওযা হয, ঠাকুব পূজা কবা হয ইত্যাদি। তাই বলা হয—হালেব পালা, দুধেব পালা, 'ঠাকুব পালা' ইত্যাদি।

ওলা— বাসি অর্থে।

—কাঁকড়াব এক প্রকাব। যে কাঁকড়াব মধ্যে ঘি থকে না সেগুলিকে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায ওলা কাঁকড়া বলে।

— নেমে আসা। শব্দটি সম্ভবত 'ঔব' শব্দ থেকে এসেছে।

— এক ধবনেব গ্রাম্য দেবী। বিবিমাব বিভিন্ন রূপ আছে। তাব মধ্যে ওলাবিবি একটি রূপ।

গড়—ঢেঁকির গর্ত। যে গর্তেব মধ্যে ধান বেখে ভানা হয়।

—প্রণাম। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় প্রণাম কবাকে গড় কবা বলে।

— Average অর্থে। যেমন— গড় পড়তা।

— দুর্গ, কেল্লা, পবিখা ইত্যাদি।

গাদা—বড় মাছেব পিঠেব অংশ।

— ঠাসা বা ভবা অর্থে।

— স্তুপ, রাশি, ভিড় ইত্যাদি অর্থে। গাদা গাদা—বাশি বাশি।

—ধানের গাদা বা ধানের স্তূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় harvest বা 'দাওয়া'র পর ধান খড় নিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে স্তূপাকারে সাজানো হয়। এই স্তূপাকার ধানের বিচালি ধান গাদা বা সংক্ষেপে 'গাদা' বলা হয়। এইভাবে ধান ঝাড়াই-এর পর শুধু খড় দিয়ে গাদা করা হয়।

গ্রামের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষার শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সংস্কার, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি থেকে এই শব্দগুলির রূপ গঠন হয়েছে। কোন বস্তু, কোন কাজ, কোন স্থান, কিংবা কোন ঘটনার পরিচয় দিতে গিয়ে হাতের কাছে পাওয়া কোন বস্তুর রূপ, চোখের সামনে দেখা কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা, কানে শোনা কোন কাহিনী কিংবা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কর্মের সংস্কার সেখানে ক্রিয়া করে আর এতেই তৈরী হয় সেই শব্দের বা শব্দাবলীর রূপ।

মানুষ যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখনই প্রয়োজন হয়েছিল কথার মধ্যে দিয়ে ভাবের আদান-প্রদানের। এই প্রকারের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম হল ভাষা। সেই ভাষা তৈরী করতে গিয়ে প্রয়োজন হল বস্তু, ঘটনা, ক্রিয়া, স্থান প্রভৃতির নাম তথা পরিচয়। মাথার উপরে নীল শূন্যস্থানের নাম দেওয়া হল আকাশ, মাটির উপর সবুজ জিনিসকে বলা হল ঘাস, গাছ, লতা। আকাশে উজ্জ্বল পদার্থগুলিকে বলা হল চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি। কিন্তু যদি আকাশকে বলা হত গাছ, গাছকে সমুদ্র, সূর্যকে পৃথিবী—তাহলে আমরা তাই জানতাম শিখতাম। সুতরাং নামই হল আসল, তাইই শব্দ—তা থেকেই ভাষা।

কিন্তু গ্রামের মানুষ নাম মাহাত্ম্যে দিশাহারা। কত ক্রিয়া, কত বস্তু, কত ঘটনা, কত অনুভূতি—এত নাম কোথায় পাবে। তাই একই নাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে লাগল। এই ভাবেই হল একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ব্যবহার লক্ষ্য করতে গিয়ে একটা ব্যাপার ধরা গেছে যে কোথাও কোথাও বস্তুর যা নাম ক্রিয়ার ও সেই নাম কিংবা ঘটনার নাম ও স্থানের নাম প্রায় একই।

এখন একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—

চাড়া—ঘোলের শেষ অংশ। ঘোল খাওয়ার পর তলায় যে সমস্ত দুগ্ধকনা পড়ে থাকে—তাদেরকে চাড়া বলে।

— খইয়ের পরিত্যাজ্য অংশ। ধান থেকে খই হয়। চালুনিতে চেলে নেওয়ার পর ধানের খোসা পড়ে থাকে তাকে চাড়া বলে।

— কোন কাজকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টাকে 'চাড়া' বলে।

ধার— [শব্দটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন বোধে পুনরায় আলোচনা করা হল।]

— ঋণ করা বা ঋণ দেওয়াকে 'ধার' বলে। তবে ব্যাপক অর্থে নয় ; গ্রামে পাড়াতে প্রতিবেশীদের ছোটখাট জিনিস, অল্প টাকা কড়ি যতদূর সম্ভব শীঘ্র ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ নেওয়াই হল ধার। এর যথার্থ প্রতিশব্দগুলি হল কর্জ্জ, হাওলাত।

— তীক্ষ্ণ অর্থে। ছোরা, ছুরি—প্রভৃতি জাতীয় জিনিসপত্রকে তীক্ষ্ণ করে তোলা হল 'ধার' দেওয়া।

— edge অর্থে। যেমন ক্ষুরেরধার।

— এক পাশ, কিনারা অর্থে। জমির ধার, পুকুরের ধার, নদীর ধার, টেবিলের ধার ইত্যাদি।

— তোয়াক্কা অর্থে। একজন অন্যের ধার ধরে না অর্থাৎ তোয়াক্কা করে না।

ঝারা— ঝরা শব্দ থেকে এসেছে। কোনো তরল দ্রব্যের ঝরে পড়াকে বোঝানো হয়। জল ঝরাকে ঝারা বলে আবার ছোট ছেলের শিকনি ঝারে পড়াকে ঝারা বলে—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই প্রয়োগগুলি বড় অদ্ভুত।

— বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের মাথায় জল ঝরে পড়ানোর ব্যবস্থাকে ঝারা বলে।

— সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে নারায়ণ শিলার উপর এইভাবে জল ঝরে ঝরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এটা ধর্মীয় অঙ্গ। এই ব্যবস্থাকে ঝারা বলে।

— মাছ ধরার এক প্রকার কৌশল। উঁচু জায়গা থেকে নীচে ঝির ঝির করে জল ঝরানো হয়। এতে ছোট ছোট মাছ জলের স্রোতের বিপরীত দিকে যায। সেখানে জাল পাতা থাকে তাতে ধরা পড়ে।

— শোলার তৈরী একটি জিনিস। রাস পূর্ণিমায় ঠাকুরের পূজায় লাগে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শোলা শিল্পীরা এগুলি তৈরী করেন।

শঙ্ক—শঙ্কা তথা ভয়। 'শঙ্কা' শব্দ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক সাধারণের উচ্চারণে 'শঙ্ক' হয়ে গিয়েছে।

—দুটি সাপের মিলনকে 'শঙ্ক' বলা হয়।

ছই— হোগলা অর্থে। এক প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ঘর-গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

—পাতলা বা হালকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কিছু প্রলেপ বা আস্তরণ দেওয়ার সময় 'ছইছই' কথা ব্যবহৃত হয অর্থাৎ পাতলা করে আস্তরণ দেওয়ার কথা বলা হয়।

ছাড়— ছেড়ে দেওয়া অর্থে। কোন বিষয় ছেড়ে দেওয়া।

— Rebate বা Commission অর্থে। যেমন কোন জিনিস বিক্রয় করলে বিক্রয় মূল্যের কিছু অংশ ছাড় দেওয়া হয়।

— ছাড়পত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর বিক্রয়কালে ক্রেতাকে এই রকম ছাড়পত্র বা 'ছাড়' দেওয়া হয়। যাতে ঐ জন্তুটি যে চোরাই নয়—এটা দ্বারা তা প্রমাণ করা হয়।

— ফাঁক অর্থে বা দূরত্ব বোঝাতে। যেমন জমিতে চারাগাছ পোঁতার সময় গাছগুলি ছাড় ছাড় করে অর্থাৎ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে লাগানো হয়।

ছেঁকা—স্পর্শ করান। যেমন—আগুনের ছেঁকা দেওয়া। জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দেয়া ইত্যাদি। সাধারণতঃ তপ্ত বস্তুর দাহজনক স্পর্শকেই 'ছেঁকা' বলা হয়।

— অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজাকে 'ছেঁকা' বলা হয়। 'সেঁকা' বা 'সেকা'র বিকৃত উচ্চারণে ছেঁকা বলা হয়।

—কোন কিছু ছেঁকে নেওয়া। যেমন দুধ ছেঁকা।

—ছাঁকনি। কোন তরল পদার্থ ছাঁকবার জন্য যে জিনিস ব্যবহার করা হয় তাকে 'ছাঁকা' বা বিকৃত উচ্চারণে 'ছেঁকা' বলে।

ছিটকি— গাছের ছোট ছোট সরু ডালকে ছিটকি বলা হয়। এগুলি ছড়ির কাজ করে। সাধারণতঃ হাল চষার সময় গরু তাড়াবার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

— 'ছিটকিনি' কে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিকৃত বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে ছিটকি বলা হয়।

— কোথাও কোথাও খিড়কি অর্থে ছিটকি ব্যবহৃত হয়।

ছোপ— দাগ। জামা কাপড়ে দাগ লেগে গেলে তাকে ছোপ বলা হয়।

—আস্তরণ বা প্রলেপ। গ্রামের মাটির বাড়ীতে কাদা-খড়-তুষ মিশিয়ে এর ধরনের আস্তরণ দেওয়া হয় দেওয়ালে, একে 'ছোপ' দেওয়া বলে।

ছোপা— কষে বাঁধা। সাধারণতঃ ধানের আঁটি কষে বাঁধাকে বলে ছোপা।

— ছোট ছোট দইয়ের ভাঁড়।

— ধানের আঁটির বোঝা বাঁধবার জন্য ধানেরই আঁটি দিয়ে বাঁধন দেওয়া হয়। একে 'ছোপা' বা 'ছোটা' বলে।

জালি— 'জাল' শব্দ থেকে এসেছে। [সং জাল + বাং ই] ঝিঙে, ধুধুল বা ঐ জাতীয় ফসলের খোসাতে জালের মত জিনিস থাকে যা দিয়ে গা ঘষা, বাসন পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজের সুবিধা হয়। এগুলিকে জালি বলে।

— 'জাল' বা নকল অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন জালি মাল, জালি কারবার ইত্যাদি।

— লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতির কচি অবস্থার ফলকে জালি বলে। অর্থাৎ অত্যন্ত কচি। যেমন জালি শশা, জালি কুমড়া প্রভৃতি।

— ছোট ছোট নৌকা বা শালতি জাতীয় নৌকাকে জালি বলে। যেমন—জালি নৌকা (Jolly boat)।

— ক্ষুদ্র জাল অর্থে 'জালি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। জালের মত কোন বস্তু কিংবা জালের মত ফাঁক ফাঁক করে তৈরী কোন জিনিসকে 'জালি' বলে। যেমন—জালি গেঞ্জী।

— কোন কোন বস্তুর মধ্যে এই জাল সদৃশ কোন অংশ পাওয়া যায় তাদেরকে 'জালি' বলে। যেমন ঝামা ইটের মধ্যে জাল জাল ধরনের অংশ থাকে। এগুলি জল শোষণ করে। এগুলিকে জালি বলে।

ঢল— ঢালু জায়গা। জমির কোন অংশ, পুকুরের পাড়, অন্য কোন ঢালু জায়গাকে ঢল বলা হয়।

— বন্যা বা অতি বৃষ্টিতে বাড়তি জলরাশির প্রবাহ। যেমন—ঢল নামা।

— রসগোল্লার রস। যে রসে রসগোল্লা ভাসতে থাকে, তাকে ঢল বলে।

— ঢিলা অবস্থা।

জুত— তেজ, শক্তি। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকলে বলা হয় শরীরের জুত আছে।

— সুযোগ, সুবিধা, ঠিকঠাক কাজকর্ম জুত'ই হচ্ছে।

— লাঙলের স্বাভাবিক অবস্থা। চাষের উপযোগী করে লাঙল ঠিকঠাক করার অবস্থাকে 'জুত' বলে।

— মেয়েদের গালি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মেয়েরা আদর বা সোহাগ মাখানো গালি দেয় 'জুত' বলে।

তার— ধাতুর তৈরী সূতা। প্রাত্যহিক জীবনে বহু কাজে ব্যবহৃত হয়।

— আস্বাদ। কোন জিনিসের ভাল মন্দ আস্বাদ বোঝাতে 'তার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

— উচ্চ ধ্বনি।

তাড়— হাতে পরা হয় এক ধরনের অলংকার। যেমন—তাড়বালা।

— আসন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বসার জায়গা বা আসনকে 'তাড়' বলা হয়।

— এক ধরনের মাছ। লম্বা, চ্যাপ্টা রূপোলী মাছ—নদীতে পাওয়া যায়। একে 'তাড়' বা তাড়মাছ বলে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এই কথ্যভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে—সেই সমস্ত অঞ্চলকে এক কথায় প্রত্যন্ত অঞ্চল বলা চলে। ভাবলে অবাক লাগে—আজকের দিনে—বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে—এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষ নিরক্ষর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রেলগাড়িতে চড়েনি এমন মানুষের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। এই সমস্ত মানুষেরা শুধু নিরক্ষরই নয়, বর্তমান জগৎ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই এদের নেই। এরা যে ভাষা ব্যবহার করে তা বই পড়ে শেখা নয়। একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। এমনই নিরক্ষর আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ-বিহীন মানুষেরা প্রয়োজনের তাগিদে হাতের কাছে পাওয়া কোন জিনিসের, কোন ক্রিয়ার, কোন স্থানের রূপকে শব্দে পরিণত করেছে। পূর্বে হয়ত সেই শব্দ অন্য কোন বস্তুর বা ক্রিয়ার বা স্থানের অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এইভাবে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ধরনের শব্দের নমুনা দেওয়া হল—

নাড়া—ঝাঁকানি। কোন জিনিসকে ঝাঁকানি দিয়ে স্থানচ্যুত করা।

— আস্তানা বা ডেরা। সুন্দর সুসজ্জিত বাসগৃহ নয়। অস্থায়ী বা নিম্নমানের আস্তানা। কোন মানুষ কোথাও 'ঠেক' নিলে তাকে নাড়া বাঁধা বলে।

— ধানগাছ কাটার পর ধান গাছের গোড়ার যে অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে।

ঠেক—আস্তানা বা ডেরা। নিম্নমানের আস্তানা। সাধারণত চোর, ডাকাত, পকেটমার, সমাজবিরোধী ইত্যাদি দলের আস্তানা।

— ঠেস। পড়ে যাওয়া অর্থাৎ পতন রোধ করার জন্য যে অবলম্বন। যেমন—কোন গাছ কাৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁশের খুঁটি ইত্যাদি ঠেস দিয়ে পতন রোধ করা হল—একে 'ঠেক' দেওয়া বলে। এ থেকে শব্দ এসেছে 'ঠেকো'—অর্থাৎ পতন রোধকারী বস্তু।

— খুব বড় বড় এবং জিনিস ভর্তি বস্তা। সাধারণত খই কিংবা মুড়ি যখন বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বেশ বড় বড় বস্তা ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হয় এগুলিকে 'ঠেক' বলে। যেমন—মুড়ির ঠেক, খইয়ের ঠেক।

বয়— বয়ে যাওয়া। যেমন—বাতাস বয়।

— দুর্গন্ধ। সাধারণতঃ কোন তরল পদার্থ যেমন ঝোলা গুড় ইত্যাদি দীর্ঘদিন থাকলে পচে যায় এবং এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হয়। একে বয় বলে।

— বিক্রয়। যা থেকে হয়েচে 'বয়নামা'—জমি বিক্রির দলিল।

নাদা— গর্জন করা, ধ্বনিত হওয়া বা শব্দিত হওয়া। শব্দটি নাদ অর্থাৎ ধ্বনি থেকে এসেছে।

— গবাদি পশু অর্থাৎ গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণী যখন মলত্যাগ করে—তখন তাকে নাদা বলে।

— বড় জালা। মাটির তৈরী বড় বড় জালা—সাধারণত জল ভরার জন্য ব্যবহার করা হয়—এগুলিকে নাদা বলে।

ফুট— মাপের একক। বারো ইঞ্চিতে এক ফুট হয়।

— ছোট দাগ বা ফোঁটা। যেমন—ফুটফুট দাগ।

— কোন তরল পদার্থ গরম করলে যে বুদবুদ ওঠে। যেমন—ডালের ফুট, ভাতের ফুট, রসের ফুট।

— ছোট ছোট বুদ্‌বুদ। কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ জলে বুদ্‌বুদ তুললে তাকে ফুট বলে।

— ফুটা বা ছিদ্র অর্থে। ফাট, চিড় ইত্যাদিও বলা যায়।

— কথার মাঝখানে কথা বলা, বা কোন কথার বিরূপ সমালোচনা করা—একে 'ফুট' কাটা বলে।

— পানা বা জলজ উদ্ভিদ ভর্তি পুকুর, খালে, বিলে জাল দিয়ে কিংবা ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্য জলের কিছু অংশ পরিষ্কার করা হয়; পানা আবর্জনা মুক্ত করে রাখা হয়। সেই জায়গাকে ফুট বলে।

চারা— ছোট বা কচি গাছ, মাছের বাচ্চা। যেমন—চারাগাছ, চারাপোনা, বেগুন চারা, লঙ্কা চারা ইত্যাদি।

— উপায় বা প্রতিকার। যেমন—আর কোন চারা নেই। নাচার, বেচারা।

— ছড়িয়ে পড়া, সর্বত্র প্রসারিত হওয়া। [সং চার—প্রচার] এ থেকে এসেছে 'চারান'।

— পশু বা মাছের খাদ্য বা টোপ। চারা—চার।

— আগুনের শিখা। উনানে যখন রান্না করা হয়, তখন উনানের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসে। একে 'চারা' বলে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই 'চারা' শব্দের অদ্ভুত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বান— বন্যা, জলপ্লাবন, নদীর অকস্মাৎ জলস্ফীতি। নদীতে বান এসেছে। বানভাসি, বানের জল ইত্যাদি।

— বামন। খুব বেঁটে লোকদের বান বলা হয়।

— এক ধরনের পাঁকাল মাছ। এই মাছগুলি বড় এবং লম্বা হয়। গায়ে কালো কালো ফোঁটা থাকে, খুব সুস্বাদু।

বাড়— পুষ্টি, বৃদ্ধি। যেমন— বয়স কালের বাড়।

— স্পর্ধা। যেমন— বাড় বেড়েছে।

— বন্যা বা প্লাবন। যেমন— বাড় এসেছে।

— পাশ/পার্শ্ব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'বাড়' শব্দের এই বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—নদীর বাড়ে, বাড়ে রেখে দে ইত্যাদি।

খাল— নালা, খাত বা জলপথ। জল নিষ্কাশনের জন্য খাত খনন করে নদী বা অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ে মিশিয়ে দেওয়া—একে খাল বলে।

— চামড়া, ছাল। সং খল্ল > খাল। পশুর চামড়াকে খাল বলা হয়।

— নিম্নভূমি। নীচু জমিকে খাল বলা হয়। এ থেকে নীচু অর্থে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'খালা' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

—খিঁচুনি বা খিল ধরাকে 'খাল' বা 'খাল ধরা' বলা হয়।

ডাঁশা— আধ পাকা। যা পাকাও নয় আবার একেবারে কাঁচাও নয়। পাকা ও কাঁচার মধ্যবর্তী অবস্থা। যেমন—ডাঁশা পেয়ারা, ডাঁশা আম ইত্যাদি।

— শক্ত, কঠিন জিনিস, কাঠ বা বাঁশের তৈরী। সাধারণতঃ ছোট জাল—যেমন ছাগনি জাল এই ডাঁসার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। কোন কাঠের পাত্রের উপবিভাগ—গোল মুখের উপবিভাগ—এগুলিকে ডাঁসা বা ডাঁশা বলে। এইরকম বাঁশ বা বেতের তৈরী পাত্রের উপবিভাগকে ডাঁশা বলা হয়।

শাঙা— এক ধরনের বিবাহ প্রথা। কিছু কিছু নিম্নশ্রেণার মানুষদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। সাধারণতঃ আদিবাসীদের মধ্যে এই বিবাহপ্রথা প্রচলিত দেখা যায়।

— কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরী ভারা। এক টুকরো লম্বা বাঁশকে দুদিকে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কিংবা দুটি বাঁশের খুঁটির মাথায় একটি বাঁশ বা লম্বা কাঠ বেঁধে দেওয়া হয়। এতে কাপড়-জামা শুকাতে দেওয়া হয়, ঘরে বারান্দায় জামা কাপড় রাখা হয়—একে শাঙা বলে।

ঠিকরে— ছিটকে বা ছড়িয়ে পড়া/বিকীর্ণ হওয়া। যেমন নুড়িটি ঠিকরে পড়ল/আলো ঠিকরে পড়ছে।

— এক ধরনের কড়াই বা কলাই। এই কড়াই ঘাসের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়—এতেই গাছ হয়।

— তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম—হুঁকা বা হুঁকার মাথায় যে কলকে থাকে—তার ছিদ্র বন্ধ করার জন্য ছোট টিল দেওয়া হয়। এতে ছিদ্র দিয়ে তামাক পড়ে যাবে না অথচ ধোঁয়া যেতে পারবে। এই ছোট টিলকে ঠিকরে বলে।

— শক্ত ও নিম্ন মানের আলু। এই আলুগুলি ছোট ছোট লাল লাল ভাবের ও শক্ত শক্ত হয়।

দোকা— দুইজন বা দোসর। কেবলমাত্র দুইজন হলে একে অপরের দোকা হয়। একার সমধ্বন্যাত্মক শব্দ। একজন—একা; দুইজন— দোকা।

— মাছ ধরার এক বিশেষ কৌশল বা টোপ। বড়শীতে ছোট জ্যান্ত মাছ গেঁথে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মাছ খেলা করে, তখন শোল, শাল কিংবা বোয়াল মাছ সেই টোপ গিলে ফেলে এবং বড়শীতে আটকে যায়। এই টোপ দেওয়াকে 'দোকা' বলে।

ধাড়ি/ধাড়ী— সর্দার বা প্রধান অর্থে। যেমন— দলের ধাড়ি, বজ্জাতের ধাড়ি।

— বয়স্ক ব্যক্তি। বেশি বয়সের ছেলে মেয়ে। যেমন— রাগের ভাষায় বলা হয় 'বুড়ো ধাড়ি ছেলে'।

— পাকা বা ঘাঘী অর্থে। যেমন— ধাড়ি শয়তান।

— বড়ো ছাগল যে একটি বা অনেকগুলি বাচ্ছা প্রসব করেছে তাকে ধাড়ি ছাগল বা এক কথায় ধাড়ি বলা হয়।

ভারা— উঁচু জায়গায় বসে কাজ করার জন্য কিংবা মঞ্চ নির্মাণের জন্য বাঁশ কাঠের দ্বারা তৈরী মাচা। যেমন—ভারা বাঁধা।

— রাজমিস্ত্রীর কাজ করার জন্য বাঁশের তৈরী মাচা।

— বাঁশ কঞ্চি দিয়ে তৈরী মাচা। যাতে লতানে গাছ—যেমন লাউ, কুমড়া, শিম প্রভৃতি বাড়তে থাকে।

— এক ধরনের পাখি। ছোট ছোট পাখি। ডাকই পাখি কে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভারা পাখি বলে।

— ভেবে/ডুবে যাওয়া অর্থে।

মলা— ময়লা বা মালিন্য। মনের মলা।

— মর্দন করা বা ডলা। যেমন—কান মলা, গরুর লেজ মলা।

— কর্জ বা ধার করা। যেমন ধান মলা করা—অর্থ হল ধান কর্জ করা।

আর্যগণ ভারতবর্ষে এসে যেমন ভারতের তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি অনেক নূতন বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ভাষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। আর্যরা যে সকল নূতন জন্তু, প্রাণী ও বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন, সেগুলির নাম তাঁরা তাঁদের ভাষায় গ্রহণ করলেন। এইভাবে সেই আদিকালে অন-আর্য ভাষা থেকে শব্দ, ইডিয়ম প্রভৃতি গ্রহণ শুরু হয়েছিল। অপর ভাষা থেকে শব্দ-গ্রহণের এই ধারা আজও বজায় আছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যেমন অন-আর্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে, তেমনি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি ভগ্নি স্থানীয় অপর ভাষা ও বিদেশী ভাষা থেকে বহু শব্দ গ্রহণ করে নিজ নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষায় এর প্রচুর উদাহরণ মেলে। শুধু গ্রহণ করা নয়, গ্রহণ করে সেগুলিকে আবার নূতন রূপে রূপ দিয়েছে। ফলে অপর ভাষার যে শব্দগুলি যে যে অর্থে গৃহীত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেগুলি নূতনরূপে প্রতিভাত হওয়ায় তাদের অর্থও বদলে গিয়েছিল এবং কোথাও কোথাও এই শব্দগুলি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল।

অপর ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ ও তাদের নিজ ভাষায় আত্মীকরণ করার ব্যাপারটা কথ্যভাষায়ও লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি প্রাচীনতর জাতির সম্পর্কে এসে আর্যগণ যেমন অনেক পরিচিত বস্তুর নাম ঐসব অন-আর্য অধিবাসীদের ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সেই নাম বা শব্দগুলি রূপান্তরিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। আবার কথ্য ভাষায় সেগুলিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কদলী, তাম্বুল, মীন, কম্বল প্রভৃতি অন-আর্য ভাষার শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দকোষেও যেমন আছে, তেমনি বাংলা ভাষায় ও এদের এবং এদের বিবর্তিত রূপের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার কথ্যভাষায় এই শব্দগুলির বিবর্তিত রূপ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই রকম বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া বহু শব্দ কথ্য ভাষায় সম্পূর্ণ অন্য অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষায় এই আত্মসাৎকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য ভারতীয়-ভাষা এবং বিদেশী ভাষা থেকে বহু শব্দ আত্মসাৎ করে নিজের মত করে গড়ে নিয়ে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। এমন উদাহরণ প্রচুর মেলে—

উলু— মূল শব্দ তামিল 'উলবৈ' > সং. উলুপ > বা. উলু

— খড়। একপ্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। আগেকার দিনে উলু খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া হত। বর্তমানে পূজার কাজে লাগে, জ্বালানি হয়।

— হুলুধ্বনি। উচ্চারণ বিকৃতিতে উলু ধ্বনি বলা হয়। সং. হুল হুলী শব্দের রূপান্তর। বিবাহের সময় এই ধ্বনি দেওয়া হয়।

— এক ধরনের কাঁকড়া। মাটি মাটি রঙের ছোট ছোট কাঁকড়া বর্ষাকালে মাঠে দেখা যায়।

মীন— অনার্যভাষার শব্দ। অর্থ হল মাছ।

— একটি রাশির নাম।

— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় মাছের ডিম বা ডিম থেকে সদ্যোজাত মাছের বাচ্ছাকে মীন বলে।

লাট— ইংরেজি 'Lot'—বাং লাট।

ইংরেজি Lord— বাং লাট।

—আবাদ অঞ্চলের এক একটি জায়গা (area) কে লাট বলা হয়।

— কোন জিনিসের থাক। যেমন জামা কাপড়ের থাককে লাট্ বলে। বই, কাগজের থাককে লাট্ বলে।

— ঘুরপাক খাওয়া। যেমন- ঘুড়িটা লাট্ খাচ্ছে অর্থাৎ ঘুরপাক খাচ্ছে।

— বিবর্ণ বা নষ্ট হয়ে যাওয়া। যেমন—মালটা লাট্ খেয়ে গেছে

— লাট্সাহেব বা জমিদার। যেমন— ব্যাটা লাট্ সাহেব হয়েছেন। লাটের বাঁট্।

বোট—ইং 'boat'

— নৌকা। তরী।

— কিন্তু 'বোট্' শব্দটি কথ্যভাষায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন জিনিস টাটকা বা তাজা অবস্থায় যে স্বাদের হয়, কিছুদিন ফেলে রাখলে তার স্বাদ অন্যরকম হয়। যেমন—ডালের বড়ি। টাটকা অবস্থায় খেতে এক রকম—কিছুদিন পরে খেলে অন্য রকম। চাল—টাটকা অবস্থায় একরকম, কিছুদিন পরে অন্যরকম। সময়ের পরিবর্তনে জিনিসের স্বাদের এই পরিবর্তনকে 'বোট্' পড়া বলে। তবে ইং boat— বোট্ ও 'বোট্' পড়া শব্দদুটির মধ্যে উচ্চারণের কিছু তারতম্য আছে।

ফারসী/ফারসি— ফারসী ভাষা- -পারস্য দেশের ভাষা। আ. ফারসী।

— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ছোট্ট কোদালকে ফারসী/ফারসি বলা হয়।

ফিরি— শব্দটি ইং Ferry থেকে এসেছে। ফেরি—ফিরি।

— খেয়াপার করা- - to carry or transport over a river in a boat

— পথে পথে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রয়কে ফেরি বা ফিরি বলে।

— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এধার ওধারে ঘুরে বেড়ানকে 'ফিরি' বলে।

পেনা — ল্যাটিন 'Penna' – শব্দের অর্থ ছিল 'পালক'। পরে পালকের কলম প্রচলিত হওয়ায় এবং আরও পরবর্তীকালে Pen শব্দের অর্থ হল 'পালকের কলম', তার থেকে Pen অর্থে কেবল 'কলম' ব্যবহৃত হতে থাকে।

— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'পেনা' শব্দটি 'মত বা সদৃশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। জলের পেনা— জলের মত।

— কাঠের সরু ও লম্বা টুকরো যা লাঙলের জোড় শক্ত করতে গুঁজে দেওয়া হয়।

এখন অন্যান্য শব্দের ব্যবহার দেখানো হচ্ছে।

তোলা—সোনা রূপা ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থের ওজনের একক। (১ তোলা- ৮০ রতি)।

— হাটে বাজারে পণ্য সামগ্রীর উপর বাড়তি শুল্ক যা হাট বাজারের মালিক নিয়ে থাকে।

— তুলে রাখা হয়েছে এমন। যেমন—তোলা জল।

— স্থানান্তরিত করা যায় এমন। যেমন—তোলা উনুন।

— আটপৌরে নয়, — পোষাকী, যা বিশেষ সময়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন—তোলা কাপড়, তোলা জামা।

মটকা— বিশেষ ধরনের তসরের কাপড়। মট্কার চাদর।

— খড়ের ঘরের চালের শীর্ষদেশ বা ধান খড়ের গাদার শীর্ষদেশ।

— ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকা।

— মাটির বড় জালা।

— তেল রাখার পাত্র।

ভোল— সাজ, বেশ, ছদ্মবেশ। যেমন ভোল ফেরান, ভোল ধরা।

— বিভোর বা আত্মবিস্মৃতি হওয়া।

— সুড়ঙ্গ বা সুড়ঙ্গাকৃতি গর্ত। অনেক সময় জমি থেকে জল বার করে দেবার জন্য মাটির নীচ দিয়ে বা আলের নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করা হয়। একে ভোল বলে।

তাত — তপ্ত > তাত। আগুনের আঁচ। যেমন—আগুন তাত।

— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'তাত' শব্দটি 'রোদ্দুর' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'রোদ্দুরের তাপ' থেকে কেবল 'রোদ্দুর' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

থর— স্তর বা থাক। যেমন— থরে থরে সাজান।

— কোঁচকানো লোল চামড়া। বয়স বেশি হলে পেটের চামড়া কুঁচকে যায়—একে থর বলে।

— শীতকালে নদীতে পাওয়া যায় এক ধরনের চিংড়ি মাছ।

দাবা— শতরঞ্জ খেলা। রাজা, মন্ত্রী, ঘোড়া, নৌকা, গজ, সৈন্য বা বল নিয়ে খেলা।

— দাওয়া বা বারান্দা অর্থে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বারান্দাকে দাবা বলে।

— দাবিয়ে দেওয়া অর্থে।

দল— পল্লব, পাতা, পাপড়ি। যেমন—বিল্বদল, শতদল।

— জোট, পাল। যেমন—দস্যুদল

— তরফ বা পক্ষ। যেমন—দলে দলে।

— গুচ্ছ। যেমন—কলমীর দল।

— ঢলঢলে কাদা। পুকুরের তলায় যে ঢলঢলে কাদা হয় তাকে দল বলে।

পাই— পোয়া অংশ।

— প্রাচীনকালের মুদ্রা $\left(\frac{১}{৩}\text{ পয়সা}\right)$।

— লাইন। মাঠে ধান কাটার সময় কাটা ধান গাছ লাইন করে রাখা হয়। একে পাই বলে।

— তেল তোলার ছোট পাত্র বা তেলের পলা। রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। একে পাই বলে।

পুঁড়ি— কাস্তের ধার। সূক্ষ্ম খাঁজ কাটা অংশকে পুঁড়ি বলে।

— সাপের বাচ্চার এক বিশেষ অবস্থা/এক ধরনের সাপ। এগুলি ছোট ছোট হয়।

ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন ভাষাবিজ্ঞানের মূল ঘটনা। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভাষার পরিবর্তন বা রূপান্তরের মূলে আছে এই ধ্বনি পরিবর্তন—একথা পূর্বে বহুভাবে বহু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখন ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে ভাষায় যে বিস্ময়কর পরিবর্তন হতে পারে তা আলোচনা করা হবে।

ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে শব্দে অক্ষরসংখ্যা কমে যাওয়াকে ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয়—সঙ্কোচন। কখনও কখনও দেখা যায় এই সংকোচনের ফলে শব্দের অক্ষর সংখ্যা কমতে কমতে কেবলমাত্র একটি অক্ষরে এসে দাঁড়ায়। এমন বিস্ময়কর ঘটনা ব্যাকরণ সম্মত হলেও বিরল দৃষ্টান্ত। তবে প্রচলিত ভাষারূপ ছেড়ে আমরা যদি কথ্যভাষার শরণ নিই তাহলে এই জাতীয় শব্দের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কথ্যভাষায় উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় এই এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামের গঞ্জের মানুষ দ্রুত উচ্চারণের জন্য ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দকে একেবারে সংক্ষিপ্ত করে কেবলমাত্র একটি অক্ষরে পর্যবসিত করেছে। এই সঙ্কোচনের জন্য কিন্তু অর্থের তারতম্য ঘটেনি। প্রাথমিক অবস্থায় শব্দের অর্থ যা ছিল সঙ্কোচনের পরেও অর্থ তাই আছে। তবে অনেক সময় একাধিক বিভিন্ন অর্থের শব্দ সঙ্কোচনের ফলে একই আকার নিয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে এই এক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

এখন এই জাতীয় শব্দের নমুনা দেওয়া হচ্ছে।

ক— কোয়া। যেমন— কাঁঠালের কোয়া, লেবুর কোয়া। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বলা হয় 'কাঁঠাল ক', 'লেবুর ক'।

— 'ক'-মই। চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের মই। এই মই দিয়ে ঢেলা-মাটি ভাঙা হয় ও সমান করা হয়।

— 'কহ' বা বলা অর্থে। যেমন—তুই ক দেখি।

— কয় বা কত। যেমন কয়জন—কজন।

— কতবার—কবার।

খ— খোয়া। ইটের টুকরো বা পাথরের টুকরো। ইটের খ/পাথরের খ।

— খোয়া। খোয়া ক্ষীর —খ-ক্ষীর।

গ— গর—গ। গর গর— গ গ। যেমন— গ গ করে উঠল।

— 'গ-ওঠা'। অপ্রকৃতিস্থ বা পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কুকুর পাগল হয়ে গেলে কিংবা শ্রাবণ/ভাদ্রমাসের কুকুরদের প্রজননের সময় তারা ক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত হয়ে গেলে—এই অবস্থারে গ-ওঠা বলা হয়।

চ— চলা অর্থে। যেমন—চল চল— চ চ।

চল দেখি—চ দেখি।

ছ— ছয়। ছয় জন—ছ জন। ছয় নম্বর—ছ নম্বর।

থ— স্তম্ভিত, অবাক, হতভম্ভ। সং. √ স্থা (= স্থিতি) > থা > থ।

দ— দহ অর্থে। যেমন—কালী দহ— কালী দ।

— দ-পড়া। কোন ব্যাপার মাঝ পথে অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া। যেমন—কাজটা দ-পড়ে গেছে।

ন— নয় (সংখ্যা)। নয়টা—নটা

নয় ঘর— ন ঘর।

— চতুর্থ সংখ্যক (সেজোর পরবর্তী)। যেমন— ন'দা, ন'বৌ।

— নূতন অর্থে।

প— পোয়া। এক প দুধ।

— আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া (কদর্যে/ব্যঙ্গার্থে) যেমন—খবরটা শুনে গা প মেরে উঠল।

— বেতের তৈরী পাত্র। চাল, ধান, মুড়ি ইত্যাদি মাপার জন্য ব্যবহৃত হতো আগেকার দিনে। সেই থেকে বেতের তৈরী ছোট পাত্রকে 'প' বলা হত। আবার এক পোয়া দুধ মাপার পাত্রকে 'প' বলা হত।

— কচু প্রভৃতি গাছের পার্শ্বমূল থেকে যে গাছ জন্মায় তাকে 'প' বলা হয় (বিকৃত উচ্চারণ)। আসলে শব্দটি 'ব'।

ব— কচু. মান কচু. আদা প্রভৃতি গাছেব পার্শ্বমূল থেকে যে গাছ জন্মায তাকে 'ব' বলে।

— বহন কবা অর্থে। যেমন— তুই এই জিনিসটা ব তো।

ম— আমোদিত হওযা। আমোদ —ম। যেমন—আমেব গন্ধে ঘবটা ম ম কবছে।

—মম (আমাব) অর্থে। মম—ম।

ব— কাঁচা অর্থে। যেমন— ব-মাংস। কিন্তু চাযেব ক্ষেত্রে দুধ-বিহীন চা কে ব-চা বলা হয।

— বও বা থামো অর্থে। যেমন— তুই ব দেখি।

— নিবেট বা বুদ্ধি জ্ঞানহীন। যেমন—লোকটা একেবাবে ব—ব-মূর্খ ইত্যাদি।

ল— লোহা। লোহা কাটা— ল কাটা।

— আল (Sharp)। আল—ল

শ— শত। শত—শ। পাঁচ শত—পাঁচ শ।

স— ভিজা অর্থে। সপ সপে—স। যেমন— স কাপড—ভিজা কাপড।

— সহা বা সহ্য কবা অর্থে। যেমন—দুঃখ স তা হলে তোব ভাল হবে।

হ— হও-হওযা অর্থে। অসম্ভ্রমে ব্যবহৃত হয। যেমন—দূব হ আমাব সামনে থেকে। আদব বা স্নেহসূচক সম্বোধনে—ভাল হ; আবাব তোবা মানুষ হ।

দা— কাটাবি অর্থে। [সং. দাত্র]। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায এই দা কে বলা হয 'দাবালি'।

— দাদা অর্থে। যেমন মেজ দাদা— মেজদা, বডদাদা—বড দা ইত্যাদি।

— প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায প্রতিবেশী/পাডা পডশীকে বলা হয 'দা-দেইজি', কোথাও কোথাও 'দে-দেইজি'। [সং. দাযাদ]।

লা— স্ত্রীলোকদেব বিশেষ কবে নিম্নশ্রেণীব স্ত্রীলোকদেব কথাবার্তা বলাব মাত্রা, ঢঙ বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনেব শব্দ। যেমন—কি বলছিস লা।

— নৌকা। না—লা। প্রাদেশিক উচ্চাবণে—কথ্যভাষায 'নৌকা' অর্থবাচক 'না' কে 'লা' বলা হয।

— মাটিব আঠা। সম্ভবতঃ শব্দটি 'লাল' থেকে এসেছে। যেমন—এই মাটিব লা মবেনি।

— 'লাউ' এব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত উচ্চাবণে 'লা'। যেমন—লাউযেব ঘণ্ট—লা-ব ঘণ্ট।

তা— তাপ অর্থে। হাঁস, মুবগী প্রভৃতি ডিম ফোটাবাব জন্য ডিমে তা দেয অর্থাৎ তাপ দেয। [সং তাপ > তা]।

— মোচড বা পাক। যেমন— গোঁফে তা দেওযা। [সং. তাব]।

— 'তাহা'-ব কথ্যরূপ। তাহা— তা।

— একখানি কাগজ অর্থে। যেমন—এক তা কাগজ। ফাবসি তাহ—তা।

জো/যো— সুযোগ, উপায। যেমন—পালাবাব যো নেই।

— অনুকূল অবস্থা বা ঠিক অবস্থা। যেমন—কৃষি কাজেব সময বীজ বপনেব জন্য মাটিকে বীজ বপনেব উপযুক্ত কবাকে 'যো' বলে।

দে— দেহ বা শবীব অর্থে। [সং. দেহ]। শব্দটি মধ্য বাংলায বেশ ব্যবহৃত হত। আধুনিক বাংলায ব্যবহাব কম। তবে আজও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব কথ্য ভাষায ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

— দেবতা অর্থে। 'দেবতা' শব্দেব সংক্ষিপ্ত রূপ 'দে' কথ্যভাষায ব্যবহৃত হয। যেমন—দে দেবতা তোমায মঙ্গল করুক।

— এক প্রকার ধান। যদিও এই ধান থেকে বেশি খই হয়। অনেকটা ভুট্টা জাতীয়। ভুট্টা গাছের মত লম্বা লম্বা গাছ হয়। [সং দেবধান্য > দে ধান]

— 'দাও' শব্দ তুচ্ছার্থে।

ঘা— ক্ষত অর্থে। যেমন – ঘায়ে মলম দাও। দগদগে ঘা ইত্যাদি।

- - আঘাত অর্থে। যেমন— বেশ কয়েক ঘা দিয়ে দাও। ঘা-খাওয়া, ঘা-দেওয়া, কাটি ঘা ইত্যাদি।

— জোর বা বেশি বলের সঙ্গে। যেমন— ঘা ঘা করে ধান ভানছে।

ঝাঁ— তীব্র অর্থে। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

— জ্বালা বোধ বা যন্ত্রণা অর্থে। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

— অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা বা তড়িৎ গতি বোঝাতে। যেমন—ঝাঁ করে একবার ঘুরে আয়।

ছা, ছে— ছানা অর্থাৎ শাবক অর্থে 'ছা' ব্যবহার হয়। কাগের ছা; ব্যাঙের ছা।

— ছেদ অর্থে 'ছে' ব্যবহার হয়। যেমন— কাঠের গুঁড়িটা ছে দিয়ে দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওঝা-গুণিনের মন্ত্র

ওঝা-গুণিনের মন্ত্র, গুপ্তক্রিয়া কৌশল ও গুপ্ত প্রতিষ্ঠান:

এই বিশাল বিশ্বে মানুষই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক সংবেদনশীল জীব, যাকে প্রতিনিয়ত নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয় এবং সেজন্য তাকে নানাবিধ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ, শোক ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। স্বাভাবিক জীবধর্ম অনুযায়ী মানুষ এগুলি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করে এবং আদিকাল থেকে এই চেষ্টা করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। এই জটিল জীব জগতে মানুষই একমাত্র জীব যাকে খাদ্যগ্রহণ করে জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণ, আমোদ-প্রমোদ, জ্ঞান-বিদ্যা চর্চা, রোগ-নিরাময় প্রভৃতির প্রয়োজন মেটাতে হয়। সেজন্য তাকে সঙ্গী-সাথী, বন্ধু, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হতেই হয়। জগতের অন্যান্য জীবের সেই দায় নেই। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাই অহরহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখছে এবং ক্রমবর্ধমান উন্নত অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। তবুও এই সংগ্রামকারী মানুষের এক এক সময় এমন এক এক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যখন সে শত চেষ্টা করেও সেই পরিস্থিতির বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না, এমনকি তার জানা সমস্তরকম উপায় অবলম্বন করেও সে সফল হয় না, তখনই তাকে নির্ভর করতে হয় অন্য শক্তির উপর যা তার কাছে অজানা, তার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। এই অজানা শক্তিকে মানুষ অলৌকিক, অতি প্রাকৃত নামে ভূষিত করেছে।

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ তার চারপাশে ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য তাকে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সেই পরিবেশ সম্পর্কে তার কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা কিংবা জ্ঞান ছিল না। এই প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থাকে জয় করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল এবং জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য ছিল বলেই এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার পশ্চাতে আদিম মানুষ অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি কল্পনা করেছিল। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল সেই অজানা অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট করার প্রাণপন প্রচেষ্টা। আদিম মানুষের কাছে এই অজানা শক্তিই ছিল অলৌকিক শক্তি। তাই ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সেই কালে অলৌকিক শক্তি বলে গণ্য করা হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে আজও মানুষ অসহায়। এখনও এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানের অতীত। যেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজও করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীনকালে আদিম মানুষ যেমন অপরিজ্ঞাত শক্তিগুলির কাছে অসহায় ছিল ও উপায়ান্তর না দেখে তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, আধুনিক যুগের মানুষ প্রভূত জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হয়েও রহস্যময় এই সব ঘটনার কাছে আজও অসহায়। যুক্তি বুদ্ধির অতীত এই সব রহস্যময় ঘটনা তাই আজও অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত নাম নিয়ে আমাদের ভীত করে চলেছে। সুতরাং একথা বলা যায় আদিম অসহায় মানুষের প্রবৃত্তির মর্মমূল থেকে যে অলৌকিক ঘটনার কল্পনা উৎসারিত হয়েছিল আজও তা আমাদের সংস্কার-বিশ্বাসে সম্পূর্ণ না হলেও কিয়ৎ পরিমাণে হয়ত পরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান আছে ও আমাদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তারা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে অস্থির ও বিপর্যস্ত করে তুলছে আর আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিজয়রথে আরোহন করেও তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পারছি না।

সুতরাং অলৌকিক হোক কিংবা অতি প্রাকৃত হোক আমাদের জ্ঞানের সীমারেখার বাইরের এই ঘটনাগুলি যখন আমাদের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং হাজারো চেষ্টা করেও আমরা সেই সমস্যার বেড়াজাল ছিঁড়ে যখন বেরিয়ে আসতে পারি না, তখন আমরা নিজেরা নিজেদের কাছে ছোট হয়ে যাই, জীবনটা বড় কষ্টকর মনে হয়, আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অসহায়ভাবে ঘটনার শিকার হয়ে পড়ি। আমাদের সমাজে একদল মানুষ আছে যারা মানুষের এই দুর্বলতা, অসহায়তার খোঁজ রাখে এবং সময় সুযোগ বুঝে তারা নিজেদেরকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে জাহির করে। সমস্যাগ্রস্ত মানুষ গত্যন্তর না দেখে বিমূঢ়ভাবে এই সমস্ত অলৌকিক শক্তিধরদের শরণাপন্ন হয় সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আশায়। এই অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রচারকারী মানুষরাই আমাদের সমাজে ওঝা, গুণিন, ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর প্রভৃতি বিচিত্র নামে পরিচিত।

আজকের দিনে মানুষের চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা, জ্ঞানচর্চার বিস্ময়করতা সভ্যতার এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র জয় করতে প্রয়াসী হয়েছে। প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা ব্যাপার আজ আর একেবারে অজানা কিংবা অধরা নয়। কিন্তু তবুও এক এক সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে, কোন কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, যখন তার কার্যকারণ সূত্রের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ তখন অসহায় হয়ে পড়ে। তখন এই সব সমস্যার মূলে অতি প্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তির কল্পনা করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। এইভাবে কল্পনাশ্রয়ী হতে হতে মানুষ এমন এক পর্যায়ে চলে যায়—যখন অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি তার সংস্কারে বদ্ধমূল হয়ে বসে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই সংস্কার লালন করে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত তা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। একে লোকবিশ্বাস (Folk belief) বলে অভিহিত করা যায়। আদিম মানুষের অসহায়তার ধারাকে বিবর্তিত আকারে একালের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলেছে, ভবিষ্যতেও তা চলবে—কত দিন তা কে জানে।

আদিম মানুষের জীবনে অতি প্রাকৃত কিংবা অলৌকিক ঘটনার অন্ত ছিল না। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের রোগ, শোক, মহামারী, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতিকে তারা অতি প্রাকৃত ঘটনার অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা উপায় খুঁজেছিল। অনেক সময় বাস্তব জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হয়তো আপনিই হয়ে গেল। হয়তো কোন রোগ আপনা থেকেই সেরে গেল, কিংবা ঘটনাচক্রে প্রাত্যহিক জীবনের কোন বস্তুর সংস্পর্শে এসে কোন রোগের নিরাময় ঘটল। কিছু বুদ্ধিমান মানুষ এই ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছিল। অতি প্রাকৃত ঘটনা বলেই তা সীমাহীন হয় না—তার শেষ আছে। বনে আগুন লাগলে এক সময় তা নিভে যায়। ঝড়-বৃষ্টিরও শেষ আছে—রোগও আপনা থেকেই নিরাময় হয় কিংবা জীবনের মৃত্যু ঘটায়। ঘটনার এই সব পারম্পর্য লক্ষ্য করে বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা তাদের মনোমত ব্যাখ্যা দিল এবং তারা এইসব অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ রূপে নিজেদেরকে প্রচার করল। সমাজে এরাই হল মাথা; এরাই গুরু, ওঝা, গুণিন ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত হল। এই সমস্ত মানুষেরা তাদের কার্যকলাপ গোপন রাখল। পরবর্তীকালে এই সমস্ত গোপনীয় কার্যপ্রণালী গুপ্তবিদ্যা বলে পরিগণিত হল। গুপ্তক্রিয়া (occult procedure)

ও কৌশলের চর্চায় যে সমস্ত মানুষ নিজেদেরকে পারদর্শী করে তুলল, সেই সমস্ত মানুষেরা বিরাট শক্তিমান বলে ও দুর্বল চিত্ত, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বোকা মানুষদের পরম সহায়, প্রধান রক্ষক হিসাবে পরিগণিত হল। প্রাচীন জনসমাজে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে স্বভাবতই ছিল অসহায় এবং তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত এই সমস্ত জানগুরু, ওঝা, গুণিন প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুপ্তক্রিয়াকুশলীরাই তাদের হয়ে অদৃশ্য দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং তাদেরকে সমস্ত প্রকার দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করবে ফলে প্রাত্যহিক জীবনে অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন ভীতি থাকবে না।

আদিম সমাজের অতি প্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা ও এদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য গুপ্তক্রিয়াচর্চাকারীদের শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারটি জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করল এবং অতি প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব লোকবিশ্বাসে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তবিদ্যা অনুশীলনকারীরাও নিজেদেরকে সংগঠিত করল এবং গুপ্তক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ করে এক সুসমঞ্জস আকার দিতে প্রয়াসী হল। শুধু তাই নয়, গুপ্তক্রিয়া চর্চার প্রসার ঘটাতে লাগল ফলে এই সব ক্রিয়া ব্যবহারের পরিধিও বেড়ে গেল। আগে যেখানে এই গুপ্ত বিদ্যা রোগ শোক, ক্ষতি, দুর্দশা নিরসনের জন্য ব্যবহৃত হত, পরবর্তীকালে তা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। মানুষের কল্যাণের কাজে যেমন ব্যবহৃত হত, এবার মানুষের ক্ষতি করার কাজেও প্রযুক্ত হতে থাকল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এই গুপ্তবিদ্যা যেমন একটা পাগল মানুষকে ভাল করার কাজে ব্যবহৃত হত, তেমনি একটা ভাল সুস্থ মানুষকে পাগল করার জন্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। মানুষের রোগ-নিরাময় যেমন এর মূল লক্ষ্য ছিল, তেমনি সুস্থ মানুষকে রোগগ্রস্ত করার কাজে প্রযুক্ত হতে থাকল। মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচান এর উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তীকালে জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াই এর অন্যতম প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়াল। ফলে যে গুপ্তবিদ্যাকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত, পরম নির্ভয়তা ও নির্ভরতার আশ্রয় বলে মনে করত তার কল্যাণমুখী কার্যকলাপের জন্য— কালে কালে তা মানুষের কাছে অকল্যাণের, অশ্রদ্ধার, ভীতির বিষয় বলে পরিগণিত হতে শুরু করল এবং গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীরাও মানুষের কাছে বিভীষিকার আসন পরিগ্রহ করল।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তবিদ্যার রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। অতি প্রাকৃত বা অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আদিম মানুষের কাছে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, অগ্নিদহন প্রভৃতি ঘটনা ছিল অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত, পরবর্তীকালে ঐ সব ঘটনার কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ঐগুলির অলৌকিকত্ব আর থাকল না। তেমনি পরবর্তীকালে গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীগণ অর্থাৎ ওঝা, গুণিন, ঐন্দ্রজালিক, জানগুরু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জনসমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা সংস্কার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাঁদের কার্যকলাপের রূপ ও বদল করলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। ফলে ওঝা-গুণিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিকে নূতন অর্থে দেখা হতে লাগল আর লোক-মানসে (Folk-mind) এর একটা স্থায়ী আসন তৈরী হয়ে গেল।

গুপ্ত ক্রিয়া কৌশলের চর্চা ও প্রয়োগ পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে যখন তার একটা নির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত রূপ দেবার চেষ্টা হতে লাগল, তখন কিছু কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে এই গুপ্তবিদ্যাকে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে স্থাপন করার জোরদার প্রচেষ্টা শুরু হল। এই সুযোগে কিছু কিছু লৌকিক ও পৌরাণিক

দেবদেবাও যুক্ত হয়ে গেল। এতদিনে যে গুপ্তবিদ্যার মূলে ছিল অতি প্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তি এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল দৈবী প্রভাব। পূজা পাঠ, হোম, মন্ত্র এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান গুপ্ত ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে লোক-বিশ্বাসের (Folk-belief) গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সামাজিক আচার, সংস্কার, প্রথা-বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের যোগ বড় নিবিড়। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে এগিয়ে এসেছে গুপ্তবিদ্যা। আদিম মানুষের সংকটময় দুর্যোগপূর্ণ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াসী হয়েছিলেন গুপ্ত বিদ্যাচর্চাকারীগণ, কালে কালে সেই বিশ্বাস পরিবর্তিত রূপে বয়ে চলে এসেছে বর্তমান কালে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হবার ফলে গুপ্ত বিদ্যার নূতনরূপ দেখা দিল এবং জনসমাজ দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করল। আজও দেখা যায় বিভিন্ন সমাজে ঝাড়-ফুঁক, ডাকিনীবিদ্যা, বশীকরণ, সম্মোহন বিদ্যার গভীর প্রভাব বিদ্যমান।

গুপ্তক্রিয়া সম্পর্কিত নানাবিধ কার্যপ্রণালীর প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দেশজ/গ্রামীণ (Indigenous)প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানে মন্ত্র, তন্ত্র, ঝাড়, ফুঁক, দুষ্ট গ্রহশান্তি, সম্মোহন, মারণ, উচাটন ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ চলে। এগুলি 'জানবাড়ি' নামে পরিচিত। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর এক নতুন বিষয়—তা হলAstrology—ফলিত জ্যোতিষ বিদ্যা। ফলে গুপ্তবিদ্যার ব্যাপারটি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার অনুন্নত সমাজের মধ্যে বেশি প্রচলিত, উচ্চবর্ণের উন্নত মানুষদের মধ্যে এদের প্রভাব ততটা ক্রিয়াশীলনয়। বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের মধ্যে ঝাড়-ফুঁকের, গুপ্তবিদ্যার প্রচলন বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। শুধু আমাদের ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই একই চিত্র। ইউরোপের অনুন্নত জনসমাজে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিতদের কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। এই পুরোহিতগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, সাধারণ জ্বর-ব্যাধি, দুরবস্থা প্রভৃতি থেকে মানুষদের রক্ষা করে। যে দুষ্টশক্তি, অপদেবতা প্রভৃতি এইসব ক্ষতিকারক কর্মের সহায়ক, তাদেরকে বশে রেখে, তাদের অনিষ্টকর ক্ষমতাকে খর্ব করে মানুষকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করে। তবে মজার কথা ইউরোপীয় অনুন্নত জনসমাজে এই পুরোহিতদের প্রভাব বেশি। এইরকম অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাচীন পারসিক পুরোহিত Magian দের কথা শোনা যায়। ইউরোপীয় সমাজে আজও Witchcraft-এর বেশ প্রচলন আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অনুন্নত জনসমাজে বিশেষ করে আদিবাসী সমাজে গুণিন মন্ত্রের বহুল ব্যবহারের পিছনে কতকগুলি কারণ লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বহু প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব এবং বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার কুফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশি মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর ও অনুন্নত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথার্থ প্রসার এদের মধ্যে হয়নি। উপরন্তু এরা প্রাচীন সমাজের কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জগতে লালিত পালিত। এর সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে সাহায্য করছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই সমস্ত মানুষ গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, সাপ-বাঘের সঙ্গে বাস করে। খাদ্য নেই, বাস করার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নেই, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই, দুঃসহ জীবন যন্ত্রণার মধ্যে এদের দিন কাটে। এরাই ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু উৎপাদনের যৎসামান্যটুকু ভোগ করে

সমাজের বুদ্ধিজীবী শাসক গোষ্ঠী। বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থা সুকৌশলে এদেরকে আশঙ্কার কুশঙ্কার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এরা সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত এবং অধিকাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। এইসব মানুষের দুর্বলতা ও অসহায়তার খোঁজ রাখে একদল চতুর ধুরন্ধর শ্রেণীর মানুষ—তারা হল ওঝা, গুণিন, হাতুড়ে (বৈদ্য), গণৎকার, গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী, জানগুরু ইত্যাদি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন ইত্যাদির শিকার হয়ে যখন এই সব মানুষেরা অসহায় হয়ে পড়ে তখন হাতের কাছে পেয়ে যায় এই সব ওঝা গুণিনদের। তাছাড়া সামর্থ্যের অভাবে বড় চিকিৎসক ডাকার সাহস হয় না এদের, ফলে অল্প পয়সায় সহজলভ্য গুণিনের কাছে এরা মাথা মুড়োয়। অনেক সময় গুণিনরাও অর্থ নেয় না, ঘরে উৎপন্ন লাউটা, বেগুনটা, কুমড়োটা ইত্যাদি আনাজ ও ফল-পাকড় দিয়ে তাদের তুষ্ট করা যায়। গ্রামাঞ্চলে 'সিধে' দেওয়ার রীতির প্রচলন আছে। সেখানে পারিশ্রমিকের অর্থের পরিবর্তে চাল কলা আলু তেল মশলা ইত্যাদি দিয়ে 'সিধে' দিলে কাজ মিটে যায়। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে বাস করা এই সব ওঝা গুণিনদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে—ফলে গুণিনদের ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা চিরাচরিত আস্থা কিংবা বিশ্বাস জন্মে যায়। এর সঙ্গে ক্রিয়া করে বংশপরম্পরাগত সংস্কার-বিশ্বাসের ফল। ওঝা-গুণিনের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ এই সব অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনে এক বিস্ময়কর সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে রাখে। এইসব ওঝা গুণিনের প্রভাব অনুন্নত জনসমাজে তথা লোকসমাজে যতটা ক্রিয়াশীল, তেমনটি আর অন্য কোথাও নয়।

ওঝা-গুণিনের মন্ত্রের ব্যবহার, গুপ্তবিদ্যার চর্চা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে প্রথমেই এই জেলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকা, ধর্মীয় পরিবেশ-পরিমণ্ডল, সাংস্কৃতিক অবস্থার পর্যালোচনা করতে হয়। যদিও এই সম্পর্কে পূর্বে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে তবুও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন আছে। আর্থ সামাজিক অবস্থা বিচার করতে গিয়ে অনেক কথার মধ্যে কেবল এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে সামাজিক দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দারুণভাবে অনুন্নত ও অনগ্রসর জেলা। এর কারণ সম্পর্কে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধারগণ হয়ত সদুত্তর দিতে পারবেন। শুধু এইটুকু বলা যায় এখানকার মানুষ অবহেলিত বঞ্চিত।

শিক্ষা সংস্কৃতির বিচারেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অনেক পিছিয়ে। এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা অক্ষর-পরিচয়হীন; কিছু মানুষ শিক্ষিত, অধিকাংশ অর্ধ-শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত। মোটকথা বলা যায় মানসিক বিকাশের জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ মানুষদের তা নেই কিংবা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বসবাসকারী মানুষদের অধিকাংশই উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। এরা কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর, শ্রমিক, মজুর ইত্যাদি। এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। সুতরাং উচ্চভাবনা, উন্নত সংস্কৃতি এখান থেকে আশা করা যায় না। যেটুকু শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—তা শহর শহরতলী বা কিছুটা উন্নত অঞ্চলের আশেপাশে এবং মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসা ধ্যান ধারণা, সংস্কার-বিশ্বাস, প্রথানুগত্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা সব বাসা বেঁধে

আছে এখানে। এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় প্রাচীন ব্যবস্থার অনুবর্তন করে আসছেন। মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাস, গুপ্তবিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া প্রাচীন ধারারই ফলশ্রুতি।

এছাড়া আর্থিক অসাচ্ছলতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষকে ঝাড় ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্রের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করিয়েছে। যে জেলার জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার সুযোগ তাদের কোথায়। তাই অল্প খরচায় অনেক সময় বিনা খরচায় হাতের কাছে পাওয়া ওঝা-গুণিনের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্রের কার্যকারিতার উপর এমন অন্ধবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে সামর্থ্য থাকলেও এখানকার মানুষ অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে যেতে চায় না রোগ নিরাময়ের জন্যে। আর যদি সে রোগের লক্ষণ তাদের অজানা হয় তা হলে তো কথাই নেই। ওঝা-গুণিনের কাছে ছুটতেই হবে। সুতরাং ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র, গুপ্তবিদ্যার ব্যবহার ও প্রসারের মূলে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অন্ধ প্রথানুগত্য, কুসংস্কার প্রভৃতি বিদ্যমান একথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে যে সমস্ত তথ্য আহরণ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখানকার মানুষ মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্য গ্রহণের জন্য ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয়। সেগুলি হল—

ইস্টকারী মন্ত্র ● রোগ নিরাময়

পেটের অসুখ, পাতলা পায়খানা, বমি, গ্যাস, অম্বল, পেটের যন্ত্রণা, যন্ত্রনায় মোচড় দেওয়া, শরীর ধনুকের মত বেঁকে যাওয়া। বাচ্চাদের হঠাৎ হঠাৎ পেটের যন্ত্রণা, সবুজ পাতলা পায়খানা করা, মুখ থেকে দুধ তোলা, বাচ্চার হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠা, খেঁচুনি, বাচ্চার খাওয়া কমে যাওয়া, বুকের দুধ না খাওয়া, বাচ্চা রোগা ও শীর্ণ হয়ে যাওয়া, পুঁয়ে পাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, খুব বেশি ঘুম কিংবা খুব কম ঘুম, বাচ্চার অস্থিরতা, আঁতুড়ে শিশুর শ্বাসরোধ, শিশুর এবং বয়স্ক মানুষের স্বরবিকার, পুরুষ ও নারীর উন্মাদ হয়ে যাওয়া, পুরুষ ও নারীর কামোন্মাদ, বিভিন্ন প্রকার কম্পন, খিল ধরা, বিছানায় প্রস্রাব করা, রাত্রে ঘুমের ঘোরে হাঁটা, শরীরে জ্বালা, স্ত্রীলোকের ঠুনকো, শিশুর তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার, গেঁটে বাত, ন্যাবা, নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয়, পেঁচোয় পাওয়া, বাধক বেদনা, ভাঁদাল ব্যথা, মূর্চ্ছা, মৃগী, রক্তহীনতা, শূল বেদনা, সূতিকা জ্বর, প্রসূতির গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়া, রক্তবমি, শিরঃপীড়া, আধকপালে মাথাব্যথা, আহারে অরুচি, তাণ্ডবরোগ, কোমর বেদনা, কানে তালা লাগা, গলার স্বর বসে যাওয়া, হাত পা অসাড় হয়ে যাওয়া, অনবরত চোখ নাচা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি।

আদিম মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা জ্বর, ব্যধি, যন্ত্রণা প্রভৃতি জীবনের দুঃখ কষ্টকে অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রোধ বা আক্রোশ বলে মনে করত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আধুনিক যুগের উন্নত মানুষও অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তির প্রভাবকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। আজও বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ কঠিন রোগ নিরাময়ের জন্য ওঝা-গুণিনের দ্বারস্থ হন। হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর জন্য ওঝা ডাকা হয়, পাগল ভাল করার জন্য গুণিনের শরণাপন্ন হতে হয়। বর্তমানকালে চারদিকে বিভিন্ন 'জ্ঞানবাড়ি' গজিয়ে উঠেছে—সেখানে জ্ঞানগুরুদের কাছে পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদেরও ভিড় করতে দেখা যায়।

শুধু রোগ নিরাময় নয়, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা, ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য ওঝা-গুণিনের ঝাড়, ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত যন্ত্রণা, ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য ঝাড় ফুঁকের সাহায্য নেওয়া হয় তার তালিকা দেওয়া হচ্ছে—

(১)**আঘাত জনিত বেদনা :** শরীরের কোন স্থানে আঘাত লেগে যন্ত্রণা হলে, হাড়ভাঙা ও হাড়ে চোট লাগলে, হাত, পা ইত্যাদি কোন অঙ্গ মচকিয়ে গেলে, কোমরে হঠাৎ লেগে গেলে, ঘাড়ে যন্ত্রণা হলে, ফিক ব্যথা ইত্যাদি।

(২) **ক্ষত জনিত বেদনা :** পুরাতন নালী ঘা, কেটে গিয়ে ক্ষত হলে এবং দীর্ঘদিন সেই ক্ষত না সারলে, মুখ ও জিহ্বায় ঘা, রক্ত আমাশা প্রভৃতিতে ভুগে অন্ত্রে ক্ষত হলে, ভগন্দর, অর্শ, ফোড়া ও পাঁচড়ার ঘা হলে, অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার পচা ঘা প্রভৃতি।

(৩) **মাকড়ের দংশনজনিত যন্ত্রণা :** বিছার কামড়, বোলতা-ভীমরুলের কামড়, মৌমাছির কামড়, শিং মাছ (শিঙ্গি মাছ) ও ট্যাংরা মাছের কাঁটা মারা, পাগলা কুকুরে কামড়ান, শিয়ালে কামড়ান, বড় জোঁকে কাটা, ইঁদুর ও ছুচোতে কামড়ান, বিড়ালের কামড়ান ও আঁচড়ান, বাঘের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি।

(৪) **প্রসবকালীন ব্যথা বেদনা ও অসুবিধা :** প্রসব বেদনা উপশমের জন্য এবং প্রসবকালীন নানাবিধ অসুবিধা দূর করার জন্য। ফুল না পড়া, প্রসবের সময় সন্তানের শরীর উল্টে যাওয়া, মৃত সন্তান প্রসব করা, সুখ প্রসবের জন্য, প্রসবের পর নানাবিধ রোগ-যন্ত্রণার উপশমের জন্য প্রভৃতি।

রোগ নিরাময়, ব্যথা বেদনার উপশম ছাড়া আর যে সমস্ত ব্যাপারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয় তার তালিকা দেওয়া হল—

সর্পদংশন :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় খাল বিল নদীনালা বন জঙ্গল বেশি। এখানে যেমন বাঘের ভয় আছে তেমনি আছে সাপের ভয়। সাপে কামড়ালে তার উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ এখানে কম। তাই সর্পদংশনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখানকার মানুষ প্রথমেই ছোটে ওঝার বাড়ী। তাছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওঝা-চিকিৎসা ছাড়া আর অন্য কোন ব্যবস্থাই নেই।

জন্মনিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ :

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য সত্ত্বেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ আজও জন্ম-নিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে গুণিনের শরণাপন্ন হয়। সন্তান জন্ম বন্ধ করা, গর্ভ নষ্টকরা ইত্যাদি ব্যাপারে এখানকার মানুষ গুণিনের সাহায্য নেয়। তবে গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপই বেশি।

সন্তান জন্ম ও বন্ধ্যাত্ব মোচন :

জন্ম নিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ গুণিনের দ্বারস্থ হয় তেমনি সন্তানহীনার সন্তানলাভের জন্য কিংবা বন্ধ্যানারীর দুঃখ ঘোচাবার জন্য গুণিনের সাহায্য নিতে হয়। সন্তানহীনা নারী সংসারে অমঙ্গলস্বরূপ। আজও গ্রামেগঞ্জে লোকবিশ্বাস প্রচলিত— আঁটকুড়া বা আঁটকুড়ি (অপুত্রক) স্ত্রীলোক অশুচি। অনেক শুভ অনুষ্ঠানে আঁটকুড়া স্ত্রীলোককে ডাকতে লোক ইতস্ততঃ করে। ভিখারিরা অনেক সময় এদের হাতের ভিক্ষা নেয়

না। এই আঁটকুড়া অপবাদ ঘোচাবার জন্য নারীরা গুণিনের শরণাপন্ন হয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানে নারীর সন্তান জন্মানোর বহু বিচিত্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তবুও এই ব্যাপারে গ্রামেগঞ্জের মানুষ সংস্কারবশতঃ হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক ডাক্তারের কাছে যাওয়ার থেকে গুণিনের কাছে যেতে পছন্দ করে। গুণিনের কুচিকিৎসায় অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে, তবুও মানুষ গুণিনের কাছে ছোটে— এই ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অর্থাভাব ও কুসংস্কারের প্রভাব এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়।

চুরি, হারিয়ে যাওয়া, নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া :

কোন জিনিস চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষ ওঝা গুণিনের সাহায্য নেয। যেমন—গহনা চুরি, কোন মূল্যবান দ্রব্য চুরি, দলিলপত্র ইত্যাদি চুরির ব্যাপারে হদিশ পাবার জন্যে গুণিনের সাহায্য নেওয়া হয়। তেমনি গরু চুরির জন্য মানুষ প্রথমেই গুণিনের শরণাপন্ন হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আজও এই গরু চুরির উপদ্রব আছে। কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলে এখানে গবাদি পশুর আধিক্য, তেমনি এখানে গরুচোরদের রাজত্ব। বেশ কিছু মানুষ দল বেঁধে এই কাজ করে। এটা তাদের পেশাও বলা যায়। যাই হোক গরু চুরির হদিশ করতে এখানকার মানুষ 'জান' বা ওঝা বা গুণিনের কাছে যায়, কারণ কম খরচায় এর চেয়ে ভাল উপায় তাদের কাছে নেই। এছাড়া এই সব গুণিন সম্প্রদায়ের মানুষ স্থানীয় বলে অনেক খোঁজখবর রাখেন কিংবা আড়কাঠির মারফৎ গরু চোরদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ থাকে। ফলে অল্প কিছু খরচার বদলে চুরি যাওয়া গরু এঁদের সাহায্যে উদ্ধার হয়।

কোন জিনিস হারিয়ে গেলে যেমন টাকা পয়সা, মূল্যবান জিনিসপত্র, গহনা, দামী পুস্তক, দলিলপত্র, দরকারি জিনিস প্রভৃতি হারিয়ে গেলে মানুষ 'জানগুরু', ওঝা, গুণিনের কাছে যায়। তেমনি গৃহপালিত পশু—গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি হারিয়ে গেলে আজও মানুষ গুণিনের শরণাপন্ন হয়।

কোন মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তাকে খুঁজতে যেমন মানুষ পুলিসের সাহায্য নেয়, তেমনি ওঝা, গুণিন, গনৎকারের কাছে যায়।

পারিবারিক সমস্যা, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির সমাধান :

এইসব সমাধানের জন্য মানুষ গুণিনের শরণাপন্ন হয়।

দুষ্ট শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করা :

মানুষ গুণিনের কাছে যায়। সাধারণ মানুষের ধারণা আমাদের চারদিকে নানাবিধ দুষ্টশক্তি, অশুভ আত্মা প্রভৃতি আমাদের অলক্ষ্যে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সুযোগ পেলে মানুষের নানারকম অনিষ্ট করে। এদেরকে প্রতিহত করার জন্য মানুষ গুণিনের সাহায্য নেয়। তেমনি অশুভ গ্রহকে শান্ত করার জন্য মানুষ ওঝা গুণিনের শরণাপন্ন হয়।

দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেত প্রভৃতি বিতাড়ণ :

লোক বিশ্বাস বা লোক সংস্কার— যাই বলা হোক না কেন, ভূত প্রেত নামক অশরীরী জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা বিদ্যমান। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভূত প্রেতের উপস্থিতি, তাদের কার্যকলাপ, তাদের সম্পর্কে উদ্ভট, বিচিত্র, রহস্যময় কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত। এখনো পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষও ভূত বা অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তবুও

ভূত নেই একথা মানুষ নির্দ্বিধায় স্বীকাব কবতে পারে না। ভূত সম্পার্কিত কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, যাব সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকাব করা যায় না। মানুষের অবচেতন মনে অশরীবী সম্পর্কিত এমন সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, হাজার হাজার যুক্তি দিয়ে যদি প্রমাণ করা যায় ভূত প্রেত বলতে কিছু নেই, তবুও মানুষ নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে না। অন্ধকার রাতে, নির্জন পথে, বিরাট বড় ফাঁকা বাড়িতে, নিঃসঙ্গ শূন্য মাঠে, শ্মশানে,গোরস্থানে, বড় বড ঝাঁকড়া গাছের নীচে, বাঁশবনের অন্ধকারে, পুরানো ভাঙা বাড়িতে (হানা বাড়ি)—এমনি কত অস্থানে কুস্থানে ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়। এরা কেউ অতৃপ্ত আত্মা, কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত, কেউ বা মায়া মমতার টানে মৃত্যুর জগৎ থেকে আমাদের এই পার্থিব জগতে সাময়িকভাবে ফিরে আসে। কাজ শেষ হলে আবাব ফিবে চলে যায়। কেউ বা সাংসাবিক বন্ধনে এমনভাবে বাঁধা পড়ে যায় যে, পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া মুক্তি পায় না। গয়াতে পিণ্ড দিলে বা অন্যান্যভাবে বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি পেলে তবেই আত্মা এই পার্থিব জগৎ ছেড়ে চলে যেতে পারে। এমনি ধাবা নানাপ্রকাব সংস্কার, কাহিনী, গল্প, কিংবদন্তী, প্রবাদ এবং সর্বোপরি বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দীর্ঘদিনের আবাদকরা এই সংস্কার-বিশ্বাস সহজে উবে যাওয়ার নয়। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংস্কার-বিশ্বাস যেমন ছিল, আজও তা বজায আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ফলে ওঝা-গুণিনের বাজত্ব বহাল তবিয়তে বর্তমান থাকবে। ভূত-প্রেত সম্পর্কিত ঘটনা, বোগ-ব্যাধি ডাক্তার কবিরাজে সাবাতে পারে না, সেখানে ওঝা-গুণিনের অবশ্যই দরকার—বংশ পবম্পরায় এই বিশ্বাস আমাদেব মনেব গভীরে শেকড় গেড়ে বসে আছে। সেখানে অশিক্ষিত গ্রামেব মানুষ শুধু নয়, শিক্ষিত শহবেব মানুষও ভূতের ওঝা ডাকে। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নয়, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে ভূত মানুষেব মনে ভর করে আছে বিচিত্ররূপে, বিভিন্ন প্রকারে যুগ যুগান্তরে আবহমানকাল ধবে।

ভূত-প্রেত : পুরুষ ভূত

ভূত প্রেত সম্পর্কিত সংস্কাব-বিশ্বাস যে দিনের পর দিন মানুষের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছে কিংবা কবতে চলেছে এব পিছনে গল্পকার, উপন্যাসকার, কবি সাহিত্যিকগণ কিছু পরিমাণে দায়ী। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, রম্যরচনা প্রভৃতি লেখা হয়েছে এই ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্মা, দুষ্ট আত্মা নিয়ে। আজকাল তো শিশু কিশোরদের কাছে প্রিয় বিষয় হলো ভূতের গল্প। এইসব গল্প-কাহিনী থেকে মানুষের মনে ভূত সম্পর্কিত সংস্কার জন্মে গেছে। ভূতের বিরাট শরীর—তালগাছের মত লম্বা লম্বা পা, জালার মত মাথা, মূলোর মত দাঁত, ভাঁটার মত চোখ, শনের মত চুল—এই আকৃতি নিয়ে ভূত আমাদের কল্পনায়, শিশুকাহিনীতে, ঠাকুরমার গল্পে, মজার ছড়ায় চিরকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভূত-প্রেত নিয়ে গল্প, কাহিনী, সত্য ঘটনা(?), কিংবদন্তী এত বেশি প্রচারিত যে এই অঞ্চলকে ভূতের দেশ বললে অত্যুক্তি হয় না। ধূ ধূ মাঠ, বন-জঙ্গল, নদীনালাতে ভরা এই অঞ্চল ভূত প্রেত থাকবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। সবার উপরে যে সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ভূতেরা বেঁচে থাকে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তার আধিক্য। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গঞ্জে প্রচুর ওঝা-গুণিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যারা তাদের নানারকম কারসাজি, প্রক্রিয়া, গালগল্প, আজগুবি কাহিনী প্রচার ও প্রসার ঘটায় যাতে মানুষের মনে ভূতপ্রেত সম্পর্কিত সংস্কার বিশ্বাস চিরকাল আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এইসব ওঝা গুণিনেরা 'জানবাড়ি', 'ভূতচালা',

'ভূতের ভর' প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর এই ভৌতিক বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর দেবতাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'অলৌকিক', 'অতিপ্রাকৃত', 'অশরীরী', 'দৈব' প্রভৃতি সম্পর্কিত এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—যাকে এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির একটা অঙ্গ বললে বোধ হয় অযৌক্তিক হয় না। এই ভূত প্রেতেরা কিন্তু বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন প্রকারের হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভূতেদের যত নাম ও প্রকার বা শ্রেণী প্রচলিত তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণ ভূত: একটি কথা প্রচলিত আছে যে মানুষ মরে গেলে ভূত হয়। তবে সব সময় তা হয় না। পাঁজি পুঁথি বিচার করে যাঁরা চলেন, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিষয়ের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের মতে তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির দোষপ্রাপ্তি ঘটে আর এই দোষ প্রাপ্তির কারণে তাকে প্রেতাত্মা হতে হয়। এই দোষের আবার মাত্রা আছে—এক পাদ দোষ, দ্বিপাদ দোষ ও ত্রিপাদ দোষ। মাত্রা যত বেশি ভূতের ভয়ঙ্করত্ব তত বেশি হয়। ত্রিপাদ দোষ প্রাপ্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি ভূত হলে সে ভয়ানক হয়ে যায়। মানুষকে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম গঞ্জ থেকে ভূত সম্পর্কিত যে সব কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে এদের আচার আচরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি হল এই সমস্ত ভূত লোকালয়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়; নির্জন রাস্তায়, বাড়ির আনাচে কানাচে, বাঁশ বনের অন্ধকারে, ভাঙা বাড়িতে এরা বিচরণ করে। খোনা স্বরে কথা বলে, মানুষকে ভয় দেখায়। কেউ কেউ আবার লোভী হয়। নির্জন পথে ভাল মাছ, মিষ্টি, খাবার দাবার নিয়ে গেলে তার কাছে চায়, না দিলে তার উপর অত্যাচার করে। এমনও শোনা গিয়েছে—রান্নাঘরে মাছ ভাজা হচ্ছে—জানালা দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে ভূত তা কপাকপ তুলে নিচ্ছে। এরা যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী মেয়েদের উপর ভর করে। অন্ধকার রাত্রে বাড়ির বাইরে গেলে এরা আক্রমণ করে। অতৃপ্ত কামনাবশতঃ, স্নেহ-মায়া-মমতার টানে, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় কিংবা অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করার জন্য মৃত ব্যক্তি ভূত হয়ে মানুষের জগতে ফিরে আসে। সাধারণতঃ অপঘাতে মৃত্যু হলে মৃতের দোষপ্রাপ্তি ঘটে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি ঘটে না, তাকে ভূত হতে হয়। গয়াতে পিণ্ড দিলে তবে এদের মুক্তি ঘটে।

ছেলে ভূত/বালক ভূত: ছোট ছেলে মারা গেলে যে ভূত হয়—তা হল ছেলে ভূত। এদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ভালভাবে হয় না। গ্রামেগঞ্জে ছোট ছেলেপিলেরা মারা গেলে দাহ না করে খালের ধারে, শ্মশানের কাছাকাছি কিংবা অন্য কোন পরিত্যক্ত স্থানে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বলা যায় সুষ্ঠভাবে এবং প্রথা অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টি না হওয়ার জন্য এরা প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত হয়। এই ছেলে ভূতেরা অনিষ্টকারক নয়। এরা কেবল ঘুরে বেড়ায়, মানুষের কোন ক্ষতি করে না বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

মেছো ভূত: মেছো ভূতেদের মাছের উপর লোভ বেশি। এরা মাছের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে কেউ মাছ ধরলে সেই মাছ চুরি করে এরা। গ্রামের মানুষ রাত্রে ছিপ টানা দিয়ে মাছ ধরে, চোরেরা রাত্রে মাছ চুরি করে, কিংবা হাট-বাজার থেকে মানুষ মাছ কিনে আনে—তখন এই মেছোভূত তাদের পিছনে লাগে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে পুকুরের ঘুন-এ (জলপথে), খালে, বিলে মাছ ধরার জন্য 'পাটা', 'উপড়ো' দেওয়া হয়। এরা সেখান থেকে মাছ তুলে খায়। কাঁচা মাছের উপর এদের লোভ বেশি।

গেছো ভূত: গেছো ভূতেরা গাছে গাছে থাকে। বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ এদের বাসস্থান। এরা গাছে বসে পা দোলায়, গাছের ডালে দোল খায়। যে গাছে বাস করে তার তলায় কেউ অ-কাজ, কু-কাজ করলে কিংবা সেই স্থান অপবিত্র করলে এরা তার ঘাড়ে চাপে, তাকে শাস্তি দেয়।

ব্রহ্মদৈত্য: 'ব্রহ্মদৈত্য' শব্দটির সঙ্গে 'দৈত্য' কথাটি থাকলেও আসলে ব্রহ্মদৈত্য হল বামুন-ভূত। ব্রাহ্মণ মারা গিয়ে যে ভূত হয় তাকেই ব্রহ্মদৈত্য বলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রেত যোনি। এই ব্রহ্মদৈত্যরা সাধারণতঃ বেল গাছে বাস করে। এরা খুব শান্তিপ্রিয়, মানুষের অপকার করার চেয়ে উপকার বেশি করে। গভীর রাত্রে এরা পৈতা মাজে, খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়ায়। ব্রহ্মদৈত্যদের মাথায় বড় টিকি থাকে। যে বেলগাছে থাকে তার তলা অপবিত্র করলে এরা রেগে গিয়ে তাকে চাপে।

কন্দকাটা বা কবন্ধ: কন্দ কাটা শব্দটি আসলে হল 'স্কন্ধকাটা'। গ্রামীণ উচ্চারণ বিকৃতিতে 'স্কন্ধ' হয়েছে কন্দ। কন্দকাটা হল মস্তকহীন দেহধারী ভূত। যে সমস্ত মানুষের মাথা কাটা যায়, তারা ভূত হলে কন্দকাটা হয়। মস্তক নেই বলে এরা দেখতে পায় না। দুহাত আন্দোলিত করে তালি বাজাতে বাজাতে এরা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এই দুহাতের মাঝখানে কেউ পড়ে গেলে তার আর রক্ষে নেই। এই কন্দকাটা তখন তাকে পিষে মেরে ফেলে। কন্দকাটাদের ভীষণ দুঃখ, অন্যান্য ভূতেদের মত মাথা নেই বলে। এরা প্রায়ই কাঁদে। তবে কান্নাটা যে কোথা থেকে নির্গত হয় তা কেউ বলতে পারে না। এরা কিভাবে খায় তা কেউ জানে না।

গো মড়ি বা গো ভূত: গরু মরে গিয়ে যে ভূত হয় তাই হল গো ভূত। গরু মারা যাওয়ার পর ভাগাড়ে ফেলা হয়। এই সময় কিছু আচার পালন করা হয়। যেমন— কিছু কাঁচা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে গরুর পা থেকে, লেজ থেকে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে মুখে গুঁজে দেওয়া হয়। তখন বলতে হয়— গোজন্ম ভাঁড়িয়ে তুই মনুষ্য জন্মে যা। এইভাবে তিনবার করতে হয়। এই আচার ঠিকভাবে পালিত না হলে, গলায় দড়ি অবস্থায় গরুর মৃত্যু হলে, দুর্ঘটনায়, বিষ খেয়ে কিংবা অন্য প্রকার অপঘাতে মৃত্যু হলে গোভূতের জন্ম হয়। গোভূতেরা গরুর আকার ধরে নির্জন পথের ধারে, মাঠে, জোৎস্নারাত্রে কিংবা জনহীন দুপুরে চরে বেড়ায়। কেউ বুঝতে পারে না তারপর হঠাৎ ছোট বাছুরের রূপ ধরে পথচারীর দুই পায়ের মাঝখানে দিয়ে গলে যায়। তখন সেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। তাই নির্জন পথে কিংবা মাঠে, রাত্রে কিংবা ঠিক দুপুরে কোন গরু দেখলে কাপড়ের কোঁচা খুলে ভাল করে পা ঢেকে দিতে হয়, যাতে গোভূত পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে না যেতে পারে।

ঘোড়া ভূত বা পৌরি: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঘোড়াভূতকে 'পৌরি' বলে। ঘোড়ার অপঘাতে মৃত্যু হলে ঘোড়া-ভূত হয়। গো ভূতের মত এরা পথে মাঠে রাত্রে, ঠিক দুপুরে চরে বেড়ায়। মানুষ দেখলে ছুটে আসে তারপর পায়ের খুর দিয়ে আঘাত করে, তাতে মানুষের মৃত্যু হয়। গভীর রাত্রে ঘোড়া ভূতেরা খট খট শব্দ করে চলা ফেরা করে।

বেগোমড়ি বা বেগোভূত: গো-মড়ি যেমন গরুভূত বা গোভূত, বেগোমড়ি কিন্তু বাঘ-ভূত নয়। বাঘ যে সমস্ত মানুষদের মেরে ফেলেছে তারা 'বেগোমড়ি' হয়। আর এই বেগোমড়িরা ভূত হয়ে 'বেগোভূত' হয়। অনেকে এদেরকে আবার 'বেগোমড়ি' বলে। 'বেগোমড়ি' শব্দের প্রকৃত অর্থহল—বাঘ কর্তৃক নিহত মানুষ।

এই বেগোমড়িরা ভীষণ হিংস্র হয়। যারা বনে জঙ্গলে কাঠ কাটতে, মধু ভাঙতে যায় তাদের মুখে শোনা গিয়েছে এই বেগোমড়ির হাতে পড়লে নিস্তার নেই।

বিড়াল ভূত: বিড়াল মরে গিয়ে যে ভূত হয় তারা হল বিড়াল ভূত। বিড়াল ভূতেরা খুব সাংঘাতিক হয়। এরা ডাইন-এর সহচর। সাধারণতঃ কালো বিড়ালগুলিই ভীষণ মারাত্মক।

'গলায় দড়ে' ভূত: যে সমস্ত মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মরে তারা ভূত হলে 'গলাযদড়ে' ভূত হয়। গলায় দড়ে ভূতেরা একটু অদ্ভুত টাইপের। এদের কাজ হল মানুষকে গলায় দড়ি দিতে প্ররোচিত করা। কোনো মানুষ রাগে দুঃখে বা কোনোকারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে যখন মনে মনে ঠিক করে তখন এইসব ভূত তাদের ডাকে। কেউ যদি একবার নির্জন পথে কিংবা জনহীন মাঠে, রাত্রে, কিংবা দুপুরে গলায় দড়ি দেবার কথা ভাবে তাহলে নিস্তার নেই। এরা এক বোঝা দড়ি নিয়ে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। যতক্ষণ না তারা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে, ততক্ষণ এরা তাদের তাড়া করে এবং গলায় দড়ি দেবার জন্য প্ররোচিত করে। তারপর সেই লোকটি গলায় দড়ি দিয়ে মরলে ভূত হয়ে যায় এবং এদের দলভুক্ত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলি 'গলায় দড়ে' ভূতেদের আড্ডা বলে চিহ্নিত।

বাঁশ বনের ভূত: বাঁশ বনের ভূত বলে ভূতেদের কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়ত ঠিক হবে না। তবে কিছু কিছু ভূত আছে যারা বাঁশবনে বাস করে। বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ লাগিয়ে এই ভূতেরা শব্দ করে।

তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী এই ভূতেরা মারাত্মক। এরা বাঁশগাছে ভর করে থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় কোন কাঁচা বাঁশ রাস্তার উপর পড়ে আছে, কেউ ডিঙিয়ে গেলে অমনি লাফিয়ে ওঠে, পথচারীর দুই পায়ের মাঝখানে লাফিয়ে উঠে বাঁশটি মানুষটাকে নিয়ে উপরে উঠে যায়। তারপর তাকে আছড়ে নীচে ফেলে দেয়।

ভূতপ্রেত : স্ত্রী-ভূত :

আমাদের পুরুষপ্রধান সমাজে এখনও পর্যন্ত পুরুষদের দাপট ও আধিপত্য। যতই নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা (Women lib) বলে নারীরা চিৎকার করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত পুরুষদের কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে নারীরা পতি পরম গুরু বলে পুরুষকে স্বীকার করে নিচ্ছে। মাতাল লম্পট স্বামীর অত্যাচার আজও নারীরা মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে। আমাদের সামাজিক গঠনটাই যে এইরকম—আজও নারীকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

মনুষ্য সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে এই যে উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ বর্তমান, ভূতেদের সমাজেও তদ্রুপ শ্রেণীভেদ বর্তমান আছে বলে মনে করা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পুরুষ ভূতেরা ভূতেদের সমাজে উচ্চস্থানে এবং মেয়ে ভূতেরা নিম্নস্থানে। জীবিত মানুষের সমাজের মতো এদের সমাজেও স্তরবিন্যাস আছে। ভূত নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন সেই সব ওঝা গুণিনদের মুখ থেকে এই ব্যাপারে বহু বিচিত্র কাহিনী শোনা গিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দিরবাজার থানার এক স্থানে 'ভূতের কাছারি' বলে একটি পোড়ো ঢিবি আছে। একদা সেখানে রাত্রে ভূতেদের কাছারি বসত। গুণিনস্থানীয় কিছু ব্যক্তি তা দেখেছিলেন। বর্তমানে পঞ্চায়েতে শিশু ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় ভূতেরা মুক্তি পেয়ে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। ওঝা-গুণিনদের এটাও একটা আক্ষেপের কারণ, তাদের রোজগার কমে যাচ্ছে।

যাইহোক, এই প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্য হল ভূতেদের সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ আছে, ভূতের কাছারি তার প্রমাণ। ওখানে বিচারক ভূত যেমন আছে, বিচারপ্রার্থী ভূতও তেমন আছে।

আবার গণ্যমান্য ভূতেদেরও ওখানে দেখা যেত। এখন ওঝা-গুণিনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী স্ত্রীভূত বা মেয়ে ভূত এবং ভূতেদের অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

পেত্নী : স্ত্রীভূতেদের সাধারণ শ্রেণী হল পেত্নী। সাধারণভাবে স্ত্রীলোক মরে গিয়ে ভূত হলে পেত্নী হয়। পেত্নীরা লোকালয়ের আশেপাশে থাকে। এদের মধ্যে হিংস্র চরিত্রের পেত্নী যেমন আছে, তেমনি ভালো চরিত্রেরও আছে। এমন কাহিনী শোনা গিয়েছে— মা মারা গিয়ে পেত্নী হয়েছে কিন্তু তার শিশুপুত্র বাস্তব সংসারে বিমাতার কাছে লাঞ্ছনা, জ্বালা-যন্ত্রনার মধ্যে অসহায়ভাবে আছে। পেত্নী-মা প্রতিদিন সকলের অলক্ষ্যে ছেলেকে দেখাশুনো করে যাচ্ছে। প্রিয়তমা পত্নী মারা গিয়ে ভূত হয়েও স্বামীর কাছে আসছে। কিছু কিছু পেত্নী আবার গাছে থাকতে ভালবাসে। শ্যাওড়া গাছ, পাকুড় গাছ, অশ্বত্থ গাছ প্রভৃতিতে এরা বাস করে। সেই সব গাছের তলায় কেউ গিয়ে খারাপ কাজ করলে, তাদের উপর ভর করে। অনেক সময় এই সব গাছ থেকে এদের প্রস্রাব করতে দেখা যায়।

গুয়েপেত্নী : গুয়েপেত্নী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীভূত। এরা ওঁছা টাইপের। এরা সব সময় খাই খাই করে। এদের গায়ে দুর্গন্ধ। এদের গায়ে বিষ্ঠার গন্ধ থাকে বলে এদেরকে গুয়ে প্রেত্নী বলে। যেমন, রাত্রে কোন স্থানে বিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া গেল অথচ আশে পাশে বিষ্ঠার কোন চিহ্ন নেই, তখনই ধরে নেওয়া যায় ওখানে গুয়ে পেত্নী রয়েছে। ওঝা বা গুণিন থাকলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

শাঁকিনী বা শাঁকচুন্নি : শাঁকচুন্নি হল প্রেতযোনিপ্রাপ্ত সধবা নারীর আত্মা। পেত্নী সধবা ও বিধবা—দুই-ই হতে পারে। কিন্তু শাঁকচুন্নি সাধারণতঃ সধবা স্ত্রীলোক মারা গিয়ে ভূত হলে তবে হয়। শাঁকচুন্নিদের মধ্যে অনেকে ভাল স্বভাবের হয়। এরা অনেকে অপকারের বদলে উপকার করে। গয়াতে পিণ্ড দিলে এদের মুক্তি ঘটে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হিন্দু লোকেদের ভূত যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য ধর্মের মানুষদের ভূতের কথা শোনা যায়। তবে মুসলমান ভূত আর খ্রীস্টান ভূত ছাড়া অন্য ধর্মের ভূতেদের কথা খুব একটা শোনা যায় না। মুসলমান ভূতেদের মধ্যে 'মামদো' হল প্রধান। আর খ্রীস্টান ভূতেদের মধ্যে পাদ্রীভূত হল উচ্চশ্রেণীর ভূত।

জীবিত অবস্থায় মানুষ যে কর্ম বা পেশায় জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পরেও অনেক সময় তার সেই সংস্কার থাকে। মৃত্যুর পরে এই সব মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হলে তারা প্রেত অবস্থায় সেইসব কর্ম করে। বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন পেশার ভূতও আছে। কথাটা হাস্যকর মনে হলেও এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে যাতে এই ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা ঘটনার কথা জানানো হচ্ছে যেটা একজন নামকরা গুণিনের মুখ থেকে শোনা। ঘটনাটা এইরকম— একবার এক চিকিৎসক মারা যান। তিনি খুব নামকরা ও প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ছিলেন। বহু রোগী ছিল তাঁর। তাঁর ছেলেও চিকিৎসক। বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে বাবার চেম্বারে বসতে লাগলেন এবং বাবার রোগীদের চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর রোগীর সংখ্যা কমতে শুরু করল, শেষে বাবার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—ছেলে এক কঠিন রোগীর চিকিৎসা করছেন। কিছুতেই রোগটা ধরতে পারছেন না—হঠাৎ কানের কাছে কে যেন রোগটার নাম বলে দিল এবং ওষুধের কথা বলে দিল। ছেলে সফলভাবে চিকিৎসা করে রোগীকে সারিয়ে তুললেন। এরপর থেকে তাঁর খুব নাম হল। আর চিকিৎসা করতে গিয়ে

যখনই আটকে যেতেন—তখনই কানের কাছে কেউ ঔষধের নাম বলে দিত। শেষে জানা গেল মৃত বাবার আত্মা ছেলেকে এইভাবে সাহায্য করত।

এইরকম বিভিন্ন পেশার ভূতেদের কাহিনী শোনা যায়। মোটামুটিভাবে যে সমস্ত পেশার ভূতেদের কথা জানা গিয়েছে তাদের বিবরণ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে:

শিক্ষক ভূত: জীবিত অবস্থায় এঁরা শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুর পরও ভূত হয়ে তাঁরা তাঁদের সেই অভ্যাস বা সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। কঠিন অঙ্ক বলে দিয়ে গিয়েছেন এমন ঘটনার কথা জানা যায়।

পুরুত ভূত: পুরুত ভূত বা পুরোহিত ভূতেদের কথা জানা যায়। এরা আসলে ব্রহ্মদত্যি। বেল গাছে বসে এরা মন্ত্রপাঠ করে—এমন শোনা গিয়েছে।

ওঝা বা গুণিন ভূত: ওঝা বা গুণিন ভূত খুব সাংঘাতিক ধরনের হয়। জীবিত অবস্থায় এরা ওঝা-গুণিন ছিল ভূত অবস্থায় এদের কোন গুণিন বা ওঝা সহজে কাবু করতে পারে না। গুণিনেরা যত মন্ত্র পড়ে, এরা তার কাটান করে দেয়। অনেক সময় ওঝা গুণিনেরা এদের কাছে পরাস্ত হয়ে যায়। তবে গুণিন ভূত অনেক সময় মানুষের উপকারও করে।

এছাড়া বহু বিচিত্র পেশার ভূতেদের কথা শোনা গিয়েছে, সেগুলো নিয়ে শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজন নেই।

ভূত, পেত্নী, ব্রহ্মদত্যি ইত্যাদি ভূতের নানা শ্রেণীবিভাগ যাই থাকুক না কেন—অশরীরী আত্মা বলে কিছু আছে তা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষকে ভূতে ধরে, তখন ওঝা গুণিন এসে ভাল করে দেয়। ভূতে ধরলে মানুষের শরীরের নানারকম উপসর্গ দেখা দেয় যেগুলোর সঙ্গে অনেক রোগের মিল আছে। আবার ওঝা-গুণিনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলোর সঙ্গে ডাক্তারি চিকিৎসার অনেক মিল আছে। সুতরাং কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমাদের চিরাচরিত সংস্কার বশে ভূত তথা প্রেত যোনি কিংবা অশরীরী আত্মার ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।

অনেকে বলেন ভূত প্রেত বলতে কিছু নেই—এগুলি মানুষের কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র, ওঝা-গুণিন নামের মানুষের চালাকি বা ভাঁওতাবাজি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বোকা মানুষদের ঠকিয়ে পয়সা উপার্জনের জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা নানারকম আজগুবি গল্প বানিয়ে প্রচার করে। যাতে মানুষের মনে এক ধরনের ভয় মিশ্রিত বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা ঘটে এবং গুণিনের সাহায্যে তাদের সুরাহা হয়। তখন মনের মধ্যে কোথা থেকে বিশ্বাসের বাতাস বয়ে আসে—হয়ত ভূত বলে, অশরীরী প্রেতাত্মা বলে কিছু আছে। এ ব্যাপারে আমার নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনার উদাহরণ দিচ্ছি— গ্রামের নাম এবং পাত্রপাত্রীর নাম বাদ দিয়ে ঘটনাটার বিবরণ দিচ্ছি।

এক বিবাহিতা মহিলার একবার ভূতে চাপে। মহিলার বয়স অল্প নব বিবাহিতা। তার দোষের মধ্যে সে রাত্রে খিড়কি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পুকুর ঘাটের কাছে আমগাছের তলায় প্রস্রাব করেছিল। ভোররাত্রি থেকে মহিলাটি গোঁ গোঁ করে বিছানায় মুখ ঘষতে থাকে এবং মুখ থেকে গাঁজলা বের হতে থাকে। মাঝে মাঝে দাঁত কপাটি লাগে। স্থানীয় ডাক্তার ডাকা হল, তিনি কিছুই করতে পারলেন না। একজন বড় ডাক্তার ডাকা হল তিনিও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। কেবল রোগীকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘুম পাড়াতে লাগলেন। দুদিন এইভাবে

কেটে যাওয়াব পর বাড়ীর সবাই মিলে পরামর্শ কবে একজন ভূতেব ওঝাকে ডাকা হল। তিনি এসে বোগীকে পবীক্ষা করে তাঁব প্রক্রিয়া শুরু করলেন। প্রথমে ঝাঁটা দিযে বেশ কবে পেটালেন তার পর হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধবলেন এবং গায়ের উপর মন্ত্রপূত সরষে ছুঁড়ে মাবতে লাগলেন। রোগীও বিছানা থেকে উঠে চক্ষু বক্তবর্ণ কবে আলুথালু বেশে চুল এলিয়ে ওঝাকে তেড়ে মাবতে গেল। এইভাবে কিছুক্ষণ ওঝা ও রোগীর মধ্যে যুদ্ধ চলাব পর মহিলাটি শান্ত হয়ে খোনা সুরে বলতে লাগল যে সে একজন মামদো ভূত। দীর্ঘদিন ধরে আমগাছে বাস করছে। সে কোনদিন কারোর অনিষ্ট করেনি। ফলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। কিন্তু ঐ মেয়েটি গাছের তলা অপবিত্র করায় তার খুব রাগ হয় তাই সে মেয়েটিকে চাপে। তখন ওঝা তাকে চলে যেতে বলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে। মামদো তা স্বীকার কবে নেয়। তখন ওঝা ছেড়ে চলে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আমগাছেব একটা ডাল ভেঙে দিতে বলে এবং শাস্তিস্বরূপ জলভর্তি একটি ঘড়া দাঁত দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে বলে। রুগ্ন শবীবে মহিলাটি জলভর্তি একটি ঘড়া দাঁত দিয়ে কিছুদূব বয়ে নিয়ে যায় তাবপর অজ্ঞান হয়ে যায়। একটু পবে আমবা বাইবে এসে দেখি আমগাছের একটি ডাল ভাঙ্গা।

ঘটনাটির মধ্যে ওঝার কারসাজি কতটা আছে জানি না। কিন্তু ডাক্তার যে বোগ সারাতে পারে নি ওঝার হাতে ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে সেই রোগ সেবে গেল এবং একজন অসুস্থ রুগ্ন মেয়ে দাঁত দিয়ে জল ভর্তি একটি ঘড়া বয়ে নিয়ে গেল এটাতেই সংশয় জাগে। তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় ওই মহিলাটির হয়ত সত্যই ভূতে চেপেছিল এবং ওঝা-গুণিনরা সত্য সত্যই ভূত ছাড়াতে পারে।

অনিষ্টকারী বা ক্ষতিকারক মন্ত্র :

ওঝা-গুণিন শ্রেণীব মানুষবা যাদেরকে আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকাবী বলে জানি—তারা ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যেমন মানুষেব কল্যাণ করে, সমাজেব উপকার করে, তেমনি এই মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ক্ষতিও করে। সুতরাং ওঝা-গুণিনের মন্ত্রতন্ত্রের দুটি দিক আছে—একটি ইষ্টকব দিক অন্যটি অনিষ্টকর দিক। পূর্বের আলোচনায় মন্ত্র-তন্ত্রের কল্যাণকর, ইষ্টকর দিকটি আলোকিত হয়েছে। এবার মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষতিকারক অনিষ্টকর দিকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে আদিম মানুষের অন্তরে অতি প্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে যে ভীতি ছিল, দৈনন্দিন জীবনের রোগ, ব্যাধি, জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করতে না পারার যে দুঃখ ছিল, প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ সূত্র সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা ছিল তা থেকেই তাদের মনে অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ধ্যানধারণার উৎপত্তি ঘটেছিল। কিছু মানুষ এই অদৃশ্য শক্তিকে আয়ত্তে আনার কৌশল ফলে জানার সমাজে তাদের মান-সম্মান, প্রভাব-পতিপত্তি বৃদ্ধি পেল এবং মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে তাদের শরণাপন্ন হল। সমাজে এরা ওঝা, গুণিন, যাদুকর, জানগুরু প্রভৃতি নামে পরিচিত ও শ্রেণীভুক্ত। একথা পূর্বে বলা হয়েছে, অদৃশ্য শক্তিকে করায়ত্ত করার উপায় হল এঁদের মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ। এই মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে এঁরা মানুষের রোগ-ব্যাধির উপশম করলেন, বিপদ-আপদ দূরে সরিয়ে দিলেন, দুঃখ দুর্দশার হাতে থেকে মানুষকে মুক্ত করলেন এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের জীবনকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। ফলে সমাজে এঁদের বিশেষ শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত হল। আদিমকাল থেকে এই ওঝা-গুণিন শ্রেণীর মানুষদের শ্রদ্ধার আসন আজও অটুট আছে।

কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এই গুণিন শ্রেণীর মানুষরা যখন অদৃশ্য শক্তিকে করায়ত্ত করে ফেলল তখন ক্ষমতার অহঙ্কার তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলল এবং তাঁদেরকে আদর্শচ্যুত করে বিপথে চালিত করল। যে মন্ত্রশক্তি মানুষের কল্যাণ ব্যবহৃত হত যা দিয়ে রোগ ব্যাধি, আপদ বিপদ দূর করা যেত, দুষ্ট শক্তিকে প্রতিহত করা হত—তাকে মানুষের অনিষ্ট করার কাজে ব্যবহার করা শুরু হল।

ভাল করার প্রবণতা ও মন্দ করার প্রবৃত্তি মনের এই দুইভাব মানুষের সহজাত। যে মন মানুষের দুঃখে বেদনাকীর্ণ হয়ে পড়ে, মানুষের প্রতি ভালবাসায়, মমতায় আপ্লুত হয়ে যায়, জাহ্নবীধারার মত শত সহস্র বাহু মেলে আর্তকে রক্ষা করতে ছুটে আসে, সেই মনই মানুষের বুকে হিংসার বিষাক্ত ছুরি বসায়, জীবনের আলোকিত পথকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। মনের এই কুপ্রবৃত্তিকে দূর করে কল্যাণকর আদর্শবোধে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হল মনুষ্যত্বের সাধনা। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, উন্নত সংস্কৃতি চর্চা এবং উত্তম পরিবেশ। ওঝা-গুণিন শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিচার করলে দেখা যায় মূলতঃ সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষরাই এই মন্ত্রতন্ত্র, গুপ্তক্রিয়াকলাপ (occultism) চর্চার ধারক ও বাহক। বিশেষ করে এই রহস্যবিদ্যা সংক্রান্ত নানাবিধ চর্চার ধারা আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বয়ে চলে আসছে। এটা তাদের বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য। আমরা একে অন্ধবিশ্বাস কিংবা কুসংস্কার যাই বলি না কেন, আদিবাসী সমাজের মানুষ আজও তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রকে তাদের রোগব্যাধি নিরাময়ের দুঃখ দুর্দশার অবসানের বিপদ-আপদ দুর্বিপাকের নিরসনের প্রকৃত উপায় বলে মনে করে। ওঝা-গুণিন, জানগুরুরা মন্ত্র-তন্ত্রকে যেমন মানুষের কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে, তেমনি তারা মানুষের অকল্যাণ ক্ষতি বা বিপদ ঘটানোর লোভ সামলাতে পারে না। বিশেষ করে সমাজের কিছু দুষ্ট লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে অপরের ক্ষতি করতে এই সব ওঝা-গুণিনদের ব্যবহার করে। তাছাড়া মূলতঃ সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠী থেকে এই সব ওঝা-গুণিনদের উদ্ভব বলে এদের মানসিক গঠন উচ্চমানের হয় না সহজেই প্রলোভনের শিকার হয়ে মানুষের অকল্যাণে নিয়োজিত হয়।

অশুভ শক্তি তথা দুষ্ট শক্তির ধারণা সমাজের আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। মন্ত্রশক্তির দ্বারা এই দুষ্টশক্তিকে আয়ত্ত করার উপায় যখন মানুষ জানল, তখন এই দুষ্টশক্তিকেও নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করা শুরু করল। মানুষের ক্ষতি করতে মানুষকে জব্দ করতে মানুষের অমঙ্গল ঘটাতে এইসব দুষ্টশক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল। এইভাবেই মন্ত্রতন্ত্রের অনিষ্টকর দিকটির প্রকাশ ঘটল। মন্ত্রশক্তিকে অবৈধ, অসামাজিক, অমঙ্গলকর প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আমরা বৈদিক যুগে পাই। মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করে যেমন সাংসারিক দুঃখ দুর্দশা, শারীরিক জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি দূর করা যায়, তেমনি মন্ত্রশক্তিকে অন্যায় অবৈধ কাজে ব্যবহার করা যায় তার উদাহরণ আছে অথর্ববেদে। অথর্ববেদে দেখা যায়—মন্ত্রশক্তি ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ তথা শত্রুকে জব্দ করা হচ্ছে কিংবা কোন বাঞ্ছিত কামিনীকে নিজের বশে আনার জন্য মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে এবং সেজন্য তার গৃহের পরিবারবর্গকে নিদ্রিত করা হচ্ছে মন্ত্রের দ্বারা যাতে কাজে বাধা না ঘটে। ঐ বাঞ্ছিত কামিনীর সঙ্গে সহবাস করে তৃপ্তিলাভের জন্য মন্ত্রেরও প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। আদিযুগের বাংলা সাহিত্য চর্যাপদেও এমন ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়। পরপুরুষের প্রতি আসক্ত পুত্রবধূ প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্বশুরের নিদ্রাকর্ষণ করছে। আমাদের দেশে চোরেরা চুরি করার জন্য 'নিদালি' মন্ত্রের প্রয়োগ করে। এইসব তথ্য থেকে

এটাই প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রের অবৈধ প্রয়োগ প্রাচীনকাল থেকে আজও চলে আসছে। এই 'নিদালি' মন্ত্রের ব্যাপকভাবে প্রয়োগের কথা অথর্ববেদে ও পাওয়া যায়।

অথর্ববেদে বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের এই অবৈধ প্রয়োগের কথা তথা মন্ত্র-তন্ত্রের অনিষ্টকর দিকটির ব্যাপক উল্লেখ থেকে এটাই বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে মানুষ এ বিষয়ে সচেতন ছিল আজও সচেতনভাবে মন্ত্রকে অনিষ্টকর কাজে ব্যবহার করছে। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এই জাতীয় মন্ত্রের কদর বেশি। কারণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কু-অভিলাষ পূরণ করার জন্য পাপ বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তারা এই অবৈধ উপায়ের সাহায্য নেয়। বহু মানুষের গড়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের অবস্থান। সেখানে কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন কিছু মানুষ তো থাকবেই। তারাই এই জাতীয় মন্ত্রের সাহায্য নেবে এবং ওঝা-গুণিনের কদর এদের কাছেই বেশি। আর ওঝা-গুণিনদের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ সচ্ছল হয় না বলেই এরা সহজেই অর্থের বশ হয়ে পড়ে এবং মানুষের ক্ষতিকর কাজে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার করতে পিছপা হয় না।

এখন যে সমস্ত অনিষ্টকর কাজে ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার করা হয় তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে—

(১) পুকুরের মাছ নষ্ট করা : মন্ত্রের সাহায্যে পুকুরের মাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। দেখা গেল হঠাৎ পুকুরের মাছ পচে যাচ্ছে কিংবা জ্যান্ত মাছ নরম/থলথলে হয়ে গেছে। হঠাৎ পুকুরের মাছ একসঙ্গে মরে গেল কিংবা মাছের গায়ে বিষাক্ত ঘা হয়ে গেল। অনেক সময় মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিষ প্রয়োগও করা হয়। এছাড়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার দেখা যায়-পুকুর ভর্তি মাছ যাকে বলা যায় জলে মাছে সমান—হঠাৎ দেখা গেল পুকুরে একটি ও মাছ নেই, কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, তা কেউ জানে না। অনেক সময় মন্ত্র ব্যবহার করে মাছের রঙ ও আকার পরিবর্তন করা হয়।

(২) গাছের ফল নষ্ট করা : ওঝা-গুণিনদের সাহায্যে গাছের ফল, সব্জি প্রভৃতি নষ্ট করা হয়। কারো গাছে হয়ত প্রচুর আম হয়েছে, কাঁঠাল হয়েছে, লিচু ফলেছে, কলার বড় বড় কাঁদি পড়েছে ইত্যাদি। সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন আম পচে পচে পড়ে যাচ্ছে, গাছে থেকে কাঁঠাল পচে যাচ্ছে, কলার কাঁদি বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে/পচে যাচ্ছে—কিংবা আমগাছ, কাঁঠালগাছ, কলাগাছ—শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। কারো এক মাচা লাউ ফলেছে—হঠাৎ দেখা গেল মাচাভর্তি লাউ গাছ শুকিয়ে মরে গেল। এইভাবে গাছের ফলপাকড় নষ্ট করা হয়।

(৩) গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করা : মন্ত্রের সাহায্যে গৃহপালিত পশুর নানাবিধ ক্ষতি করা হয়। যেমন—দুধেল গাই-এর বাঁটের দুধ হঠাৎ শুকিয়ে যাওয়া, ছাগলের দুধ হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া, হাঁস মুরগী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া, গরু-মহিষের হঠাৎ রোগ হওয়া ও মারা যাওয়া। এমনও দেখা গিয়েছে এক গোয়াল গরু এক সঙ্গে মারা গেল, এক পাল হাঁস মারা গেল, পোল্ট্রি ভর্তি মুরগীর সকলের এক সঙ্গে অসুখ হল—পরে মারা গেল। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল—কুকুরের ডাক বন্ধ হয়ে যাওয়া। তখন কুকুর কিছুই খেতে পারে না, খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল থাকা সত্ত্বেও মুখ খুলতে পারেনা। সাধারণতঃ চোরেরা চুরি করার সুবিধার জন্য গুণিনের সাহায্যে কিংবা নিজেরাই মন্ত্রের দ্বারা কুকুরের মুখ বন্ধ করে।

(৪) মাঠের শস্যের ক্ষতি করা : মন্ত্রের সাহায্যে মাঠের শস্যের ক্ষতি করা হয়। ধান, গম, সরষে, কলাই প্রভৃতি শস্যে হঠাৎ পোকা লেগে গেল, শুকিয়ে গেল, গাছ শুকিয়ে মারা গেল।

পাশের ক্ষেতে এইরকম কিছুই ঘটল না। দেখা গেল যত ধান ফলেছে তার সবই চিটে বা আকড়া হয়েছে—একটাও পুষ্ট হয়নি। তখনই বুঝতে পারা যায় মন্ত্রের সাহায্যে কেউ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

(৫) স্ত্রীলোকের বুকের দুধ নষ্ট করা: মন্ত্রের দ্বারা মায়ের বুকের দুধ নষ্ট করে দেওয়া হয়। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ডাকিয়ে, শত চেষ্টা করেও বুকের দুধ ফিরিয়ে আনা যায় না। তখন আবার ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হতে হয়। সেই ওঝা বা গুণিন যদি শক্তিশালী ওস্তাদ হয় তাহলে পূর্বের যে গুণিন বুকের দুধ নষ্ট করেছে তার মন্ত্রকে কাটান করে তবে বুকের দুধ ফিরিয়ে আনতে পারবে।

(৬) শিশুর উপর কুদৃষ্টি দেওয়া: সুন্দর স্বাস্থ্যবান হাসিখুশি দেখতে শিশুকে মন্ত্রের সাহায্যে রোগা, রোগগ্রস্ত, কুৎসিৎ করে দেওয়া হয়। যে শিশুটি একদিন আগে পর্যন্ত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ছিল—হঠাৎ দেখা গেল সে কোন অজানা রোগে ভুগছে—ডাক্তার ও তার কিছু করতে পারে না। এই ভাবে রোগে ভুগতে ভুগতে জীবন্মৃত হয়ে যায় কিংবা শেষে মারা যায়।

(৭) মানুষের শরীরের ক্ষত বিষাক্ত করে দেওয়া: অনেক সময় দুষ্টপ্রকৃতির গুণিনরা মানুষের ক্ষতস্থানকে মন্ত্রের সাহায্যে বিষাক্ত করে দেয়। হাজার চেষ্টা করেও ডাক্তার সেই বিষাক্ত ঘা সারাতে পারে না। একে 'বোকোসে খাওয়া' বলে।

বোকোস: যে সমস্ত গুণিনরা স্ত্রীলোকের বুকের দুধ নষ্ট করে, শিশুর উপর কুদৃষ্টি দেয়, মানুষের শরীরের ঘা বিষাক্ত করে দেয়—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ তাদেরকে 'বোকোস' বলে। শব্দটি সম্ভবত 'Bogus' শব্দ থেকে এসেছে। মানুষের কোন কিছু ভাল দেখলে এদের লোভ/হিংসা হয়—তখন এরা লোভ সামলাতে না পেরে মন্ত্রের সাহায্যে তার ক্ষতি করে। যেমন—মাচা ভর্তি কিংবা ঘরের চাল ভর্তি সুন্দর ঢলঢলে লাউ গাছে লাউ ফলেছে। তা দেখে কোন দুষ্ট গুণিনের লোভ হল—তখন সে মন্ত্রের সাহায্যে লাউ গাছের রস শোষণ করে নিল। ফলে গাছটি শুকিয়ে গিয়ে মারা গেল। আমাদের দেশে ডাইনি বা ডান জাতীয় নারীপুরুষ আছে। 'বোকোস'-এর সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। 'বোকোস'রা সাধারণতঃ তন্ত্র-মন্ত্র জানা ওঝা বা গুণিন হয়, আর 'ডাইনি' বা 'ডান'রা মন্ত্র জানতে পারে আবার নাও জানতে পারে। এদের দৃষ্টিটাই খারাপ।

অন্যান্য ক্ষতিকারক মন্ত্র: একথা সর্বজনবিদিত যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তি ও কু-প্রবৃত্তি দুইই বর্তমান। প্রকৃত শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সু-প্রবৃত্তির উদ্বোধন ঘটানোই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার প্রভাবে যদি কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহলে মানুষের জীবনে নেমে আসে সর্বনাশ। মানুষের ভিতরের পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফল হয় বিপরীত। যে জীবন মানুষের কল্যাণের জন্যে সুন্দর জগৎ গড়ার জন্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে—পশুত্বের প্রভাবে তা হয়ে ওঠে বিষময়, কদর্য, কুৎসিৎ, অভিশপ্ত—মানুষের অমঙ্গল প্রচেষ্টায় সতত নিয়োজিত।

মানুষের জীবনে ষড়রিপুর প্রভাব অপরিসীম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য মানুষকে কুপথে ও বিপথে চালিতকরে। গীতা, উপনিষৎ, পুরাণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতিতে এ নিয়ে বহু আলোচনা আছে। বহু মানুষ বহুকাল ধরে মানব জীবনে ষড় রিপুর প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন। তবে রিপুর প্রাবল্যে সুন্দর জীবন কদর্যতায় ভরে ওঠে এ বিষয়ে সবাই একমত। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হল এই ষড় রিপুর প্রাবল্যজনিত কুফলের কথা সকলের

জানা থাকা সত্ত্বেও ষড বিপুব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত কবতে অনেকেই সচেষ্ট নয—উপবন্তু ষড বিপুব আবাধনায অনেকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত। কিছু কিছু ওঝা গুণিনেব মন্ত্র তন্ত্র এই যড বিপু সাধনায, প্রথম বিপু চবিতার্থতায এবং কুপ্রবৃত্তিব জাগবণে সাহায্য কবেছে, কবছে এবং ভবিষ্যতেও কববে।

ষড বিপুব প্রথম বিপু হল কাম। এই কামবাসনা চবিতার্থ কবতে মন্ত্র-তন্ত্রেব সাহায্য নেওযা হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে। অথর্ববেদে বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষযে উল্লেখ আছে। সম্মোহন, বশীকবণ প্রভৃতি এই পর্যাযেব। নিজ স্ত্রী, পব স্ত্রী, নিজ স্বামী, পব পুরুষ প্রভৃতিকে বশ কবে নিজেব অভিলাষ চবিতার্থ কবাব ইতিহাস বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বর্তমানে গুণিন, জানগুরু প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ এই বিষযে ফলাও কাববাব কবছেন। এছাডা মাবণ, উচাটন প্রভৃতি মন্ত্রেব দ্বাবা মানুষেব ক্ষতি, অঙ্গহানি, জীবননাশ প্রভৃতি কবে থাকেন দুষ্ট মন্ত্র ব্যবসাযীগণ।

এখন মন্ত্রতন্ত্রেব সাহায্যে যে যে ব্যাপাবে মানুষেব ক্ষতি কবা হয তাব আবও কিছু বিববণ দেওযা হচ্ছে—

(১) মন্ত্রতন্ত্রেব সাহায্যে স্ত্রীলোককে বশীভূত কবা ও কামবাসনা চবিতার্থ কবা।

(২) মন্ত্রেব সাহায্যে মানুষেব বৈষযিক বিষযে ক্ষতি কবা। যেমন—সম্পত্তি নাশ, অর্থনাশ, মূল্যবান বত্নাদি হবণ প্রভৃতি।

(৩) তন্ত্র-মন্ত্রেব সাহায্যে মানুষেব অঙ্গহানি, মানুষকে জড অথর্ব কবে দেওযা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবে দেওযা; অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি কবে দেওযা।

(৪) মন্ত্রেব সাহায্যে মানুষেব জীবন হানি। বাণ মাবা প্রভৃতি।

(৫) মন্ত্রেব সাহায্যে ও শেকডবাকড জাতীয ঔষধেব সাহায্যে মানুষেব শবীবে কঠিন, দুবাবোগ্য ব্যাধি ঢুকিযে দেওযা।

(৬) মন্ত্রেব সাহায্যে ঘুম পাডিয়ে চুবি কবা—নিদালি মন্ত্র।

মন্ত্র-তন্ত্রেব ইষ্টকব ও অনিষ্টকব দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কবা হল। এখন ঝাড, ফুঁক, তুক-তাক প্রভৃতিব প্রক্রিযা, কৌশল, পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা কবা হবে। সেই সঙ্গে মন্ত্রগুলি এবং সঙ্গে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিববণ দেওয়া হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ কবা হযেছে, তা হুবহু তুলে দেওযা হবে।

ভাষা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য : মন্ত্র-তন্ত্র ও তাব প্রযোগ পদ্ধতিব বিববণ দেওযাব পূর্বে কযেকটি বিষয়ে আলোচনা কবা দবকাব। পূর্বে বলা হয়েছে এবং একথা সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত যে মানুষেব মঙ্গলেব জন্য কিংবা মানুষেব অনিষ্ট কবতে যেজন্যেই হোক মন্ত্রতন্ত্রেব ব্যবহাবেব মূলে মানুষেব বিশ্বাস ও সংস্কাব বিদ্যমান। এই বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস এবং সংস্কাবকে কুসংস্কাব বলা যায়। কিন্তু এই সংস্কাব বিশ্বাস এত গভীব ও দৃঢ় যে হাজাবো যুক্তি তর্ক দিয়ে, উদাহবণ দিয়ে, বিশ্লেষণ কবে মন্ত্রেব অসাবতা প্রমাণ কবা যাবে না। দীর্ঘকাল ধবে যে সংস্কাব-বিশ্বাসকে মানুষ সযত্নে লালন কবে আসছে আজকেব দিনে শত চেষ্টা কবেও সে সম্বন্ধে মানুষকে নিবৃত্ত কবা যাবে না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ কবা হয়েছে তাব ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় সেগুলি মামুলি ও ভুলে ভবা। এই ভাষার যে কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকতে পারে, তা কিছুতেই মানা যায় না। মন্ত্রগুলিব গঠন অসংলগ্ন, বাক্যগুলিতে পবিপূর্ণ অর্থের প্রকাশ নেই, এমন কি অশুদ্ধ বাক্যও প্রচুব আছে। কোথাও কোথাও অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যে মন্ত্রগুলি পদ্যের আকারে আছে, তাদেব ছন্দেব মিল

তো নেইই, উপরন্তু সেগুলি অসংগতিপূর্ণ। গদ্যমন্ত্রগুলি আরও মারাত্মক—ছেদচিহ্ন বলে কিছু নেই, শব্দগুলির পারস্পরিক অর্থও সুসংবদ্ধ নয়। এই ধরনের মন্ত্রের যে কি শক্তি থাকতে পারে তা বোঝা যায় না।

মন্ত্রগুলির মধ্যে কোন ভণিতা দেখা যায় না। ফলে কে রচয়িতা তা জানা যায় না। তেমনি কবে এগুলি রচিত হয়েছে তাও বোঝা যায় না। এগুলির উৎপত্তি কোথায়—তাও কিছু বলা যায় না। এগুলির জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে কি না—সে সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যখন এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, তখন যে গুণিনের কাছ থেকে এগুলি পাওয়া গিয়েছে—তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরু অন্য এক গুণিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। গুরুকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন—তিনিও তাঁর গুরুর কাছ থেকে পেয়েছেন—এইভাবে খোঁজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ প্রথম গুণিন যে কোথায় হারিয়ে যায় তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি দুর্বোধ্য। এগুলির প্রকৃত অর্থ কি তা বোঝা যায় না। এমন হতে পারে শব্দগুলি প্রথম দিকে সঠিক ও যথার্থ অর্থপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকের হাতে পড়ে সেগুলি বিকৃত হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, শব্দগুলি অচেনা হয়ে গেছে। এগুলির সঠিক রূপ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

মন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু দেবদেবীর উল্লেখ আছে। হিন্দু দেবদেবী ছাড়া মুসলমান পীর, পয়গম্বর ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কোন দেবদেবীর আদেশে বা আজ্ঞায় মন্ত্রগুলি রচিত এবং তাঁদের আদেশে এগুলি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যাপারটিকে 'আদেশকাড়া' বলে। অর্থাৎ কোন দেবদেবীর আজ্ঞায় এগুলি ব্যবহৃত না হলে 'মন্ত্রের শক্তির স্ফূরণ ঘটবে না'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষায় যাকে বলা হয় মন্তর ফোরে না। এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে আছেন শিব/মহাদেব/মহেশ্বর, পার্বতী, মনসা, রাম-সীতা, বীর হনুমান/পবন নন্দন, হাড়ি ঝি চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, মাকালী, কাঁউরের কামিক্ষে মা, গণেশ, লক্ষ্মী মা, বাল্মীকি মুনি, গড়ুর প্রভৃতি। আবার মুসলমান পীর, ফকির, মহম্মদ; বৈষ্ণব ষোড়শ গোপিনী, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির আজ্ঞাও আছে।

অধিকাংশ মন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি ভুলে ভর্তি। কিছু মন্ত্রকে কোন মন্ত্রের বই থেকে টোকা বলে মনে হয়। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণতগত দোষ প্রবল। মন্ত্রগুলির লেখা প্রাচীন। আগেকার দিনে দন্ত্যন-এর নীচে ফুটকি দিয়ে ল-কার বানানো হত। এইগুলির মধ্যে অনেক মন্ত্রে এইরকম অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা প্রাচীন বাংলা অক্ষরের মত।

যদিও মন্ত্রগুলির সঠিক উৎপত্তিস্থল জানা যায় না। তবুও এগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একথা মোটামুটিভাবে বলা যায়। কারণ মন্ত্রের ভাষা বিচার করে দেখা গিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্যবহৃত কথ্যভাষার প্রচুর লক্ষণ এদের মধ্যে বিদ্যমান। বাক্ব্যবহার, শব্দবিন্যাস, ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতি বিচার করে এগুলিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সবশেষে এই কথা বলা যায় এগুলি যেখানে উৎপত্তি হোক না কেন—এগুলি যারা রচনা করেছিল, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার জ্ঞান ছিল কম। কারণ মন্ত্রগুলির রচনারীতি, ভুল শব্দ ব্যবহার, অসংলগ্ন বাক্যবিন্যাস এই কথা বলে দেয়। সমাজে গুরুত্বর শ্রেণীর কিছু মানুষ মানুষের অজ্ঞানতার অসহায়তার বোকামির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ পরিপুষ্টির জন্য 'মন্ত্র' নামক কিছু অপুষ্ট

পদ। কিংবা বিকৃত গদ্য সৃষ্টি করেছিল এবং একই সঙ্গে কিছু দেবদেবীর নাম জুড়ে দিয়ে মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল। অসহায় মানুষ হাতের কাছে বিপদ পরিত্রাণের এমন সহজ উপায় পেয়ে নিশ্চয় প্রভাবিত হয়েছিল সেদিন। আজও তার ধারা বয়ে চলেছে। ওঝা-গুণিন-জানগুরুরা মানুষের বিশ্বাসের পুঁজি ভাঙিয়ে আজও চুটিয়ে ব্যবসা করে চলেছে।

একটা কথা খুবই প্রচলিত আছে যে যার তার হাতে মন্তর ফোরে না। অর্থাৎ যে কোন লোকের দ্বারা মন্ত্রশক্তির যথার্থ স্ফূরণ ঘটানো সম্ভব নয়। মন্ত্রশক্তির স্ফূরণ ঘটানোর জন্য ওঝা গুণিনদের কিছু ব্যক্তিগত গুণ থাকা দরকার। যেমন গুণিন নামক ব্যক্তি ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী প্রভৃতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। যিনি কথার দ্বারা মানুষকে বশীভূত করতে পারেন, সেইরকম লোক গুণিন হলে মন্ত্রশক্তির যথার্থ স্ফূরণ ঘটাতে পারেন। একথা ঠিক মন্ত্র তো কতকগুলি শব্দ তথা ধ্বনির সমষ্টি— তা সে শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ হোক— শব্দ বা ধ্বনির মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে। আবার এই ধ্বনিসমষ্টির প্রয়োগের উপর সফলতা/বিফলতা নির্ভর করে। যে ধ্বনি সমষ্টি মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে সেই ধ্বনিকে সুর তাল সহযোগে ব্যবহার করে মানুষের মনকে মোহিত করা যায়। তাই ভাল গুণিনকে মন্ত্রের ধ্বনি-প্রয়োগের ব্যাপারটাকে ভালভাবে রপ্ত করতে হয়। বাজারে অনেক মন্ত্রের বই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বই কিনে কেউ মন্ত্রের ব্যবহার করলে কোনই ফল হয় না। বাজারের বইয়ে মন্ত্র থাকে ঠিকই তবে যথাযথ প্রয়োগ-কৌশলের কথা থাকে না, যেটা গুণিনরা গুরু ধরে শিক্ষা করেন।

মন্ত্রের প্রয়োগ কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনদের আকার-আকৃতি ও বেশবাসেরও কিছুটা ভূমিকা থাকে। গুণিন জানগুরুরা মানুষের মনে ভয়, শ্রদ্ধা সমীহ জাগানোর জন্যে নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা আলাদাভাবে সজ্জিত করেন। দাড়ি, গোঁফ, মাথায় জটা, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, রক্তবর্ণ কিংবা গৈরিক পোশাক, কমণ্ডলু, মড়ার মাথার খুলি, বাঁকানো লাঠি, লোহার চিমটা, ভস্ম, হোম-ধুনি, কারণ বারি, প্রভৃতি ব্যবহার করে নিজেদেরকে ভয়ঙ্কর কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ রূপে প্রতীয়মান করতে চান। এর ফলে সাধারণ মানুষ কিছুটা তো প্রভাবিত হয়ই।

মন্ত্রের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনরা কিছু কিছু দ্রব্য ব্যবহার করেন। এই দ্রব্যাদিরও কিছু ক্রিয়া থাকে। যেমন ভূতে পাওয়া রোগীকে হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরা হয়। এই হলুদ পোড়ার যে ক্রিয়া তাতে অনেক কাজ হয়। কিংবা সাপে কাটা রোগীকে কাঁচা দুধ, শ্বেত আকন্দর আটা খাওয়ানো হয়। এগুলি বিষনাশক। সুতরাং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যগুণেরও ভূমিকা থাকে।

ওঝা-গুণিনের মন্ত্রশক্তি কতটা সত্য বা মিথ্যা এ বিচারে না গিয়ে বলা যায় গ্রামে গঞ্জের মানুষ আজও অসহায়, তাদের অর্থ কম, সম্বলও অল্প—এই সব অসহায় মানুষের বিপদে আপদে এক ডাকে যারা পাশে দাঁড়াতে পারে, তারা যাই হোক না কেন তাদের একটা বড় পরিচয় হল—ওরা মানুষের বন্ধু। মন্ত্রশক্তির অসারতার বিচার সেখানে অনেক পিছনে।

জলপড়া, তেলপড়া, নুনপড়া ইত্যাদি মন্ত্র : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোক, বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদে ঝাড় ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। একথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এগুলির ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বিশদ, বিবরণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোথায়, কখন, কিভাবে, কেমন করে এই মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়, তাদের চেহারাই বা কিরকম এবং মন্ত্রগুলির ভাষাগত দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

ওঝা, গুণিন, জানগুরুগণ মন্ত্রের যে প্রয়োগ ঘটান তার কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই প্রয়োগপদ্ধতির আবার বিভিন্ন নাম আছে। এই নামগুলি হল মন্ত্রগুলির চিনে নেবার উপায়। ব্যক্তিবিশেষের দুরবস্থা, দুর্ভাগ্য, দুঃখ দুর্দশা, বিপদ-আপদ ইত্যাদি নিরশনের জন্য হোক কিংবা রোগ নিবারণের জন্য হোক, ওঝা গুণিনগণ প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র আওড়াবেন এবং নির্দিষ্ট করণীয় কর্ম করবেন, তবেই সেই কাজ সফল হবে। নতুবা মন্ত্রের কোন কার্যকারিতা পাওয়া যাবে না। যেমন, সাপে কাটার মন্ত্র নিয়ে ভূত ছাড়াতে গেলে কোন কাজ হবে না কিংবা জ্বর সারানর জন্য নির্দিষ্ট ঝাড়ন দিয়ে বশীকরণ করা যাবে না। তাই মন্ত্রগুলি চেনবার জন্য প্রয়োগ পদ্ধতির নাম জানা প্রয়োজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সাধারণতঃ যে কাজের জন্য যে মন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

জলপড়া : জলকে মন্ত্রপূত করা হয়। এই মন্ত্রপূত জল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার রোগ সারান হয়। তবে এই জল সংগ্রহ করবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। পুকুর, খাল, বিল কিংবা নদীর জল হলে ভাল হয়। সকালে শুদ্ধ কাপড়ে বাসি মুখে পরিষ্কার ঘটি, জগ প্রভৃতি পাত্রে জল সংগ্রহ করতে হবে। সেই জলের মধ্যে কোন ধাতুকে ডুবিয়ে নিতে হবে। সাধারণভাবে লোহার তৈরী কোন জিনিস ঐ জলে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ঐ জল মন্ত্রপূত করা হয়। ঐ জল পড়ায় পেটের রোগ, জ্বর, ব্যথা বেদনা, বাত, পুড়ে যাওয়া, বাতাস লাগা, প্রভৃতি সারান হয়। ভূত, প্রেত, ডাইনি, যোগিনী, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, জিন, পরী প্রভৃতি চাপলে ছাড়ান হয়। বিভিন্ন প্রকার বাণ মারার কাটান দেওয়া হয়। নজর দোষের কাটান প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন গুণিনের জল পড়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার। সাধারণতঃ গুণিনগণ তিনবার মন্ত্র পড়ে জলে তিনটি ফুঁ দেন তারপর সেই জল রোগীকে খেতে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও এই পড়া জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ওঝা-গুণিনদের প্রাথমিক এবং প্রধান অস্ত্র হল জলপড়া। যে গুণিন খুব মন্ত্র কম জানে, সে অন্তত জলপড়াটা শিখে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জল পড়া ব্যবহার করা হয়। সর্ব ঘটে যেমন কাঁটালী কলা, তেমনি প্রায় সর্ব রোগে সর্বক্ষেত্রে জল পড়া।

তেল পড়া : তেলকে মন্ত্রপূত করার নাম তেল পড়া। এই তেল সরষের তেল কিংবা নারকেল তেল হতে পারে। সরষের তেল হোক কিংবা নারকেল তেল হোক সব তেলই খাঁটি হওয়া দরকার। সেইজন্য অনেক সময় সরাসরি কলুর বাড়ী থেকে তেল আনতে হয়। যেমন—পোড়া ঘায়ের তেল পড়ার জন্য শনিবার অথবা মঙ্গলবার কলুর বাড়ী থেকে এক ডাকে সরষেরতেল এনে তাকে তিনবার মন্ত্র পড়ে তবেই তেলকে মন্ত্রপূত করতে হয়।

ফিক বেদনা, গরল রোগ, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, নালি ঘা, মচকান বেদনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্যথা-বেদনা ও রোগের জন্য তেলপড়া ব্যবহার করা হয়।

নুন পড়া : লবণ বা নুনকে মন্ত্রপূত করার নাম নুন পড়া। নুনপড়াতে সাধারণতঃ সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করা হয়। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও বৃদ্ধা—এই তিনটি আঙুলের সাহায্যে লবণ সংগ্রহ করে পাত্রে রেখে তাতে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। পেট কামড়ান, বদহজম, ফোস্কা ঢেকুর ওঠা, অম্ল, বমি প্রভৃতি অসুখ ও অন্যান্য ব্যাপারে নুনপড়া ব্যবহার করা হয়।

চুন পড়া : চুনকে মন্ত্রপূত করবার নাম চুন পড়া। চুন পড়া পাথরের চুনে হয় না, শামুক-চুন ব্যবহার করতে হয়। গেঁড়ি, গুগুলি, শামুক প্রভৃতি থেকে যে চূর্ণ তৈরি হয় তাকে শামুক চুন বলে। অল্প একটু চুন নিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। গরল রোগ, পোকামাকড়ের দংশন, চিতি সাপের চাটা, শামুকে কাটা প্রভৃতিতে চুন পড়া প্রয়োগ করা হয়।

হলুদ পড়া : হলুদ মন্ত্রপূত করার নাম হলুদ পড়া। তিনটি কাঁচা হলুদ পরিষ্কার করে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। তারপর ঐ হলুদ বেটে লাগাতে হয়। গরল রোগ, মচকা ব্যথা, আরও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

আদা পড়া : দু-তিন টুকরো আদা পরিষ্কার করে ধুয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে আদা পড়া হয়। বিষাক্ত পোকার দংশন, সর্দিকাশি, সাপে কাটা প্রভৃতিতে আদাপড়া ব্যবহার করা হয়। দংশনস্থানে আদা বেটে লাগাতে হয় ও রস করে খেতে হয়। সর্দিকাশিতে আদার রস খেতে হয়।

নেবু পড়া : 'নেবু পড়া'তে পাতিলেবু এবং কাগজি লেবু ব্যবহার করা হয়। লেবুকে তিনবার অভিমন্ত্রিত করলে 'নেবুপড়া' হয়। 'নেবুপড়া' গরল রোগের এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই।

মাটি পড়া : এক ঢেলা মাটি—এঁটেল মাটি হলে ভাল হয়—মন্ত্রপূত করলে 'মাটি পড়া' হয়। অনেকে বাকস পাতায় এঁটেল মাটি মাখিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেন। ক্ষতস্থানের বেদনা নিবারণের জন্য, ফোড়া ফাটাবার জন্য মাটি পড়া ব্যবহার করা হয়।

চাউল পড়া/চাল পড়া : বাধক বেদনা, প্রসব বেদনা, কিংবা গর্ভিনীর গর্ভ সংক্রান্ত অন্যান্য রোগের জন্য। চোর ধরার জন্য চাল পড়া ব্যবহার করা হয়। এক মুঠো চাল তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে চাল পড়া হয়। তবে বাধক বেদনার জন্য চাল পড়ার মন্ত্র ও চোর ধরার জন্য চাল পড়ার মন্ত্র আলাদা। এছাড়া অন্যান্য কাজে চাল পড়া ব্যবহার করা হয়।

তুলসীপাতা পড়া : কৃষ্ণ তুলসী পাতায় তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছির দংশন প্রভৃতির জন্য ও সর্দি কাশির জন্য এবং আরও অন্যান্য কাজে তুলসীপাতা পড়া ব্যবহার করা হয়।

বকুল ফল/বকুল বীজ পড়া : বকুল ফলের বীজ তিনবার মন্ত্রপূত করে সেই বীজ বেটে লাগালে বিছার দংশনের জ্বালা নিবারণ হয়। এইভাবে বকুল ফল মন্ত্রপূত করে ব্যবহার করলে দাঁতের যন্ত্রণার নিবারণ হয়।

মেছুনির খোলা পড়া : মৃতবৎসা দোষ নষ্ট করার জন্য মেছুনির খোলা পড়া ব্যবহার করা হয়। তিন কোনা মেছুনি-খোলা তিনবার মন্ত্র পড়ে কোমরে বাঁধলে মৃতবৎসা দোষ কেটে যায়।

পান পড়া : পান পড়া কিন্তু পানপাতা পড়া নয়, সাজাপান অর্থাৎ খিলিপান—সুপারি, খয়ের, পান মশলা দিয়ে তৈরী পান মন্ত্রপূত করা হয়। পান সেজে তিনবার মন্ত্রপাঠ করে তিন বার ফুঁ দিতে হয়। ঋতু বেদনা নিবারণের জন্য, অনিয়মিত ঋতু সহজ ও নিয়মিত করার জন্য, মূর্চ্ছা রোগ তথা মৃগী রোগ নিবারণের জন্য প্রভৃতি মানুষের মঙ্গলকর কাজে পান পড়া ব্যবহার করা হয়। আবার মানুষের অনিষ্টকর কাজে পান পড়া ব্যবহার করা হয়। যেমন—পরস্ত্রী ও পরপুরুষকে বশীভূত করার জন্য, কারো শরীরে কঠিন ব্যাধি প্রবেশ করানোর জন্য, মানুষের হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, রক্তবমি ঘটিয়ে কাউকে মেরে ফেলার জন্য পানপড়া ব্যবহার করা হয়। আবার দুষ্টা স্ত্রী বশীভূত করার জন্য এবং গুণিন মন্ত্র নষ্ট করার জন্য পান পড়া ব্যবহার করা হয়। এইরকম আরো অনেক ইষ্টকর ও অনিষ্টকর কাজে পান পড়া ব্যবহার করা হয়। তবে প্রতি ক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা।

ধুলা পড়া : এক মুঠা ধুলা তিনবার মন্ত্রপূত করলে ধুলাপড়া হয়। ধুলাপড়া শত্রুকে জব্দ করার জন্য এবং ঈপ্সিতা স্ত্রীলোককে কিংবা ইপ্সিত পুরুষকে পাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ডাকিনী মন্ত্রেও ধুলা পড়া ব্যবহার করা হয়।

সরিষা পড়া : [illegible] সরিষাপড়ার দ্বারা যে সাপ কামড়েছে তাকে ধরে আনে তারপর সেই সাপ ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে বিষ তুলে দেয়। ভূতে চাপলে ভূতকে ছাড়ানোর জন্য সরিষা পড়া ব্যবহার করা হয়। আবার স্ত্রী / পুরুষকে বশীভূত করার জন্য সরিষা পড়া ব্যবহার করা হয়। সরিষাপড়াতে শ্বেত সরিষা ও কালো সরষে দুই প্রকার সরষেই ব্যবহার করা হয়। ভূত ছাড়ানোর জন্য এবং স্ত্রী বশ করার কাজে কুলের কাঠের আগুনে কিছু সরিষা তিনবার মন্ত্রপূত করে নিক্ষেপ করা হয়।

ফুল পড়া : ফুল পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীবশ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। দুষ্টা স্ত্রীকে যেমন বশ করা যায়, তেমনি পরস্ত্রী ও কুমারী মেয়েকেও বশ করার জন্য ফুল পড়া ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে চাঁপা ফুল ব্যবহার করা হয়। আবার অন্যান্য সম্মোহনের কাজে ফুল পড়া ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে জবা ফুল লাগে। ফুল পড়াতে সাদাফুল অপেক্ষা রঙীন ফুলের কার্যকারিতা বেশি। ছোটছেলেকে ভুলানো, শত্রুকে বশ, কোন মানুষকে পাগল করে দেওয়া প্রভৃতি কাজেও ফুল পড়া ব্যবহার করা হয়। প্রতিক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা।

সিঁদুর পড়া : সিঁদুর পড়া স্ত্রীলোক দ্বারা ব্যবহার করানো হয় পুরুষকে বশ করার জন্য। কোন স্ত্রীর স্বামী বিপথগামী হলে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হলে—তাকে বশীভূত করার জন্যে সিঁদুর পড়া ব্যবহার করা হয়। ব্যাঙের মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে সেই সিঁদুর কোন স্ত্রীলোক কপালে পরলে তার স্বামী বশে থাকে। এটা পুরুষ বশীকরণ।

কড়ি পড়া : কড়িকে তিনবার মন্ত্রপূত করে তার ভিতর কিছু ঔষধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হাঁপানী, নারাঙ্গা, শরীরে চুলকনা, আঁচিল, গরল রোগ, আরও অন্যান্য রোগে কড়ি পড়া ব্যবহার করা হয়। কড়িকে ফুটো করে কালো 'কার' দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কিংবা কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়। বালকদের রোগে কড়িপড়া খুব উপযোগী।

মাষ কলাই পড়া : গুণিনরা মাষকলাই মন্ত্রপূত করে বাণ মারার কাজ করেন। উড়ন-এর জন্য মাষ কলাই পড়ার প্রয়োজন হয়। পেটের বেদনা উপশম করতে মাষকলাই পড়া ব্যবহার করেন গুণিনগণ।

মরিচ পড়া : একুশটি সাদা মরিচ তিনবার করে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। তারপর মন্ত্রপূত মরিচগুলি বেটে নিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হয় এবং দংশন স্থানে লাগাতে হয়। মরিচ পড়া সর্পদংশন, বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের দংশনজনিত বিষক্ষয় করে দেয়।

মেথি পড়া : ভূতগ্রস্ত রোগীর ভূত ছাড়ানোর জন্য মেথি পড়া ব্যবহার করা হয়। কিছু মেথিকে তিনবার মন্ত্রপূত করে রোগীর গায়ে ছড়িয়ে দিতে হয়। মন্ত্রপূত মেথিকে জলে ভিজিয়ে সেই জল পান করলে হিক্কা সারে।

জিরা পড়া : মেথি পড়ার মত জিরা পড়া ভূত ছাড়ানোতে ব্যবহৃত হয়।

ঘৃত পড়া : গাওয়া ঘি মন্ত্রপূত করে জিহ্বার ঘায়ে লাগালে ঘা সেরে যায়।

এইরকম বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য মন্ত্রপূত করে ব্যবহার করলে নানারকম রোগ সারে ও নানা কাজ সফল হয়।

ঝাড়ন, ফুঁক ও ভাঙ্গা মন্ত্র :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে ঘুরলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পরিচিত ছবিটাই দেখা যায়—ভাঙাচোরা কাদাভর্তি সংকীর্ণ পথ, দু'পাশে ঘাস-আগাছার জঙ্গল, খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি,

দুএকটা টালি ছাওয়া ঘর কিংবা হাড় পাঁজরা বের করা ইটের বাড়ি, নানারকম গাছগাছালিতে ভর্তি প্রায় অন্ধকার পরিবেশ, বাঁশবন, পানাপুকুর, কন্দ কচুর জঙ্গল, পচা ডোবা। বর্ষাকালে কোথাও জলে ডুবে থাকে পথ ঘাট। সাপ, বিছে, বিষাক্ত পোকামাকড় তখন বাসা বাঁধে মানুষজনের ঘরের আনাচে কানাচে। মশা মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়।

এইরকম পরিবেশে বাস করে হতদরিদ্র কিছু মানুষ। যাদের সহায় নেই, সম্বল নেই। দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, ভাল মন্দ খাওয়ার আশা দূরঅস্ত। এরা সারা বছর জ্বর-জ্বাড়িতে ভোগে। কাছে পিঠে ভাল ডাক্তার বদ্যি নেই। হাসপাতাল বা অন্য কোন চিকিৎসাকেন্দ্র হয়ত বহু দূরে। এরা কেউ হয়ত অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত। দুচারজন অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানে।

এই সমস্ত মানুষজনের অধিকাংশই শ্রমজীবী। দিন আনে দিন খায়। কঠোর পরিশ্রম করে জীবনধারণ করতে হয়।

এটাই হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবনের চালচিত্র। এই চালচিত্রে মোটা রেখায় যে রঙগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি হল দারিদ্র্য, অশিক্ষা/কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস। আর এগুলির সহায়তায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনজীবনে এসেছে ভূত প্রেত, জড়ি বুটি, হাঁচি, টিকটিকি, ঝাড়, ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি। এই ঝাড় ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি এখানকার লোকায়ত জীবনধারার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে এগুলিকে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করলে দোষের হয় না।

ইতিপূর্বে জলপড়া তেলপড়া, নুন পড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গুণিন মন্ত্রের প্রয়োগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখন ওঝা গুণিনগণ কোথায় কীভাবে বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ন ও ফুঁকের সাহায্যে মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ ঘটান তা আলোচনা করা হবে।

ঝাড়ন বিভিন্ন প্রকারের হয়। সাধারণতঃ বিষের জন্য ঝাড়ন ও ভূতচাপার ঝাড়নের প্রচলন বেশি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে সাপ বিছা ইত্যাদির উপদ্রব যেমন আছে, তেমনি ভূত সম্পর্কিত সংস্কার আজও জনমানসে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ফলে ভূতে চাপলে কিংবা সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে ছুটতে হয়।

বিষঝাড়ন: সাপ বিছা প্রভৃতি কামড়ালে শরীরে জ্বালা যন্ত্রনার সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু হয়। ওঝা বা গুণিনরা প্রথমে রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে দষ্ট-স্থানে নানাপ্রকার বিষ-প্রতিরোধক দ্রব্য লাগায় তারপর শরীরের ঊর্ধ্বদিক থেকে নিম্নদিকে হস্তচালনাকরে। শরীর স্পর্শ না করে শরীরের কাছাকাছি সমান্তরালভাবে হস্ত চালনা করে। এতে বিষ শরীরের ঊর্ধ্বদিকে উঠতে পারে না এবং মস্তকেও সঞ্চারিত হতে পারেনা। যদি বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে কিছুদূর ওঠে, এই হস্তচালনার ফলে তা নেমে যায়। অবশ্য এই হস্তচালনার সঙ্গে সঙ্গে গুণিনরা মন্ত্রপাঠ করেন।

সর্পবিষ ঝাড়ন: সর্পবিষ ঝাড়নের বহু মন্ত্র আছে। এক এক গুণিন এক এক রকমের মন্ত্র ব্যবহার করেন। মা মনসা/বিষহরি রাইয়ের নামে আদেশ কড়া হয়। এছাড়া ষোড়শ গোপিনী, শ্রীরামচন্দ্র, গড়ুর প্রভৃতির নামেও আদেশ কড়া হয়। যে সাপে দংশন করেছে, তাকে যদি দেখা যায় এবং চিনতে পারা যায়, তাহলে একরকম মন্ত্র আর সাপ যদি না চেনা যায় এবং কি ধরনের বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে তা যদি জানতে না পারা যায় তাহলে অন্যরকম মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

সর্পবিষ ঝাড়নে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী মন্ত্র প্রয়োগের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সর্প দংশনের অব্যবহিত পরের অবস্থা হল রোগীর প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় এক রকম মন্ত্র ও ঝাড়ন।

এই রকম পরপর দশম অবস্থা নির্ণয় করা হয় এবং মন্ত্রের আবাওৎ সুরও পরিবর্তন করা হয়। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রের ধ্বনি উচ্চতর হতে থাকে। প্রথম দিকে মন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পাঁচবার, সাতবার ও শেষে দ্বাদশবার পর্যন্ত আবৃত্তি করা হয়। রোগীর অবস্থা যত খারাপ হতে থাকে ততই মন্ত্রের সুর জোর হয়। রোগী ঢলে পড়লে তখন খুব জোরে ক্রন্দনের সুরে মন্ত্র আবৃত্তি করা হয়। প্রত্যেকবার মন্ত্র উচ্চারণের সময় রোগীর নাম ধরে মন্ত্র পড়া হয়। তবে গুণিন ভেদে প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সাধারণ ঝাড়ন মন্ত্রে যদি বিষক্রিয়ার উপশম না হয়, তখন বিশেষ মন্ত্র তথা 'সার' মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন—মনসা সার, মথন সার, জলসার, কৃষ্ণ সার, গোপিনী সার, রামসার, চাপড় সার, গামছা সার, অমৃত সার প্রভৃতি। এই সার মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সর্পবিষ নিবারক ঔষধও পান করানো হয়। প্রবাদ আছে যে রামসারে মৃত ব্যক্তিও জীবিত হয়ে যায়।

সর্পবিষ ঝাড়ন ছাড়া অন্যান্য বিষক্রিয়ায় ঝাড়ন পদ্ধতির ব্যবহার আছে। যেমন—বিছা কামড়ালে, পিঁপড়া কামড়ালে, পাগলা শিয়াল কিংবা পাগলা কুকুর কামড়ালে, শিঙ্গি মাছে কাঁটা মারলে, ইঁদুর কিংবা ছুঁচোতে কামড়ালে, কোন পাখি ঠোকরালে, শুঁয়োপোকার কাঁটা লাগলে, কোন বিষাক্ত কীট কিংবা পোকা দংশন করলে ঝাড়ন করা হয়।

ভূতে পাওয়া রোগীর ঝাড়ন: সর্পবিষ ঝাড়নের মত ভূতে পাওয়া রোগীকে ঝাড়নের দ্বারা আরোগ্যলাভ করানোর ব্যবস্থা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা গুণিনগণ করে থাকেন। এখানেও কয়েকটি পর্যায়ে ঝাড়ন-প্রক্রিয়া হয়। ভূতগ্রস্ত রোগীর গায়ে মন্ত্রপাঠ করার সঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করা হয়। ঝাড়নের পূর্বে সরিষা পড়া, মেথি পড়া, জিরা পড়া, হলুদ পড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এবং কিছু কিছু দ্রব্যগুণ আরোপ করা হয়। এই ঝাড়ন প্রক্রিয়ারও পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ের ঝাড়নে কিছু কাজ না হলে দ্বিতীয় পর্যায় ব্যবহার করা হয়। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ পর্যায় প্রভৃতি কয়েক পর্যায়ের ঝাড়ন হয়।

সর্পদংশন বিষাক্ত পোকামাকড় দংশন ভূতে পাওয়া ছাড়া আরও নানারকম শারীরিক অসুস্থতা, রোগ প্রভৃতিতে ঝাড়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। সেগুলি হল—ডাইনের দৃষ্টি ঝাড়ন, নালি ঘায়ের ঝাড়ন, বাধক বেদনার ঝাড়ন, ঋতু বেদনার ঝাড়ন, অর্শরোগের ঝাড়ন, মাথা বেদনার ঝাড়ন, আগুনে পোড়ার ঝাড়ন প্রভৃতি। প্রায় সব রোগেরই ঝাড়ন হয়। আসলে ঝাড়ন এবং ফুক (ফুঁ দেওয়া) ওঝা-গুণিনদের মন্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ। যে কোন প্রকার মন্ত্র ব্যবহার করতে হলে এগুলি প্রাথমিকভাবে করে তবে অন্য কোন প্রক্রিয়া করাই গুণিনদের রীতি।

বিভিন্ন প্রকার ঝাড়নের মত ফুঁ/ফুঁক (ফুঁ দেওয়া) ও বিভিন্ন প্রকারের হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ফুঁক হল গুণিনদের মন্ত্র প্রয়োগের প্রাথমিক কাজ। যে কোন প্রকার মন্ত্র আবৃত্তি/পাঠ করে ফুঁ দেওয়াই হল বিধি। তবুও ফুঁকের কিছু নাম আছে। অনেক সময় কেবলমাত্র ফুঁ দেওয়া হয়। কোন দ্রব্যগুণ ব্যবহার না করে, অন্য কোন মন্ত্র প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে নয়, কেবলমাত্র ফুঁকের দ্বারা যে রোগ সেরে যায় এমন অন্ধ বিশ্বাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও দেখা যায়। এমন ঘটনার কথা জানা যায় যে হয়ত কাজ করতে করতে মাঠে কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল—তখন কাছে পিঠে গুণিনের বাড়ী ছুটে গেল লোকটা। গুণিন অন্য কিছু না করে কেবলমাত্র মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে দিল, তাতেই লোকটা চাঙ্গা হয়ে গেল। এই ঘটনার অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তবুও বলা যায় মন্ত্রের প্রতি, গুণিনের প্রতি

আবার বিশ্বাস গ্রামাঞ্চলের এই সব মানুষদের অনেক ছোটখাট দুর্ঘটনা রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ করে।

ঝাড়নের মত ফুঁকে প্রায সমস্ত রোগ সেরে যায। যেমন জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দি কাশি, কোমরে ব্যথা, আঘাত লাগা, হাঁপানি, আমাশা, ন্যাবা, স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, বিষক্রিয়া, জটিল রোগ প্রভৃতি। তাই মন্ত্রের ফুঁক গুণিনদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফুঁকের কিছু কিছু নাম আছে। মুঠ ফুঁক, নুটী ফুঁক, হাত ফুঁক, উড়ো ফুঁক, চাপড় ফুঁক প্রভৃতি।

ঝাড়ন-ফুঁকের পর এখন 'ভাবা মন্ত্র' নিযে আলোচনা কবা হবে। এখানে 'ভাবা' শব্দটি নষ্ট বা নাশ কবা অর্থে ব্যবহৃত। কোন কিছু ভালো, সুন্দর জিনিসকে নষ্ট কবে দেওযা হল ভাবা-মন্ত্রের কাজ। সুতবাং ভাবামন্ত্র মানুষেব ইষ্টকব কাজ অপেক্ষা অনিষ্টকব কাজে বেশি ব্যবহৃত হয। এই অনিষ্টকব মন্ত্র অনেক গুণিন সযত্নে বর্জন কবেন। গ্রামে গঞ্জে মানুষ সহজেই হিংসা, ঈর্ষাব বশীভূত হযে মন্ত্রেব সাহায্যে ক্ষতি কবাব চেষ্টা কবে। এক শ্রেণীব দুষ্ট প্রকৃতিব গুণিন অর্থেব লোভে এই সব অনিষ্টকব কাজে সহাযতা কবে। ভাবা মন্ত্র দিযে প্রায় সব জিনিস নাশ কবে দেওযা যায তবে সাধাবণতঃ কিছু কিছু জিনিস নষ্ট কবাব জন্য ভাবা-মন্ত্রেব প্রয়োগ দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাতে দেখা যায। যেমন—পিঠা (পিষ্টক), চালগুঁড়ি, মাছ, দুধ, রান্না কবা তবকাবী, মিষ্টান্ন, পাযেস প্রভৃতি। এছাড়া আবও অনেক দ্রব্য নষ্ট কবে দেওযা যায বা মানুষেব অনেক ক্ষতি কবা যায—সেগুলি ডাইনমন্ত্রেব আওতায পড়ে যায। এখন কিছু কিছু ভাবামন্ত্র সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

পিষ্টক ভারা: যে পিষ্টক/পিঠা তৈবী সম্পূর্ণ হযনি, তা দেখে কেউ মনে মনে তিনবাব এই মন্ত্র আওড়ালে সেই পিঠা নষ্ট হযে যায। আবাব তৈবী পিঠাও নষ্ট কবে দেওযা যায। উভয ক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা।

গুড়ি ভারা: যে গুঁড়ি অর্থাৎ চাল গুঁড়ি দিযে পিঠা তৈবী হয, সেই গুঁড়ি দেখে কেউ এই মন্ত্র মনে মনে তিনবাব আওড়ালে গুঁড়ি নষ্ট হযে যায। সেই গুঁড়িতে আব কিছুতেই পিঠা তৈবী কবা যায না।

মৎস্যভারা: রান্না কবাব পূর্বে এবং রান্না কবাব পবে দুই পর্যাযেই মাছকে এই মন্ত্রেব সাহায্যে নষ্ট কবে দেওযা যায।

দুগ্ধ ভারা: দুগ্ধ ভাবা মন্ত্রে কাঁচা দুধকে সহজেই নষ্ট কবে দেওযা যায। কাঁচা দুধ নষ্ট কবলে তখন তা জাল দিলে কেটে যায। এইভাবে ভাবা মন্ত্রেব সাহায্যে দই নষ্টকবে দেওয়া যায়। তখন আব দই কিছুতেই জমানো যায না।

পরমান্ন ভারা: পবমান্ন তথা পাযেস এই মন্ত্রেব সাহায্যে নষ্ট কবে দেওযা যায। তখন পাযেস পচে যায, বিশ্রী গন্ধ হয।

এইভাবে 'ভারা-মন্ত্রে'ব সাহায্যে বহু দ্রব্য নষ্ট করে দেওযা যায। তবে একটা মজাব ব্যাপাব লক্ষ্য কবা যায় যে, যে সমস্ত দ্রব্য বেশিক্ষণ থাকলে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায় সেই সমস্ত দ্রব্য সাধাবণতঃ ভারা মন্ত্রের সাহায্যে নষ্ট করা হয়। অর্থাৎ এটা কাকতালীয ঘটনা হতে পারে। হয়ত পিঠা কিংবা পায়েস এমনিতেই নষ্ট হয়ে গেল, তখন লোকে ভেবে নিল কেউ শত্রুতাবশতঃ এইগুলি করেছে। ঘটনা যাই হোক, অন্ধবিশ্বাসের আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে এই সব মন্ত্রতন্ত্রের সৃষ্টি এ কথা বলাই বাহুল্য।

চালনা বা চালন মন্ত্র : হাতচালা, নলচালা ইত্যাদি

আমাদের প্রাচীন বাংলাসাহিত্য 'চর্যাপদ' এর একটিপদে চারটি বড় অদ্ভুত পংক্তি আছে-

"আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বি আতী।
কানেট্ চোরি নিল অধরাতী।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট্ চোরে নিল কা গই মাগঅ।।"

পদটি চর্যাকার কবি কুক্কুরীপাদের। চারটি পঙক্তির অর্থ হল- 'ওগো বধূ, শোন। অর্ধরাত্রে চোর (এসে) কানেট্ (=কর্ণভূষণ) নিয়ে গেল। শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূ (রইল) জেগে।' চোরে কানেট্ নিল, কার কাছে গিয়ে সন্ধান করা যায়। কবি কুক্কুরী পাদের লেখায় যে জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছিল—কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ। তার উত্তর কবি পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে তৎকালীন বাংলাদেশের মানুষরা জানত যে চোরে চুরি করলে কোথায় কার কাছে সন্ধান করতে হয়।

প্রাচীনকালে দস্যু তস্করের উপদ্রব যেমন ছিল, তেমনি এই উপদ্রব নিবারণে সেকালেও প্রহরী নিয়োগ ও তালাচাবির ব্যবস্থাও ছিল এবং চোর ধরার জন্য দারোগা ছিল, পথে ঘাটে থানা বা কাছারি ছিল—চর্যাপদে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি ছিল প্রত্যক্ষ উপায়। তেমনি পরোক্ষভাবে মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা চোর ধরা কিংবা চুরি করা জিনিস উদ্ধার করার কথা সেকালের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন কাহিনীতে পাওয়া যায়। সুতরাং একথা বলা যায় মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার কেবল আজকের নয়, একালের নয়, অর্বাচীনকালের নয়- প্রাচীনকালেরও। বহুদিন ধরে, বহু যুগ ধরে মানুষ মন্ত্রতন্ত্রের চর্চা ও ব্যবহার করে আসছে। এখনও করছে ভবিষ্যতেও হয়ত করবে।

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরা, চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পদ্ধতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত আছে। এক এক করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখন এই বিষয়ে 'চালন' পদ্ধতির কথা বলব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় চোর এবং চোরাই দ্রব্যের হদিশ করার জন্য যে 'চালন' পদ্ধতিগুলির প্রচলন আছে, তাদের মধ্যে হাতচালা, নল চালা, কুলাচালা, বাটি চালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একে একে এগুলি আলোচনা করা হবে। তবে এগুলি আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে কিছু বলা দরকার। পূর্বোক্ত কুক্কুরীপাদের চর্যাপদে আমরা দেখেছি বধূ জেগে রইল অথচ তার কান থেকে কানেট্ চুরি করে নিল চোরে। আশ্চর্য ঘটনা! বধূ আর চোরের মধ্যে জানাজানি ছিল বোধ হয়, না হলে এরকম ঘটনা ঘটে কি করে ! চর্যাপদ সন্ধ্যাভাষায় লেখা। ঐ পদের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা অন্যরকম। যাইহোক, আমাদের কাজ বাইরের অর্থ নিয়ে। আসলে এটি যোগসাজসে, জানাজানি করে চুরি। এই যোগসাজসে চুরির ঘটনা সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি আছে। পুলিস ফাঁড়ি/থানার নাকের ডগায় চুরি হয়ে যাচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে—পুলিস কিছুই জানে না। এরকম ঘটনা আকচার হয়। চোর পুলিশে পড়া পেটা জানাজানি ভাগাভাগি।

চোর ডাকাতের পুলিসের সঙ্গে যেমন গোপন জানাজানি রাখতে হয় তেমনি এলাকার ওঝা গুনিনের সঙ্গে গোপন আঁতাত রাখতে হয়। ওঝা-গুণিনরা এলাকার মানুষ। কে চোর, কে সাধু, কে বদমাশ—সমস্ত খবর রাখেন। এই খবরাখবর রাখার উপর তাদের ব্যবসার জনপ্রিয়তা। পাশের গ্রামে চুরি হল গুণিন গণনা করে চোর ধরে দিলেন, মাল উদ্ধার করে দিলেন। আজকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে যা বিস্ময়কর। তাই ডিটেক্টর, গোয়েন্দা-কুকুর যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে গ্রামের একজন সাধারণ গুণিন সফল হয়ে যান বড়ই আশ্চর্যের।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। নিজের চোখে দেখা ঘটনা। একবার পাশের একটা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হয়। গুণিন ডেকে আনা হল। গুণিন বাটি চালা করলেন। আশেপাশের সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং গৃহস্থের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম লিখে বাটি চালা শুরু হল। গুণিন মন্ত্র পড়ে বাটি চালা শুরু করলেন। শেষে একজনের নাম উঠল। তাকে ধরে আনা হল। সে কিছুতেই স্বীকার করে না। শেষে চালপড়া খাওয়ানোর ভয় দেখাতে অবশেষে স্বীকার করল। তবে চোরাইমালের অনেকখানি বিক্রি করে দিয়েছে—বাকি যেটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ গুণিন পূর্বেই বলে নিয়েছিলেন যে তিনি চোর ধরে দেবেন, তবে চোরকে কিছু বলা যাবে না, মারধর করা যাবে না কিংবা পুলিসে দেওয়া যাবে না। আর মাল যা পাওয়া যাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ব্যাপারটা বুঝুন!

সুতরাং চুরি সম্পর্কিত ব্যাপারে চোরধরা কিংবা চোরাই মালের হদিশ করার কাজে ওঝা-গুণিনের মন্ত্রশক্তি কতখানি ক্রিয়াশীল আর ওঝা-গুণিনের খবরাখবর সংগ্রহ করা এই ব্যাপারে কতখানি সাহায্য করে তা বিচার করে দেখতে হয়। কিন্তু গ্রামের মানুষের এমনই বিশ্বাস যে চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পাবার জন্য আজও তারা গুণিনের দ্বারস্থ হয় এবং মন্ত্রবলে সম্ভব হবে বলে তারা ধরে নেয়। শুধু মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ নয়, এই সঙ্গে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে গুণিনরা। গ্রামের মানুষ তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পিছুপা হয় না এবং গৃহশান্তির জন্য পূজা পার্বন, হোম, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করে। ফলে এই ব্যাপারগুলো লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি গেলে গণেশ পূজো করা হয়।

এখন ওঝা গুণিনের চালনমন্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :

হাত চালা : 'হাত চালা' শব্দটির অর্থ হাত চালনা করা অর্থাৎ মন্ত্র বলে হাতের চালন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'হাত চালা'র প্রয়োগ করা হয়। যেমন চুরির ব্যাপারে, সাপ কিংবা বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে বিষ আছে কিনা জানার ব্যাপারে শরীরে কোন গোপন রোগ আছে কিনা তা নির্ণয় করার ব্যাপারে প্রভৃতি। তবে চুরির ব্যাপারে 'হাতচালা' প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয় বেশি।

চুরি ব্যাপারে হাত চালা মন্ত্রের প্রয়োগ সাধারণতঃ দুভাবে হয়। প্রথম প্রকার হল গুণিন শুদ্ধ হয়ে হাতে বা কানে একটি শিকড় নেয়। তারপর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখন এক এক করে সমস্ত সন্দেহভাজন লোকের নাম করা হয়। যার নামে হাত চলতে শুরু করে সেই লোক চোর। তখন তাকে ধরে আনা হয়, নানারকম জেরা করা হয়। এতে স্বীকার না করলে চালপড়া (মন্ত্রপূত চাল), নুন পড়া ইত্যাদি খেতে বলা হয়। যদি সে সত্যই চোর হয় তলে চালপড়া, নুনপড়া ইত্যাদি খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা রক্তবমি করবে। এই ভয়ে অনেক সময় চিহ্নিত ব্যক্তি স্বীকার করে। এইভাবে চোর ধরা পড়ে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হল—টুকরো টুকরো কাগজে কিংবা পাতায় সন্দেহভাজন বিভিন্ন ব্যক্তির নাম লিখে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। এইবার গুণিন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে হাত চলতে শুরু করে অবশেষে একটি নামের উপর হাত উঠে থেমে যায়। তখন তাকে সনাক্ত করা হয়।

সর্প দংশন, বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশন, শরীরে গোপন রোগ ইত্যাদির ব্যাপারে গুণিন মন্ত্র পড়ে হাতে শিকড় নিয়ে হাত চালা শুরু করে। শরীরে বিষ থাকলে, কিংবা রোগ থাকলে হাত চলতে শুরু করে। না থাকলে হাত চলবে না।

বাটি চালা : 'বাটি চালা'র প্রক্রিয়া অনেকটা হাত চালার মত। হাত চালাতে শুধু হাত চলে আর বাটি চালাতে গুণিন বাটিটাকে রেখে তার উপর হাত চাপা দিয়ে থাকে। মন্ত্র পড়ার পর বাটি চলতে শুরু করে। বাকি পদ্ধতি হাত চালার মত।

নল চালা : নল চালাও হাত চালা কিংবা বাটি চালার মত। এখানে বাটির বদলে নল। এই নল কাঁচা বংশের নল হয় সাধারণতঃ। অনেক গুণিন ধাতব নল ব্যবহার করেন। মন্ত্র পড়লে নল চলতে শুরু করে।

কুলা চালা : কুলা চালার প্রক্রিয়া একটু অন্য ধরনের। একটা কাঁচির সূঁচালো আগায় একটা কুলোকে গেঁথে দেওয়া হয়। এইবার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম করা হয়। যে প্রকৃত অপরাধী তার নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুলোটা বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করে। অন্যলোকের বেলায় ঘুরবে না। এইভাবে চোর সনাক্ত হয়। তারপর স্বীকারোক্তির জন্য অন্য পদ্ধতি।

পিঁড়ি চালা : পিঁড়ি চালার প্রক্রিয়া একটু অদ্ভুত ধরনের। একটা পিঁড়ির নীচে একটা গোটা সুপারি রেখে তার উপর কোন একজনকে বসতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ কোন বাচ্ছা ছেলেকে বসানো হয়। এইভাবে বসলে স্বভাবতই পিঁড়ি কাত হয়ে পড়ে। তারপর এক এক করে সন্দেহভাজন লোকদের নাম করা হয়। যে অপরাধী তার নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়িটি মেঝের সঙ্গে সমান্তরালে সুপারির উপর ঘুরতে থাকে। এইভাবে দোষী সনাক্ত করা হয়।

থালা চালা বা বাটা চালা : পিতলের থালা বা পিতলের বাটার নীচে গোটা সুপারি রাখা হয়। এইভাবে রাখা বাটা বা থালা কাত হয়ে পড়ে। কিন্তু দোষী ব্যক্তির নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাটাটি সুপারির উপর রাখলে সেটি সমান্তরালভাবে ঘুরতে থাকে।

পাতা চালা : পাতা চালার পক্রিয়াটি অনেকটা নল চালার মত। গুণিন হাতে একটি পাতা নেন। এদিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম সাজিয়ে রাখা হয়। মন্ত্রপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত সুদ্ধ পাতাটি চলতে আরম্ভ করে। শেষে দোষী ব্যক্তির নামের উপর গিয়ে থেমে যায়। এইভাবে দোষী সনাক্ত হয়।

কড়ি চালা : যদিও শব্দটি কড়িচালা, তবুও ব্যাপারটি হল কড়ির উড়ন। মন্ত্রের দ্বারা কড়িকে উড়িয়ে দোষী ব্যক্তির কপালে সেঁটে দেওয়া হয় কিংবা সাপের মাথায় সেঁটে দেওয়া হয় সর্প দংশনের ক্ষেত্রে। উড়ন মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হবে।

এই হাতচালা, বাটি চালা প্রভৃতি ব্যাপারে এক গুণিনকে প্রশ্ন করেছিলাম—হাত চালানো কিংবা বাটি চালানো তো আপনার নিজের ব্যাপার। আপনি ইচ্ছা করলে চালাতে পারেন, আবার নাও পারেন। মন্ত্রবলে সত্যি সত্যি হাত কিংবা বাটি চলে কি? গুণিনটি বললেন—মন্ত্র বলে এগুলি না চললে তাহলে চোর ধরা পড়ে কি করে? উত্তর দিলাম—পুলিস ইচ্ছা করলে যেভাবে চোর ধরতে পারে সেইভাবে। তিনি রেগে গেলেন। বললেন আপনারা লেখাপড়া জানা, ইংরাজী জানা লোক, আপনারা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করবেন কেন? চোর ধরছি কি এমনি এমনি? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। না এমনি এমনি হয় না। মন্ত্রের কতখানি জোর আছে জানি না, তবে গুণিনের গলার জোর আছে আর মানুষকে বোকা বানানোর ক্ষমতা আছে তা বোঝা যায়।

ভূত চালা : আজকাল মিডিয়ার জয়জয়কার। মিডিয়ার কল্যাণে ছোট শিশুটি পর্যন্ত বর্তমান কালের হাল চাল সম্পর্কে দস্তুর মতো ওয়াকিবহাল। তেমনি মিডিয়াকে অবলম্বন করে ব্যবসাদারেরা বে বে করে নেমে পড়েছে বাজারে। ছোটখাট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় বড় মার্চেন্টরা, ম্যানুফ্যাকচারেরা সবাই দৌড় প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। খবরের

কাগজ, টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকা এমনকি পাড়ার পূজোর চাঁদার বিলে পর্যন্ত বিজ্ঞাপন। সেদিন এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের কথা শুনলাম। বিজ্ঞাপনটি এইরকম—"চুরি, হারানো, নিরুদ্দেশ, কঠিন রোগব্যাধির উপশম, সংসারে মনোমালিন্য, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি সমস্যার সুরাহার জন্য আসুন। —তান্ত্রিক জ্ঞান গুরু। ঠিকানা প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার। রেলস্টেশনের ২ নং প্লাটফরম, বটগাছের নীচে। সময় বেলা ১১টা থেকে ৪টা। [প্রয়োজনে জ্ঞানগুরুর নাম ও রেলস্টেশনের নাম দেওয়া গেল না।] প্রসঙ্গত বলে রাখি এই চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের বিশদ বিবরণ আমার এক বন্ধু দিয়েছেন।

যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা সত্য কিংবা মিথ্যা হোক—মোদ্দা কথা হল এই- এটা বিজ্ঞাপনের যুগ, বিজ্ঞাপন ছাড়া কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসা সফল হয় না। যে যার সামর্থ্য ও অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে চলেছে। আপনি যেখানেই যান, সর্বত্রই কোন না কোন বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে। রেলস্টেশনে যে গাছগুলো আছে তার কাণ্ডগুলোতে ছোট ছোট টিনের পাতে হরেক রকমের বিজ্ঞাপন সাঁটা আছে। বাসস্ট্যান্ডে মাথার উপর হরেক রকমের বিজ্ঞাপন। আজকাল আবার চলতি পিচ রাস্তায় বিজ্ঞাপন সাঁটা। তার উপর দিয়ে মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে—তাতে কি ? হাঁটতে গিয়ে কারোর না কারোর তো চোখে পড়বে।

এতক্ষণ ধরে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে আজকাল ওঝা-গুণিনরা রীতিমতো নিজেদেরকে বিজ্ঞাপিত করছে। এতদিন ধরে যাদের প্রচার ছিল মানুষের মুখে মুখে এবং গ্রামগঞ্জের লোকেরাই কেবল তাদের খোঁজ রাখত। কারণ তারাই ছিল সহজে হাতের কাছে পাওয়া গ্রামের মানুষের মুশকিল আসান। এখন তারা গ্রামের মেঠো পথ ছেড়ে শহরের রাজপথে, জনাকীর্ণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। মিডিয়ার মধ্য দিয়ে মন্ত্রের শক্তির প্রকাশ ঘটছে।

ওঝা-গুণিনদের মন্ত্র-ব্যবসায়ের বিভিন্ন মাধ্যম আছে। 'ভূত চালা' এইরকম একটি মাধ্যম। ভূত চালার সাহায্যে গুণিন করতে পারে না এমন কাজ নেই। চোর ধরা, চুরি যাওয়া জিনিসের উদ্ধার করা, রোগ ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা ও রোগ সারানোর উপায় ও ঔষধ বলে দেওয়া, মামলা-মোকদ্দমার জয় পরাজয় সম্পর্কে ফলাফল বলে দেওয়া, সংসারে অশান্তির কারণ ও প্রতিকারের উপায় বলে দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর কলহের মীমাংসা করে দেওয়া, পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর উপর আকর্ষণ দূর করা, শত্রুকে জব্দ করার উপায় বলে দেওয়া কিংবা শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় বলে দেওয়া, প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল 'ভূত চালা' তে ভূত চাপার প্রতিকার করা হয়।

মানুষ অনেক জিনিস নিয়ে ব্যবসা করে, কিন্তু ভূত নিয়ে ব্যবসা করা বড়ই আশ্চর্যের। তবে ঘটনা আশ্চর্যের হলেও বহু লোকের মুখে, ওঝা-গুণিনের মুখে ভূত-ব্যবসার কথা শোনা যায়। আমি একজন লোককে জানতাম, অনেকেই তাঁকে জানতেন, তিনি বড় গুণিন ছিলেন না। কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র ভালই জানতেন। তিনি কতকগুলো ভূত পুষতেন এবং প্রয়োজনমত গুণিনদের ভূত সরবরাহ করতেন। অর্থাৎ তিনি ভূতের ডিলার।

ব্যাপারটা আজগুবি, গাঁজাখুরি, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ছেলেবেলায় এই মানুষটা সম্পর্কে ভূতপ্রেত নিয়ে এত মজার মজার কাহিনী শুনেছিলাম যে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম- হয়ত হলেও হতে পারে। তিনি আমাদের গ্রামের লোক। নাম—নীলমণি হাজারি। তাঁদের একটা বিরাট বাগান ছিল। বাগানে বিভিন্ন ধরনের গাছ, বাঁশঝাড়, পুকুর ছিল। তিনি নির্জনে পুকুর পাড়ে একটা কুঁড়ি (কুঁড়ে) বেঁধে থাকতেন। সারাদিন বাগানে খাটতেন আর সন্ধ্যায়

[illegible] গাইতেন, কখনো তবলা বাজাতেন। কখনো হতো [illegible] এমন শব্দ [illegible]। যেত নাকি সুরের শব্দ, বাচ্চা ছেলের কণ্ঠস্বর ইত্যাদি। দিনের বেলা যখন [illegible] আমরা তাঁর বাড়িতে উঁকি দিতাম। দেখতাম মড়ার মাথার খুলি, সিঁদুর লাগানো হাড়, কঙ্কাল এবং নানারকম জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাজরার একটা বালক ভূতকে ধরে রেখেছিলেন। তাকে দিয়ে চাকরের কাজ করাতেন— এমন শোনা যেত। গ্রামের লোক, আশপাশের লোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে নীলমণি হাজরার ভূত পোষে। এই হাজরার 'ভূতচালা'—ব্যবসায়ীদের ভূত সরবরাহ করতেন বলে জনশ্রুতি ছিল।

এখন 'ভূত চালা' সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হবে। পূর্বে নল চালা, বাটি চালা, কলা চালা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে বাটি, নল কিংবা কুলা গুণিনের মন্ত্রশক্তির প্রয়োগের মাধ্যম। কিন্তু 'ভূতচালা' তে মিডিয়ম হল ভূত। গুণিন মন্ত্র বলে ভূতকে কোন স্থানে আনয়ন করেন, তারপর তাকে দিয়ে পূর্বোক্ত বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূত আসে তারপর অনুষ্ঠান শেষে আবার চলে যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এইরকম বিভিন্ন 'ভূতচালা' কেন্দ্র আছে। এক এক জন গুণিন এই কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এইরকম একটি কেন্দ্রের 'ভূতচালা' অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানটি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত একটা গ্রাম—নাম গড়িজিলা। এই গ্রামের এক গুণিন—সাধন হালদারের ভূতচালা অনুষ্ঠানে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান হত মাসে একবার কিংবা দুবার। অমাবস্যা, চতুর্দশী, ত্রয়োদশী কিংবা ঘন অন্ধকার রাত্রি ছাড়া এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। কারণ অন্ধকার রাত্রিই ভূতপ্রেতের চলাফেরার পক্ষে উপযুক্ত। আবার প্রথম রাত্রি কিংবা শেষ রাত্রি হলে চলবে না। মোটামুটি মধ্যরাত্রি উপযুক্ত সময়। সেবার রাত্রি প্রায় বারোটার সময় অনুষ্ঠানটি হল। বাগানের মধ্যে একটি নির্জন ঘরে অনুষ্ঠানটি হল। আমরা প্রায় কুড়ি/পঁচিশজন লোক সেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। আমি ছাড়া আর সবাই খরিদ্দার অর্থাৎ ভূত চালা থেকে তারা কিছু জানতে চায়। সাধন হালদার আমাদের বলে দিয়েছিল কোন কথা বলা চলবে না, বিড়ি সিগারেট খাওয়া চলবে না, দেশলাই বা কোনরকম আলো জ্বালানো চলবে না। টর্চ নিয়ে 'ভূতচালা' ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ।

অন্ধকার ঘর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। নিজের হাত নিয়ে চোখের সামনে ধরলে ভাল করে বোঝা যায় না। ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা পিঁড়ি পাতা। ঐ পিঁড়ির উপর ভূত আসবে। পাশে একটা পাত্রে কিছু খাবার রাখা আছে। তার মধ্যে দুধ ও কলা আছে। ভূত এসে প্রথমে ঐ খাবারগুলি খাবে তারপর লোকেদের প্রশ্নের জবাব দেবে। এদিন ছিল দুটো ভূতের বৈঠক। একটি মুসলমান ভূত বা মামদো, অন্যজন ব্রহ্মদত্যি। ঘরের এক কোণে সাধন হালদার বসে। সামনে কিছু উপচার।

আমরা কুড়ি/পঁচিশজন নিঃশব্দে দুরু দুরু বক্ষে বসে আছি। ভূত বলে ব্যাপার। একটু আধটু ভয়তো থাকবেই। ওদিকে সাধন ধ্যানে বসেছে। মন্ত্র পড়ছে—ভূতকে চালনা করে নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর পিঁড়িতে খট্‌খট্ শব্দ হল। আমার পাশের একজন ফিসফিস করে বলল—ভূত এসেছে। তারপর কচর মচর করে খাদ্য ও কলা খাওয়ার শব্দ হল, শেষে দুধ পানের শব্দ। একটু পরে নাকি সুরের কথা শুনতে পাওয়া গেল—সাঁধন, সাঁধন আমি এঁসেছি। ঘরের কোন থেকে সাধন জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি বাবা? ভূত উত্তর করল—আমি ব্রহ্মদত্যি। যজ্ঞের

পাড়ার বেলগাছে থাকে। এরপর বিভিন্ন জন হরেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। ব্রহ্মদত্যি মহাশয়ও উত্তর দিল। সে সব কথোপকথন আজ আর মনে নেই। প্রশ্নোত্তরপর্বের শেষে ব্রহ্মদত্যি চলে গেল পিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ তুলে। বলে গেল যাবার সময় চৌরাস্তার বটগাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যাবে তার আসার কিংবা চলে যাওয়ার নিদর্শনস্বরূপ।

কিছুক্ষণের জন্য বিরতি। সাধন আবার আসনে বসে জপ শুরু করল—আর কি সব করছিল অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলনা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আবার পিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ। আমার খুব মনে আছে দ্বিতীয়বারে পিঁড়িতে বেশ জোরে জোরে খট্ খট্ শব্দ হয়েছিল। এবারে এলেন মামদো। মামদোর গায়ে জোর বেশি—তাই পিঁড়ির আওয়াজে বেশ জোর। এরপর হল কি—খাদ্য খেয়ে মামদো তো থু থু করল। নাকি সুরে বেশ জোরে জোরে বলল— সাধন, এসব কি রেখেছিস। এসব তোর ঐ চালকলা গেলা বামুন কে দিস। আমাকে দিবি না। আমি কি খাই তুই জানিস না। সাধন সম্ভবত হাতজোড় করে বলল—কারণ অন্ধকারে হাতজোড় করাটা দেখা যাচ্ছিল না—ভুল হয়েছে মিঞাসাহেব কিংবা ওই গোছের কোন সম্বোধন। আজকের মত দয়া করে যেন সেরে নেন। এরপর প্রশ্ন ও উত্তরের পালা। কথোপকথনের মাঝে মাঝে মামদো বেশ গালাগালি করছিল এবং ধমক দিচ্ছিল। মনে আছে এক জনের গরু চুরি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তরে মামদো মশায় ধমকে বলেছিল যে তার গরু হারিয়ে গিয়েছে আর সে কি না চুরির ব্যাপারে জানতে এসেছে। শেষে মামদো একটা জায়গায় নির্দেশ দিল—সেখানে গেলে সে গরু পেয়ে যাবে। এইভাবে বেশ কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে যাবার পর একটা কাণ্ড ঘটল। আমাদের দর্শকদের মধ্যে কে একজন লুকিয়ে টর্চ এনেছিল। হঠাৎ টর্চ জ্বালল। তখন ঘরের মধ্যে হুটিপুটি কাণ্ড। পিঁড়িটিডি উল্টিয়ে কে একজন কালো কাপড়ে ঢাকা মানুষের আকৃতি খোলা দরজা দিয়ে পড়ি কি মরি করে হুমড়ি খেয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। অনেকটা সাধনের ভাইয়ের মত মনে হল। তারপর সাধনের কি তর্জন গর্জন ঝগড়া।

এই হল 'ভূত চালা'র ব্যাপার। উপরের ঘটনাটা বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা নিয়ে সংশয় জাগতে পারে। আসলে ভূত বলে কিছু আছে কি না এ তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি। কিন্তু ভূতের প্রতি বিশ্বাস আজও মানুষের মনে স্থায়ী বাসা বেঁধে আছে। সুতরাং ভূতকে চালনা করা যায়, আর ভূত তো সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী বলে মানুষের ধারণা, তাই তাকে দিয়ে রোগ প্রতিকার, হারানো জিনিসের উদ্ধার, চুরির হদিশ প্রভৃতি করানো যায়। লোক-সমাজের এই সহজ বিশ্বাস ও সংস্কারকে পুঁজি করেই গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠেছে 'ভূত চালা' কেন্দ্র।

কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা অন্যরকম। 'ভূত চালা'র নাম করে কিছু অসাধু মন্ত্র-ব্যবসায়ী, গুণিন প্রভৃতি মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অর্থ উপার্জন করে চলেছে। গ্রামে গঞ্জের সহায় সম্বলহীন মানুষ সস্তায় ফললাভের আশায় এদের দ্বারস্থ হচ্ছে। তারা যে ঠকছে সে সম্পর্কে তাদের হুঁশ নেই। উপরন্তু কেউ সতর্ক করে দিলে তার উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে—এমনই এদের সংস্কারান্ধতা, এমনই গভীর বিশ্বাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি এই সব নলচালা, কড়ি চালা, বাটি চালা, কুলা চালা, হাত চালা, ভূত চালা, জল পড়া, নুন পড়া, তেল পড়া, হলুদ পড়া—সবই মানুষকে ঠকানো, মানুষকে বোকা বানানোর কিছু কৌশল মাত্র। যেমন যাদুকর যাদু প্রদর্শনী করে, তখন কোন খেলা দেখে আমরা মুগ্ধ হই—সত্য ভেবে ভুল করি। গুণিনরাও এক ধরনের যাদুকর। কীভাবে মানুষকে মোহিত করে, বোকা বানিয়ে পয়সা উপার্জন করা যায় সে কায়দা তারা জানে।

আজও ওঝাগার, গুণিনাগার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু মানুষের পেশা। সুতরাং সত্য মিথ্যা যাই হোক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবনে এর যে একটা ভূমিকা আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

দর্পন মন্ত্র : জলদর্পণ, তৈলদর্পণ ইত্যাদি

বিভিন্ন পুরাণ ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তন্ত্র-মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী, নানাবিধ উপাখ্যানের কথা জানা যায়। মন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরার নানাবিধ কাহিনীর কথাও আমরা জানতে পারি এই সব প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্যে। এই রকম সেকালের এক কাহিনীতে জানা যায় এক ব্যক্তি এক অনার্য নারীর (মা) কাছ থেকে একটি মন্ত্র শিক্ষা করেন, যে মন্ত্র আওড়ালে চোরের পায়ের চিহ্ন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তারপর সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চোর ধরা সম্ভব হয় এবং চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ করতে পারা যায়। 'পদচিহ্নকুশলী' এই ব্যক্তির কাহিনী থেকে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যায়—(১) প্রাচীনকালে মন্ত্রশক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো এবং মন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরার পদ্ধতি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। (২) কিছু কিছু মানুষ এই মন্ত্রশক্তি আয়ত্ত করেছিলেন। (৩) সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও মন্ত্রশক্তির প্রচলন ছিল।

এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই গুলির ধারাবাহিকতা বর্তমান সমাজে বজায় আছে। গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় তন্ত্র-মন্ত্রের উপর মানুষের বিশ্বাস আজও অটুট আছে। আজও মন্ত্রকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে মন্ত্রশক্তির ব্যাপক প্রচলন আছে। নিম্নবর্ণের বহু মানুষ ওঝা-গুণিন হিসাবে সমাজে পরিচিত। আর মন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরার পদ্ধতি আজও সমাজে প্রচলিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরার অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে 'দর্পণ' নামক পদ্ধতিগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই 'দর্পণ' মন্ত্রের সাহায্যে ওঝা গুণিন চোরধরা, চুরি যাওয়া সামগ্রীর হদিশ করা, হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সন্ধান করা, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করা, শত্রুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হওয়া, ভূতপ্রেতের আকর্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, ক্ষতিকারী ও ক্ষতিকারিনী নারীপুরুষের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক হদিশ পাওয়া প্রভৃতি কাজও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করতে পারেন। এগুলির মধ্যে 'জলদর্পণ', 'নখদর্পণ', 'সিঁদুর দর্পণ', 'তৈল দর্পণ' প্রভৃতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এক শ্রেণীর ওঝা-গুণিন এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। এটাই তাঁদের পেশা। এই করেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা যেমন হয়, তেমনি সমাজে মান-সম্মান অর্জন করেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এখন নানারকম 'দর্পণ' সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 'দর্পণ' মানে 'আয়না' বা 'আরশি'—যার দ্বারা কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয়। [সং. √ দৃপ্ (=হর্ষ) + অন (র্তৃ)]। দর্পণে যেমন যে বস্তু দর্পণের সামনে থাকে, তার প্রতিবিম্ব পড়ে; তেমনি 'দর্পণ' মন্ত্রের সাহায্যে চোর বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

জলদর্পণ : জলকে আয়নার মত ব্যবহার করে মূর্তি প্রতিবিম্বিত করা হয়। সাধারণতঃ চোর ধরার কাজে 'জলদর্পণ' করা হয়। একটি পাত্রে কিছু পরিষ্কার জল রেখে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া হয়। তখন জলের মধ্যে যে লোক চুরি করেছে তার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে বলে জনশ্রুতি আছে। চুরি ছাড়া অন্য কাজেও জলদর্পণ করা হয়।

তৈলদর্পণ : জলদর্পণের মত তৈলদর্পণ বা তেলদর্পণের পদ্ধতি। কেবল জলের পরিবর্তে একটি পরিষ্কার পাত্রে সরষের তেল রাখা হয়। তেল দর্পণেও চোর, শত্রু, দুষ্ট লোক প্রভৃতির প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

নখদর্পণ : সাধারণতঃ বড়ো আঙুলের নখে তেল মাখান হয়। তখন নখটি চকচক করে। এবার মন্ত্র পড়ে ফু দেওয়া হয়। তখন নখের মধ্যে উদ্দিষ্ট মানুষের মুখ ফুটে ওঠে বলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এইভাবে চোর শত্রু প্রভৃতি চিহ্নিত করা যায়।

সিঁদুর দর্পণ : 'সিঁদুর দর্পণ' প্রধানতঃ চোর ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি আয়নার কিছু অংশে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে সেখানে ফুঁ দেওয়া হয়। তখন সিঁদুরের মধ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখ কিংবা আকৃতি ফুটে ওঠে। তখন তাকে চিহ্নিত করা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় উপরোক্ত চারপ্রকার 'দর্পণ' প্রচলিত। আরও কিছু কিছু দর্পণ এর কথা শোনা যায়। কিন্তু সেগুলির খুব একটা প্রচলন নেই। তাছাড়া উপরোক্ত দর্পণগুলিতে গুণিনরা যেমন সফল হয় অন্যান্য 'দর্পণে' তেমন সফলতা পায় না বলে তাদের বিশ্বাস। এই সম্পর্কে ওঝা-গুণিনদের মতামত হল—যে কোন তরল এবং স্বচ্ছ বস্তু যাতে প্রতিফলন ঘটে তা 'দর্পন'-এর পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ যে কোন তরল ও স্বচ্ছ বস্তুর 'দর্পণ' করা যায়, তবে পূর্বোক্তগুলি জনপ্রিয়। তাই এগুলিই প্রচলিত আছে।

এ যাবৎকাল যে সমস্ত মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং যাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এখন সেই সমস্ত মন্ত্রের কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া হবে এবং তাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও ভাষাগত দিকটি তুলে ধরা হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মন্ত্রগুলি সংগৃহীত। সংশ্লিষ্ট গুণিনদের অনুরোধে তাদের নামঠিকানা প্রকাশ করা হবে না। কয়েকজন মানুষের বাড়ি থেকে কিছু মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। যেগুলি অনাদরে অবহেলায় তাদের বিভিন্ন কাগজপত্রের মধ্যে পড়েছিল। এগুলির ওঝা-গুণিন কে তা জানা যায়নি। সেই বাড়ীর কেউ হয়ত এগুলির চর্চা করত।

জল পড়ার মন্ত্র :

ওং পানীত পানী গঙ্গা দেবির পানী
মাটীর ঘটে পুরিইলে আজ্ঞি কহিলা
বার তিয়া খাইলা সাপ রোমে রোমে তার
ভেদিলাক বিষ এমিকি গুরুদের কীররা
কিস এমিকি গুরুদের যানতি পানী—
গর্ভ ভিতর বিষ আনন্তি ছালিবে বিষ
যা ভষ্ম তবাজগায়াত কঁটররি॥
ওং অন্ধ হেলে, চন্দ্র উদে হেলে অনু
লাগিলা কি ডঙ্ক কাঁপাইলা তনুঃ
হুংকারি কস্যো গন্ডুর পার্বতি তুলিলে
পানী এসবে বইলে ত্রিশূল যাবে বিষ জ্বলি॥

[এই মন্ত্রে জল পড়িয়া যে ডাকিতে আসিবে তাহাকে খাইতে দিবে।]

এই মন্ত্রটি জল পড়ার মন্ত্র। তবে সাপে কাটার পর যে জলপড়া দেওয়া হয় সেই মন্ত্র। যেমনটি সংগৃহীত হয়েছে তেমনি হুবহু তুলে দেওয়া হল।

এখন এই মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় অনুধাবন করা যায়। **প্রথমত**, মন্ত্রটির মধ্যে যে শব্দ ও বাক্যগুলি আছে সেগুলি অসংলগ্ন, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগহীন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। **দ্বিতীয়ত**, বাক্যগুলি অপূর্ণ- সুগঠিত নয়। **তৃতীয়ত**, বাক্যগুলির কোন সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। **চতুর্থত**, কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলির অর্থ একেবারে বোঝা যায় না। **পঞ্চমত**, বানান ভুল। মন্ত্রের ক্রিয়া উচ্চারণে- সেজন্য বানান ভুলকে অগ্রাহ্য করা চলে। তাছাড়া যে গুণিন এটি লিখেছিলেন---তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমানের হতে পারে। সে কারণে তাঁর বানান সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকতে পারে।

শব্দ ব্রহ্ম। ঠিক ঠিক শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়ে যথাস্থানে প্রযুক্ত হলে তার ক্রিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য মন্ত্রটির শব্দ তথা ধ্বনি ঠিক ঠিক উচ্চারিত হলে এবং যথাস্থানে প্রয়োগ করলে এর কি ক্রিয়া হতে পারে তা বোঝা যায় না। এটি যদি সত্যই সর্পবিষ নিবারণের জন্য জলপড়ার মন্ত্র হয় তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এই ওঝা-গুণিনের মন্ত্র-ব্যাপারটাই ভাঁওতাবাজি। গুণিনরা কোন মন্ত্র এমন জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করেন যে তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে হুংকার দেন, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করেন, ভয় দেখান এবং কণ্ঠস্বর কখনো উঁচু কখনও নীচু করে এমন বিকট ব্যাপার করেন এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু দ্রব্য ব্যবহার করেন তাতে মানুষ সম্মোহিত হয়ে যায়। ভূত ছাড়ান চোর ধরা প্রভৃতির পক্ষে এই কায়দাগুলো খুব কার্যকরী।

এখন আর একটি জলপড়ার মন্ত্র হুবহু তুলে দেওয়া হচ্ছে---

জল জল জল বারি বারি বারি।
নদীর জল, সাগরের বারি, সপ্তসমুদ্রের বারি
দেবীর ঘটের বারি আমার পাত্রে আসুক।
গুরুর আজ্ঞায় পাড়লাম ফুঁক
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের বারি লাগুক।
ব্যথা বেদনা ভাল হয়ে যাক
হাজা মজা ভাল হয়ে যাক।
মা কালীর আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

এই মন্ত্রটি ব্যথা বেদনা নিবারণের জন্য জলপড়ার মন্ত্র।

এই মন্ত্রটি একটি কবিতার মত। শব্দবাক্য সুগঠিত। এখানে আদেশ কাড়া আছে। প্রথম মন্ত্রটির সঙ্গে এটির বিরাট পার্থক্য। এটির মন্ত্রশক্তি কতখানি আছে তা জানা যায় না তবে এটিকে সুর সংযোগে সুষ্ঠভাবে উচ্চারণ করলে এবং বারবার আবৃত্তি করলে মানুষের মনে প্রভাব ফেলা যেতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

আর একটি জল পড়ার মন্ত্র :

কাট্যারি কাট্যারি কাট্যারি
পরশুরামের কুঠার, রামের বাণ, ইন্দ্রের বজ্র,
কৃষ্ণের চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল আর মাকালীর খাঁড়া।
যেখানে পাঠাব, সেখানে কাটুক।

ভূত কাটুক, প্রেত কাটুক, ডাকিনী কাটুক,
শাকিনী, যোগিনী, যক্ষ রক্ষ কাটুক।
ও বাণ ছিন্নের দোহাই, নাড়ীদা' কাটুক
আপন বাবা কাটুক, পোড়াজ্বালা কাটুক ॥
কাটু কাটু কাটু বাণ শ্রীরামচন্দ্র
স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে যেখানে থাকবে কাটু।
মা মনসার আজ্ঞে
হাড় ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
রামসীতার আজ্ঞে।

[এই জলপড়ায় ডান, ভূত, প্রেত, শাঁকিনী, যোগিনী, পরী, দানো, পোড়া বাণ, জ্বালা বাণ, নজর দোষ প্রভৃতি কাটান ছাড়ান করা যাবে। তিনবার মন্ত্র পড়ে তিনটি ফুঁক দিতে হবে জলে। ঐ জল তিন ঢোকে খেতে হবে। সকালের বাসি জল হলে চলবে না। ঘটিতে এক ডুবে জল তুলতে হবে।]

আলোচ্য মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। যদিও শব্দ ও বাক্যের গঠন বজায় আছে, তবুও কথাগুলি অকিঞ্চিৎকর। এইভাবে কোন কিছু কাটতে বললে সেটি কাটা যাবে কিংবা ভূত চাপলে এই মামুলি বাক্য বললে ভূত ছেড়ে যাবে এমন বিশ্বাস করা যায় না। যদিও ওঝা-গুণিনদের অঙ্গভঙ্গি ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়াশীল দ্রব্যের ব্যবহার আছে, তবুও সমগ্র প্রক্রিয়াটি যে যথার্থ কার্যকরী এমন কথা স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়।

তেল পড়া, চুন পড়া, নুন পড়া ইত্যাদি মন্ত্র :

'জলপড়া'র মত 'তেল পড়া', 'নুন পড়া', 'চুন পড়া', 'সরিষা পড়া' 'হলুদ পড়া' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি আলোচনা করলে একটি কথা প্রতিপাদিত হয়—এইগুলি অসার এবং কতকগুলি হাস্যকর অপুষ্ট, অপূর্ণ, অসংলগ্ন, অবান্তর, অসংযত, অশ্লীল বাক্যে গঠিত কিছু কিছু মানুষের খেয়ালীপনার ভাঁওতাবাজির উদাহরণ। এইরকম বাক্যে তথা শব্দে বা ধ্বনিতে কোন শক্তি নিহিত থাকতে পারে যা দিয়ে মানুষের রোগের প্রতিকার করা যায়, যন্ত্রণার নিরাময় করা যায়, দুর্দশার অবসান ঘটানো যায়—একথা মেনে নেওয়া শক্ত। কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন না হলে কোন যুক্তিবাদী সুস্থমস্তিষ্কের মানুষ মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কতকগুলি মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি হুবহু এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে—

তেল পড়া

রাম খোলে তিঁউড়ী সীতা রাঁধে ভাত
সেই আগুনে পুড়ে গেল অমুকের হাত।
না ফোস্কে, না পাকে, না হয় ঘা
আমার এই তেলপড়ায় জল হয়ে যা ॥
কার আজ্ঞে—
রাম লক্ষ্মণ সীতার আজ্ঞে।

এই তেল পড়ার মন্ত্রটি হাস্যকর। এটি আগুনে পোড়ার জন্য তেলপড়ার মন্ত্র। এটির মধ্যে কি শক্তি নিহিত থাকতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না।

চুন পড়া

চুন চুন পড়াতে জল হাড়ের ঘর চামের কুঁড়ে
মর বিষ তুই চুনে পড়ে।
হাড়ার কোমরের বিষ অমুকের অঙ্গেও বিষ
সাপা সাপিনার বিষ,
চৌসাপা মাকড়সার বিষ মর তুই চুনে পড়ে।
কার আজ্ঞে—
শ্রীদেবী মনসার আজ্ঞে
আমার এই চুনপড়া অমুকের অঙ্গে শীঘ্র লাগ।।

মন্ত্রের বদলে এটাকে যদি একটা গদ্য কবিতা বলে ভাবা যায় তা হলে বোধ হয় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। আলোচনা করলে দেখা যায় মন্ত্রটি সাপের বিষ, মাকড়সার বিষ নাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এতে যে কি শক্তি থাকতে পারে তা কেবল গুণিনরা জানে—আমাদের বোধগম্য হয় না।

নুন পড়া

সাগরের নুন, মাটির নুন—নুন নুন
সিন্দুক নুন, যে খায় তার গুণ।
এ নুন কে পড়ে।
দেবাদিদেব মহাদেব পড়ে আর মাতা পার্বতী পড়ে।
এ নুন কে খায়।
বাত ব্যথা পেটের রুগী খায়।
কার আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে, হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
শিব পার্বতীর আজ্ঞে আর গুরুর আজ্ঞে
পেট কামড়ানি ধড়ফড়ানি ভাল হয়ে যা
অম্বল ব্যথা দূর হয়ে যা।

[বৃদ্ধা, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী—এই তিনটে আঙুল দিয়ে সৈন্ধব লবণ তুলে মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে রোগীকে খেতে দিতে হবে।]

হলুদ পড়া

হলুদ হলুদ হলুদ কলুদ বনে হলুদ।
বড় বড় গাঁট, সরু সরু আঁশ।
কাটা নয়, গোটা নয়—শুধুই বাটা
শুকো নয়, পচা নয়—কাঁচা কাঁচা কাঁচা।
মা পার্বতীর পা ধুইয়ে দিলাম জল
বিষ গেল, বিষ গেল সর্ববিষ নাশ।
কার আজ্ঞে
ঈশ্বর শিবের আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে
কাঁউরের কামিক্ষের আজ্ঞে।

গুরুর আজ্ঞে
রাম সীতার আজ্ঞে।

[তিনখানি কাঁচা হলুদ ভাল করে ধুয়ে বেটে তার সঙ্গে দেবদেশীর চ্যামেও মিশিয়ে রোগীকে খেতে দিলে গরল বিষ ভাল হয়ে যায়। আবার কিছুটা গরল দষ্টস্থানে লাগাতে হবে। তিনবার মন্ত্র পড়ে ফু দিতে হবে।]

মরিচ পড়া

গাছের মরিচ মানুষের লাগে ঝাল
শরীরে বিষ লাগে তারও লাগে ঝাল।
ঝালে ঝালে বিষ ক্ষয় মহাদেবের আজ্ঞে।
মরিচ মরিচ মরিচ মরিচ তুই বিষ
কালকূট বিষের ক্ষয় শীঘ্র করে দিস॥
হে মহাদেব কালকূট বিষ হর হর
দেবী পার্বতীর আজ্ঞে, গুরুর আজ্ঞে
অমুকের শরীরের বিষ শীঘ্র জল কর
বিষ নাই বিষ নাই বিষ গেল পাতালে
এই সাদা মরিচে ফুঁ দিলাম
অমুকের বেদনা যা, বিষ চলে যা।
বিষহরি বাইয়ের আজ্ঞে॥

[একুশটি সাদা মরিচ নিয়ে তিনবার মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। এরপর সেগুলি বেটে চারভাগের একভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে খেতে দিতে হবে। একভাগ দংশনস্থানে লাগিয়ে তার উপর কলাপাতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। একভাগ আ-চলা পুকুরে ফেলে দিতে হবে। শেষ ভাগ মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এই মরিচ পড়া সাপ, বিছা, মাকড়সা, বিষ পিঁপড়া এবং অন্যান্য বিষাক্ত পোকার দংশন বিষ থেকে রক্ষা করবে।]

এই মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিষে বিষে বিষক্ষয় এর তত্ত্বটি এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। বিষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ কালকূট বিষ যেহেতু সমুদ্র থেকে উঠেছিল, সেই জন্য সমস্ত বিষকে জলতল তথা পাতালে পাঠানো হচ্ছে—তাহলে পৃথিবী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এর ফলে রোগী বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল সাপ, বিছা কিংবা কোন বিষাক্ত পোকার কামড়ে মানুষের শরীরে বিষ প্রবেশ করেছে, সেই বিষকে কোন দেবতা বা দেবীর নামে 'আজ্ঞা' করে পাতালে চলে যেতে বলা হল, আর বিষ অমনি চলে গেল। বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযায়ী বলা যায় প্রত্যেক ক্রিয়া তথা কার্যের ফল (effect) থাকে। এখানে মামুলি ওই কয়টি শব্দ ও বাক্য মানুষের শরীরে কি ধরনের ক্রিয়া ঘটাতে পারে যাতে শরীরের বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরে যে বিষ প্রবেশ করেছে যদি তার যথার্থ প্রতিষেধক প্রবেশ করানো যায় তবে প্রথমোক্ত বিষের নাশ ঘটানো সম্ভব। তা হলে ওঝা গুণিনকে মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষনাশক দ্রব্য রোগীর শরীরে প্রবেশ করাতে হবে। এটা যদি কোন গুণিন করতে পারেন, তাহলে তিনি সফল হবেন আর তখন এ কথাটিও বলা যাবে তিনি গুণিন নন, তিনি চিকিৎসক। তখন আর মন্ত্রের প্রয়োজন হবে না।

সিঁদুর পড়া

সিঁদুর সিঁদুর সিঁদুর মেটে সিঁদুর, চিনা সিঁদুর
ব্যাঙের মাথার সিঁদুর।
সেই সিঁদুরের দিলাম ফোঁটা
সিঁদুর বলে তুই কার বেটা।
অমুকের কপালে দিলাম ফোঁটা
অমুক হল গাড়ল পাঁঠা।
তার কান ধরে টানবো নাকে দড়ি ঘোরাবো
যা বলবো তাই করবে।
কার আজ্ঞে
কামরূপ কামিক্ষে মার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
দেব মহাদেবের আজ্ঞে
জয়গুরুর আজ্ঞে॥

[বাজার থেকে মেটে সিঁদুর কিংবা চিনা সিঁদুর কিনে তা ব্যাঙের মাথায় লাগাতে হবে। তারপর এই মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে। তারপর ঐ সিঁদুর কোন স্ত্রী নিজের কপালে পরে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাস করলে বারমুখো স্বামী একেবারে বশ হয়ে যাবে।]

উপরোক্ত মন্ত্রটি পড়লে হাস্যকর এবং বালকোচিত বলে মনে হয়। আরও সবচেয়ে হাসির কথা হল ব্যাঙের মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে তাতে মন্ত্র পড়তে হবে। আসলে মন্ত্রের শক্তির গুরুত্ব বোঝাতে এই উদ্ভট ব্যাপারটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী তার স্বভাব, আচার আচরণ, সেবা ও অন্যান্য গুণের দ্বারা স্বামীকে বশ করে। সেখানে মন্ত্রের ভড়ং কেন ?

পুরুষ যেমন বারমুখো হয় তেমনি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরও পরপুরুষে আকর্ষণ থাকে। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে সব দেশে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ও এই জাতীয় স্ত্রীলোকের সন্ধান মেলে। খেটে খাওয়া মানুষ সারাদিনের পর কর্মক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যদি স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা না পায় তাহলে জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, মন বেদনায় ভরে ওঠে। তাই দুষ্টা স্ত্রীকে বশ করার জন্য ওঝা-গুণিনরা 'পানপড়া', 'ফুলপড়া' প্রয়োগ করেন।

পান পড়া

সাঁচি পান মিঠা পান, আর ঝাল পান
গেছো পান বরজের পান সকল সমান,
পানের যতেক গুণ চুন খয়ের সুপারিতে
নানা বিধ মশলা দাও-তাহার সঙ্গেতে॥
খোলা নয়, এলো নয় খিলি সাজা পান
যে পান খেলে দেব দেব মহাদেব টলে যান।
সেই পান খা তুই ছুঁচো মুখী বারমুখী মাগী
দেবের কিরপায় তোর ভাল মতি হোক।

আমাবএই পান পড়া লাগে তাক, না লাগে তুক
কুলটাব মতি গতি ভাল হযে যাক।
কাব আজ্ঞে—
বাবা মহাদেবেব আজ্ঞে,
বামসীতাব আজ্ঞে
হাড়ি ঝি চণ্ডীব আজ্ঞে।

[শনিবাবেব বাববেলায বউনিব সময পান সুপারি খযেব ও সুগন্ধি মশলা কিনতে হবে। ভাল কবে পান সেজে তাতে তিনবাব মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হবে। তাবপব ঐ পান দুষ্টা স্ত্রীকে খাইয়ে শুদ্ধভাবে তাব সঙ্গে বাত্রিবাস কবতে হবে। তাহলে সেই স্ত্রী বশীভূতা হবে।]

'ফুলপড়া' ও এমনি 'পান পড়া'ব মত মন্ত্র। একটি ফুল হলে স্ত্রীব হাতে দিতে হবে, অনেক ফুল হলে মালা গেঁথে গলায পবাতে হবে। সেই সঙ্গে চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে স্ত্রীব সঙ্গে পবিত্র হযে বাত্রি বাস কবতে হবে। তাহলে পবপুরুষে আসক্তা স্ত্রী পতিগতপ্রাণা হযে উঠবে।

আসলে যৌন সম্বন্ধই হল স্বামী-স্ত্রী সুসম্পর্কেব প্রথম ও শেষ কথা। সেখানে কোন মন্ত্রেব প্রযোজন হয না।

বিষ ঝাড়ন : একদিন গ্রামেব পথ দিযে যাচ্ছিলাম। একটা বাড়ীব ভিতব থেকে হঠাৎ ঝগড়াব শব্দ কানে এল। 'দাঁড়াবে আঁটকুড়িব ব্যাটা, ফল্লা বাড়ী আসুক, তোব বিষ ঝেড়ে দেবে।' প্রতিপক্ষ উত্তবে কি বলেছিল, আজ তা ঠিক ঠাক মনে নেই। শুধু ওই একটা বাক্যই আমাব কানে বেজে উঠেছিল—কাবণ ওই বাক্যেব মধ্যে তিনটি শব্দ আমাব চেতনায় ঘা দিযেছিল। সেই তিনটি শব্দ হল—'বিষ ঝেড়ে দেবে।' এই তিনটি শব্দেব মধ্য দিযে বক্তা সেদিন প্রতিপক্ষকে প্রহাবেব ভয দেখিযেছিল। 'ঝাড়ন' 'ঝাড়া, 'ঝেড়ে দেওযা' প্রভৃতি শব্দেব সঙ্গে প্রহাব বা শাবীবিক নির্যাতনেব যোগ আছে। এ থেকে আজকাল 'ঝাড় দেওযা' কথা চালু হযেছে।

যাই হোক 'বিষ ঝাড়া', 'ঝাড়া' কিংবা 'ঝাড়ন' শব্দ গ্রামেব মানুষেব কাছে সুপবিচিত। ওঝা গুণিনেব দৌলতে বিষেব ঝাড়ন ব্যাপাবটিতে গ্রামেব মানুষ এমনই অভ্যস্ত যে প্রাত্যহিক জীবনেব কথাবার্তাতেও তাব ব্যবহাব ঘটে চলেছে। এই ঝাড়নেব সঙ্গে প্রহাবেব কেমন সম্পর্ক সে সম্পর্কে গ্রামেব মানুষ ভুক্তভোগী। এক ভূত চালাব ঘটনায এক গুণিনকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁটাপেটা কবতে দেখেছি এক মাঝবযসী লোককে। মন্ত্র পড়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড প্রহাব। মন্ত্রেব ভাষা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেবল গুণিনেব মুখ থেকে চড়া গলাব এবং নীচু গলাব কিছু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—সে সব ছাপিযে ঝাঁটা পেটাব শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে। ঝাঁটাব চোটে আধ ঘণ্টাব মধ্যে ভূত ছেড়ে গেল। একেই বলে ঝাড়ন।

ওঝা-গুণিনেব কাছে এই ঝাড়ন মন্ত্রেব বড় সমাদব। এই ঝাড়ন মন্ত্রেব মধ্য দিযে তাবা যা খুশি তাই বলতে পাবেন। এই মন্ত্রেব মধ্যেই অশ্লীল শব্দেব ব্যবহার বেশি হয়। পেত্নী, শাঁখিনী, ডাকিনী ঝাড়ান গুণিনবা অশ্লীল শব্দ বেশি ব্যবহার করেন। যে গুণিন যত বেশি খিস্তি খেউড় কবতে পাবেন, তাব মন্ত্রে ফল হয় বেশি এমন একটা কথা গুণিন সমাজে প্রচলিত আছে। কাবণ প্রেতযোনি তো এত সহজ কিংবা সাদাসিধা নয় যে যাও বললেই চলে যাবে। তাই বেশি পবিমাণে গালাগালি কবতে হয, খিস্তি খেউড় কবতে হয়। এটাই গুণিন সমাজেব চল বা বীতি বলে লোকেব ধাবণা।

পূর্বে এই 'ঝাড়ন' মন্ত্র নিয়ে আলোচনা কবা হয়েছে এখন এই মন্ত্রেব উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে—

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে বাখি—অশ্লীল শব্দযুক্ত ঝাড়ন মন্ত্রগুলি প্রকাশ কবা যাবে না। এতে যৌনাঙ্গ এবং যৌনক্রিয়া বিষযক অশ্লীল শব্দই বেশি, সঙ্গত কাবণে এদেব উদাহবণ দিচ্ছি না। তাছাড়া যে যে ওঝা গুণিনেব কাছ থেকে সংগ্রহ কবেছি তাঁদেব কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এই মন্ত্রগুলি প্রকাশ কবব না।

এখন একটা বিষ ঝাড়নেব উদাহবণ দিচ্ছি—

বিষঝাড়ন

আয় আয আয় মাগো আয বলি তোবে,
তোব বালক স্মবণ কবে এস মা আসবে,
আমাব আসব ছেড়ে যদি অন্য আসবে যাও
দোহাই শিবে তোব ভক্তেব মাথা খাও।
আয গো নেতো ধুপুনী মাযেব চামব ঢুলাও।
নেতো ধুপুনী কাপড কাচে মন পবনেব খাবে
বনেব সাপ ডেকে এনে আপন পুত মাবে।
আপন পুত মেবে ধুপুনী আপনি হোল বোঝা,
কাপড় কেচে ধুপুনী বাঁধিল বোঝা।
চিও পুত ঘবে যাও বিষ নাই কো তোব গায
পদম হুহুঙ্কাবে বিষ হাসীযে ওলায
হব বিষ হব
অমুকাব অঙ্গেব বিষ খা
নেই বিষ অমুকাব সঙ্গে
মা জয় বিষহবিব আজ্ঞে॥

এটি সর্পবিষ ঝাড়নেব মন্ত্র। সাপে কাটা বোগীব গাযে মন্ত্রটি পড়ে তিনবাব ফুঁ দিতে হবে। যে কোন বকম বিষাক্ত সাপেব ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

মন্ত্রেব ভাষা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নেতা ধোপানীব গল্প এনে বলা হল—অমুকেব অঙ্গে বিষ নেই। এতে যদি সাপে কাটা বোগীব বিষ চলে যায় তাহলে এব থেকে বিস্ময়েব আব কি আছে!

আব একটি ঝাড়ন মন্ত্রেব উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

বিষ ঝাড়ন

মনসাব চবণ বন্ধ মস্তকেব পাকে যতেক দেবতা বন্ধ, যেবা যেথায় থাক রোজা ধন্বন্তরি বন্ধ। ছত্রকুটি শিষ একে একে বন্দিলাম দুনিয়ার যত জীব, দুনিয়াব যত জীবেব রক্ত। কি কহিবে কথা যারে বিধি বাম। তবে কি করে দেবতা? এত যে দেবতা থাকিতে মনসার সনে বাদ। এইরূপে চাঁদবেনের হইল সর্বনাশ। সাত পুত্র মরিল তার, সাত বধূ রাঁড়ি, কালিদহে সপ্তডিঙ্গা হইল ভরা ডুবি। এমত মনসা মায়া কে বুঝিতে পারে। নগরে হইল পূজা প্রতি ঘরে ঘরে। গুরুর চরণ বন্দ সেল্যাম করিয়ে দিক্কে গুরু বন্দিলাম একমনা হইয়ে। ডাকিনী যোগিনী মায়ের করিলাম স্মরণ। বিনা অপরাধে যে-মোর আসরে আসিয়ে যে করেছিল ঘা চণ্ডালিয়ে সাপ তারে ধরে খা। চণ্ডালিয়ে সাপের মাথায় ফুল ছোট বড় দুটি বিষ [illegible] সমতুল। নাই [illegible] বিষ [illegible]

কারস ডর। অমুকার অঙ্গের বিষ দা মুখে মর নিই বিষ অমুকার অঙ্গের। মা জয় বিষহরির আজ্ঞে— [এই মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে।]

উল্লিখিত মন্ত্রটি গদ্যের আকারে লেখা আবার মাঝে মাঝে পদ্যের মত মিল আছে। এটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথম অংশে বন্দনা— সমস্ত দেবতা, বোজা বা ওঝা, পীর প্রভৃতিকে বন্দনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মনসার সঙ্গে বাদ করায় চাঁদ সদাগরের সর্বনাশের কথা। তৃতীয় অংশে বলা হল—অমুকের অঙ্গে বিষ নেই, শেষে মা বিষহরির আজ্ঞা কাড়া হল। এই হল মন্ত্র। এতে শরীরের বিষ চলে যাবে? মরনোন্মুখ মানুষ বেঁচে উঠবে? কোন যুক্তি ব্যাখ্যা দিয়ে এই ব্যাপারটা বোঝা যায় না। শরীরে যদি বিষক্রিয়া হয়, তাহলে প্রতিষেধক ছাড়া কিভাবে সেই বিষ নষ্ট করা সম্ভব? উপরের মামুলি কিছু শব্দ বাক্য তথা ধ্বনি সেই প্রতিষেধকের কাজ করতে পারবে—এমন চিন্তা করা শুধু অযৌক্তিক কিংবা অস্বাভাবিক নয—তা বাতুলতা মাত্র।

আর একটি ঝাড়ন মন্ত্র :

'ধর্ম নিরাঞ্জন বন্দ পুট করি পানি স্বর্ণ আসনে বসিল দিনমণি
হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্ম বন্দ গোড়ুর গোবিন্দ বরুণ কুবের বন্দ।

ঐরাবতে ইন্দ্র মঙ্গলিয়া বোড়ার পৃষ্ঠে করিয়া আসন তাম্বুলিয়ে বোড়া মায়ের তাম্বুল জোগায় বেজে টেবি দড়ি বিশুতিয়ে বোড়া মায়ের চরণ পাপড়ি ফাঁক লিসে বোড়া মায়ের কানের কুণ্ড তেঁতুলিয়া বিছে মায়ের সিতেরি সিন্দুর গোক্ষুরিয়ে চক্ষুরিয়ে বোড়া মায়ের কুলুপিয়ে তাড় অনুমনী বোড়া মায়ের সরস্বতী হার ফণী বংক রাজমাতা নিল হাতে অনকুটী নাগের মাতা জয় জয় বিষহরি জয় দে জয় দে মাগো জয় চমৎকার আর্দ্বির মনসার পায় মোর নমস্কার। গুরুর সোঁপে মোর খেলাইতে সাপ তলে রেখে ডুকুনীউপরে দিলাম হাত। বেঁউড় বাঁশ কড় কড় কাড়ে অশুদ্ধ কাড়ে ঘি শ্মশান ফাটে মড়া মা বাহুড়ে আইসেচি আড়ে ডংক বাড়ে ডংক মড়া কাড়ে বা শ্বরম শ্বরম বিষ দাড়ে কর ভর হর বিষ হর অমুকার অঙ্গের বিষ স্বামুখে মর নিই বিষ অমুকার অঙ্গে জয় বিষহরির আজ্ঞে॥'

মন্ত্রটি যেমন যেমন আছে তেমন তেমন তুলে দেওয়া হল। বানান ভুল, শব্দ বাক্য তথা ভাষার অসঙ্গতি এর সর্বাঙ্গে। এছাড়াও মন্ত্রটিতে আসলে কি বলতে চেয়েছে এবং কি বোঝাতে চেয়েছে গুণিন তা খুব চেষ্টা করেও বোঝা যায় না। 'তেঁতুলিয়া বিছে', 'ফণী', 'বংক', 'অনকুটী নাগের' প্রভৃতি শব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে বিছার বিষ কিংবা সাপের বিষ যে কোন বিষের ক্ষেত্রে এই 'ঝাড়ন' প্রয়োগ করা চলবে। তবে শব্দ গঠন, বাক্য গঠন অসংলগ্ন কোন বিরাম চিহ্ন নেই। অর্থ একেবারে অস্পষ্ট। এই মন্ত্রের কোন শক্তি আছে—এমনটি বিশ্বাস করা যায় না।

এর থেকে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে এই সব গুণিন মন্ত্রের কোন সত্যতা নেই। এগুলি মনে হয় ওঝা গুণিনের চালাকি কিংবা মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল। এই মন্ত্রগুলিই ভুয়া। স্রেফ ধোঁকাবাজি।

এখন একটি ভূতে পাওয়া রোগীর ঝাড়নের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

ভূতে পাওয়া রোগীর ঝাড়ন

"বনের মাঝে রামচন্দ্র বসিয়া আছিল
সীতাদেবী সামনে বসি পান খাচ্ছিল।
এমন সময় শ্রীলক্ষ্মণ এসে উপস্থিত

রামচন্দ্র তাকে কারণ জিজ্ঞাসিল
লক্ষ্মণ বলে আমার দেরির কারণ এই
দক্ষিণের পর্বতের উপর গিয়েছিলাম মুই।
সেখানে আছে ভূতের বাসা বিরাট গুহাতে
অনেক কষ্টে লুকিয়ে আমি দেখি কোনমতে।
ব্রহ্মদত্যি কন্দকাটা, মামদো আর বেগোমুড়ি
সবাই মিলে আনন্দেতে করে জড়াজড়ি।
আরো আছে শাঁকিনি ডাকিনী যোগিনী পরী
কী সব ছিরি তাদের আহা মরি মরি॥
এত শুনি শ্রীরামচন্দ্র তিন ফুঁক পাড়ে
ফুঁকের তেতে ভূতেরা পড়ে কি মরে।
ভূত নেই, প্রেত নেই, শাঁকিনী নেই আর
রামচন্দ্রের ফুঁয়ে সব হয়েছে সাগর পার।
ভূত নেই, ভূত নেই অমুকার অঙ্গে
যা ভূত চলে যা--চলে যা—
কার আজ্ঞে
শ্রীরামসীতার আজ্ঞে।"

রামলক্ষ্মণ-সীতার এই গল্পকে কি মন্ত্র বলা যায় ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার হয়ত কোন প্রয়োজন নেই। পাঠক মাত্রেই এই মন্ত্রটি পাঠ করলে সবই বুঝতে পারবেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামেগঞ্জে এই জিনিস চলে আসছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। মানুষ ঠকছে, তবু তারা এমন সংস্কারান্ধ যে এই সব গুণিন মন্ত্রের অসারতা সম্পর্কে বুঝেও বুঝতে চায় না। এ এক ধাঁধাঁ। আর এরই সুযোগ নিয়ে কিছু চতুর ভাঁওতাবাজ লোক পয়সা উপার্জন করে চলেছে। সমস্ত ব্যাপারটার মূলে আছে কিন্তু অশিক্ষা আর দারিদ্র্য। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে এই ফাঁদ থেকে কে উদ্ধার করবে ? অসহায় মানুষকে ঠকানো, বঞ্চিত করার দিন কবে শেষ হবে ?

কিছু অনিষ্টকারী মন্ত্র : পিষ্টক ভারা, অগ্নিভারা, বোকোস মন্ত্র ইত্যাদি।

আমার জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে। আমার ছেলেবেলা এমনকি যৌবনের অনেকগুলি বছর পর্যন্ত আমার সেখানেই কেটেছে। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে একজন লোক ছিলেন—তাঁর নাম পশুপতি হালদার। জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু পেশায় ছিলেন একজন হকার। দাদ-চুলকানি-খোস-পাঁচড়ার মলম বিক্রি করতেন। তাঁর একটা দোষ ছিল কারোর শরীরে চুলকানি পাঁচড়া দেখলেই গিয়ে টিপে দিতেন তারপর নিজের পকেট থেকে মলম বের করে লাগিয়ে দিতেন। এইভাবে তাঁর মলমের প্রচার হত। মলম তিনি নিজেই বানাতেন। কিন্তু এই লোকটির সম্পর্কে একটা দুর্নাম ছিল—তিনি নাকি 'বোকোস'। বোকোসরা মন্ত্র বলে মানুষের ঘা খায়। কারোর শরীরে চুলকনা-পাঁচড়া-ফোঁড়া কিংবা কাটা ঘা থাকলে তিনি তা খেয়ে নিতেন, সেগুলি আর সারত না। তখন সারাবার জন্য তাঁর মলম কিনতে হত।

পশুপতি হালদারকে আমরা কাকা বলতাম। তিনি আমাদের বাড়ীতে এলে আমার ঠাকুরমা আমাদের সকলকে সাবধান করে দিতেন—আমাদের কারোর শরীরে যদি ঘা-চুলকানি-পাঁচড়া থাকে, সেগুলি যেন ঢেকেঢুকে রাখি। যাতে পশুপতির নজরে না আসে। আমার ঠাকুরমার

মুখে শুনেছিলাম এই যে 'কোস'রা মন্ত্রবলে মানুষের শরীরের ক্ষত থেকে রস টেনে নিয়ে অদৃশ্যভাবে খেয়ে ফেলে। তার সেই রসের স্বাদ নাকি অনেকটা চাঁপা কলার স্বাদের মত।

যাইহোক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এক প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে কিছু দুষ্টলোক (ভাবা মন্ত্র তন্ত্র জানে) কিছু ওঝা-গুণিন শ্রেণীর মানুষ মন্ত্রবলে মানুষের অনিষ্ট করে। এরা মানুষের ক্ষত থেকে রস টেনে নিয়ে খায়, পুকুরের মাছ খেয়ে নেয়, মাচায় কিংবা ঘরের চালের তলতলে লাউ গাছটার রস খেয়ে নেয়। কারোর বাড়ীতে পিঠা-পায়েস হয়েছে সেগুলির ওপর লোভ গেলে আর রক্ষা নাই, কারোর বাড়ীর গাইটা ভালো দুধ দেয় এদের চোখে পড়লেই সর্বনাশ। আসলে এদের চোখের দৃষ্টিটাই খারাপ। এই দৃষ্টিতেই সবসময় লোভ জেগে ওঠে। আর তখনই মন্ত্রের সাহায্যে সেই লোভের তৃপ্তি ঘটায়। এইরকম ধারণা এখানকার লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে। যে মন্ত্রের সাহায্যে 'কোকোস'রা মানুষের ঘা খায় কিংবা গুণিনরা কচি লাউডগার রস খায় সেই মন্ত্রকে 'ভাবা' মন্ত্র বলা হয়।

পূর্বে ভাবা মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এখন এই মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে —

পিষ্টক ভাবা

ওঁ লং জং ক্লীং হ্রীং হুং ক্ষোং ফট্।
আটা রে আটা গমের আটা, যবের আটা
গুঁড়িরে গুঁড়ি চাউলের গুঁড়ি।
আটারে করলাম নাটাপাটা
গুঁড়িরে করলাম ছাই।
এই 'পিঠা' জোড়া লাগিস নাই।
খ্রং খ্রং খ্রং খ্রং খ্রং
যে পিঠায় লোভ যায়, সে পিঠা নষ্ট হয়ে যা।
যা যা যা
শাঁকিনী, ডাকিনী যোগিনীতে খা।
কার আজ্ঞে
কাঁউরের কামিক্ষের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে--
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

[কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট কাঁকর কিংবা গোটা ধান নিয়ে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। তারপর সকলের অলক্ষ্যে পিঠা তৈরীর আটা কিংবা চাউলগুঁড়ির মধ্যে ফেলে দিতে হবে। তা হলে পিঠা নষ্ট হয়ে যাবে।

এছাড়া, কাঁকর কিংবা ধান না দিয়েও কেবল এই মন্ত্র তিনবার মনে মনে জপ করে তিনটি ফুঁ দিয়ে যে আটা কিংবা চাউলগুঁড়িতে পিঠা তৈরী হবে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। তাহলে ঐ আটা কিংবা চাউলগুঁড়িতে আর পিঠা তৈরী করা যাবে না।

এখন এই মন্ত্রটি বিচার করলে দেখা যায় নিছক একটা ছেলে ভুলানো ছড়ার মত এই মন্ত্রটি। এ দিয়ে কোন কিছু সকলের অলক্ষ্যে যে নষ্ট করা যায়—এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না।

আর একটা 'ভারা'মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

অগ্নিভারা

অগ্নি, অগ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর
ব্রহ্মার জঠরে আর জীবের শরীরে অবস্থান।
হিং ট্রিং, আং, বাং ফট স্বাহা।
যজ্ঞের হোমের কুণ্ডলীতে জ্বলন্ত
নিবুত্তে স্বাহা নিবুত্তে স্বাহা নিবুত্তে স্বাহা।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যত অগ্নি আছে
নির্বাপিত হোক, নির্বাপিত হোক।
হে দেবতা অগ্নি, তোমার বিদায় বিদায়।
কার আজ্ঞে—
কাঁউরের কামিক্ষের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—
দেবতা ব্রহ্মার আজ্ঞে।

[এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে তিনবার ফুঁ দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে সেই আগুন নিভে যাবে।]

উপরের মন্ত্রটি একটি কবিতার মত কিংবা একটি স্তোত্রের মত। আসলে যে গুণিন এই মন্ত্রটি রচনা করেছেন তাঁর হয়ত কিছু কবিত্বশক্তি ছিল। সেই জন্য ভাল ভাল শব্দ চয়ন করে মন্ত্রটি রচনা করেছেন। তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এটিকে কবিতা কিংবা স্তোত্র বললেও এর যে কোন শক্তি আছে যার দ্বারা আগুন নেভানো যায় এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলে ঘরে আগুন লাগলে মানুষকে আর দমকল ডাকার প্রয়োজন হত না। আসলে এগুলি নিছক প্রচার। এই মন্ত্রটি যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সেই গুণিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এটাও স্বীকার করেছেন যে তিনি এই মন্ত্রটি প্রয়োগ করে দেখেননি। গুরুর কাছ থেকে যেমনটি পেয়েছিলেন তেমনটি রেখে দিয়েছেন।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে যজ্ঞের হোমের জন্য আগুন জ্বালাতেন—এমন কথা শোনা যায়। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনীতে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানোর কথা আছে। কিন্তু দূর থেকে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে প্রজ্বলিত আগুন নেভানোর কথা জানা যায় না। কিন্তু 'অগ্নিভরা' মন্ত্রের সাহায্যে এই কাজটি ঘটানো যায়—এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর। মন্ত্রের নমুনা যা পাওয়া গিয়েছে—তার যে এইরকম কোন শক্তি আছে এমন কথা মনে করা যায় না।

এখন যে মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শরীরের ক্ষত থেকে রস টেনে নিয়ে খায় গুণিনরা সেই মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—এই মন্ত্রকে 'ডাইন মন্ত্র' বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় 'বোকোস মন্ত্র' বলা যায়।

ওঁ ক্লিং হ্রিং টিং ফট স্বাহা—
রস রক্ত পুঁজ ঘা বাসড়ো যত
সব শুদ্ধ হয়ে যা—ফলের গন্ধ ফলের গন্ধ।

শরীর থেকে চলে আয়।
সুগন্ধ বিলায় স্বর্গের অপ্সরী,
সুখাদ্য খায় দেবতা যত।
আমার কাছে সব সুখাদ্য হয়ে যা।
প্রেত পিশাচ যক্ষ রক্ষ সব-দূর হয়ে যা।
অমুকার অঙ্গের ঘা
রস রক্ত চলে আয়, চলে আয়।
কার আজ্ঞে—
দেবতা পিশাচের আজ্ঞে
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
গন্ধর্ব কিন্নরের আজ্ঞে।
মাকালীর আজ্ঞে।
দেবদেব মহাদেবের আজ্ঞে॥

[এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে তিনটি ফুঁ দিয়ে কারোর শরীরের ঘা কিংবা ক্ষত লক্ষ্য করতে হবে। তখন জিহ্বার তলায় যেন জলের উৎস খুলে যাবে। সারা গালে রস ভর্তি হয়ে যাবে। কোন একটা ফলের নাম করলে সেই ফলের স্বাদ এবং গন্ধ পাওয়া যাবে।]

এই মন্ত্র অনিষ্টকারী মন্ত্র। তাই অনেকে এই মন্ত্র ব্যবহার করেন না। কেবল দুষ্ট প্রকৃতির গুণিনগণ এই মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটান। তবে গুণিনদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে অনিষ্টকারী মন্ত্র বেশি ব্যবহার করলে গুণিনের মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া যাদের অনিষ্ট ঘটানো হয়, তারাও কোন না কোনভাবে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। ফলে সেই গুণিনকে অনেক সময় প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

এইভাবে রজকের বস্ত্রনাশ মন্ত্র, ধীবরের মৎস্যনাশ মন্ত্র, তেলির তৈল নাশ মন্ত্র, গোয়ালার দুগ্ধ নাশ মন্ত্র, তাম্বুলীর তাম্বুলনাশ মন্ত্র, শুঁড়ির মদিরানাশ মন্ত্র, কৃষকের ধান্যক্ষয় মন্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এই মন্ত্রগুলি আবার নক্ষত্র বিচার করে তিথি বিচার করে বিভিন্ন কাঠের 'কীলক' (গজাল) তৈরী করে সেগুলি মন্ত্রপূত করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পুঁতে দিতে হয়। তবে এগুলির কাজ হয়। যেমন রজকের তথা ধোপার বস্ত্রনাশ মন্ত্রের বিধিতে পাওয়া যায়—পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে, আট আঙুল জাতী কাঠের গজাল কে এক শত আটবার মন্ত্র পড়ে তাকে সিদ্ধ করতে হবে। তারপর উদ্দিষ্ট রজকের গৃহের চারিপাশের সীমানার মধ্যে কোন এক স্থানে গভীর রাত্রে উলঙ্গ হয়ে ঐ গজাল বা খোঁটাটি পুঁতে আসতে হবে। তাহলে ঐ ধোপার কাপড়গুলি যে কোনরূপে হোক নষ্ট হয়ে যাবে। এই সব মন্ত্র যেমন বাংলা ভাষায় আছে, তেমনি আবার সংস্কৃতেও আছে। তবে সত্য সত্যই এই সব মন্ত্রের কোন ক্রিয়া হয়—এমন নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

কিছু চালন মন্ত্র :

ছোটবেলায় ওঝা-গুণিন সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। গল্পের ভূতের তালগাছের মত লম্বা লম্বা পা, মুলোর মত দাঁত, বড় বড় বাতাবী লেবুর মত চোখ, মেচাকার মত মাথা ইত্যাদি না থাকলে যেমন মানায় না, তেমনি ভূতদের নিয়ে যারা কারবার করে সেই সব গুণিনদের

বিরাট এবং বিকট চেহারা না হলে মোটেই জমে না। আজকাল সিনেমাতে ওঝা গুণিনদের এইরকম উৎকট চেহারা দেখা যায়। বিরাট দশাসই চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় গোল চোখ, পরনে কিম্ভূত কিমাকার পোষাক, গলায় নানারকম মালা---রুদ্রাক্ষ থেকে শুরু করে জন্তু জানোয়ারের হাড় কিংবা দাঁত ঝোলানো মালা ইত্যাদি। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত সাধারণ চেহারার গুণিন আমাদের মনে ভয় কিংবা শ্রদ্ধা জাগাতে সব সময় সমর্থ হয় না। তাকে কিছুটা অসাধারণ তো হতেই হবে, নতুবা মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগকারী হিসাবে আমাদের বহুদিনের সংস্কার এবং কল্পনায় গড়া চেহারার সঙ্গে মিলবে কি করে? যে লোক হাত চালিয়ে শরীরে বিষের অবস্থান, কিংবা নল চালিয়ে চোরের হদিশ বলে দিতে পারে, প্রেতাত্মাকে ধরে এনে তার কাছ থেকে ভূত ভবিষ্যৎ, রোগ শোকের উপায়, মামলা মোকদ্দমার হারজিৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় জেনে নিতে পারে সে লোক আমাদের মত সাধারণ লোক হলে আমাদের কল্পনা আহত হয়, আমাদের মানস-আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হয়।

কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যত ওঝা-গুণিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি দেখেছি কেউ অসাধারণ চেহারার কিংবা উৎকট পোষাক পরা মানুষ নন। সবাই সাধারণ চেহারার, আমাদের আশেপাশের পরিচিত মানুষজনের মত নিতান্তই সাদামাটা। আমাদের গ্রামে কয়েকজন মানুষ ছিলেন যাঁরা হাতচালা, জলপড়া, ফুঁ দেওয়া ইত্যাদি জানতেন। তাঁরা খেটে খাওয়া মানুষ, সংসার জীবনের আর দশটা কাজকর্মের সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার একটু আধটু শিখে রেখেছেন। তাঁরা সরল সাদাসিধে মানুষ। তাঁদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম—এই সব মন্ত্র-তন্ত্রে কাজ হয় কি না। তাঁরাও অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, যার মর্ম হল—বিশ্বাস করলেই সব হয়। এইখানেই যত গোল। বিশ্বাস জিনিসটা বড় গোলমেলে ব্যাপার। আপনি যদি বলেন---ভূত আছে কি নেই? বিশ্বাস করলেই ভূত আছে আর না করলে নেই। তেমনি বিশ্বাস করলে ভগবান আছেন না করলে কিছু নেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষজনের মনে এই বিশ্বাস বোধটা বড় প্রবল। তাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে এই বিশ্বাসটুকু মণিমুক্তার মত দামী হয়ে আছে। তাই আজও নলচালা, বাটি চালা, কুলাচালা প্রভৃতি সেখানে চলে।

এখন বাটি চালার মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

বাটি চালা

[এই মন্ত্র চোর এবং চুরি যাওয়া দ্রব্যের সন্ধান দিতে সাহায্য করে।]

ভূত নাথ বাবা ভূতনাথ তোমারে স্মরণ করি।
তোমাকে স্মরণ করি এই মাটি রাখিলাম বাটির উপরি॥
জয় বাবা গণেশ, সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি দাও,
তোমার ইঁদুরের মাটি বাটি ভরে রাখি।
তোমার আজ্ঞায় মাটিতে দিলাম ফুঁক
যেখানে চোরাই-মাল বাটি সেখানে চলুক॥
চল বাটি চল যেখানে আছে চোর,
না চললে বাবা ভূতনাথের কাছে নিস্তার নাই তোর॥
কার আজ্ঞে—
বাবা ভূতনাথের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে

গণেশঠাকুরের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
গুরুজী বাপের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
বাবা ধর্মরাজের আজ্ঞে।

[পূর্বদিন রাত্রে বিবস্ত্র হয়ে কিছু ইঁদুর মাটি নিয়ে একটি কাঁসার বাটি পূর্ণ করে সকলের অলক্ষ্যে তুলসীতলায় কিংবা কোন পবিত্রস্থানে রেখে দিতে হবে। পরদিন স্নান করে শুদ্ধাচারে শিব, গণেশ, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবতার পূজা করে পূর্বোক্ত ইঁদুর মাটি নিয়ে সাতবার উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে তারপর সাতটি ফুঁ দিতে হবে। এরপর মন্ত্রপূত ইঁদুর মাটি নিয়ে কোন একজনকে দিয়ে চারদিকে ছড়াতে হবে। এই ইঁদুর মাটি যে ব্যক্তি চুরি করেছে এবং যেখানে চোরাই মাল আছে সেখানে পৌঁছাবে। চোরের শরীরে নানাপ্রকার যন্ত্রণা হবে। সেই যন্ত্রণার চোটে চোর চোরাইমাল সমেত চলে আসবে। যদি ইঁদুর মাটির ক্রিয়া না হয় তা হলে কোনো একজনের হাত বাটির উপর উপুড় করে রাখতে হবে। পুনরায় উক্ত মন্ত্র সাতবার পাঠ করে সাতটি ফুঁ দিলে বাটি চলতে শুরু করবে এবং যেখানে চোর আছে, সেখানে পৌঁছাবে।]

এই হল বাটি চালার মন্ত্র ও বাটি চালা প্রক্রিয়া। এখন প্রশ্ন হল এই মামুলি কিছু শব্দের সাহায্যে শক্তিসম্পন্ন হয়ে ইঁদুর মাটি চোরের কাছে চলে যাবে, তার শরীরে যন্ত্রণাদায়ক ক্রিয়া করবে, যার জ্বালায় চোর চোরাই মাল সমেত ছুটে চলে আসবে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এই সব বিশ্বাস করে ? কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ এমন সংস্কারাচ্ছন্ন যে আজও কোথাও চুরিদারি হলে গুণিন ডেকে এনে নলচালা, বাটিচালা করে।

এখন একটি নল চালা মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

নল চালা

গুরুর আদেশে নল দিলাম তোমার হাতে
নল চলে গুরুর আদেশে আর মন্ত্রের বলেতে।
জয় গুরু জয় শ্রীরামচন্দ্র বাবা বিশ্বনাথ হরি
আমার নল তার কাছে যাক যে করেছে চুরি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যেখানে চোর থাকবে
মন্ত্রের জোরে নল আমার সেখানে চলে যাবে।
ব্রহ্মা করিল বাঁশের সৃষ্টি তাহার নাম নল
হনুমান আগে চলে ধরি সপ্ত বল।
যে চোর বা যারা করেছে এই চুরি।
এই নল আনবে তাদের টুঁটি ধরি॥
কার আজ্ঞে—
শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে—
কার আজ্ঞে—
ব্রহ্মার আজ্ঞে।

একটি বা দুটি কাঁচা বাঁশের লম্বা লাঠি (যাকে নল বলা হয়) নিয়ে কোন এক ব্যক্তিকে ধরতে বলতে হবে। তারপর গুণিন মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দেবে। তখন নলটি শক্তিসম্পন্ন হয়ে

ধরে থাকা ব্যক্তিটিকে টেনে নিয়ে যাবে যেখানে চোর কিংবা চুরি করা জিনিস আছে। এইভাবে নলচালা চোর ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়।

এখন সেই একই প্রশ্ন হল পূর্বোক্ত মন্ত্রটি দ্বারা বাঁশের নলকে কি গতিসম্পন্ন করা যায়? এই প্রশ্ন করেছিলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাগদহ গ্রামের গুণিন শ্রীকার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রীকে। তিনি রহস্যময়ভাবে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—আপনি বিশ্বাস করলে মন্ত্রের শক্তি আছে, না করলে কিছু নেই। আমি বলেছিলাম—আপনি নল চালার এই শক্তি দেখিয়ে দিতে পারেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন এসব বাজে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। শ্রীমিস্ত্রী এখন প্রেতাত্মা ও দৈব চালনায় রোগ ধরার ও তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে সকল প্রকার রোগ সারানোর কাজ করেন।

চালন মন্ত্রের মধ্যে হাত চালার ব্যাপারটা আরও মজাদার। এখানে শুধু হাত চলে—তা গুণিনের নিজের হতে পারে বা অন্য কারোর হাত হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণিন নিজেই নিজের হাত চালান। আজকাল আবার গুণিনরা হাত চালাতে চোর ধরার কাজ না করে বিষ সন্ধানের কাজ বেশি করছেন। বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে—তাতে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের সাহায্যে চোর ধরার চেয়ে মন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য কাজ করার প্রবণতা আজকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণরূপে দেখা যায় চোর ধরতে ঝুঁকি খুব এবং গুণিনরা প্রায়ই অসফল হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে চোরেরা গোপনে গুণিনদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ফলে প্রাণের ভয়ে গুণিনরা আর ঐ কাজে যেতে চাইছেন না।

হাত চালার সাহায্যে রোগ নির্ণয়, কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়ালে কিংবা সাপে কাটলে শরীরে বিষ আছে কি না প্রভৃতি কাজ গুণিনরা করে থাকেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে অনেক সাধারণ মানুষ যারা গুণিন নয়, হাত চালা শিখে রেখেছে। বাড়িতে আশেপাশে ছোটখাট ঘটনায় হঠাৎ তারা কিছুটা সামাল দিতে পারে বড় গুণিন কিংবা বৈদ্য, ডাক্তার, কবিরাজ না আসা পর্যন্ত। এটাও লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। এখন হাত চালা মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

হাত চালা

হাত চালা পাট চালা কুড়ুম্বের পৃষ্ঠে
বসুমতী চালম, খাট পাট বাসুকী চালম।
তা দেখে তেত্রিশ কোটি দেবগণ চালম।
তা দেখে রামের বাণ চালম।
তা দেখে অমুকার হাত চালম,
চল হাত চল যেখানে সাপের বিষ সেই স্থানে চল।
কার আজ্ঞে—
মা মনসার আজ্ঞে
বিষ থাকিতে যদি কপট করিস
বাঁঢ় বামনির পায় ধরিস।
ভাদ্র মাসে বেড়ে চুরি করে
তার পাছা জলদে গলিস।
শ্রীরাম হুহুঙ্কার শিক্কে গুরু পায়
যতদূর সাপের বিষ ততদূর হাত যায়।

উপরোক্ত মন্ত্রটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণিনের

ভাষায় এই মন্ত্রটি খুব শক্তিশালী। যে কোন সাপে কাটুক, এই হাত চালায় বিষ ঠিক নির্ণয় করা যাবে। সুতরাং সেই মত চিকিৎসা করা যাবে।

কিন্তু মন্ত্রটি পড়লে আমাদের মনে এর ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস জন্মায় না। আর পাঁচটা মন্ত্রের মতই কতকগুলি মামুলি আকাঙ্খাৎকর শব্দ ও বাক্যে তৈরী মন্ত্রটি। এর কি শক্তি থাকতে পারে?

মন্ত্রটিতে বিষ নির্ণয়ের কাজ হোক বা না হোক গুণিনের পয়সা রোজগারের কাজে লাগে এটাই সত্যি।

কিছু দর্পণ মন্ত্র :

মহাভারত যুদ্ধ কাহিনীর ভাষ্যকার সঞ্জয় অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে পাণ্ডব ও কৌরবদের ভীষণ যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে আর সঞ্জয় বর্ণনা দিয়েছিলেন রাজধানীতে রাজার সামনে বসে হস্তিনাপুরে। কুরুক্ষেত্র আর হস্তিনাপুরের দূরত্ব অনেক। এতদূর থেকে সঞ্জয় কিভাবে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন? মহাভারতের কাহিনী থেকে আমরা জানি পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে যুদ্ধাদি সন্দর্শন, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের বাক্যাদি শ্রবণ ও তাদের মনোভাব সমস্ত পরিজ্ঞাত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। তাহলে একথা বলা যায় যে যোগশক্তি কিংবা মন্ত্রশক্তির দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে বহুদূরের জিনিস প্রত্যক্ষ করা যায় এবং দূরের শব্দাদিও শ্রবণ করা যায়। প্রাচীনকালে যে ব্যাপারগুলো যোগশক্তি কিংবা মন্ত্রশক্তির সাহায্যে সম্ভব হতো, আজকের যুগে বিজ্ঞান তা ঘরে ঘরে টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘটিয়ে দিচ্ছে। বহু দূরের জিনিস দেখা এবং বহুদূরবর্তী শব্দ শোনা প্রাচীনকালে সম্ভব ছিল এটাই ঘটনা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঘুরতে ঘুরতে এক মন্ত্র ব্যবসায়ী ওঝা-তান্ত্রিকের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সঙ্গে পরিচয় হলো, যাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে একরকম মন্ত্রপূত কাজল তৈরি করা যায় যা চোখে লাগালে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায় এবং সুর, অসুর, মানুষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতিদের দেখা যায়—যারা বহু দূরে থাকে কিংবা আমাদের চোখের আড়ালে ঘুরে বেড়ায়। এই কাজল তৈরি করতে হয় শ্মশানে বসে মড়ার মাথার খুলিতে বিশেষ মন্ত্রপাঠের সাহায্যে। বলাই বাহুল্য মন্ত্রটি সংস্কৃত মন্ত্র। মন্ত্রব্যবসায়ীর ঐ মন্ত্রের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি কারণ নির্জন শ্মশানে বসে মন্ত্রপাঠ করার সাহস কিংবা ইচ্ছা আমার কোনটাই নেই, অনেকেরও নেই বলে মনে হয়।

যাই হোক, প্রাচীনকালে যে ব্যাপার সম্ভব হত, আজও সেই ব্যাপার ঘটানো হয়ে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনরা মন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী ঘটনা কিংবা মানুষকে অবলোকন করার পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। এই পদ্ধতিকে 'দর্পণ' বলা হয়। পূর্বে 'দর্পণ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন 'দর্পণ' মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

জল দর্পণ

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।
জলদেবী জলেশ্বরী জলে অবস্থান
জলেতে জীবের জীবন, জলেতেই প্রাণ।।
সেই জল নিয়ে করি দর্পণ-করণ
জলেতে জাগিবে ছবি যা করিব মন।।

জলেশ্বরী দেবীর কৃপায় জলে ছবি পড়ুক
চোর, বদমাশ, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে, যে যেখানে থাকে অসুর।
কার আজ্ঞে—
মা গঙ্গার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—
জলদেবী পাতাল কন্যার আজ্ঞে।
ওঁ ক্রিং ক্রিং বিং বিং ফট্ স্বাহা॥

উপরের 'জলদর্পণে'র মন্ত্রটিতে কয়েক লাইন বাংলা পদ্য বা ছড়ার সঙ্গে কিছু সংস্কৃত শব্দ যোগ করে মন্ত্রটির ভয়ঙ্করত্ব কিংবা গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এগুলি গুণিনদের চালাকি। সংস্কৃত শব্দের উপর আমাদের দুর্বলতা আছে। তাছাড়া যেখানে গ্রামেগঞ্জে এই সব মন্ত্রের প্রয়োগ-অনুষ্ঠান দেখানো হয় সেখানকার মানুষজনেরা অনেকে সংস্কৃত শব্দের অর্থ বোঝে না। সুতরাং 'ক্রিং বিং' কিছু বলে বেশ গুরুগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করলে মানুষ স্বভাবতই ঘাবড়ে যায় এবং ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দেয়। মনস্তত্ত্বের এই সহজ সত্যকে কাজে লাগিয়ে গুণিনরা ভেল্কিবাজী দেখায়। 'জলদর্পণে'র এক ঘটনায় দেখেছি গুণিন এক দর্শককে জিজ্ঞাসা করছে— আপনি জলের পাত্রে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছেন ? লোকটি প্রকৃতই কিছু দেখেনি—তাই সে উত্তর দিল যে সে কিছু দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে গুণিনটি দুবার মন্ত্র আওড়াল আর বেশি করে ধূনোর ধোঁয়া করতে লাগল। এরপর গুণিন জিজ্ঞেস করল—এবারে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। এদিকে ধোঁয়াতে লোকটির চোখমুখ তখন জ্বালা করছে। পাছে আরও বেশি ধোঁয়া খেতে হয়, সেই ভয়ে এবং গুনিনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ করল। এবার গুণিন যেমন যেমন বর্ণনা দিতে লাগল, লোকটি মাথা নেড়ে সব স্বীকার করল। এইভাবে গুণিন কোন কাল্পনিক কিংবা পরিচিত কোন দুষ্ট লোককে উদ্দিষ্ট চোর কিংবা অনিষ্টকারী হিসাবে চিহ্নিত করে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই ভাঁওতা।

এইরকম 'জলদর্পণ'-এর মত 'সিন্দুর দর্পণ', 'তৈল দর্পণ', 'নখদর্পণ' প্রভৃতি সকল প্রকার 'দর্পণ'-পদ্ধতি ও মন্ত্র গুণিনদের ভাঁওতাবাজির অস্ত্র। মানুষের অসহায়তা ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে গুণিনরা ঠকিয়ে পয়সা উপার্জন করে।

আমার ছোটবেলায় 'সিঁদুর দর্পণ' ও 'নখদর্পণ' দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির একটি চুরির ব্যাপারে বাড়ির লোকের সঙ্গে গুণিনের কাছে গিয়েছিলাম কৌতূহলবশতঃ। আমাদের গ্রাম থেকে বেশ দূরেরগ্রামের এক গুণিন (তিনি এখন মৃত, সুতরাং নাম ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই)। তাঁর কাছে সিন্দুরদর্পণে' কিংবা 'নখদর্পণে' কোন চোরের মুখ আমরা দেখতে পাই নি। অথচ গুণিনটি বার বার জোরের সঙ্গে সমানে বলে গিয়েছে—একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। শেষে বিরক্ত হওয়ার ভান করে আমাদের মিথ্যুক অপবাদ দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর প্রাপ্য টাকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এইভাবে আমরা ঠকেছিলাম। পরে আরও এইরকম অনেক ঠকে যাওয়ার ঘটনা শুনেছি। কোথাও এই 'সিন্দুর দর্পণে' কিংবা 'নখদর্পণে' কিংবা 'তৈল দর্পণে' কোন মানুষ সফল হয়েছে বা চোর/অনিষ্টকারীর কেউ ধরা পড়েছে এমন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চোর ধরার গল্প মানুষের মুখে শোনা গিয়েছে মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দর্পণ ব্যাপারগুলি আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে চলে এবং এখানকার মানুষ এগুলিকে আজও বিশ্বাস করে।

এখন কয়েকটি 'দর্পণ' মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

'সিন্দুর দর্পণ'

দর্পণে লেপিলাম সিন্দুর তাতে দিলাম ফুঁ
যে করেছিস চুরি ভাঙব তার মুণ্ডু।
আমার এই দর্পণে স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ পাতাল দেখা যায়
কোথায় পালাবি চোর ধরব তোকে তায়।
শিবের কপালে আছে তৃতীয় লোচন
তার থেকে ছটা বেরয় সারা ত্রিভুবন।
সেই ছটাতে ধরে আনব চোর
যেখানে থাকিস তুই নাইকো নিস্তার।
আমার এই দর্পণে তার মুখ দেখা যায়।
কার আজ্ঞায়—বাবা শিবের আজ্ঞায়—
আর কার আজ্ঞায়
মা মহাদেবীর আজ্ঞায়
কার আজ্ঞায়—
গুরু শিরোমণির আজ্ঞায়।

[একটি দর্পণে খানিকটা সিঁদুর গুলে গোল অথবা চৌকো করে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর মন্ত্রটি পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে। এরপর শুদ্ধ বস্ত্রে কাউকে সেই সিঁদুরের উপর দেখতে বলতে হবে। তাহলে যে চুরি করেছে তার মুখ দেখা যাবে। প্রথমবার সফল না হলে দ্বিতীয়বার; দ্বিতীয়বার সফল না হলে তৃতীয়বার এইভাবে পর্যায়ক্রমে সপ্তমবার পর্যন্ত করতে হবে। প্রতিবারে মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে।]

এই মন্ত্রটি যে গুণিনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তিনি মাকালীর সাধক। তিনি আরও বলেন যে মন্ত্রটি প্রয়োগ করার আগে পূজা করে নিলে ভাল হয়। তারপর পূজা করা সিঁদুরে 'দর্পণ' করলে শীঘ্র ফললাভ হয়।

তৈল দর্পণ

প্রদীপেতে তেল জ্বলে, চোর বাটপাড়ের বুক জ্বলে।
যে করেছে চুরি তাকে মারলাম বাণ
তার বুক ফেটে খান খান।
চলে আয় চলে আয় চলে আয়
তেলের মধ্যে তার মুখ দেখা যায়।
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে
দেবতার কোপে পড়বি তুই
তোর মাথায় ডাণ্ডা মারি
শালা খানকির ছেলে, শালী খানকি মাগী
চুরি করেছিস রক্ষে নেই আর।
নাহি পাবি পার।
আমার তেলের মধ্যে মুখের ছায়া ভেসে উঠুক।

কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।

[উপরোক্ত মন্ত্রটির মধ্যে আরও অশ্লীল শব্দ ছিল, সেগুলি অশ্রাব্য— ফলে সেগুলি বাদ দিতে হল।]

[এক বাটি সরষের তেলে মন্ত্রটি পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে। তখন চোরের ছায় দেখা যাবে।]

এতক্ষণ যে মন্ত্রগুলি উল্লেখ করলাম, এগুলোকে কি মন্ত্র বলা যায়? ওঝা-গুণিনরা ব্যবহার করলেই সেগুলো মন্ত্র হয়ে যাবে—এমন কথা মানা যায় না। শব্দ-ধ্বনির যে শক্তি তা ঠিকমত রচিত হলে এবং প্রয়োগ করতে পারলে মানুষকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত মন্ত্রটির মধ্যস্থিত শব্দধ্বনিগুলির সে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। এখন সংশয় হল ওঝা-গুণিনরা কি সত্যই এই মন্ত্রগুলি ব্যবহার করে? না তারা যেগুলি ব্যবহার করে তা কাউকে দেয় না বা দেখায় না। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তারা হয়ত এইসব বাজে মন্ত্রগুলি তাদের খাতায় লিখে রেখেছে। এই ব্যাপার নিয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এগুলিকে যথার্থভাবে পর্যালোচনা করা উচিত।

বন্ধন মন্ত্র

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের 'অভিসার' পর্যায়ের একটি পদে আছে—

"কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে।"

গোবিন্দদাসের এই পদে শ্রীমতী রাধিকার অভিসার গমনের জন্য প্রস্তুতির চিত্র আছে। পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্রীরাধিকাকে যেতে হয় কখনো প্রখর গ্রীষ্মে, কখনো বর্ষণমুখর বর্ষার দিনে কখনো জ্যোৎস্না রাত্রে আবার কখনো বা ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। পথে কত বিপদ। পথ পিছল—পড়ে যাবার ভয়, পথে কাঁটা—পায়ে ফুটে যাবার আশঙ্কা, পথ অন্ধকার—হোঁচট খাওয়ার ভয়, পথে সর্প— দংশনের আশঙ্কা। এ সমস্তই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভিসার গমনের বাধাস্বরূপ। তাই শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে যাতে ভালোভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছাতে পারেন তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আঁধার রাতে কালিয়া বঁধুর কাছে যেতে হবে বলে অন্ধকারে ভ্রমণ করা যেমন অভ্যাস করছেন, তেমনি আঁধার রাতে বঁধুর উদ্দেশ্যে পথ চলতে সাপ সম্মুখে পড়লেও যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওঝার নিকট সাপের মুখ কিরূপে বন্ধ করতে হয় তা শিখছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা সর্প-মুখ-বন্ধন মন্ত্র ও প্রক্রিয়া অভ্যাস করছেন।

অভিসারের সাধনা বাস্তবের সাধনা। তার যে কষ্ট তা কেবল কবির কল্পনা নয়। সে কষ্ট অনেকাংশে লৌকিক। রাধার প্রস্তুতিও অতিশয় বাস্তব চিত্র। রাধা যে সর্পমুখবন্ধনমন্ত্র অভ্যাস করতেন—একথা অলৌকিক কিংবা অবাস্তব ভাবার কোন কারণ নেই। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে তন্ত্রমন্ত্রাদির প্রচলন হয়ে আসছে। বিভিন্ন গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। সেখানে শ্রীরাধিকার মত দুর্জয় শক্তিসম্পন্না এক নারী ওঝার কাছে সাপের মুখবন্ধন করার মন্ত্র শিখবে—এতে আর আশ্চর্য কি!

বন্ধনমন্ত্রের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে। অথর্ববেদে এই ধরনের মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডের ষষ্ঠ অনুবাক-এর তৃতীয় সূক্তে সর্পের মুখ

বন্ধন করবার মন্ত্র আছে। তৃতীয় সূক্তের ১ নং এবং ৩ নং মন্ত্রে এই সর্পমুখবন্ধনের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

১ নং মন্ত্র—"মা নো দেবা অহির্বধীৎ সতোকান্ত্স সহপূরুষান্।
সংযতং ন বিস্পরদ্ ব্যাত্তং ন সং যমন্নমো দেবজনেভ্যঃ॥

[হে বিষ-প্রতিকার কুশল দেবগণ, সর্প যেন পুত্র, ভৃত্যাদির সাথে আমাদের হিংসা না করে। তাদের মুখ যেন বিস্ফারিত না হয়, বিবৃত মুখ যেন সংযুক্ত না হয়, মন্ত্রপ্রভাবে প্রতিবদ্ধ হয়ে থাক। সর্পাদি বিষের প্রতিকারে সমর্থ দেবগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার।]

৩ নং মন্ত্র—"সং তে হন্মিদাতা দতঃ সমুতে হণ্বা হনূ।
সং তে জিহ্বয়া জিহ্বাং সম্বাস্নাহ আস্যম্॥"

[হে সর্প, তোমার উপর পংক্তির দাঁতের সাথে নীচের পংক্তির দাঁতের সংযুক্ত করছি। তোমার হনুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট করছি। তোমার জিহ্বাদুটি সংহত করছি, সেরূপ তোমার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি।]

এছাড়া বহু তন্ত্র এবং আগম শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বিভিন্ন প্রকার 'বন্ধন' মন্ত্রের প্রচলন ও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ওঝা-গুণিনগণ বিভিন্নকার্যে এই মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। এই মন্ত্র যেমন মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিংসা চরিতার্থ করবার জন্য, লোকের অনিষ্টকর কার্যে এই মন্ত্রের প্রয়োগ করে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত বন্ধন মন্ত্রের প্রচলন আছে তাদের মধ্যে 'সর্প-মুখ-বন্ধন', কুকুর মুখ-বন্ধন, বিভিন্ন প্রকার হিংস্র জন্তুর মুখবন্ধন, দেহবন্ধন, গৃহবন্ধন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সর্পমুখবন্ধন কিংবা বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর মুখবন্ধন প্রভৃতি মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কুকুর মুখ বন্ধন কিংবা কোনো গৃহপালিত পশুর মুখ বন্ধন মানুষের অনিষ্ট সাধনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কোনো বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কুকুর থাকলে, সে বাড়ীতে চুরি করবার খুব অসুবিধা। তাই চোরেরা কুকুরের মুখ বন্ধন মন্ত্র ব্যবহার করে। তেমনি হিংসা চরিতার্থ করবার জন্য বিড়াল, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মুখ বন্ধন করা হয়। এই মুখ বন্ধন করলে মুখ আর কিছুতেই খোলা যায় না। ঐ সমস্ত পশুরা ডাকতে পারে না কিংবা কোন কিছু খেতে পারে না। তারপর পশুগুলি ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে মারা যায়। অনেকে বলেন এ এক ধরনের রোগ। প্রকৃত চিকিৎসা করলে সেরে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকম উৎকৃষ্ট পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তাই এগুলি রোগ না দুষ্ট ওঝা-গুণিনের মন্ত্রের কারসাজি তা জানার কোন প্রকৃত উপায় নেই।

এখন বিভিন্ন 'বন্ধন'-মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে—

মুখবন্ধন : 'মুখবন্ধন' হল মুখবন্ধ করে দেওয়ার মন্ত্র। ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্রের সাহায্যে সাপ, কুকুর, বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের মুখ বন্ধ করে দিয়ে থাকেন। এই মুখবন্ধন করলে সেই জন্তু আর কামড়াতে পারে না। গুণিন বিষাক্ত সাপ ধরার সময় মন্ত্রের সাহায্যে সাপের মুখ বন্ধ করে দেন। যে সমস্ত লোক বনে যায় (যেমন—দেয়াশী, বাওয়ালি, মৌলে প্রভৃতি) তারা বনে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঘের মুখ বন্ধন করে। তেমনি পাগলা শিয়াল এবং পাগলা কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মন্ত্রের সাহায্যে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেহবন্ধন : বিপদ থেকে রক্ষা কিংবা আত্মরক্ষার জন্য 'দেহবন্ধন' করা হয়। দেহবন্ধন করলে কোন কিছুই আর শরীরের উপর কোন ক্ষতি করতে পারেনা। যে সমস্ত তান্ত্রিক শ্মশানে শব সাধনা করেন তাঁরা প্রথমে দেহকে বন্ধ করে দেন মন্ত্রের সাহায্যে। যাতে ভূত-প্রেত, যক্ষ

রক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি কোন ক্ষতি না করতে পারে। ভূত চালা কিংবা ভূত চাপার ছাড়ান করেন যে সমস্ত গুনিন, তাঁরা প্রথমে নিজের শরীরকে বন্ধ করে নেন। মন্ত্রের সাহায্যে যাতে ভূত-প্রেত তাঁদের কোন ক্ষতি না করতে পারে। এছাড়া পথে ঘাটে চলতে, অশরীরী কিছুর হাত থেকে রেহাই পেতে; ডাইন, জিন, পরী প্রভৃতিদের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রথমে মন্ত্রের সাহায্যে দেহকে বন্ধ করতে হয়। ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন দেশে এই মন্ত্রতন্ত্রের চর্চা হয়। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিংবা বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুষ্ট শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন মানুষ 'Cult' এর চর্চা করেন। এঁদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন—Medicine man sorcerer witch finder witch doctor exorcist প্রভৃতি। বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া করতে গিয়ে এঁরা প্রথমে নিজের দেহকে বন্ধ করে নেন—যাতে বিপদে না পড়তে হয়। ড্রাকুলা-সিরিজের বিভিন্ন ছায়াছবিতে কিংবা 'Exorcist' নামক ছবিতে এই দেহবন্ধনের নজির দেখা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'দেহবন্ধন' মন্ত্রের ব্যাপক চর্চার কথা জানা যায়। এখানকার অনেক সাধারণ মানুষও এই মন্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্মা, অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে মানুষের সংস্কার প্রবল। তাই একলা পথ চলতে, নির্জনে, অন্ধকারে চলাফেরা করার জন্য মানুষের সাবধানতার অন্ত নেই। এই সমস্ত মানুষ 'দেহবন্ধন' মন্ত্র শিখে রেখেছে। এছাড়া ওঝা-গুনিন তো আছেই।

দেহবন্ধন মন্ত্রের-ব্যাপারে দুই একজন তান্ত্রিক সাধকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁদের মতে যে কোন তন্ত্র-সাধনায় দেহবন্ধন প্রাথমিক কর্তব্য। বিশেষ করে শব সাধনা করতে গিয়ে কোন সাধক যদি ভুলবশতঃ দেহবন্ধন না করেন, তাহলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। ভূতপ্রেত প্রভৃতি অশরীরী শক্তি সাধককে মেরে ফেলে।

আসন-বন্ধন : দেহবন্ধনের মত 'আসন বন্ধন'ও তান্ত্রিক সাধকগণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ করে সাধক আসনে বসে থাকেন কিংবা চারদিকে গণ্ডী কেটে তার মধ্যে বসে সাধনা করেন। এই সাধনা ভঙ্গ করার জন্য ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি নানাপ্রকার বীভৎস ক্রিয়াকলাপ করে ভয় দেখায়। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে যদি সাধক আসন ছেড়ে গণ্ডীর বাইরে চলে যান তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। বিশেষ করে শব সাধনার ক্ষেত্রে আসন ছেড়ে কোনরকমে ওঠা চলবে না। সাধক সাহস সঞ্চয় করে ওই গণ্ডীর মধ্যে আসনে দৃঢ়ভাবে বসে থাকলে, কোন অশরীরী শক্তি সাধককে কোন প্রকারে ক্ষতি করতে পারবে না। বহু ইংরেজী ছবিতে গণ্ডীর মধ্যে আসনে বসে মন্ত্র পাঠ করার দৃশ্য দেখা যায়।

গৃহবন্ধন : ওঝা গুণিনগণ মন্ত্রপূত জল দিয়ে গৃহের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে গৃহবন্ধন করেন। এইভাবে কোন গৃহের চারপাশ মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করলে সেই গৃহে ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্মা, দুষ্ট শক্তি, যক্ষ, রক্ষ, পরী, জিন, ডাইন প্রভৃতি অনিষ্টকারী শক্তি প্রবেশ করতে পারেনা। গুণিনরা ভূত ছাড়ান, গৃহের অমঙ্গল দূর, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কাজে গৃহবন্ধন করে থাকেন। অনেক সময় গৃহের বাইরের সীমানার চার কোণে চারটি কাঠি, পেরেক, লোহার নাল, ঘোড়ার খুর প্রভৃতি দ্রব্য মন্ত্রপূত করে পুঁতে দিয়ে গৃহবন্ধন করেন।

মুখবন্ধন, আসন বন্ধন, দেহবন্ধন, গৃহবন্ধন ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনমন্ত্র ও প্রক্রিয়া আছে। যেমন—সর্পবিষ নাশ/নিবারণের জন্য আঁচলিবন্ধন, গায়ত্রীবন্ধন, শির বন্ধন প্রভৃতি বন্ধন প্রক্রিয়া আছে। তবে প্রথমোক্ত চার প্রকার বন্ধন-প্রক্রিয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বেশি চলে।

পূর্বে আলোচিত অন্যান্য মন্ত্রের মত এই বন্ধনমন্ত্রও অন্তঃসারশূন্য। যদিও এই মন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীন কালে ছিল; বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এই সব মন্ত্র কেমনভাবে ব্যবহার করা হতো তার সঠিক চিত্র আমরা পাই না। যদি প্রাচীনকালে এই মন্ত্রগুলি কার্যকরী ছিল তাহলে বলা যায় বর্তমানকালে এদের সঠিক প্রয়োগবিধি মানা হয় না কিংবা সঠিক প্রয়োগ বিধি জানা যায়নি। এছাড়া বহুকাল অতিক্রম করার ফলে সেই আসল মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেক বাজে জিনিস ঢুকে গিয়ে এর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বাংলা ভাষায় লেখা যে মন্ত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে এগুলি আসলে মন্ত্রই নয়। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলির সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই এবং প্রাচীন মন্ত্রগুলির ভাষান্তরও নয়। এগুলি ওঝা-গুণিন আখ্যাধারী কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত চতুর ব্যক্তির স্বকপোল কল্পনার ফসল। এতে কোন কাজ হয়, কিংবা কোন কাজ হয়েছে—এ বিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিছু বন্ধন মন্ত্র : রামায়ণ-কাহিনীতে আছে যে পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় রামচন্দ্র যখন স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন এবং ছদ্মবেশী মারীচ মৃত্যুকালে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল করে লক্ষ্মণকে ডেকেছিল আর সেই স্বর শুনে লক্ষ্মণ গণ্ডী কেটে মন্ত্র পড়ে সীতাকে সেই মন্ত্রপূত গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বলেছিলেন। এদিকে ছদ্মবেশী রাবণ সীতাকে হরণ করার মানসে এসে প্রথমে থমকে গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডী ভেদ করে যেতে পারেননি। সীতাদেবী গণ্ডীর বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে এলে তবেই রাবণ তাঁকে অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। তবে এ থেকে একটা সূত্র আবিষ্কার করা যায় যে লক্ষ্মণ যে মন্ত্র পড়ে গণ্ডী দিয়ে গিয়েছিলেন তা এক ধরনের বন্ধন মন্ত্র ও গণ্ডী দেওয়া এক ধরনের প্রক্রিয়া। রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, ভূত প্রেত প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এইভাবে গণ্ডীবন্ধন তথা দেহবন্ধন করা হতো। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বেও এই বন্ধন মন্ত্রের প্রচলন ছিল একথা আমরা জানতে পারি।

রামায়ণ-কাহিনী সত্য কিনা তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। মহাকবি বাল্মীকির কল্পনায় যে ঘটনা প্রতিভাত হয়েছিল, তার প্রচলন নিশ্চয়ই তৎকালীন ভারতবর্ষে ছিল—একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কবির কল্পনা যতই আকাশ কুসুম হোক না কেন, সমসাময়িক দেশ-কাল-সমাজ-রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহার-কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাব তার মধ্যে পড়বেই। এছাড়া বর্তমান কালের সমালোচকগণের মতে কোন কল্পনাই অবাস্তব জিনিষের উত্তর ভিত্তি করে হতে পারে না। এমনকি 'আকাশ কুসুম' শব্দটার মধ্যেও 'আকাশ' এবং 'কুসুম' দুটি শব্দই দুটি বাস্তব জিনিসের রূপ প্রতিফলিত করে। সুতরাং মহাকবি বাল্মীকির কল্পনায় লক্ষ্মণের মন্ত্র পড়ে গণ্ডী দেওয়ার যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল, তৎকালীন ভারতবর্ষে সেই ঘটনার প্রচলন যে ছিল একথা নিশ্চিত করে বলতে পারা যায়। তবে লক্ষ্মণ কি মন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন অর্থাৎ মন্ত্রের ভাষা তথা শব্দ বাক্য গঠিত সমন্বিত সঠিক রূপটি বাল্মীকি কবি লিখে যাননি। কি ধরনের মন্ত্র বুঝতে পারা যায়, কিন্তু মন্ত্রটি যথার্থ কি ছিল তা জানা যায় না। মহাকবি বাল্মীকি যদি এইটুকু লিখে যেতেন তাহলে ঐ মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা যেতো।

বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন আছে একথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে এই বন্ধন-মন্ত্রের প্রচলন ছিল তার রূপ-বৈশিষ্ট্য এবং প্রক্রিয়ার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তখন এই প্রকার মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে দেহবন্ধন ও গৃহবন্ধনের মন্ত্র প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের দেহবন্ধন মন্ত্র আছে। সবগুলির উল্লেখ করবার সুযোগ নেই এবং প্রয়োজন নেই। দু-একটি মন্ত্রের উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

দেহবন্ধন

বা বাওড়, যক্ষ রক্ষ, ভূত প্রেত আছে সর্বখানে।
কামাখ্যা মা গো তোমার দয়ার কথা কে না জানে।
কাজেকর্মে দিনে রাতে বাহির হলাম পথে
কামাখ্যা মা রক্ষা কর আমায় সকল মতে।
হাত বন্ধন, মাথা বন্ধন, গলা বন্ধন
পেট পিঠ কোমর বুক চরণ বন্ধন॥
সকলি বন্ধন করি পথে দিলাম পা
আমাকে রক্ষা কর কাঁউরের মা॥
সর্বাঙ্গ বন্ধন করি মা মনসার বরে।
ভূত প্রেত পিশাচ, ওঝা-গুণিন কি করিতে পারে॥
কামিক্ষে মার স্মরণ করি, পেলাম বর।
অষ্টাঙ্গ বন্ধন করে হইলাম অমর।
কার আজ্ঞে—
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
বাবা ধর্মরাজের আজ্ঞে।

আর একটি দেহবন্ধন মন্ত্র এখানে দেওয়া হল।

এর সঙ্গে জন্তু জানায়োরের, মুখবন্ধন মন্ত্রও মিশ্রিত আছে।

বাঘ, ভালুক, শিয়াল সাপ সাপিনী
রাক্ষস খোক্কস দত্যিদানো ভূত-পেত্নী
সকলের মুখ বন্ধ হোক, দাঁতে চাবালিতে লাগুক কপাট
আমার এই মন্ত্রে সকলের শক্তি হলো কাট।
আমার শরীর হল বন্ধ মনে নেই সন্দ
নির্ভয়ে পথ চলি করি সকল ধন্দ।
ঘর থেকে বার হয়ে পথে ঘাটে রাখলাম পা।
মা মনসার বরে লোল পাথর হল গা।
জীবজন্তুর মুখবন্ধ আমার বন্ধ গা।
আমাকে রক্ষা করবে কামাক্ষ্যা মা॥
কার আজ্ঞে—

মা' মনসার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
কামিক্ষ্যে মায়ের আজ্ঞে ॥

[এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে শরীরে তিনটি টোকা মেরে বুকে ফুঁ দিতে হবে। তাহলে ভূত-প্রেত, অপদেবতা, কোন হিংস্র জীবজন্তুর ভয় থাকবে না।]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আঠাশ রকমের দেহবন্ধন তথা গা-বন্ধন মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্ত্রগুলির ধরন মোটামুটি একই প্রকার। বক্তব্য ব্যাপার সর্বত্র প্রায় একই। জীবজন্তু যক্ষ রক্ষ ডাইন, পিশাচ, অপদেবতা প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শরীর তথা সর্বাঙ্গ বন্ধন করা হয়েছে মন্ত্রের দ্বারা। এই মন্ত্রে যেমন নিজের শরীরকে বন্ধন করা যায় তেমনি অপরের শরীরকেও মন্ত্রবন্ধন করা যায়। অনেক ওঝা-গুণিন মন্ত্রের দ্বারা বাণ মারে। তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যও শরীর বন্ধন করা হয়। তবে এই মন্ত্রগুলি অসার। মন্ত্রগুলি পড়লে চমকপ্রদ কিছু মনে হয় না। মামুলি ভাষা কোথাও কোথাও অবান্তর শব্দ ও বাক্যে ভর্তি। এই মন্ত্রের কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। যে কথা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে তা আবার বলতে হচ্ছে,—এই সব মন্ত্র ওঝা-গুণিনের চালাকির ফসল, লোক ঠকানোর উপায়।

এখন যে সমস্ত গৃহবন্ধন মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে তার থেকে দু একটা নমুনা দেওয়া হচ্ছে—

গৃহবন্ধন

হাট বন্ধ বাট বন্ধ, বন্ধ হয় ঘর।
মহাদেবের আজ্ঞায় বন্ধ হয় ত্রিভুবনের সংসার।
স্বর্গে বন্ধ হয় দেবতা পাতালে হয় নাগ।
মর্ত্যে সব মুনি ঋষি করে যজ্ঞ যাগ।
সামনে বন্ধ পেছনে বন্ধ উত্তরে বন্ধ বন্ধ দক্ষিণে।
পূবে বন্ধ, পশ্চিমে বন্ধ, বাঁয়ে বন্ধ বন্ধ ডাহিনে॥
ঊর্ধ্বে বন্ধ, অধঃ বন্ধে বন্ধ চারিধার।
সর্বত্র বন্ধ হল কোথাও নাই পার॥
এই বন্ধনে বন্ধ হল নকুল সহদেব।
শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ হল আর বাবা মহাদেব।
এঁরা সব ঘরে বন্দী রক্ষা করবেন ঘর।
এঁদের কৃপায় আমার নাইক কোন ডর॥
এমনি হল ঘর বন্ধন মহাদেবের বরে।
চোর-বদমাশ, বা-বাওড়, ভূত-পিশেচ না ঢুকতে পারে।
ওঝা-গুণিনের বান আমার কি করতে পারে।
কার আজ্ঞে
বাবা মহাদেবের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
কার দোহাই
মা মনসার দোহাই।

[এক মুঠো ধুলো নিয়ে এই মন্ত্র তিনবাব পাঠ করে ফুঁ দিয়ে সেই ধুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে কিংবা চারটি পেরেক নিয়ে এই মন্ত্র তিনবাব পড়ে ফুঁ দিয়ে ঘরের বাইরেব সীমানার চার কোনে পুঁতে দিতে হবে। তাহলে ভূত-প্রেত, অপদেবতা, চোর, গুণিনের বাণ ইত্যাদিব কোন ভয় থাকবেনা।]

এই গুলি হল বন্ধন মন্ত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এইরকম এগারো প্রকারের বন্ধন মন্ত্র সংগ্রহ কবা হয়েছে। সেগুলি এখানে আর উল্লেখ করা হল না। এছাড়া আরও অন্যান্য বন্ধন-মন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। যেমন, বিষবন্ধন, আঁচলি বন্ধন, মুখবন্ধন, আসন বন্ধন প্রভৃতি। এগুলিরও উল্লেখ করা হল না। একটা কথা উল্লেখযোগ্য মন্ত্রগুলি ভুলে ভর্তি ছিল, এখানে সংশোধন করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের ভাষা কিছুটা মার্জিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যান্য যে সমস্ত মন্ত্র উদ্ধাব করা হয়েছে তাদের ভাষা যেমন অমার্জিত, অশ্লীল, অসংলগ্ন কিংবা দুর্বোধ্য—এই বন্ধন মন্ত্রগুলিব ভাষা তেমন নয়। ভণিতা বা আদেশ কাড়া প্রায় সর্বত্র একই। বিভিন্ন দেবদেবীর কৃপা ভিক্ষা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও মহাভাবত, রামায়ণ কিংবা অন্যান্য পুরাণকাহিনীর ছায়াপাত ঘটানো হয়েছে। শব্দ নির্মাণ ও বাক্য গঠনে কোন জটিলতা নেই। তবে মন্ত্রগুলির ছন্দ-নির্মাণে যথাযথভাবে নিয়মকানুন মানা হয়নি। প্রায় সর্বত্রই ছন্দদোষ ঘটেছে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা এই মন্ত্রগুলির মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার খুব কম। প্রায় নেই বললেই চলে। সর্বত্র নিকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করার একটা আপ্রাণ চেষ্টা রয়ে গিয়েছে। যদিও 'চাবালি', 'বা-বাওড়', 'দে-দেওতা', 'পিশেচ', 'কাঁথাকানি', 'নেলকানি', 'আগুন-মালসা', 'খাটরি', 'ভ্যাঁটা' প্রভৃতি কিছু শব্দ আছে যেগুলিকে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথ্যভাষার পর্যায়ে ফেলা হয়। তবুও মনে হয় এইরকম শিষ্টভাষার ব্যবহার মন্ত্রগুলির আসল চেহারা নয়। সন্দেহ হয় এগুলি বাজার থেকে কেনা কোন মন্ত্রের বইয়ের অনুসরণ করে তৈরী করা হয়েছে।

যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল এইসব মন্ত্রের কি কোন শক্তি আছে, যার দ্বারা দেহবন্ধন করা যায়? হয়ত এগুলি আসল মন্ত্র নয় কিংবা সঠিক প্রয়োগ কৌশল আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। শুধু এইটুকু বলা যায়—এগুলি ভাষা ও লোকসংস্কৃতি গবেষণার কাজে কিছুটা সাহায্য করবে।

স্তম্ভন: খুব মনে পড়ে ছোটবেলায় চট পেতে বসে গুরুমশায়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দুলে দুলে আমরা গ্রামের পাঠশালার কিছু ছাত্র জোরে জোরে সুর করে পড়তাম—একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চ বান...। আজও গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এইভাবে 'শটকে' (শতকিয়া) শেখানো হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্ক শেখানোর কত আধুনিক পদ্ধতি বার হয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে সে সবের তেমন গুরুত্ব নেই। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজও সুর করে পড়ে চলেছে—চারি বেদ, পঞ্চবাণ...। হয়ত চারটিবেদ কি কি তারা জানে, কিন্তু পঞ্চ বাণের কি কি নাম, তা বোধ হয় জানে না। অনেক বড় বড় শিক্ষিত মানুষও জানেন না। এই পঞ্চবাণের নাম হল—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। এগুলি ছাড়া আরও পাঁচটি নাম আছে। সেগুলি বলার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই পঞ্চবাণের ব্যবহার কর্তা হলেন মদন দেব।

এই পঞ্চবানেব একটি বাণ হল স্তম্ভন। মদনদেবেব এই বাণটি বিশেষ শক্তিশালী বাণ। পৌবাণিক ঘটনা থেকে জানা যায মদনদেব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই বাণ ব্যবহাব কবতেন। 'স্তম্ভন' শব্দেব অর্থ হল—জড়ীকবণ ; দৃঢ়ীকবণ ; প্রবৃত্তিবোধ ; নিবাবণ ; মন্ত্রবলে জড়, নিষ্ক্রিয বা শক্তিহীন কবা। কন্দর্পদেব মানুষেব প্রবৃত্তি বোধেব হেতু এই বাণ ব্যবহাব কবেছিলেন এবং কবে থাকেন। মানুষ প্রকৃতিব দাস। যুগ যুগ ধবে মানুষ এই প্রবৃত্তিব লালন কবে চলেছে। প্রবৃত্তিব প্রকাব ভেদ আছে। তা যেমন মানুষকে কর্মোদাম কবে তোলে, তেমন তা আবাব মানুষকে সর্বনাশেব পথে অন্ধকাবেব দিকে— ধ্বংস, অবক্ষয়েব দিকে চালিত কবে। তখন প্রয়োজন হয সেই প্রবৃত্তিবোধেব। স্তম্ভনেব দ্বাবা তখন প্রবৃত্তি বোধ কবা চলে।

এই সুন্দব পৃথিবীতে লীলাময ভগবানেব অনন্ত লীলা অহবহ সংঘটিত হযে চলেছে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে তাবই সুব। এই আনন্দ যজ্ঞেও মানুষ সেই লীলামযেব হাতে খেলাব পুতুল। কিন্তু এই পুতুলেব বসেব স্রোতে বঙেব খেলায যেমন উন্মাদনা জাগে, তেমনি উন্মাদনাব বাড়াবাড়ি বোধেব জন্য স্তম্ভনেব প্রযোজন। কন্দর্পদেব তাই সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, পবিশেষে স্তম্ভনেব দ্বালা জগতেব সাম্যাবস্থা বজায বেখেছেন।

কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গুণিনগণ 'স্তম্ভন' কে প্রবৃত্তিবোধেব কাজে ব্যবহাব কবেন না। তাঁবা 'স্তম্ভন' মন্ত্রেব দ্বাবা মানুষকে জড়, নিষ্ক্রিয কিংবা শক্তিহীন কবে দেন। মন্ত্রেব যে অনিষ্টকব, অমঙ্গলকব দিকটিব কথা আমবা শুনে থাকি বা জানি, দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গুণিনগণ 'স্তম্ভন'-মন্ত্রেব সাহায্যে সেই কাজ কবে থাকেন। 'স্তম্ভন' শব্দটিব এখানে বিপবীত ক্রিযাব পবিচয পাওযা যায। প্রবৃত্তি বোধেব জন্য কন্দর্পদেব যদি স্তম্ভন বাণ ব্যবহাব কবে থাকেন, তো দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গুণিনগণ কুপ্রবৃত্তিব জাগবণেব জন্য 'স্তম্ভন'-মন্ত্রেব ব্যবহাব কবে থাকেন। হিংসাব বশে লোভেব জন্য লালসাব জন্য মানুষ অপব মানুষেব সর্বনাশ কবে তাকে জড়, নিষ্ক্রিয, শক্তিহীন কবে দিযে নিজেব কুপ্রবৃত্তিব চবিতার্থতা কবে। এখানে 'স্তম্ভন' মন্ত্র সেই কর্মে ব্যবহৃত হয। দুষ্ট প্রকৃতিব ওঝা-গুণিন পযসাব লোভে এই 'স্তম্ভন' মন্ত্রেব ব্যবহাব ঘটিযে মানুষেব সর্বনাশ কবেন।

তবে 'স্তম্ভন'-মন্ত্র কেবল অমঙ্গল কিংবা অনিষ্টকব কাজে ব্যবহৃত হযনা। এব দ্বাবা মানুষেব কল্যাণ, দুবাবোগ্য ব্যাধি দূব, শত্রুব হাত থেকে বক্ষা, অগ্নিব থেকে বক্ষা প্রভৃতি কাজ হতে পাবে। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায এই মন্ত্রকে অনিষ্টকব কাজে বেশি ব্যবহাব কবা হযে থাকে।

স্তম্ভন মন্ত্রেব দ্বাবা যে সমস্ত অনিষ্টকব কাজ কবা যায—তাদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মানুষেব শবীবকে দুর্বল, জড় কিংবা শক্তিহীন করে দেওয়া। প্রতিশোধ নেবাব জন্য, লোভেব জন্য কামনা লালসাব জন্য মানুষকে জড়, পঙ্গু কিংবা শক্তিহীন কবে দেওয়া হয়। যেমন কোন মানুষেব ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ কবাব জন্য গুণিনেব সাহায্যে স্তম্ভন মন্ত্রেব দ্বাবা তাকে জড় কিংবা নিষ্ক্রিয কবে দেওযা হল। পবপুরুষে আসক্ত কোন স্ত্রীলোক এই মন্ত্রের সাহায্যে স্বামীকে পঙ্গু কবে দিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য কেউ গুণিনেব সাহায্যে অন্য কাউকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবে দিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে অনেকে বাণমারা বলে থাকেন। এছাড়া মুখস্তম্ভন, নৌকাস্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন প্রভৃতি অনিষ্টকর কাজ হয়ে থাকে।

স্তম্ভন মন্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত ভালো কাজ করা যায় সেগুলি হল—অগ্নিস্তম্ভন, মেঘস্তম্ভন, শস্ত্র স্তম্ভন, দন্তস্তম্ভন, শুক্রস্তম্ভন প্রভৃতি।

অগ্নিস্তম্ভন দু'ধরনের হয়। প্রজ্জ্বলিত আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া আর শরীরকে মন্ত্রপূত করে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলে পুড়ে না যাওয়া। ঘরে আগুন লাগে, বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে

খড়ের চালের ঘর, ধান-খড়ের গাদা থাকে, সেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি। এইরকম কোথাও আগুন লেগে গেলে স্তম্ভন মন্ত্রের সাহায্যে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। আবার এক অযুত কিংবা এক লক্ষবার স্তম্ভন মন্ত্রপাঠ করে কেউ যদি খয়ের কাঠের আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে তার শরীর দগ্ধ হবে না।

প্রচণ্ড বারিপাত মন্ত্রের সাহায্যে নিবারণ করা যায় কিংবা মেঘস্তম্ভনের ফলে আসন্ন বৃষ্টিকে রোধ করা যায়। মেঘস্তম্ভন স্থানিক হয় অর্থাৎ কোন একটি এলাকাকে বা স্থানকে বর্ষনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। প্রাচীনকালে অতিবৃষ্টি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে রোধ করার নানা প্রকার প্রচেষ্টা ও কৌশলের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মন্ত্রের সাহায্যে কিংবা বাণের সাহায্যে মেঘকে স্তম্ভিত করার কাহিনী জানা যায়। সেইরকম স্তম্ভন মন্ত্রের সাহায্যে মেঘকে স্তম্ভিত করে প্রচণ্ড বারিপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধের সময় শস্ত্র, তীর প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার কাহিনী পাওয়া যায়। ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্র-শস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার কাজটি করে থাকেন। একে শস্ত্র-স্তম্ভন বলা যায়। বর্তমান কালে চোর, দস্যু, গুণ্ডা, বদমাশ প্রভৃতির অস্ত্রকে মন্ত্রবলে জড় কিংবা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় এই শস্ত্র-স্তম্ভন মন্ত্রের সাহায্যে। এইভাবে এই মন্ত্র মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হয়।

সর্প, পাগলা কুকুর, ক্ষ্যাপা শিয়াল প্রভৃতি জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মন্ত্রের সাহায্যে তাদের দন্তপংক্তিকে জড় বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই সব জন্তু ও সরীসৃপ তাদের দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারবে না।

শুক্রস্তম্ভন মানুষের রতিক্রিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যে সমস্ত মানুষ বেশিক্ষণ বীর্যধারণে অক্ষম, কিংবা যাদের দ্রুতস্খলন হয় তারা রতিক্রিয়ায় নারীকে সুখ কিংবা আনন্দ দিতে পারে না এবং যৌনক্রিয়ার সুখ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে না। শুক্রস্তম্ভন মন্ত্রের সাহায্যে তাদের শুক্রকে স্তম্ভিত করে রাখা যায় যাতে দ্রুতস্খলন না হয় এবং দীর্ঘক্ষণ যৌন ক্রীড়ার সুখ উপভোগ করতে পারে।

এই সমস্ত স্তম্ভন ক্রিয়ায় মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যগুণের ব্যবহার বেশি পরিমাণে করতে হয়। যেমন, মুখস্তম্ভনে সাদা কুঁচবৃক্ষের মূল এবং যষ্টিমধুর মূল প্রয়োজন হয়। এছাড়া পলাশ বৃক্ষের মূলও লাগে। নৌকাস্তম্ভনে ক্ষীরিকাষ্ঠের কীলক ব্যবহৃত হয়। অগ্নিস্তম্ভনে খয়ের কাঠের আগুন দরকার হয়। মেঘস্তম্ভনে নূতন ইট নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করতে হয়। শুক্রস্তম্ভনে রাখাল শশার মূল, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, গোদুগ্ধ, নীলিবৃক্ষের মূল প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। শস্ত্রস্তম্ভনে কদবেলের মূল, শ্বেত গুঞ্জার মূল প্রভৃতি লাগে। এছাড়া এই সমস্ত স্তম্ভন ক্রিয়া তিথি-নক্ষত্র যোগে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন মুখস্তম্ভন করতে হয় পুষ্যানক্ষত্র যোগে, নৌকা স্তম্ভনে ভরণীনক্ষত্রযোগ প্রয়োজন হয়। শস্ত্রস্তম্ভন করতে হয় কৃত্তিকা নক্ষত্রে।

এখন এইসব স্তম্ভন মন্ত্র কতখানি ক্রিয়াশীল তা বিচার্য বিষয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বহু ওঝা-গুণিনের কাছ থেকে যে সমস্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে স্তম্ভন মন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে খুব আশাপ্রদ মন্তব্য পাওয়া যায় নি। স্তম্ভন মন্ত্রের অনিষ্টকর দিকটি সম্বন্ধে বহু ওঝা-গুণিন অবহিত থাকলেও মঙ্গলকর দিকটি সম্বন্ধে সমপরিমাণে অজ্ঞ। মুখস্তম্ভন, নৌকাস্তম্ভন, অগ্নিস্তম্ভন, মেঘস্তম্ভন, দন্তস্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন, শস্ত্রস্তম্ভন কিংবা শুক্রস্তম্ভনের ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত গুণিনগণই এক বাক্যে নএরর্থক উক্তি করেন। তাঁরা বলেন এই সমস্ত স্তম্ভন মন্ত্র কেউ পরীক্ষা করে দেখেন নি। সুতরাং মেঘস্তম্ভনের সাহায্যে বৃষ্টি বন্ধ করা

যায় কিংবা অগ্নিস্তম্ভনের সাহায্যে দারুণভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করা যায় এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না। মন্ত্রশিক্ষার ধারা অনুসারে তাঁরা গুরুর কাছ থেকে এইমন্ত্রগুলি লাভ করেছেন কিন্তু কেউ পরীক্ষা করে দেখেননি, কিংবা পরীক্ষা করে সফল হতে পারেননি। তাছাড়া গ্রামে গঞ্জের মানুষ ঘরে আগুন লাগলে ওঝা-গুণিন ডাকে না, তার চেয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো অনেক সহজ কাজ। সেই রকম বৃষ্টিতে দেশ ভেসে গেলেও বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য ওঝা ডাকার কথা কারোর মনে হয় না। বরং এই দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হওয়াটা হাস্যকর ব্যাপার। তাছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ অপেক্ষাকৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও কিংবা বেশি পরিমাণে অন্ধ বিশ্বাসের পোষকতা করলেও স্তম্ভন মন্ত্র ও তার ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে তারা মোটেই মোহগ্রস্ত নয় উপরন্তু এই সব গুলিকে তারা আজগুবি গাঁজাখুরি কিংবা রূপকথার গল্প বলে মনে করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে এই মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্তম্ভনমন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অলৌকিকতা অনেকাংশে জড়িয়ে আছে যার উৎস প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী। আমরা আজও অনেকস্থলে প্রাচীনত্বের অনুবর্তন করে আসছি— সেগুলি অসার, অবাস্তব কিংবা ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও। মন্ত্র-তন্ত্রের উপর যুক্তিহীন অগাধ বিশ্বাস তারই ফলশ্রুতি।

কিছু স্তম্ভন মন্ত্র :

অথর্ব বেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়। "গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলযুক্ত দ্যুলোক যেমন স্থির রয়েছে, নীচে পড়ে যায় না, সব কিছুর আধাররূপ পৃথিবী যেমন স্থির আছে এবং তাতে এ পরিদৃশ্যমান জঙ্গম প্রাণিগণ যেমন অবস্থিত আছে, বৃক্ষ যেমন দাঁড়িয়ে থেকে নিদ্রা অনুভব করে— শুয়ে নয়, হে রোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমার এ রক্ত ক্ষরণরূপ রোগ সেরূপ স্থির হোক, রক্তক্ষরণ যেন না হয়।" এটি রক্তক্ষরণ রোগ নিরাময়ের মন্ত্র। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় এটিও একপ্রকার 'স্তম্ভন' মন্ত্র। প্রাচীনকালে আর্যঋষিগণ এইভাবে মন্ত্রদ্বারা রোগস্তম্ভন ঘটাতেন। শুধু রোগ নয়, শোক, দুঃখ, জরা, কামনা, লোভ, লালসা, হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করে মানবজীবনকে মহৎ আদর্শের পথে চালিত করতেন ও জীবনকে সুখী সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করতেন।

জীবনকে সুখী বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করে তোলার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হলো বীর্যস্তম্ভন। যৌনক্রিয়ায় নারীকে চরম সুখদান করতে পারলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে আসতে পারেনা বা অশান্তি ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম—এ সত্যটা প্রাচীন ঋষিগণ খুব ভালভাবেই জানতেন। যৌনসুখ দান করে নারীকে জয় করার ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে বহুগ্রন্থের বহুকাহিনীতে পাওয়া যায়। নর-নারীর মিলনকে সুন্দর সার্থক ও আনন্দময় করে তোলার প্রকৃষ্ট উপায় হলো বীর্যস্তম্ভন। বর্তমানকালে দেশে বিদেশে সর্বত্র অশান্তি, কলহ, ব্যাভিচার প্রভৃতি সাংসারিক দুর্যোগের মূলে একটা বিষয়ই প্রকট—তাহল যৌন জীবনে অসফলতা।

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারে বীর্যস্তম্ভন মন্ত্রের ব্যবহার ও বীর্যস্তম্ভন প্রক্রিয়ার চর্চা চলে আসছে। বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসক, আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক, তান্ত্রিক, যোগী প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে বীর্যস্তম্ভন ঘটানোর চেষ্টায় রত আছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিন ও মন্ত্রব্যবসায়ীগণ প্রাচীন কালের সেই চর্চার ধারাটি ধরে রাখার কিংবা আরো অধিক ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার যে প্রাচীনকালের আর্যঋষিগণের ব্যবহৃত

প্রক্রিয়া আজ বহুকাল পেরিয়ে বিভিন্ন মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত ও অব্যবহার্য হয়ে গেছে। মূল ব্যাপারটি কেমন ছিল তা আজ আর জানা হয় না। আজ যেটুকু পওয়া যায় তা কেবলমাত্র কিছু টোটকা চিকিৎসার নামান্তর। আজকাল হাটে বাজারে, রেলগাড়ীর কামরায়, শহরের পথে কিছু অসাধু, ঠগ লোকদের দেখা যায় যারা কথার জালে মানুষকে মুগ্ধ করে কিংবা মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিছু কবিরাজী ওষুধ বিক্রি করে —যেগুলিতে কখনো কোন কাজ হয় না। বর্তমানকালে সাংসারিক কলহের প্রধান বিষয় হলো স্ত্রীকে যৌনসুখ দিতে না পারা। শারীরিকভাবে দুর্বল, অক্ষম মানুষ আজ দ্রুতস্খলন, বেশি সময় বীর্যধারণ করতে না পারা, যৌনক্রিয়ায় অসমর্থ হওয়া প্রভৃতি রোগে ভুগছে। এইসব ধুরন্ধর ব্যবসায়ীগণ মানুষের এই দুর্বলতার খবর রাখে। এই সুযোগ নিয়ে তারা বীর্যস্তম্ভনের স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা উপার্জন করে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে বীর্যস্তম্ভন বিষয়ে অনেক চিকিৎসাপদ্ধতি আছে। এই চিকিৎসাতে দেশীয় বহু গাছ-গাছড়ার প্রয়োজন। বর্তমান কালে সেগুলি প্রায় দুর্লভ। এছাড়া আরো অনেক অনুপান ও দ্রব্যাদির কথা আছে যেগুলি সংগ্রহ খুবই কষ্টকর— প্রায় দুঃসাধ্য বলা চলে। কিন্তু সফল যৌনক্রিয়ার আশায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে। আমাদের দেশের টোটকা চিকিৎসা ব্যবসায়ী, কিছু অসাধু কবিরাজ, পথে ঘাটে হাটে বাজারের ধুরন্ধর ঠগ মানুষ এবং সেই সঙ্গে কিছু তান্ত্রিক ও ওঝা-গুণিন মানুষকে আশার মরীচিকা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করছে। এদের কারবার হলো কিছু গাছের মূল, জন্তুজানোয়ারের দাঁত নখ, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, নানাবিধ দ্রব্যাদি দেখিয়ে নানারকম কথা বলে মানুষকে ভুলিয়ে বিক্রি করে। হাটে বাজারের ও রেলগাড়ির কামরার ঠগ মানুষরা নানারকম বটিকা বিক্রি করে। যেগুলিকে তারা আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত দেশীয় গাছগাছড়ায় (Harbal) প্রস্তুত বলে প্রচার করে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলো তান্ত্রিক ও ওঝা-গুণিনরা যা করে। এরা আরও এক কাঠি উপরে। এরা এইসব দ্রব্যগুণের সঙ্গে মন্ত্রের ভড়ং জুড়ে দিয়ে মানুষকে ঠকায়। এদের ঠকানোর প্রক্রিয়া খুব সূক্ষ্ম ও কৌশল যুক্ত। যেমন বীর্যধারণে অপারগ কোন ব্যক্তি এদের কাছে এলে প্রথমে এরা কিছু দুঃষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করতে বলে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই বিষয়ে পিছিয়ে যায়। এরা তখন পয়সার বিনিময়ে সেগুলি বিক্রির প্রস্তাব দেয়। এর সঙ্গে গ্রহশান্তি এবং সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজা প্রভৃতির জন্য পয়সা নেয়। তারপর পরিচিত কিছু দ্রব্যাদির সঙ্গে কোন গাছের মূল বা শিকড় (তা আসল কিংবা নকল হোক) বাটা মিশিয়ে তিনি নক্ষত্র অনুযায়ী ধারণ কিংবা সেবন করতে বলে। এইভাবে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে পয়সা রোজগার করে। কিন্তু এত করেও কেউ অসফল হলে এরা দোষ দেয় যে ব্যবহারকারী ব্যক্তি ঠিকমত নিয়ম কানুন পালন করতে পারেনি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বীর্যস্তম্ভন তথা শুক্রস্তম্ভন বিষয়ক মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে দুরকমভাবে। কিছু সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু বাংলা ভাষায় লেখা। কিন্তু দুটি ভাষার মন্ত্রই অশুদ্ধ, অপূর্ণ, অসংলগ্ন, অবান্তর। শব্দ ও বাক্যের মাথামুণ্ড নেই। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি আরও মজাদার। কিছু কিছু বাংলা শব্দের সঙ্গে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগ করে সংস্কৃত করা হয়েছে। এগুলি মন্ত্র নয়, মন্ত্রের ভড়ং মাত্র। এগুলি নানারকম সুর করে ওঝা-গুণিনরা আবৃত্তি করে, সাধারণ মানুষের সত্য মিথ্যা যাচাই করার কোন সুযোগ থাকে না। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে নানারকম দ্রব্যাদির ব্যবহার ও তিথি নক্ষত্রের ভড়ং থাকে। যেমন, (একটি গুণিনের কাছ থেকে পাওয়া) অমৃতযোগে পুষ্যা কিংবা স্বাতী নক্ষত্রে বাবলা গাছের মূল তুলতে হবে শুদ্ধ হয়ে। তারপর সেই মূল শুকিয়ে শুঁঠ, পিপুল, শুকনো আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, মরিচ ও অশ্বগন্ধার সঙ্গে গুঁড়ো করতে

হবে। পবে সেগুলি গোদুগ্ধে ফুটিয়ে কিছু বড়ি প্রস্তুত কবে ছাযায শুকাতে হবে। এবপব এই বটিকা মুখে ধাবণ কবে শুদ্ধবস্ত্রে স্ত্রীসহবাস কবলে বীর্যধাবণ তথা বীর্যস্তম্ভন কবা যাবে।

কিন্তু এই বটিকা প্রস্তুত কবাব সঙ্গে সঙ্গে বীর্যস্তম্ভন মন্ত্র তিনবাব পাঠ কবতে হবে। এখন সেই স্তম্ভন মন্ত্রটি এখানে তুলে দেওয়া হল—

ওঁ হ্রীং ক্রীং ক্রাং খ্রিং
ওঁ বজ্রদেবতা ইন্দ্রং, জল দেবতা বরুনং, আদি দেবতা শিবায নমঃ।
পুষ্যো নক্ষত্রে, স্বাতী নক্ষত্রে নগ্ন ভবেৎ
বাখালশশা মূলং উত্তোলং কবতঃ
ক্ষীবৈং সংপিষ্য পিপ্পলী অশ্বগন্ধাদিসহ
গোলাকাবকৃতং এবং চ ছাযা শুষ্কং কবং।
বটিকা গলধীকৃতং শুদ্ধ বস্ত্রে স্ত্রী সহবাস কবম।
এতৎ ভবেৎ বীর্যস্তম্ভনং ভবন্তি।
ওঁ হ্রীং হ্রীং খ্রিং খ্রিং
ওঁ ইন্দ্রায নমঃ।
ওঁ বরুণায নমঃ
ওঁ শিবায নমঃ।

এছাড়া আব এক ধবনেব বীর্যস্তম্ভন মন্ত্র আছে—যে মন্ত্র পাঠ কবাব সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানস্থ নীলিবৃক্ষেব মূল সোমবাব বাত্রে তুলতে হবে। সেইমূল শুষ্ক কবে ত্রিধাতু কিংবা পঞ্চধাতুদ্বাবা তৈবী মাদুলীতে ভবতে হবে। তাবপব ত্রিবাত্রি শোধন কবে মঙ্গলবাব প্রাতে স্নান কবে কালো কাব (ঘুনসি) দিযে বাঁধতে হবে কোমবে, কিংবা বাম বাহুতে। সেই মন্ত্রটি হল—

পদ্মপলাশ লোচন হবি জগৎপিতায নমঃ
ত্রিশূলধাবী শ্মশানবাসী মহাদেবায নমঃ।
এতৎ বীর্যস্তম্ভন মন্ত্রং পাঠং কবতঃ নীলবৃক্ষমূলং
উৎপাটিতং কবিষ্যামি সোমবাবে নিশীথং।
পঞ্চধাত্যাদি সহ শোধনং কবতঃ প্রাতঃ সমুদ্ধৃত্য
কোমব বন্ধনং বীর্যস্তম্ভনং কর্বান্তু।
ওঁ মহাদেবতায নমঃ।
ওঁগোবিন্দায় নমঃ।

এইভাবে মাদুলি ধাবণ কবে স্ত্রী-গমন কবলে দ্রুতস্খলন হবে না পবন্তু বীর্যস্তম্ভন কবা সম্ভব হবে।

মন্ত্রগুলি সংগ্রহ কবাব পব পাঠ কবে হাসব না কাঁদব ঠিক কবতে পাবিনি। এগুলি কি মন্ত্র! এইসব মন্ত্র জড়িয়ে জড়িয়ে সুর কবে উচ্চৈস্বরে পাঠ কবে নিবীহ বোকা মানুষদেব ঠকিয়ে কিভাবে পয়সা বোজগাব কবে চলেছে ওঝা-গুনিনগণ ভাবলে শিউবে উঠতে হয়।

তবে মাঝে মাঝে নিজেব মনে সন্দেহ হয় সত্যিই কি এই মন্ত্রগুলি ওঝা-গুণিনগণ ব্যবহাব কবেন না আমি সঠিক মন্ত্র সংগ্রহ কবতে পাবিনি। ওঝা-গুণিনগণ কি আমাকে ভাঁওতা দিয়েছেন!

বীর্যস্তম্ভন মন্ত্র ছাড়া মেঘস্তম্ভন মন্ত্র, নিদ্রাস্তম্ভন মন্ত্র, নৌকাস্তম্ভন মন্ত্র, বিষ স্তম্ভন মন্ত্র, অগ্নিস্তম্ভন মন্ত্র প্রভৃতি যে মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সবগুলির চেহারা প্রায় একই ধরনের।

কিছু বাংলা শব্দ কিছু সংস্কৃত শব্দ মিশিয়ে তাদের সঙ্গে অনুস্বার বিসর্গ জুড়ে দিয়ে মন্ত্র বানানো হয়েছে। সেজন্য আর উদাহরণ দেওয়া হল না।

তবে সুখের কথা এই যে এই স্তম্ভন মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে খুব বেশি চলে না। মন্ত্রদ্বারা বীর্যধারণ সম্ভব— এমন কথা হয়ত এখনকার মানুষ বড় একটা বিশ্বাস করে না। এছাড়া মেঘস্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন কিংবা শস্ত্রস্তম্ভন প্রভৃতি ব্যাপারগুলির বড় একটা প্রয়োজন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে হয় না। এই অঞ্চলের মানুষ মূলতঃ খেটে খাওয়া মানুষ, তারা এই সব ব্যাপারগুলির বড় একটা ধার ধারে না।

তবে লোক সংস্কৃতির নিরিখে বিচার করলে এই মন্ত্রতন্ত্রগুলি একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। এই অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক মানুষ এইসব মন্ত্র, মাদুলি, কবজ, তাবিজ, গাছ গাছড়া, ধাতু, গ্রহশান্তি, দেবদেবীর পূজা বার ব্রত প্রভৃতির উপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা জ্বরজাড়ি, অসুখ-বিসুখে ভোগে, দুঃখ দুর্দশায় পড়ে, জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে তবুও বহুকাল থেকে বয়ে আসা সংস্কার-বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারে না। এটাই তাদের লোকধর্ম। এই লোকধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা-গুণিনগণ আরও কতকাল ধরে যে মন্ত্রতন্ত্র চালিয়ে যাবে তা কে জানে!

তাগা বাঁধা, গেঁটেল ও আঁচলি বাঁধা: পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সরকারি দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। এখানে অনেক কিছুই নেই। যেমন ভাল স্কুল, ভাল কলেজ, বড় কলকারখানা, শিল্পকেন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু যার অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় তা হল—উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসা-ব্যবস্থা কিংবা ভাল হাসপাতাল। কোন কঠিন ব্যাধি, হঠাৎ কোন বড় দুর্ঘটনা প্রভৃতির জন্য এই জেলার মানুষকে কলকাতা কিংবা অন্য কোথাও ছুটতে হয়।

ধূ ধূ মাঠ, খাল, বিল, নদী, বন নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই পরিবেশ বড় মনোরম ও সৌন্দর্যময়। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যে আছে মৃত্যুর হাতছানি। এই জেলার দক্ষিণে সুন্দরী সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যেমন আছে ভয়ঙ্কর হিংস্র কালান্তক 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' তেমনি এই জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আরও ভয়ানক মৃত্যুদূত—বিষধর সর্প, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শামুকমুটি, লাউডগা, বেত্রাং, শেওড় চাঁদা—আরও কত নামের তীব্র বিষধর সাপ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান কি আছে জানি না, তবে প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রতি বৎসর সাপের কামড়ে অসহায়ভাবে প্রাণ হারাচ্ছে। এর কোন প্রতিকার নেই। না আছে ভাল হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, না আছে উন্নত কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা। সাপে কামড়ানোর চিকিৎসার জন্যে তাই আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষকে ওঝা গুণিনের দ্বারস্থ হতে হয়।

সাপে কামড়ানোর চিকিৎসা সম্পর্কিত ওঝা গুণিনের মন্ত্র নিয়ে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখন আরও বিভিন্ন প্রকার সর্পবিষ চিকিৎসার মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে ওঝা-গুণিনের মন্ত্র যত প্রকার প্রচলিত আছে—তাদের মধ্যে সর্পবিষ চিকিৎসার মন্ত্র বেশি। এ থেকে অনুমান করা যায় এখানে সাপের উপদ্রব বেশি। তাই ওঝা-গুণিনগণ বিভিন্ন ধরনের সর্পবিষ নিবারণের মন্ত্র ব্যবহার করে রোগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন।

সাপে কামড়ানোর প্রতিকার হিসাবে যত প্রকার মন্ত্র আছে তাদের মধ্যে যেগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বেশি প্রচলিত তার তালিকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে: যেমন (১) বিষ-ঝাড়া

(২) হাত চালা (৩) ঝাড়ন (৪) ফুঁ (৫) তাগা বাঁধা (৬) গেঁটেল ( ) সাপমন্ত্র - মনসা সার, কৃষ্ণ সার, রাম সার, গামছা সার, চাপড় সার (৮) তিলক (৯) আঁচলে বাঁধা, (১০) মৃত সঞ্জীবনী (১১) জল পড়া (১২) বিষ স্তম্ভন।

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে বহু পর্যায়ের মন্ত্র ও তার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলি অবশিষ্ট আছে বর্তমান পর্যায়ে সেগুলি আলোচনা করা হবে।

তাগা বাঁধা : সাপে কামড়ালে দংশন স্থানের উপরে পাট, পাটের দড়ি, মোটা সূতা কিংবা সুতলি প্রভৃতি এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে রক্ত চলাচল না করতে পারে এবং রক্ত শরীরের উপর দিকে না যেতে পারে। একে বলে তাগা বাঁধা। এর ফলে বিষ রক্ত বাহিত হয়ে উপরে যেতে পারে না। এই পাট বা পাটের দড়ি ইত্যাদিকে মন্ত্রপূত করে বাঁধাই রীতি।

সর্পদংশনের প্রথম এবং প্রাথমিক চিকিৎসাই হল তাগা বাঁধা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে ওঝা গুণিনগণ এই 'তাগা বাঁধা' চিকিৎসা যথেষ্ট যত্ন সহকারে করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসাতেই রোগী সুস্থ হয়ে যায়। তবে হাত পা ছাড়া শরীরের অন্য কোন স্থানে সর্প দংশন করলে তাগা বাঁধা যায় না। মনসা মঙ্গলের এক কবি লিখেছেন— "শিরে হইল সর্পাঘাত তাগা বান্ধি কোথা।" তবে হাতে কিংবা পায়ে সাধারণতঃ সাপে কামড়ায়।

তাগা বাঁধা মন্ত্র

আয় মাগো মনসা দেবী আমার কণ্ঠে আয়
আমার মন্ত্রে মা গো তোমার শক্তি যোগাও।
তোমার বরেতে মাগো বিষ না উঠে উপরে
তাগার নীচেতে বিষ থাকুক ঘুম ঘোরে॥
মাগো মা মনসা দেবী কৃপা কর সন্তানে
তোমার কৃপায় অধম বিষ বাণ হানে॥
থাক বিষ থাক তাগার নীচেতে
কিছুতেই উঠিস না উপরে॥
কার আজ্ঞে—
মা মনসার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
বিষহরি বাইযের আজ্ঞে॥

আর এক ধরনের তাগা বাঁধার মন্ত্র—

ধন্নি বাঁধি ধন কুলিকা
ধান বেঁধে গেলাম লঙ্কা
লঙ্কায় থেকে দিলাম ডাক
যেখানে ধনি সেইখানে থাক॥
ধনি যদি নড়ে চড়ে
মহাদেবের মাথায় বজ্রাঘাত চড়ক্কি পড়ে॥
কার আজ্ঞে
ঈশ্বর মহাদেব কুটির আজ্ঞে॥

গেঁটেল : 'গেঁটেল' শব্দটি এসেছে 'গ্রন্থিল' শব্দটি থেকে। যার অর্থ হল 'গ্রন্থি সম্বন্ধীয়' অর্থাৎ গাঁটযুক্ত কোন জিনিস। সর্পদংশন করলে এক টুকরো কাপড় কিংবা দড়িতে তিনটি, পাঁচটি বা

সাতাটি গাঁট তৈরী করে দংশনস্থানের উপর জোরে বেঁধে দেওয়া হয়। এর নাম গেঁটেল বাঁধা। বলাই বাহুল্য গাঁটগুলি মন্ত্রপূত করে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তাগা বাঁধার পর গেঁটেল বাঁধা হয়। অর্থাৎ তাগা বাঁধাতে সফল না হলে গেঁটেল বাঁধা হয়। ওঝা-গুণিনরা বলেন—তাগা বাঁধা সফল না হলে গেঁটেল বাঁধা তে বিষ আটকে যেতে বাধ্য। গেঁটেল বাঁধলে বিষ আর উপরে উঠে মাথায় পৌঁছাতে পারে না।

গেঁটেল মন্ত্র

আকাশের কুণ্ডলি মেদিনীর চাক
অমুকার অঙ্গের বিষ নির্জনেতে থাক।
তোরে বাঁধিলাম আঁচলে দেবী মা মনসার বরে।
থাক বিষ তুই তলে পড়ে
যত দিন না আসি লঙ্কা বেড়ে॥
কার আজ্ঞে—
মা মনসার আজ্ঞে।

গেঁটেল কাটান

আঁট কঠিন গাঁট কঠিন কঠিন লোহার শিকল
আঁট গাঁট কেটে বিষ ঘা মুখেতে লিখল॥

প্রথমে মন্ত্র পড়ে গেঁটেল বাঁধতে হয় তারপর তা আবার কাটান করে দিতে হয় রোগী সুস্থ হয়ে যাবার পর। নতুবা রোগীর শরীরে বিষ থেকে যায়। তারপর সেই বিষ আবার উড়ান করে দিতে হয়। যাতে সেই বিষ আর অকুস্থলে না থাকে। এইভাবে তিন পর্যায়ে গেঁটেল মন্ত্র সম্পন্ন হয়।

উড়ান পুঁড়ে

পথে গেলে খেলে মাছি
ডাহিনে খেলে বাঁয়ে পুছি।
ধর্মগুরু মহাদেবের শিস
না পোঁছড়ে যাবি চৌসাপা সাপিনীর বিষ॥
কার আজ্ঞে—
বাবা মহাদেবের আজ্ঞে॥

অনেকে গেঁটেল কাটার পর 'চুমকুড়ি' দেয়। এতে রোগীর শরীর থেকে বিষ নির্গত হয়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। বিষের আর কোন কার্যকারিতা থাকে না। উড়ানের বদলে 'চুমকুড়ি' ব্যবহৃত হয়।

চুমকুড়ি

আয় বিষ তেড়ে ফুড়ে
বিষ মারি চুমকুড়ে।
এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা
অমুকার বত্রিশ নাড়ীর বিষ জ্বলে যা।
কার আজ্ঞে—
জগৎগৌরী মা মনসার আজ্ঞে
অবধৌতির আজ্ঞে॥

আঁচলি বান্ধা : গেঁটেল এবং আঁচলি বান্ধা প্রায় একই পর্যায়ের। অনেকে তাগা বাঁধার পর গেঁটেল ব্যবহার করেন। অনেকে আঁচলি বান্ধা ব্যবহার করেন। গেঁটেলে ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া কিংবা পাটের দড়ি বা শাড়ীর পাড় ব্যবহার করা হয় আর আঁচলি বান্ধাতে শাড়ীর আঁচল লাগে। অনেক ওঝা-গুণিন আঁচলি বান্ধা মন্ত্র তিনবার পাঠ করে নিজের পরনের কাপড়ের আঁচলে একটি অথবা তিনটি গাঁট বাঁধেন। এই আঁচলি বান্ধার পর সাপে কাটা রোগীর শরীরের বিষ অনেকাংশে কমে যায়। এরপর ঝাড়ন মন্ত্র কিংবা উড়ান মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তাহলে রোগীর শরীরে আর বিষ থাকে না—রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

আঁচলি বান্ধার মন্ত্র গেঁটেল মন্ত্রের মত। তবে গুণিন অনুযায়ী মন্ত্রের ভাষা বিভিন্ন রকমের হয়। কোন কোন গুণিনের মন্ত্রের ভাষা অনেকটা উন্নত ধরনের। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনরা অনেকে শ্রমজীবী মানুষ। চাষী, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর প্রভৃতি মানুষরা প্রয়োজন বোধে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র শিখে রেখেছে যাতে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় সাহায্য করতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সব সময় ডাক্তার ডাকা কিংবা ওঝা ডাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না—তখন কাছে পিঠের এই সব মানুষরা আপাতভাবে কিছু সাহায্য করে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত একটি তাগা বাঁধার মন্ত্রে আছে—"ধান বেঁধে গেলাম লঙ্কা"। এই লাইন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই মন্ত্রের অধিকারী ব্যক্তি হল একজন চাষী, যে ধান বাঁধতে বাঁধতে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করেছে।

এই মন্ত্রগুলির শক্তি কতটুকু কিংবা এতে কোন কাজ হয় কিনা—এই বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তখন এই বিতর্কিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না করে বলা যায়—এই মন্ত্রগুলি লোক সংস্কৃতি গবেষণার পক্ষে খুব সহায়ক। এগুলি শুধু মন্ত্র নয়, এগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাধারণ মানুষের সমাজের দলিল। গ্রামে গঞ্জে খেটে খাওয়া মানুষের আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

'তাগা বাঁধা' এবং 'গেঁটেল বাঁধা'—মন্ত্রগুলি ওঝা-গুণিনদের ভাঁওতা দেবার উপায় মাত্র, কিন্তু এদের প্রক্রিয়াটুকু বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন সর্প দংশন করলে দংশন স্থানের উপরে খুব জোরে কষে তাগা বাঁধার নিয়ম। এইভাবে জোরে বাঁধলে শরীরের ঐ অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিষ আর ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রে কাজ হোক বা না হোক, এই বাঁধনের ফলে অনেক সময় রোগীর উপকার হয়ে থাকে। 'গেঁটেলে' আবার দড়িতে গাঁট দিয়ে বাঁধা হয় যাতে বাঁধনটা আরও শক্ত হয়। এসকল ছাড়া ওঝা-গুণিনগণ কিছু বিষনাশক দ্রব্যও রোগীকে খাওয়ান। এতেও অনেক কাজ হয়। সুতরাং মন্ত্র চালাকি হলেও সমগ্র প্রক্রিয়াটা অনেক সময় কাজে লাগে, মানুষের উপকার হয়। আর এইরকম ঘটনা ঘটে বলেই আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছুটা বিশ্বাস করে চলে।

তিলক মন্ত্র ও কৃষ্ণসার :

প্রাচীনকালে কোথাও যাত্রার (গমন) পূর্বে কপালে তিলক দেওয়া হত। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে জননী বীরপুত্রের কপালে তিলক এঁকে দিতেন। উদ্দেশ্য— সন্তান যেন যুদ্ধে জয়ী হয়। মায়ের দেওয়া তিলক বীর পুত্রের শরীর মন শুদ্ধ রাখবে এবং শরীরে শক্তি যোগাবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলকাটার প্রচলন আছে। চন্দন বা গেরিমাটির দ্বারা ললাট, বাহু প্রভৃতি দেহের বারোটি স্থানে তিলক কাটা হয়। উদ্দেশ্য প্রায় একই—শরীর মন শুদ্ধ রাখা পবিত্র রাখা। তেমনি দেখা যায় দেবপূজার পূর্বে পূজারী ঠাকুর কপালে, কণ্ঠে, বক্ষে, নাভিতে চন্দন-তিলক দিয়ে থাকেন। এখানেও উদ্দেশ্য শরীর মন শুদ্ধ বা পবিত্র রাখা।

এইভাবে দেখা যায় শরীর ও মনকে শুদ্ধ করতে বিভিন্ন অবস্থায় শরীরে তিলক চিহ্ন আঁকা হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতি। বিশেষ করে শুভকাজের পূর্বে এই তিলক অঙ্কনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

শরীর ও মনকে শুদ্ধ করতে তিলক চিহ্ন ধারণের এই সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে ওঝা-গুণিনগণ তিলক মন্ত্রের অবতারণা করেছেন। এই তিলকের সাহায্যে শরীরস্থ বিষ, গ্লানি, রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি দূর করে শরীরকে সজীব, সুস্থ ও শুদ্ধ রাখা এর উদ্দেশ্য। বিশেষ করে সর্পবিষ নাশ করার জন্য ওঝা-গুণিনগণ এই তিলকমন্ত্রের বহুল ব্যবহার করে থাকেন। অথর্ববেদে সর্পবিষ প্রতিকারের বিষয়ে যে সূক্তগুলি আছে তাতে সর্প বিষের চিকিৎসার মন্ত্র ও ওষধির কথা বলা হয়েছে। অনেক ওঝা-গুণিন তিলকমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রগুলিও ব্যবহার করে থাকেন। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে যে মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে এই জাতীয় মন্ত্র পাওয়া যায়নি। গুণিনদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটি জানা গেছে।

তিলকমন্ত্রের ব্যবহারবিধি একটু জটিল। কেবল মন্ত্র ব্যবহার নয়, এর সঙ্গে কিছু ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-অর্চনাও জড়িয়ে আছে। মন্ত্র প্রয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীকে বিধিমতে নিখুঁতভাবে পূজা অর্চনা করতে হয়। এই মন্ত্রের ব্যবহারের পূর্বে নীল নিভা দেবীকে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হয়। তারপর দেবীর চরণামৃত নিয়ে চন্দনবাটার সঙ্গে মিশিয়ে সাপে কাটা রোগীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে তিলক দিতে হয়। এই তিলক রোগীর মাথায় বত্রিশ বার, মুখে ষোলবার, কণ্ঠে বারো বার, বক্ষে আটবার, নাভিতে ছয়বার এবং জানুতে চারবার দিতে হয়। প্রতিবার তিলকের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। এরপর রোগীকে দই, মধু, ননী, পিপুল, আদা, গোলমরিচ, গুড়, সৈন্ধবলবণ খাওয়াতে হবে এবং দেবীর চরণামৃত পান করাতে হবে। অনেক গুণিন দেবদানীর মূল, শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেত আকন্দের আঠা একত্র মিশিয়ে উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গে দিয়ে থাকেন। ওঝা-গুণিনদের মতে তিলকমন্ত্র ও ব্যবহারবিধি যদি ঠিকঠিক পালন করা যায় তাহলে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করে তোলা যায়।

তিলক মন্ত্র

ওঁ হ্রীং ছট ছট ফট ফট স্বাহা
ওঁ হ্রীং ক্রিং ক্রিং ফট ফট স্বাহা।
ওঁ দেবী নীলনীভে
কৃপয়া বিষ নাশয় নাশয় নাশয় নির্বিষং কুরু।
ওঁ স্বর্গ মর্ত্যং আকাশ ভূমণ্ডলং স্থাবরং জঙ্গমং
জলস্থল অন্তরীক্ষং বিষ নাশয় বিষ নাশয়।
——নাম্নী ব্যক্তিং শরীরং বিষ নাশয় নাশয়।
ওঁ ফট ফট ফট ফট ছট ছট ছট ছট স্বাহা।
হ্রীং ফট স্বাহা॥

বাংলা ভাষায় তিলকমন্ত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে পাওয়া যায়নি। এর অর্থ এই নয় যে বাংলা তিলকমন্ত্র এখানে নেই। তবে ওঝা-গুণিনদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে যে এখানে এই মন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ করতে চান না গুণিনগণ। তাছাড়া পূজা-অর্চনাদি সম্পন্ন করে বিধিসম্মতভাবে ঠিকঠিক প্রয়োগ না করতে পারলে কোন ফল লাভ করা তো যাবেই না, উপরন্তু ব্যবহার করতে গিয়ে ত্রুটি হলে ব্যবহারকারী অর্থাৎ গুণিনের ক্ষতি হতে পারে—বলে শোনা যায়। সেইজন্য অনেকে ভয়ে এই মন্ত্র ব্যবহার করতে চান না।

সর্পবিষ ছাড়া অন্য কোন বিষ শরীরে প্রবেশ করলে, কোন কঠিন রোগ ব্যাধি, কিংবা কোন পাপ কাজ করলে এই ত্রিলকমন্ত্রের সাহায্যে দূর করা যায়। মনে রাখা দরকার যে ত্রিলকমন্ত্রের মূল কাজ হল শরীর ও মন শুদ্ধ করা।

ত্রিলকমন্ত্রের মত মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র সর্পবিষ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রের ব্যবহারবিধি আরও জটিল এবং কঠিন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এই মন্ত্র সংগ্রহ করতে পারা যায়নি। তবে গুণিনদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুচারজন গুণিন এই মন্ত্র জানেন, কিন্তু কঠিন বলে প্রয়োগ করেন না। এতে চারজন গুণিন লাগে। একজন মূল-বাকীরা তাঁর সহকারী। ঘোড়ার মাথা, কুমোরের মাটি, কামারের লোহা, তাঁতীর নূতন বস্ত্র, ছুতোরের কাষ্ঠ-কীলক, প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রয়োজন হয়। অঘোর মন্ত্রে শিবলিঙ্গের অর্চনা করতে হয়। মূলতঃ এটা আভিচারিক কর্ম। এই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সমস্ত প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারলে ঘোড়ার মুখ থেকে চিঁ-হি-হি শব্দ উঠবে এবং ঐ মুখে মাটি লেপন করে আকোল গাছের বীজ রোপন করতে হবে। তাছাড়া এই মন্ত্রের সাধনা করা যেমন কঠিন তেমনি প্রয়োগবিধিও কঠিন। দীর্ঘদিন সময় লাগে। দীর্ঘদিন ধরে অঘোর মন্ত্র জপ করতে হয়। এই সব কারণের জন্য গুণিনগণ এই মন্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন।

সর্পবিষ নিবারণের আরও কতকগুলি মন্ত্র হল—সার মন্ত্র (যেমন কৃষ্ণসার, রাম সার ইত্যাদি), মর্দনমন্ত্র, মথন-মন্ত্র, গোর মন্ত্র। সার মন্ত্র নিয়ে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি বর্তমানে কৃষ্ণ সার নিয়ে আলোচনা করব।

'সার' শব্দের অনেক অর্থ। এক্ষেত্রে 'সার' শব্দের অর্থ হল সারাংশ, উৎকৃষ্ট অংশ বা সংক্ষিপ্ত নিষ্কর্ষ। শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাশিত করে সার-গ্রন্থ তৈরী হয়। ভগবৎ তত্ত্ব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত কাহিনী প্রভৃতির সারাংশ নিয়ে সারগ্রন্থ তৈরী হয়েছে আমাদের দেশে। আসলে এগুলিকে ধর্মশাস্ত্রসার বলা যায়। এই সমস্ত গ্রন্থকে একত্রিত করে 'সারাবলী' নাম দেওয়া হয়েছে। যাই হোক এই 'সার' শব্দের ভাবার্থকে লক্ষ্য করে ওঝা-গুণিনগণ 'সারমন্ত্র' উদ্ভাবন করেছেন। অর্থাৎ এগুলি মন্ত্রাদির সার। 'সারমন্ত্রের'র মধ্যে কৃষ্ণসারই শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত ও বহুল ব্যবহৃত। গুণিনগণ বলে থাকেন সাপে কাটা রোগীর পক্ষে এই মন্ত্র অমোঘ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর কৃষ্ণসার মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় 'কৃষ্ণসার' মন্ত্র এই অঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত।

'কৃষ্ণসার' মন্ত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় মন্ত্র হিসাবে এগুলির যত না মূল্য, তার চেয়ে এগুলি অনেক বেশি মূল্যবান লোকসংস্কৃতি চর্চার উপাদান হিসাবে। বহু প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে, সেইসঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কৃষ্ণকথার জোয়ার এসেছিল। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যাত্রা, নাটক, গান, কীর্তন, কবি, ঝুমুর, টপ্পা, পাঁচালী, এবং কাব্য কবিতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হয়েছিল। 'কানু বিনে গীত নাই'-এর ভাবধারায় ও সংস্কারে তখন বাংলাদেশ মাতাল হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ বিচার করে দেখা যায় অন্যান্য ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার একটা প্রবল স্রোত বহুদিন থেকে এদেশে প্রবাহিত। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে, ক্রিয়া-কর্মে, সংস্কৃতিচর্চায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা, গোষ্ঠলীলা, জন্মাষ্টমী, রাসলীলা প্রভৃতি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এখানে আজও 'কেষ্টযাত্রা', কীর্তনগানের আসর, অষ্টপ্রহর নাম মহোৎসব, পাঁচালী, কবিগান, টপ্পার আসর বসে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আজও পরিবার অন্যান্য মতের সঙ্গে

সঙ্গে 'গোস্বামী মতে'ব (যড় গোস্বামী প্রবর্তিত মত) প্রচলন দেখা যায। সুতবাং এই আলোচনা আব দীর্ঘাযিত না কবে বলা যায আমাদেব আলোচ্য 'কৃষ্ণসাব' মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বৈষ্ণবীয ভাবাদর্শেব প্রতিফলনেব একটা উদাহবণ মাত্র। ওঝা গুণিনগণ এই বৈষ্ণবীয প্রভাব এড়াতে পাবেননি। তাঁদেব মন্ত্রগুলিকে জনপ্রিয কবে তোলবাব উপায হিসাবে এই 'কৃষ্ণসাব' মন্ত্রেব প্রবর্তনা এমন কথা বললে বোধ হয অযৌক্তিক হয না।

এই মন্ত্রগুলিব মধ্যে দেখা যায সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত কিংবা শ্রীগৌবাঙ্গ সম্পর্কিত কোন কাহিনী জড়িয়ে আছে। এগুলিকে 'লোক ছড়া' বলাও যায। শুধু 'আদেশ কাড়া' অংশটি বাদ দিলে এগুলিকে আব মন্ত্র বলে চেনা যায না। মনে হয বচযিতা 'কৃষ্ণকথা'-ব ভাবধাবায অনুপ্রাণিত হযে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীগৌবাঙ্গ বিষযক ছোট ছোট পদ বা পদ্য বচনা কবে তাব সঙ্গে আদেশ কাড়া (কাব আজ্ঞে—) অংশটি জুড়ে দিযেছেন।

কৃষ্ণসাব

কবতালি দিযে বানী গোপালে নাচায।
নবনী খাইতে কৃষ্ণ মাগিছেন মায়।
বানী বলে নাচ নাচ মোব নিলমণি।
দুকব পুবিযা খেতে দিব ক্ষীব ননী॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বেশে নাচেন শ্রীহবি।
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত যশোদা সুন্দবি॥
বানী বলে ও বোহিনী দেখ বাহিবিযে
দেখিলেন কৃষ্ণেব নাচ বাহিব হইযে॥
আঙিনাব মাঝে চিকন কালিযে
দোহাই কৃষ্ণ আযবে বিষ নাশিযে॥
কাব আজ্ঞে—
শ্রীকৃষ্ণেব আজ্ঞে॥

কৃষ্ণসার

আনন্দে গৌবাঙ্গ চন্দ্র নাচিযা নগবে
সংকীর্তন কবেন প্রভু ভক্ত জনাব ঘবে।
হরি বোল বোল বলে প্রেমনগব মাঝাবে
হেনকালে সর্পাঘাত গৌরাঙ্গ শবীরে॥
শ্রীবাধা বলিযা নাম ডাকে উচ্চৈস্ববে
রাধাব স্মবণে বিষ ঘা মুখে মবে॥
যা বিষ ঘা মুখে মবে যা।
কার আজ্ঞে
শ্রীবাধাব আজ্ঞে
কাব আজ্ঞে
শ্রীকৃষ্ণেব আজ্ঞে॥

এগুলির মন্ত্রশক্তি কতখানি আছে জানি না, তবে 'সেই 'কানুবিনে গীত নাই' -এব দিনে এগুলি যে জনচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল সে কথা দৃঢ়স্বরে বলা যায়। মানসিক সন্তুষ্টিবিধান

করে হয়ত ওঝা-গুণিনগণ বিষক্রিয়ার হাত থেকে তৎকালে মানুষকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন একথা মনে করা যেতে পারে।

অন্যান্য সার মন্ত্র, গোব মন্ত্র ও চিয়েন

ভারতবর্ষের দেব-দেবী কল্পনার ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। এই ধারাগুলির মধ্যে দেব দেবীর যুগলরূপ কল্পনা ভারতীয় দেব-ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক কিংবা তার কিছু পূর্ব থেকে বাংলাদেশে দেবদেবীগণের তিনটি যুগল রূপ বহু প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সেই তিনটি রূপ হল—(১) হর-পার্বতী (২) রাধা-কৃষ্ণ (৩) রাম সীতা।

যদিও উপরোক্ত তিনটি ধারার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূল স্থানগুলি হল অ-বাংলাভাষী দেশসমূহ। যেমন রাধাকৃষ্ণের জনপ্রিয়তা পূর্বভারত ও উত্তরভারতে বেশি, তেমনি রাম ও সীতার মূল প্রসিদ্ধি স্থান হল উত্তর ভারত আর হর-পার্বতীর জনপ্রিয়তা উত্তর ভারত, পূর্ব ভারত, মধ্য ভারতে কম বেশি আছে। কিন্তু এই তিন ধারার প্রচলন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজজীবনকে হরপার্বতী আর রাধা কৃষ্ণ যেমনভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে রাম-সীতা তেমনভাবে পারেনি।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় দেবভাবনার যে প্রভাব বাংলাদেশ বহন করে এনেছিল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তার অস্তিত্ব আজও বর্তমান। এখানকার ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রথা, আচার প্রভৃতি আলোচনা করলে একথা যেমন প্রমাণ করা যায় তেমনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা-গুণিন মন্ত্রেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি প্রাচীন পৌরাণিক কৃষ্ণ কিভাবে বাংলাদেশে 'কানু' হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে স্থানলাভ করেছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা-গুণিন মন্ত্রে তার প্রভাবের উদাহরণ 'কৃষ্ণসার' মন্ত্রগুলি। তেমনি এ বিষয়ে আরো একটি প্রমাণ হল 'গোপিনী সার' মন্ত্র।

'কৃষ্ণসার' মন্ত্রগুলির মত 'গোপিনী সার' মন্ত্র সর্পবিষ নিবারণের মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে রাধা সহ গোপিনীগণ যেমন বাংলার ধর্ম সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে, তেমনি গুণিনমন্ত্রের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে। মূলকথা হল—সর্পবিষ প্রতিকারের মন্ত্র কে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য ওঝা-গুণিনগণ গোপিনীদের নাম করে মন্ত্রের নামকরণ করেছেন বা আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সর্পবিষ-নিবারণের মন্ত্রের মত এও বিষ প্রতিষেধক মন্ত্র। কেবলমাত্র ভনিতায় ষোড়শ গোপিনীর নামে 'আজ্ঞা' দেওয়া হয়েছে এবং কৃষ্ণ গোপিনীগণের লীলার কিছু কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রক্রিয়া প্রায় অন্যান্য 'ঝাড়ন'মন্ত্রের প্রক্রিয়ার মত। রাধা, কৃষ্ণ ও গোপিনীদের নিয়ে লীলা, বনে গোচারণে গোপবালকগণের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা, যশোদার বাৎসল্য, কৃষ্ণের ননীচুরি, দধি খাওয়া প্রভৃতি 'গোপিনীসার' মন্ত্রগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। একথা পরিষ্কার বোঝা যায় কৃষ্ণলীলা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এগুলি রচনা করা হয়েছে।

গোপিনী সার

জল আনিতে যমুনায় যায় রাধারাণী।
পথিমধ্যে সর্পরাজ তক্ষক ছিলেন আপনি।।
বৃক্ষের উপর থেকে তক্ষক ঝাঁপায়।
পূর্বরোষ-হেতু সে রাধারে দংশায়।।
বিষের জ্বালায় রাধা হইয়া কাতর।

ভূমির উপর গড়াগড়ি যান অতঃপর ॥
পাইয়া খবর যত ব্রজগোপীগণ।
ত্বরিতে রাধার কাছে করেন গমন।
সবে মিলি রাধারে পরিচর্যা করে।
কেহ তাগাবান্ধে, কেহ ক্রোড়ে করে॥
শুনিয়া রাধার বার্তা কৃষ্ণ উপস্থিত হন।
রাধারে হেরিয়া তিনি হন অচেতন॥
এইসব কাণ্ড দেখি গোপিনীরা ক্রন্দন জুড়িল।
তাহাদের কান্নার সুরে মন্ত্র উপজিল॥
গোপিনী ক্রন্দন-বাক্য যে মন্ত্র হয়।
তাহারে গোপিনীসার নাম দেওয়া যায়।
গোপিনী সার মন্ত্রে রাধার বিষ দূর হল।
চোখ চাহি রাধারানী উঠিয়া বসিল॥
বিষ নাই, বিষ নাই অমুকের শরীরে।
গোপিনীসার মন্ত্র সর্ববিষ হরে॥
কার আজ্ঞে—
রাধারানীর আজ্ঞে—
কার আজ্ঞে—
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনগণ বিষ-নাশক দ্রব্যাদি ও ব্যবহার করে থাকেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রভাব বহনকারী 'কৃষ্ণসার', 'গোপিনীসার' মন্ত্রগুলি যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক-সংস্কৃতির পরিচায়ক, তেমনি রামকথার প্রভাব অঙ্গে ধারণ করে 'রামসার' মন্ত্রগুলির আত্মপ্রকাশ।

'রামসার' মন্ত্র ও সর্পবিষনাশক মন্ত্র। 'কৃষ্ণসার', 'গোপিনীসার' মন্ত্রগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলার কাহিনী আছে, তেমনি 'রামসার' মন্ত্রের মধ্যে রামায়ণ-কাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ লক্ষ্মণের নাগপাশ কাহিনী এই মন্ত্রগুলির মধ্যে আছে। সেই সঙ্গে রামলক্ষ্মণ সীতার বনবাসের কাহিনী, রামচন্দ্রের বিলাপ, গড়ুরের আগমন ও তার উপস্থিতিতে নাগপাশ মুক্তি ও সর্পবিষ দূর প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে মন্ত্রগুলির মধ্যে। শেষে শ্রীরামচন্দ্রের কিংবা গড়ুরের আজ্ঞা দিয়ে মন্ত্রগুলি শেষ হয়েছে। মন্ত্রগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পয়ার ছন্দের অনুকরণ করে রচিত হয়েছে, যদিও পয়ার ছন্দের নিয়ম সঠিকভাবে কোথাও রক্ষিত হয়নি।

'রামসার'

রাম-রাবণ যুদ্ধকালে লক্ষ্মণের নাগপাশ হল।
তাহা দেখি শ্রীরামচন্দ্র কাঁদিতে লাগিল॥
বক্ষে করাঘাত করি রাম কাঁদেন উচ্চৈস্বরে
তাহা শুনি গড়ুরদেবের মন কেমন করে॥
বিনতানন্দন গড়ুর আসেন ত্বরা করি।
তাকে দেখি নাগেরা পলায় পড়িমরি॥

নাগ গেল পলাইয়া বিষ নাই অঙ্গে।
বিষ সব গেল চলি নাগেদেব সঙ্গে॥
বিষ নাই নাই বিষ বিষ নাই আব।
এই মন্ত্রেব গুণ শ্রীবাম সাব॥
কাব আজ্ঞে—
প্রভু শ্রীবামচন্দ্রেব আজ্ঞে।
কাব আজ্ঞে
গড়ুব দেবেব আজ্ঞে॥

ওঝা গুণিনবা বলেন 'বামসাব' মন্ত্র পড়লে মবা বোগীও বেঁচে ওঠে।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব ওঝা-গুণিন মন্ত্রে হবপার্বতীব ধাবাব প্রভাব সর্বত্র লক্ষ্য কবা যায়। শিবেব কন্যা মনসা সর্পদেবী। সর্পবিষ নিবাবণেব মন্ত্রগুলিব আবাধ্যা দেবী হলেন মনসা। শিবেব স্ত্রী হিসাবে চণ্ডীদেবীব উল্লেখ বহু মন্ত্রে আছে। এছাড়া মনসা'ব নামে আজ্ঞা চণ্ডীব নামে আজ্ঞা শিবেব নামে আজ্ঞা প্রভৃতি মন্ত্রগুলিব মধ্যে শৈব প্রভাবেব সাক্ষ্য বহন কবে। 'মনসাসাব' মন্ত্র এবং 'মথন সাব' মন্ত্রগুলিব মধ্যে শিবকাহিনীব উল্লেখ আছে।

এককালে বাংলাদেশে শিবকাহিনী তথা 'শিবায়ন' কাব্যেব প্রচুব জনপ্রিয়তা ছিল। শিব প্রাচীন পৌবাণিক দেবতা হলেও বাংলাদেশ শিবকে নিজেদেব ঘবেব মানুষে পবিণত কবে নিয়েছিল। শিবায়ন কাহিনীগুলিব মধ্যে সেই লৌকিক শিবেব উপস্থিতি। এই শিব স্ত্রীপার্বতীব সঙ্গে সংসাব কবেন, অভাবেব তাড়নায় চাষবাস শুরু কবেন, স্ত্রীকে শাঁখা কিনে দেবাব সামর্থ্য না থাকায় স্ত্রী পার্বতী বাগ কবে বাপেব বাড়ী চলে যায়। 'শিবেব শাঁখা পবানো' পালা একসময় বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় ছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব লোকসংস্কৃতিতে শিবকাহিনীব এই প্রভাব খুব ভালভাবে লক্ষ্য কবা যায়। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রামে শাঁখা পবানোব পালা গেয়ে ভিখাবিবা ভিক্ষা কবে। কিছু ঝাড়ন, মনসাসা'ব ও মথনসাব মন্ত্রেব মধ্যে কিছু কিছু শিবকাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য কবা যায়। এই মন্ত্রগুলি মন্ত্র হিসাবে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, লোকসংস্কৃতি চর্চায় এদেব গুরুত্ব অনেক বেশি।

একটি ঝাড়নে শিব দুর্গাব ঝগড়াব কাহিনী আছে। মনসাসাব মন্ত্রে শিবকন্যা হিসাবে মনসাব শক্তি ও বিষনাশিনী ক্ষমতাব কথা আছে। 'মথনসাব'মন্ত্রে সমুদ্র মন্থনেব কাহিনী ও কালকূট বিষ পান কবে মহাদেবেব 'নীলকণ্ঠ' নাম ধাবণেব কাহিনী বর্ণিত আছে।

কিছু কিছু গোবমন্ত্রে বামায়ণ কাহিনী যেমন আছে তেমনি শিবকাহিনীব বর্ণনা লক্ষ্য কবা যায়। 'আগুন গোব', 'শীতল গোব' প্রভৃতি এই জাতীয় মন্ত্র। এছাড়া কিছু কিছু মন্ত্র আছে যেমন 'জলভবা', 'তুলসী পড়া' প্রভৃতিব মধ্যে কৃষ্ণকথা এবং কিছু বিষনাশক মন্ত্রেব মধ্যে শিবকথা, বামকথাব পবিচয় পাওয়া যায়। সুতবাং লোকসংস্কৃতি চর্চায় দক্ষিণ চব্বিশ পবগনা থেকে প্রাপ্ত বিষনাশক মন্ত্রগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় সর্পবিষ নাশক আব এক প্রকাব মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাব নাম 'চিয়েন' মন্ত্র। এই 'চিয়েন' মন্ত্রেব মধ্যে শিব, মনসা ও চণ্ডীব ঝগড়াব কাহিনী আছে। এই চিয়েন মন্ত্রেব একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে বিষ গা মুখে চলে আসে তাবপব নষ্ট যায়।

একটি চিয়েন মন্ত্রে দেখা যায় শিব গৃহচ্ছেড়ে দূবদেশে চলে যাচ্ছে—এতে চণ্ডী কাঁদছে। পথে কালীনদী। কিন্তু সর্পবিষে নদীব জল বিষাক্ত। সেই বিষে শিব অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতে

গঙ্গা ও দুর্গাও কাঁদছে। তখন মনসাকে ডাকা হল। মনসা এসে সর্পগণেব সাহায্যে বিষ নষ্ট কবল। এই মন্ত্রে বাংলা মঙ্গলকাব্যেব বিশেষ কবে মনসামঙ্গলের কাহিনীব প্রভাব আছে। আব একটা চিয়েন মন্ত্রে আছে বিষ খেযে, শিব ঢলে পড়ে গেছে, তা দেখে গঙ্গা ও দুর্গা কাঁদছে। সুতরাং 'পদুমা' ঝি কে ডাকা হল। 'পদুমা' ঝি অর্থাৎ মনসা ধ্যানে বসল এবং শেযে শিবেব মাথায় হাত দিলে শিবেব শবীব থেকে বিষ চলে গেল।

এইভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব মন্ত্র-তন্ত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায এই মন্ত্রগুলির মধ্য দিযে লোক সংস্কৃতিব এক ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকে বযে চলে আসছে। মানুষের দুঃখদুর্দশা, বিপদ-আপদ, দৈবদুর্বিপাকেব সামাল দিতে গিযে প্রযোজনেব সূত্র ধবে ওঝা-গুণিনেব মন্ত্রগুলিব আবির্ভাব। অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নাবস্থায অবস্থিত দক্ষিণ চব্বিশ পবগনার মানুষ হাতের কাছেব 'বন্ধু' হিসাবে যে মন্ত্রগুলিকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং আজও ধরে আছে ওঝা-গুণিনগণ সেই মন্ত্রগুলির সৃষ্টি করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু কখন অজান্তে তাঁরা সেই মন্ত্রগুলির মধ্যে ধর্ম-সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটিয়েছেন তা তাঁবা নিজেরাই জানেন না।

ভাষা বিচারে এই মন্ত্রগুলিব কোন গুরুত্ব নেই কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ভাষা মন্ত্রগুলির অঙ্গে অঙ্গে। কার্যকারিতাব দিক দিয়ে এগুলি কতদূব সার্থক তা আজও সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুযের বিপদ-আপদের দঃখ দুর্দশার তাৎক্ষণিক সহায় হিসাবে এবং এই অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে এগুলি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

অতি আহারের মন্ত্র ও পেট কামড়ানির ঝাড়ন

মহাভারত কাহিনীতে দেখা যায় পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব অর্থাৎ মহাবলী ভীম সেন অত্যধিক আহার করতে পাবতেন। তাঁর উদবে 'বৃক' নামে বহুভক্ষ অগ্নি বিরাজ কবত। সেই জন্য তিনি প্রচুর খেতে পারতেন এবং সেই কারণে তাঁর আর এক নাম হয়েছিল 'বৃকোদর'। দুর্যোধন দুবাব ভীমের খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারের বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে ভীমের কোনপ্রকাব অনিষ্ট হযনি, তিনি তা হজম করে ফেলেছিলেন।

জতুগৃহ ঘটনার পর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে একচক্রানগরে যখন অবস্থান করেছিলেন, সেখানে ভীম বক রাক্ষসকে বধ করেন। এই রাক্ষসকে বধ করার পূর্বে তার যে খাদ্যসম্ভার ভীম খেয়েছিলেন তা কোন মানুযেব পক্ষে সম্ভব ছিল না। অত্যধিক আহাব কবতেন বলে ও সর্বভুক ছিলেন বলে মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের পতন হয়েছিল।

শুধু ভীমসেন নয়, প্রাচীনকালে বহু মুনি ঋষি এইরকম অত্যধিক আহার করতে পারতেন। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকে তা জানা যায়। তবে কেবলমাত্র শারীরিক ভোজন ক্ষমতা বলে তাঁরা এইরূপ অত্যধিক আহার করতে পারতেন তা নয়, প্রাচীনকালে মুণি ঋষিগণ যোগসিদ্ধ মন্ত্রতন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁরা অত্যধিক আহারে সমর্থ হতেন। বাতাপী-ইল্বলের কাহিনী থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়।

যাই হোক মন্ত্র-তন্ত্রের জোরে অত্যাধিক আহার করা ও তা হজম করা সম্ভব— এতথ্য প্রাচীনকালের মানুষ যেমন জানতেন, বর্তমান কালের ওঝা-গুণিনগণও তা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কিছু কছু গুণিনমন্ত্র আছে যার দ্বারা গুরুপাক এবং দুস্পাচ্য দ্রব্যও অত্যধিক ভোজন করা যায় ও সেগুলি হজম করা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এইরকম দু-একটি পাওয়া গিয়েছে। এই মন্ত্রগুলিতে দেখা যায় ভীমের মত, বক রাক্ষসের মত, হনুমানের মত ভোজন করতে পারার ব্যবস্থা আছে। এখানে মহাভারত কাহিনীর একচক্রানগরে ভীম ও বক রাক্ষসের কথা মনে পড়িয়ে

দেয। প্রসঙ্গত বলা যায ভীম ও বক বাক্ষসেব ঘটনার কথা মনে বেখেই বোধ হয ওঝা গুণিনগণ মন্ত্রেব সৃষ্টি কবেছিলেন।

অতি আহাবেব এই মন্ত্রে বক-বাক্ষস ও ভীমেব প্রসঙ্গ আছে একথা পূর্বে বলা হযেছে। এ থেকে অনুমান কবা যায় বাংলাদেশে মহাভাবতেব প্রভাব কত ক্রিযাশীল, যেখানে ওঝা-গুণিনেব মন্ত্রে মহাভাবতেব কাহিনীব ছাযাপাত লক্ষ্য কবা যাচ্ছে। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রামাঞ্চলে কার্তিক মাসে ঘবে ঘবে মহাভাবত পাঠ হয। বাড়ীব বউ ঝি, বুড়ো বুড়ি, ছেলে মেযে এমনকি পাড়াব লোকজন এসে সমবেত হযে মহাভাবত পাঠ শ্রবণ কবে। গোটা মাস ধবে এই পাঠ-পর্ব চলে এবং মাসেব মধ্যেই অষ্টাদশপর্ব মহাভাবতখানিব পাঠ সম্পূর্ণ কবতে হয। কার্তিক সংক্রান্তিতে এই পাঠ উপলক্ষ্যে পূজাঅর্চনা, নাম-কীর্তন, হবিব লুট এমনকি কোথাও কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে ভোজনাদি ও হযে থাকে। সুতবাং অতি আহাবেব এই মন্ত্রেও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব লোকসংস্কৃতিব প্রভাব লক্ষ্য কবা যায।

অতি আহাবের মন্ত্র

বক বাক্ষস বক বাক্ষস তুমি বড বীব।
তোমাব অত্যাচাবে মানুষ নয় স্থিব।।
তোমাব সকল খাদ্য ভীম সেন খাইল।
খাদ্য ভক্ষণ কবে বীব তোমাকে মাবিল।।
সুখাদ্য কুখাদ্য যত না কবি বিচাব।
ভীম বীব মুহূর্তেই কবে অতি আহাব।।
গুরুব আজ্ঞায আমি মন্ত্র দিই পড়ে।
যেখানে যত খাদ্য আছে সবাব উপবে।।
ভীমেব মতন সবে পেট ভবি খাও।
সব খাদ্য জীর্ণ হযে মহাসমুদ্রে যাও।।
কাব আজ্ঞে—
হাড়ি ঝি চণ্ডীব আজ্ঞে
কাব আজ্ঞে—
পঞ্চ পাণ্ডবেব আজ্ঞে।
কাব আজ্ঞে—
মহাবীব ভীমেব আজ্ঞে।

এই মন্ত্র সাতবাব পাঠ কবে কাষ্ঠেব আসনে বসে ঘৃতমিশ্রিত পলান্ন গ্রহণ কবলে মহাভারতেব ভীমেব মত ভোজন কবা যায।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব ওঝা-গুণিনগণ বেশ বিচক্ষণ ছিলেন। অতি আহারেব মন্ত্রে যদি সুফল না হয, পদ্ধতিগত কোন গলদ থাকার জন্য যদি খাদ্য ঠিকমত হজম না হয়, অন্তে বদহজম কিংবা পেটকামড়ানি হলে তা নিবাবণ করাব জন্য পেট কামড়ানির মন্ত্র আছে। পেট কামড়ানিব অন্য মন্ত্রও আছে। তবে অতি আহাবের মন্ত্রেব পব এই বিশেষ নির্দিষ্ট পেটকামড়ানিব মন্ত্র পাঠ কবতে হয়। তাহলে অতি আহারেব কাবণে সমস্ত অসুবিধা দূব হয়ে যাবে। এটিও এক ধবনেব ঝাড়ন মন্ত্র। তবে অন্য ঝাড়ন মন্ত্রেব সঙ্গে তফাৎ এই যে এটি এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তবেই সুফল পাওয়া যায়।

পেটকামড়ানির মন্ত্র বা ঝাড়ন

ওঁ নমঃ শিবায়
ওঁ নমঃ শিবায়॥
পেটে হাত দিয়া শব হইল অস্থিব।
পেট কামড়ানিব প্রতাপে সে নহে কিছু স্থিব॥
পেট কামড়ানি সর্বনাশী গালি দিই তোবে॥
বোচকা বুচকি বেঁধে তুই যা সাত সমুদ্রেব পাবে॥
ফেব যদি দেখি তোবে কবব ছাবখাব।
গুরুব বাণেতে তুই না পাবি আব পাব।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যত বাক্ষসী আছে।
নির্বংশ কবে দিই বাণেব আঘাতে॥
কাব আজ্ঞে—
দেবী জগদম্বাব আজ্ঞে
কাব আজ্ঞে
হাড়ি ঝি চণ্ডীব আজ্ঞে।

প্রথমে বোগীব পেটটি ঠাণ্ডা জলে ভাল কবে ধুয়ে নিতে হবে তাবপব বোগীকে চিৎ কবে শুইয়ে এই মন্ত্রটি পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র তলপেটে মৃদু মৃদু চাপড় মাবতে হবে যতক্ষণ না বোগী আবাম বোধ কবে। এই মন্ত্র কমপক্ষে সাতবাব পাঠ কবতে হবে। কোন কোন গুণিন কিছু লতাপাতাব বস এই সঙ্গে প্রযোগ কবে থাকেন। কি ধবনেব লতাপাতা তাব নাম জানতে পাবা যাযনি। তবে কোন ওষধি লতাপাতা (Harbal) হওযা সম্ভব।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব ওঝা-গুণিনগণেব সতর্কদৃষ্টি সাংসাবিক জীবনেব প্রতিটি বিপদআপদ সুবিধা অসুবিধাব উপব নিবদ্ধ ছিল। তাঁদেব উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত বিচিত্র প্রকাবেব মন্ত্রগুলি লক্ষ্য কবলে তা প্রমাণ কবা যায়। সাংসাবিক জীবনেব খুঁটিনাটি বিষযগুলি সম্বন্ধে যেমন তাঁবা অবহিত ছিলেন, তেমনি সেই জীবনকে সুস্থ ও সুন্দব কবে তুলতে তাঁদেব চেষ্টাব অন্ত ছিল না। হতে পাবে ভাষা বিচাবে কিংবা ক্রিয়াশীলতা বিচাবে এই মন্ত্রগুলি মূল্যহীন। তবে এও হতে পাবে যে মন্ত্রগুলি আমবা সংগ্রহ কবেছি, সেগুলি যথার্থ নয। প্রকৃত মন্ত্র ও তাদেব ব্যবহাব বিধি ওঝা-গুণিনগণ সযত্নে গোপন কবে বেখেছেন। তাছাড়া আসল গুণিনেব সাক্ষাৎ আমবা হয়ত পাইনি। ওঝা-গুণিনদেব খ্যাতিব সুযোগ নিয়ে কিছু ঠগ-প্রতাবক কিছু কিছু অসংলগ্ন অবাস্তব ছড়া বা পদ্য বচনা কবে সেগুলিকে মন্ত্র বলে চালিযে লোক ঠকিযে পযসা উপার্জন কবছে। যাই হোক, তবু যে ধবনেব বিচিত্র প্রকাবেব মন্ত্র আমবা সংগ্রহ কবেছি সেগুলি (আসল না হলেও) দেখে বলা যায় মানুষেব সুখ সুবিধাব দিকে এঁদের দবদী-দৃষ্টিপাত ঘটেছিল। এইসব কারণেব জন্য তাঁদেবকে সমাজেব মানুষেব বন্ধু বলে অভিহিত কবা যায়।

ওঝা-গুণিনগণ জীবনকে যে খুব কাছে থেকে দেখেছেন তা যেমন তাঁদেব জীবনেব খুঁটিনাটি বিষযেব উপব মন্ত্র বচনাব ধবন থেকে লক্ষ্য কবা যায় তেমনি তাঁবা যে ভেষজ বিদ্যা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষযে এবং জ্যোতিষ বিদ্যায় পাবদর্শী ছিলেন তা বিভিন্নভাবে প্রমাণ কবা যায়। মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবা নানাপ্রকার দ্রব্যগুণ- যথা, গাছগাছড়াব শিকড়, লতা-পাতা, ধাতু, জন্তুজানোয়াবেব হাড়, দাঁত, নখ, সামুদ্রিক জিনিস প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তাঁরা বিভিন্নপ্রকার

দেব দেবীর পূজাপদ্ধতি, মানুষের ধর্ম অনুযায়ী আচার-বিচার, গ্রহ নক্ষত্রদের অবস্থান, মানুষের শরীরে গ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র, তাদের ক্রিয়া পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। যেমন—

দেশে অনাবৃষ্টি হলে ইন্দ্র দেবতার পূজা করতে হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ ও অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা ইন্দ্র দেবতার হোম ও এক সহস্রবার 'বৃষ্টিকরণ' মন্ত্র জপ করলে অনাবৃষ্টি দূর হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটে।

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের শিকড় কিংবা শ্বেতগুঞ্জার মূল তুলে কবচ করে বাহুতে বাঁধলে ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। মন শান্ত ও স্থির করে তদগত হয়ে শুদ্ধভাবে 'ওঁ হ্রীং সূর্যায়' মন্ত্রটি ৬০০০০ (ষাট হাজার) বার জপ করতে পারলে রবিগ্রহের শুভদৃষ্টি লাভ করা যায়।

তান্ত্রিক ক্রিযাকলাপ বিনষ্ট ও প্রতিরোধ করার জন্য 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং বটুকভৈরবঃ শ্রীং শ্রীং হুং হুং হ্রীংস্বাহা' মন্ত্রটি দশ হাজার বার জপ করতে হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু কিছু নিষ্ঠাবান গুণিন আছেন যাঁরা ঐগুলি করে থাকেন। সর্বশত্রু ও বিপদনাশক জ্বালামুখী মন্ত্র 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং জ্বালামুখী দেবী সর্বশত্রুনাশ সর্ববিপদ নাশ কুরু কুরু স্বাহা'—এক লক্ষবার স্থির চিত্তে জপ করতে পারলে সমস্ত বিপদ আপদাদি দূর হয় এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দুষ্টব্যক্তি, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, জম্বুক, নাগ, গজ ও হয়াদিতে অনিষ্ট করতে পারে না।

মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যগুণ তথা গাছ গাছড়ার মূল, লতাপাতা, ধাতু বিভিন্ন জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা গুণিনগণ। এঁদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল—

১. গাছ-গাছড়ার মূল, শিকড়, লতাপাতা ইত্যাদি :

রক্তচন্দন, বচ, কুড়, বেণোর মূল, ছোট এলাচ, শ্বেতচন্দন, হলুদ, তিল, যব, করবী ফুল, পান, ত্রিফলা, করঞ্জবীজ ও মূল, কালো ধুতুরার ফুলফল, বিল্বপত্র, বেল, ত্রিপুরারী ফুল, পিপুল, অপরাজিতা, আপাং-এর মূল, কন্টিকারীর মূল, শ্বেত আকন্দ, মহালক্ষের মূল, রাখালশশার মূল, সরিষা, কুলত্থ কড়াই, জাতি ফল, তিল, যব, শ্বেত সরিষা, ত্রিকূট, পলাশ ফুল, জয়ন্তী মূল, পুনর্নবা, আদা, বাকস পাতা, কৃষ্ণ তুলসী, বকুল বীজ প্রভৃতি।

২. বিভিন্ন জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি :

ছুঁচোর মস্তক, ময়ূরের বিষ্ঠা, পায়রার বিষ্ঠা, ঘুনের গুঁড়া, উইমাটি, ছাগমূত্র, মহিষচর্বি, গরুর শিং, নরকপাল, মার্জ্জারের মল, শামুক চুন, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, গোরোচনা, পেঁচার হাড়, গরুর দাঁত, কচ্ছপের খোলা, ব্যাঙের মাথা, মূষিকের বিষ্ঠা, ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগনাভি, মৌমাছির পাখা, শকুনির ডিম প্রভৃতি।

ধাতু ও ও অন্য দ্রব্যাদি :

হরিতাল, লোহা, ইঁদুরমাটি, সিঁদুর,চিতাভস্ম, কাজল, কর্পূর, কুঙ্কুম, ধুনা, গন্ধক, সীসা, চুম্বক, সোহাগা, মধু, সৈন্ধব লবণ, তামা, মদ্য, পলা বা কোন রক্তবর্ণ ধাতু প্রভৃতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা

গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা : আলোচনা ও পর্যালোচনা-১

কোন বিদ্যা বা বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনভাবে চর্চা করা হলে তাকে গুপ্তবিদ্যা বলা যেতে পারে। প্রাচীনকালে ধর্মগুরুগণ কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গোপনভাবে সম্পন্ন করতেন। প্রাচীনকালের ধর্মচিন্তা ছিল বহুলাংশে তন্ত্রপ্রভাবিত। এই তন্ত্রপ্রভাবিত ধর্মচর্চার পদ্ধতি ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। জনসাধারণের পক্ষে এই দুর্বোধ্য ও জটিল তত্ত্ব কিংবা পদ্ধতির সম্যক অনুধাবন কিংবা অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তাই ধর্মগুরুগণ ধর্মচর্চার গুহ্য বিষয়গুলিতে জনসাধারণকে সযত্নে পরিহার করতেন। ফলে এই বিষয়গুলি গুহ্যবিদ্যারূপে পরিগণিত হতে থাকল। খৃঃ ৮ম-১০ম-১২শ শতাব্দীতে সহজিয়া চর্যাসাধকগণ এইভাবে গুহ্যপন্থার সাধকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির পথ ধরে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে কিছু কিছু গোপন রহস্যচর্চা শুরু হয়েছিল যেগুলি পরবর্তীকালে গুপ্তবিদ্যা আখ্যা পেয়েছে। বশীকরণ, ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক, ডাকিনীবিদ্যা, মোহিনীবিদ্যা, মারণ, উচাটন প্রভৃতি এই গুপ্তবিদ্যার অন্তর্গত। যেহেতু তন্ত্রসাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গুপ্তবিদ্যার আবির্ভাব ঘটেছিল তাই তান্ত্রিক ক্রিয়াপদ্ধতির অনেক বিষয় গুপ্তবিদ্যায় অনুসৃত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনার মূলে আছে কতকগুলি গুহ্যসাধন পদ্ধতি। দেহ হল যন্ত্র। সেই যন্ত্রকে অবলম্বন করে কিছু কষ্টসাধ্য পদ্ধতি অনুশীলন করেই তন্ত্রসাধনার পরাকাষ্ঠা, গুপ্তবিদ্যাতে এইরকম গুহ্য সাধন পদ্ধতি আছে—যেগুলি মূলতঃ দেহকেই অবলম্বন করে আবর্তিত হয়। বশীকরণ, সম্মোহন, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি চর্চায় দেহ সাধনার প্রাধান্য থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলাদেশে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ মহাযানী সাধকগণ তথা সহজিয়া সাধকগণ দেহকে ভিত্তি করে তাঁদের সাধনপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। এই সাধনপদ্ধতি ভারতীয় তন্ত্রসাধনার নামান্তর মাত্র। মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাই বজ্রযান সহজযান প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীকালে ভারতীয় তান্ত্রিকধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল।

ভারতীয় তন্ত্রসাধনা বহু প্রাচীন। পন্ডিতগণের মতে প্রাক্-সংস্কৃত যুগ থেকে এই তন্ত্রসাধনার ধারা বয়ে চলে আসছে এবং বাংলাদেশে দেড় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই তান্ত্রিক ধারা প্রবাহিত। কাশ্মীর থেকে শুরু করে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, কামরূপ এবং বাংলাদেশে তন্ত্রচর্চার ধারা প্রবাহিত। পৌরাণিক কাহিনীর বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশ থেকে তন্ত্রাচার ভারতবর্ষে এনেছিলেন এমন মতও প্রচলিত আছে।

ভারতীয় তান্ত্রিকগণ ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ দেহকে অবলম্বন করে সাধন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসাধনার মধ্যে তন্ত্রসাধনাই সর্বাপেক্ষা জটিল, আচারনিষ্ঠ ও কষ্টসাধ্য। বুদ্ধিগ্রাহ্য মননশীল তত্ত্বআলোচনার চেয়ে কায়বাদী আচারআচরণের অনুশীলনের প্রাধান্য এখানে। এই আচরণ পদ্ধতির মধ্যে মন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা, ন্যাস, যোগ, প্রাণায়াম প্রভৃতি অধিক কার্যকরী ও পালনীয়। মন্ত্রের মধ্যে বীজমন্ত্রের (একাক্ষরী) আবৃত্তি হল প্রধান। এই বীজমন্ত্রের আবৃত্তির ফলে শরীর মধ্যস্থ নানাপ্রকার শিরা-ধমনীর

ক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ঘটে তাতে সাধকের অন্তরস্থশক্তির জাগরণ ঘটে। এই জাগরিত শক্তি সাধকের কল্পনায় দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজনিজ গুণ অনুযায়ী নিজ নিজ মণ্ডলে অবস্থান করে সাধককে শক্তিদান করেন। সাধক তখন মন্ত্রোচ্চারণের বদলে নানাবিধ শারীরিক মুদ্রা, নির্বাক করন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে আরাধ্য দেবীর আবাহন করেন। এর সঙ্গে দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণরেখাত্মক মন্ত্র ও মৈথুনাদি, অন্য ম-কারের ব্যবহার, আভিচারিক ষটকর্ম প্রভৃতি জড়িত থাকে। তন্ত্রসাধনার প্রথম দিকে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ন্যাস প্রভৃতির ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কায়াসাধনের অঙ্গ হিসাবে তান্ত্রিক যৌনাচার বিশেষ গুরুত্ব পায়।

ভারতীয় তন্ত্রসাধনার মত সহজিয়া বৌদ্ধসাধকদের সাধনায় এই কায়াসাধনার বিশেষ গুরুত্বছিল। সহজিয়া সাধকগণ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে প্রব্রজ্যা, শাস্ত্রপাঠ, জপতপ প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যানুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে একমাত্র দেহকেই অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তন্ত্রসাধকদের মতে শরীরের বামদিকে প্রবাহিত ইড়া ও ডানদিক দিয়ে প্রবাহিত পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রাণ ও অপ্রাণ বায়ুকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মধ্যগা নাড়ী সুষুম্নার মধ্য দিয়ে চালিত করে মস্তকের সহস্রার পদ্মে পৌঁছাতে পারলেই সাধকের সিদ্ধি লাভ ঘটে। এইভাবে সাধকগণ দেহের মধ্যে ছয়টি চক্রের কল্পনা করেছেন। নিম্নতম স্থান নাভিদেশে মূলাধারচক্র থেকে আরম্ভ করে ভ্রু-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে নিয়ে এই ছয়টি চক্র তথা ষটচক্র। এই ছয়টি চক্রের ছয়জন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন— ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই ছয়জন দেবীর সাধনা ও আরাধনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তান্ত্রিক সাধকগণ এই দেবীগণকে সন্তুষ্ট করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

তন্ত্রের মধ্যে মুদ্রা, মণ্ডল, ন্যাস প্রভৃতির মত মন্ত্রের প্রাধান্য থাকে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই মন্ত্রের মধ্যে একাক্ষরী বীজমন্ত্র অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই বীজমন্ত্রের মধ্যে ওঁ, হ্রীং, ক্লীং, হৈঁ, ক্রীং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওঁ-প্রণবমন্ত্র হল বৈদিক মন্ত্র, বাকীগুলি অবৈদিক। এই বীজমন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে অনুশীলন করে সাধকগণ সাধনপথে অগ্রসর হন।

তান্ত্রিক সাধনার এই সব ক্রিয়াপদ্ধতি গুপ্তবিদ্যা চর্চার মধ্যে বর্তমান। গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারীগণ শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে, নানাবিধ মন্ত্রের সাহায্যে এই বিদ্যার চর্চা করে থাকেন। যেমন নানাবিধ যোগ, প্রাণায়াম প্রভৃতিতে সিদ্ধ না হলে বশীকরণ, সম্মোহন বিদ্যায় সফল হওয়া যায় না। ডাইনীতন্ত্র বা ডাকিনী বিদ্যার মূল তাৎপর্য হল মহাজ্ঞান বিদ্যা। ডাকিনী কথার মূল অর্থ হল সম্ভবতঃ গুহ্যজ্ঞানসম্পন্না নারী। সমালোচকগণের মতে মধ্যযুগীয় নাথসাহিত্যের গোপীচাঁদ ময়নামতী কাহিনীর ময়নামতী মহাজ্ঞানসম্পন্না এক জাতীয় 'ডাইনী' ছিলেন। তিনি মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন অর্থাৎ তিনি 'মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা' জানতেন। তিব্বতে 'ডাকিনী' নামে নিগূঢ় জ্ঞানসম্পন্না দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বত, নেপাল, ভুটানে, 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। আজও আমাদের দেশে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রচলন আছে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে আমাদের দেশে দু'ধরনের তন্ত্র-মন্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে। একরকম হল মানুষের ইষ্টকারী তথা মঙ্গলকারী মন্ত্র, অন্যপ্রকার হল মানুষের অনিষ্টকারী মন্ত্র। এই দু' ধরনের মন্ত্রচর্চার জন্য ওঝা-গুণিন সমাজকে সাধারণভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত ওঝা-গুণিন বা যাদুকর মানুষের অনিষ্টসাধনে লিপ্ত থাকে তাদেরকে সাধারণভাবে ডান ডাইন, মায়াবী-মায়াবিনী, দুষ্ট যাদুকর (Black-magician), দুষ্ট-তান্ত্রিক প্রভৃতি নামে অভিহিত

করা হয়। এইসব মানুষদের যে অনিষ্টকারী ক্ষমতা আছে তা তাদের জন্মগত বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। তাছাড়া এরা সাধারণতঃ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী হয়।

মানুষের অনিষ্টকর ক্ষমতা যাদের জন্মগত বাল্যকাল থেকেই তাদের শরীরের গঠনের মধ্যে তার আভাস থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিকতা, শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রভৃতি তাদেরকে গোড়া থেকে চিহ্নিত করে দেয়। যেমন কোন মানুষের (স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ) দৃষ্টি শক্তি এমনই প্রখর হয় যে, সেই দৃষ্টির সামনে পড়লে মানুষ সহজেই অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। কোন মানুষের নাক, কান, দাঁত, হাত পা ইত্যাদি কোন না কোন অঙ্গ এমন অস্বাভাবিক হয় যা তাকে অদ্ভুত দর্শন কিংবা ভীষণ দর্শন করে তোলে। তার এই অস্বাভাবিক শারীরিক গঠনই তাকে মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর কিংবা অদ্ভুত রূপে চিহ্নিত করে এবং ভীতির সঞ্চার করে। এই সমস্ত মানুষেরা সমাজের কাছে বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশীর কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে সমাদর পায় না বরং পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এরাই ডান-ডাইনী ইত্যাদি নামে ভূষিত হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু মানুষ তাদের স্বভাবগত খলতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা প্রভৃতির জন্য অকারণে মানুষের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এরা অনিষ্টসাধনের উপায়স্বরূপ তন্ত্র-মন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করে। সমাজে এরাও দুষ্ট-তান্ত্রিক, দুষ্ট যাদুকর, ডান-ডাইনী প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়। আবার কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যাদের অনিষ্টকর শক্তি লাভের উৎস হল নানারকম লৌকিক কিংবা আঞ্চলিক দেবদেবী। এই সমস্ত দেবদেবীকে আরাধনায় তুষ্ট করে এরা কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী কিংবা অধিকারিনী হয়, যার দ্বারা এরা মানুষের অনিষ্টসাধন করতে সমর্থ হয়।

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ভূত-প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, দানব, দৈত্য প্রভৃতিকে সাধন বলে বশ করে এবং তাদের দিয়ে নানারকম দুষ্কর্ম ও মানুষের অনিষ্টসাধন করে বেড়ায়। আবার কিছু কিছু অশরীরী, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দুষ্টশক্তি আছে যারা মানুষের অনিষ্টসাধন করে, মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে তৃপ্ত হয়। কিছু কিছু জিন, পরী, মায়াবিনী, রাক্ষসী, রক্তপায়ী জীব (যেমন—ইংরেজি গল্পের ড্রাকুলা, ভ্যাম্পায়ার প্রভৃতি) এদের পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত অশরীরী দুষ্টশক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষকগণ এখনও সঠিক তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন নি, তবে এদের অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেছেন।

আমাদের বাংলা মঙ্গলকাব্যে মনসাদেবীকে সর্পদেবীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে মনসাদেবীকে বিষকন্যা কিংবা নাগিনী-জাতীয়া কোন প্রাণী অথবা মন্ত্র-তন্ত্রে অভিজ্ঞা কোন মায়াবিনী মানবী রূপে দেখা যেতে পারে। দেবী মনসার দংশনে চণ্ডীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কাহিনী মঙ্গলকবিগণ বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় মনে করা যায় দেবী মনসার শরীর এমনই বিষাক্ত ছিল যে তাঁর দংশনে বিষক্রিয়ায় চণ্ডী মূর্ছিতা ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাছাড়া মনসার চ্যাং ব্যাং ধরে খাওয়ার ঘটনার কথা মনসা মঙ্গলে পাওয়া যায়। আসলে এই সব নারীগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। এই অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতাকে গুপ্তবিদ্যা বলে অভিহিত করলে বোধহয় অযৌক্তিক হয় না। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুপ্তবিদ্যার চর্চা হয়ে আসছিল একথা মনে করা যায়। এই চর্চার ধারা আজও বয়ে চলেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অনুসন্ধান করলে এইসব গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারীদের খোঁজ পাওয়া যায়।

গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা : আলোচনা ও পর্যালোচনা-২

ভারতীয় তান্ত্রিকগণের তথা হিন্দু তন্ত্র-সাধকদের এক দলের অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল জীবন-মুক্তির সাধনা। এই সাধকগণ বৌদ্ধসিদ্ধসাধক কিংবা অন্যান্য সাধন-পন্থীদের মত দেহান্তে মুক্তির পরিকল্পনাই যথাযথ আদর্শ বলে গ্রহণ করেননি, তাঁদের মতে আধ্যাত্মিক দেহে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করাই জীবন-মুক্তির আদর্শ। আর এই সাধনার মূল অবলম্বন ছিল দেহ। হঠযোগের মধ্য দিয়ে কায়া-সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই এঁদের চরম লক্ষ্য ছিল। বাংলাদেশের নাথ যোগীরা ছিলেন এই ধরনের সাধক। এঁদের সাধনার মধ্যে আর্যপূর্ব তন্ত্রধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের সাধনার নাম 'সিদ্ধাই'। এই সিদ্ধাই হল মূলতঃ কায়া সাধনা এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন যোগ সাধনা। পরবর্তীকালে ভারতীয় যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে মন্ত্র-তন্ত্র-সাধনা ও যোগ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, মনে করা যায় প্রাচীনভারতীয় 'সিদ্ধাই' এর সাধনধারা তাদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "obscure Religious Cults of Bengal as a Background of Bengali Literature" গ্রন্থে বলেছেন— "This Siddha cult is a very old religious Cults of India with its main emphasis on a psychochemical prócess of Yoga. known as the Kaya-Sadhana or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life."

বাংলাদেশে যে গুহ্যবিদ্যা তথা গুপ্তবিদ্যার প্রচলন আছে তা এই 'সিদ্ধাই'-এর অনুসরণে অনেকাংশে পালন করা হয়ে থাকে বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। গুপ্তবিদ্যায় সিদ্ধ হতে গেলে প্রথমে দেহসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। দেহমধ্যস্থ নাড়ী, বিভিন্ন শক্তি, বায়ুর অবস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও এই সকলের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে গুহ্য সাধনায় সফল হওয়া যায় না। নাথসাহিত্যের ময়নামতী যে মহাজ্ঞান জানতেন, তা মূলতঃ দেহসাধনা এবং গুহ্য সাধনা দ্বারা তা অর্জন করতে হয়।

মনুষ্য শরীরের চঞ্চল অবস্থায় তথা চঞ্চল হৃদয়ে শক্তি এবং সুস্থির হৃদয়ে শিবের অবস্থান। সুতরাং সুস্থির চিত্তসম্পন্ন মানুষই সাধনায় সিদ্ধিলাভে সর্বতোভাবে সমর্থ হয়ে থাকেন। আবার শরীর মধ্যস্থ শক্তির অবস্থিতি তিন স্থানে। কণ্ঠদেশে ঊর্ধ্বশক্তি, গুহ্যদেশে অধঃস্থশক্তি আর নাভিতে মধ্য শক্তি। এই তিন শক্তির অতীত হতে পারলে সাধকের পরম সিদ্ধি ঘটে। তিনি ভগবান তথা ব্রহ্মের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারবেন। এছাড়া আছে ষটচক্র। গুহ্য প্রদেশে একটি চক্রের অবস্থান—নাম 'আধারচক্র'। সাধিষ্ঠান চক্র আছে লিঙ্গ সমদেশে, নাভিদেশে আছে মণিপুরচক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্র এবং মস্তকে সহস্রদল চক্র। আবার দেহের ঊর্ধ্বভাগকে ব্রহ্মলোক এবং অধোভাগকে পাতাল বলা হয়। মনুষ্য শরীরের দশটি দ্বার, দশ প্রকার বায়ু এবং সর্বশরীরে বিভিন্ন নাড়ীর অবস্থান। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, গুহ্যদেশ, লিঙ্গ এবং মুখ—এই হল নয়টি দ্বার এবং মন হল দশম দ্বার। দশ প্রকার বায়ুর অবস্থান ও উৎপত্তি শরীরের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ায়। যেমন—গুহ্যদেশে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমানবায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু, হৃদয়ে প্রাণবায়ু এবং সর্বশরীরে ব্যান বায়ুর অবস্থান। আবার শরীর মধ্যস্থ ঊর্ধ্বগত অবস্থায় নাগবায়ু, তীর্যাশ্রিত অবস্থায় কূর্মবায়ু, ক্ষোভনে অর্থাৎ হাঁচবার সময় ক্রকর বায়ু, জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই তোলার সময় দেবদত্ত বায়ু এবং নাদঘোষে ধনঞ্জয় বায়ুর অবস্থান ঘটে।

তন্ত্রসাধকগণেব মতে, মানুষেব শবীরে সর্বমোট বাহাত্তব হাজাব প্রকাব নাড়ী আছে। সমস্ত নাড়ীর অবস্থান কোন সাধাবণ মানুষ জানে না। একমাত্র প্রকৃত যোগীই এই সকল নাড়ীব অবস্থান জানেন। সাধক নিজে নিজে এই নাড়ীব অবস্থান জানতে পাবেন না। তাঁকে গুরুব সাহায্য নিতে হয। গুরু নির্দেশিত পথে সমস্ত নাড়ীব অবস্থান জ্ঞাত হয়ে এবং নাড়ী সমুদয়েব ক্রিয়াকলাপ নিযন্ত্রিত কবতে পাবলেই সাধকেব সিদ্ধিলাভ ঘটে। সমস্ত নাড়ীব মধ্যে জ্ঞাননাড়ীই সাধকেব সিদ্ধিলাভেব প্রধান সহায।

শবীবেব মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিব অবস্থান। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত কবা এবং তাকে ঊর্ধ্বগামী কবাই সাধকেব সাধন প্রক্রিযাব অন্যতম অঙ্গ। এই কুণ্ডলিনী শক্তি থেকে দশটি নাড়ী প্রসৃত হযেছে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক তিনটি নাড়ী ঊর্ধ্বগামিনী, হস্তিজিহ্বা, গান্ধাবী ও প্রসবা—এই তিনটি নাড়ী স্থিতিস্থাপিকা, শবীবেব দক্ষিণ অঙ্গে অলম্বুষা ও যশা নামে দুটি নাড়ী প্রবাহিতা এবং কুহু ও শঙ্খিনী নামে দুটি নাড়ী শবীবেব বাম অঙ্গে প্রবাহিত হযে চলেছে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীকে বৌদ্ধ সহজিযা সাধকগণ প্রজ্ঞা, ককণা ও অবধূতিকা বলেছেন। হিন্দুতন্ত্রসাধনাব মত সহজিযা সাধকগণও কাযাসাধনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রত্যেক হঠযোগী বা সাধককে শবীবেব উপব নির্ভব কবতে হয বলে শবীব সম্পর্কিত সমস্ত প্রকাব জ্ঞান তাঁকে অর্জন কবতে হয। এতক্ষণ ধবে শবীবেব যে তত্ত্ব বর্ণনা কবা হল—এগুলি দেহ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান। এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু না থাকলে কাযাসাধক সাধনপথে অগ্রসব হতেই পাববেন না। এছাড়া সাধনাব বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি আছে—যেগুলি গুরুব কাছে শিক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন প্রকাব আসন, মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদিব মধ্যে দিযে শবীবস্থ ইন্দ্রিয়দেব বশীভূত কবতে হয। যেমন চিত্তকে স্থির ও বিশুদ্ধ কবতে প্রাণযামেব প্রযোজন। পদ্মাসন, বীবাসন প্রভৃতিতে উপবেশন পূর্বক বেচক, কুম্ভক ও পূরকেব সাহায্যে ইন্দ্রিযগণকে স্ব স্ব বিষয থেকে নিবৃত্ত কবে প্রাণবায়ুকে দমন কবে বিশুদ্ধ চিত্ত ও স্থিব চিত্ত হতে হয। সাধনপদ্ধতিব এটাই হল প্রাথমিক পর্যায়। এইভাবে সাধককে গুরু-উপদেশ-নির্দিষ্ট পথে অগ্রসব হতে হয।

হঠযোগী কিংবা ব্রহ্মযোগী—যে কোন প্রকাব যোগী বা সাধক হোন না কেন তাঁকে প্রথমে শবীবকে বিশুদ্ধ ও নির্মল কবতে হবে। তাবপব বিশেষ বিশেষ ক্রিযাপদ্ধতিব মধ্য দিযে অগ্রসব হযে সাধনায সিদ্ধিলাভ কবতে হবে। কিন্তু সাধকগণ কখনও কখনও তাঁদেব উদ্দেশ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হযে পড়েন। তাঁদেব সাধনালব্ধ ক্ষমতাকে মানুষেব অনিষ্টকব কাজে নিয়োজিত কবেন। এঁবাই আমাদেব কাছে দুষ্ট তান্ত্রিক, অবিদ্যাচর্চাকাবী, গুপ্তসাধক, Black-magician প্রভৃতি নামে পরিচিত। এঁদেব সাধনাব উদ্দেশ্য আত্মাব মুক্তি, মোক্ষলাভ, কিংবা ব্রহ্মলাভ পবমানন্দলাভ প্রভৃতি নয়—এঁদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন, নিজেব ক্ষমতাব পবিতৃপ্তি, প্রবৃত্তির চবিতার্থতা, ভোগ-বিলাসেব উৎকর্ষতা ইত্যাদি।

এই অবিদ্যাচর্চাকাবী কিংবা দুষ্টতান্ত্রিক যাঁদেবকে এক কথায় গুপ্তসাধক বা গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী বলা যায়—এঁবা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এঁদের ক্রিযাকলাপেব পবিচয় ভালভাবেই পাওয়া যায়। সাধাবণ ওঝা-গুণিনের থেকে এঁবা কিছুটা আলাদা। এঁরা যে সমস্ত ক্রিয়া কবে থাকেন সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী না হলে সেগুলি করা সম্ভব নয়। আব তন্ত্রসাধনাব অনেক কিছুই এঁরা পালন করে থাকেন এবং তন্ত্রসাধকদেব মত এঁদের ক্রিয়াকলাপ মনুষ্যশরীব তথা দেহ নির্ভব।

এই সব গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব জনসমাজে এমনভাবে মিশে থাকেন যে এঁদেব চেনা খুব শক্ত। এঁদেব ক্রিয়াকলাপ হয় গোপনে। বিভিন্ন অঞ্চল ঘুবে এঁদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ কবা হয়েছে তা এখানে আলোচনা কবা হচ্ছে।

(১) অবিদ্যাচর্চাকাবীগণ দু বকমভাবে কাজকর্ম কবেন। কেউ কেউ একা একা কাজকর্ম কবেন আব অনেকে দল বেঁধে প্রতিষ্ঠান বা সমিতি তৈবী কবে তাঁদেব কাজকর্ম চালিযে যান।

(২) এঁদেব মূল উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন। অন্য উদ্দেশ্য হল নাম যশেব মোহ কিংবা সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পাবাব আকাঙ্ক্ষা।

(৩) সমস্ত জাতি নির্বিশেষে এই কর্ম কবেন। এঁদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন আছেন, তেমনি অব্রাহ্মণ জাতিব মানুষও আছেন। তবে অনুন্নত সম্প্রদাযেব মানুষেব মধ্যে এই গুপ্তবিদ্যাচর্চাব প্রবণতা বেশি।

(৪) গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ বিভিন্ন বকম ভেক ধাবণ কবে থাকেন। এঁবা কিছু কিছু ধর্মীয আচাব অনুষ্ঠান উৎসব ইত্যাদি পালন কবে থাকেন। ফলে এঁদেব ধর্মীয চবিত্রটি জনগণেব সামনে প্রকটিত হয় এবং ধর্মীয আচাব অনুষ্ঠান যুক্ত থাকাব জন্য সহজ সবল গ্রাম্যলোক সহজেই এঁদেবকে বিশ্বাস কবে। প্রতিষ্ঠানেব বহস্যময়তা, তাঁদেব বহস্যজনক কার্যাবলী আডালে থাকে।

(৫) গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ অনেক সময তাঁদেব ক্রিয়াকলাপকে দেবতাব কাজকর্ম বলে চালান। কোন এক বিশেষ দেবতাকে অবলম্বন কবে এঁদেব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সমস্ত দেবদেবীব মধ্যে মা কালী, মা মনসা, মা চণ্ডী প্রভৃতি অগ্রগণ্যা।

(৬) এঁবা কিছু কিছু তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচাব কবেন। গীতা, উপনিষৎ, পুবাণ, বেদ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিব সাহায্যে ভগবৎ-তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, দেহবাদ, পাবলৌকিকতত্ত্ব, আত্মাব বহস্য, জন্মান্তববাদ. প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি প্রচাব কবেন। এতে মানুষ সহজেই মুগ্ধ প্রভাবিত হযে যায়।

(৭) এঁবা ধর্মীয আচাব অনুষ্ঠানেব সাহায্য নেন। যেমন পূজা, হোম, যজ্ঞ, জপ, ধ্যান, প্রাণাযাম, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতিব সাহায্যে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন কবেন।

(৮) গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী তথা বহস্যচর্চাকাবীগণ উৎসব ও অনুষ্ঠানেব সাহায্যে জনগণকে প্রভাবিত কবেন। যেমন মহোৎসব, ভব, স্বপ্নাদেশ সূত্রে অনুষ্ঠান, বাৎসবিক পূজা, বলিদান প্রভৃতি।

(৯) তান্ত্রিক গুহ্যসাধনাব নাম কবে নানাবিধ অসামাজিক ও অবৈধ ক্রিয়াকলাপ চলে। মধুচক্রেব আসব বসে। যৌন ক্রিয়া তথা দেহব্যবসায চলে। প্রচুব পবিমাণে বেআইনী অর্থেব লেনদেন হয়।

(১০) বিভিন্ন ধবনেব নেশা যেমন সুবাপান, গঞ্জিকা সেবন, সিদ্ধিভাঙ খাওয়া এমনকি হেরোইনের ব্যবহার ঘটে থাকে। অনেকস্থলে এইসবকে ঘিরে স্মাগলিংও হয়।

(১১) গুপ্তক্রিয়াচর্চাকাবীগণ মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহাব কবেন এবং বিভিন্ন প্রকাব দ্রব্যগুণেব সাহায্যে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন।

এই সমস্ত গুপ্ত প্রতিষ্ঠানেব কাজকর্ম বাইবে থেকে আপাতদৃষ্টিতে নিবীহ বলে মনে হয়। অনেক সময় এঁদের ক্রিয়াকলাপ, আচাব অনুষ্ঠান এমনভাবে হয়, দেখে মনে হয় এগুলি সংস্কৃতিচর্চা। তবে বিভিন্ন জাতি কিংবা গোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে তুলে ধরে। তবে মন্ত্রবাদের বিকৃত অংশটুকু বাদ দিলে এদেব ক্রিয়াকলাপে লোকসংস্কৃতির একটা ছাপ থেকে যায়।

গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা : আলোচনা ও পর্যালোচনা-৩

যে বিদ্যা গোপনে চর্চা বা অনুশীলন করা হয় তাই গুপ্তবিদ্যা—গুপ্তবিদ্যার এই সংজ্ঞা ধরলে এই বিদ্যার আয়তন বিশাল। তন্ত্রসাধনা থেকে শুরু করে যে কোন গুপ্ত বা গুহ্য সাধনাই গুপ্তবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে ওঝা-গুণিনের মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার ও গুপ্তবিদ্যা। তবে কিছু কিছু বিষয়কে আমরা গুপ্তবিদ্যা আখ্যা দিয়ে থাকি কারণ সেগুলির অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম ভীষণ গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয় এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের অনুশীলন চলে। এগুলির সঙ্গে আবার ভয়াবহতা ও রহস্যময়তার দিকগুলি জড়িয়ে আছে।

আমাদের পরিচিত জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যানধারণার, কার্যকারণ সূত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের, গ্রন্থপাঠলব্ধ জ্ঞানসীমার বাইরে যে অঘটন বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকে, তাকে অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত নাম দিয়ে আমরা স্বস্তি পেয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত ঘটনাগুলির কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায়নি বলে বিষয়গুলি আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। আমাদের জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মানুষ এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, যাতে আমরা ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ি এবং আমাদের মন রহস্যাবৃত হয়ে যায়। এই সমস্ত মানুষদের গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী বলা যেতে পারে। শুধু তাই নয় বহুযুগ ধরে এই সব ক্রিয়াকলাপ আমাদের মনে এমন সংস্কার সৃষ্টি করেছে যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা দেখলেই আমরা তাকে গুপ্তবিদ্যার ফল বলে মনে করি। কোন গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী শত্রুতা করে ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে বলেও মনে করি।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আমার জন্মস্থানে আমাদের পাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছিল। আমাদের বাড়ীর তিন চারটি বাড়ীর পরে একটি বাড়ীতে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। সন্তানটি অপরিণত, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং সেটি ছিল মৃত সন্তান। তার আকার-আকৃতি বীভৎস। কালো রঙের, মাথাটি অস্বাভাবিকভাবে বড় এবং মাথাতে প্রচুর চুল। সারা শরীর লোমশ। মাথার তুলনায় হাত পা গুলি বীভৎস। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছেলেটির দুটি পাটিতে কয়েকটি দাঁত ছিল। এই ঘটনায় পাড়ার সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মৃত সন্তানের প্রসবিনী ভীষণভাবে আতঙ্কিত। সব সময় ভয় এই বুঝি কিছু ঘটল। পাড়ার লোকেরা বলতে লাগল এটা কোন গুপ্ত গুণিনের কাজ। যারা যক্ষ, ডাইনী প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করে তাদের কেউ এই কাজ করেছে। নানারকম ওঝা ডেকে ঝাড়-ফুঁক করা হল, বাড়ীতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হল। কিন্তু পাড়ার সকলেই প্রায় মাসখানেক ধরে শঙ্কিত হয়ে রইল—এই বুঝি কিছু অঘটন ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছু ঘটেনি। সেই গর্ভিনীর আরও তিনটি সন্তান হয়েছে—তারা আজও ভালভাবে বেঁচে আছে। এই যে অদ্ভুত দর্শন মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এর কারণের ব্যাখ্যা দিতে পারবে জীব-বিজ্ঞান। কিন্তু সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারলে আমরা ধরে নিই এটি কোন গুপ্তচর্চাকারীর কাজ। অনেকে আবার এর সঙ্গে জন্মান্তরের কথা জুড়ে দিয়েছে। পূর্বজন্মে ঐ গর্ভিনী মহিলা হয়ত এমন কোন কাজ করেছিল, তার জন্য কোন যক্ষ, পিশাচ কিংবা ডান এইভাবে গর্ভে জন্মে প্রতিশোধ নিয়েছে। মোট কথা পাড়ার সবাই কিন্তু ঐ মৃত শিশুটিকে কোন যক্ষ, পিশাচ কিংবা ঐ জাতীয় কোন রহস্যময় অপার্থিব জীব বলে ধরে নিয়েছে।

যাইহোক, গুপ্তবিদ্যার যদিও কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই তবুও কিছু কিছু বিষয়কে আমরা গুপ্তবিদ্যার আওতায় ফেলতে পারি। সাধারণভাবে এই বিষয়গুলি রহস্যময় এবং এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ আজও ঘটে ওঠেনি। এই বিষয়গুলি হল—(১) ডাইনীবিদ্যা বা ডাইনী তন্ত্র বা ডাকিনী বিদ্যা (witch craft)। অনেকে একে বলছেন—কুহকিনী বিদ্যা। 'ডাইনী' শব্দেব বহু অর্থ আছে। সং ডাকিনী > বাং ডাইনী/ডাইনী। এদেবকে কুহকিনী, মাযাবিনী, জাদুকবী, পিশাচী প্রভৃতি বলা হচ্ছে। আবাব গুপ্তজ্ঞান বা মন্ত্রশক্তি যাদেব আযত্তে তাদেবকেও ডাইনী বলা হয। তন্ত্রসাধনাব এক দেবীকে ডাকিনী বলা হয—পূর্বে তাব উল্লেখকবা হযেছে। শিব ও দুর্গাব অনুচবীকে ডাকিনী বলা হয। বাংলা সাহিত্যে 'ডাক ও খনাব বচন' নামে কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচনেব সংগ্রহ আছে। সেখানে 'ডাক'-এব স্ত্রীলিঙ্গে 'ডাকিনী' বলা হয। এই ডাক ও ডাকিনী কিছু কিছু অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ও নাবী। এঁবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলতে পাবতেন। বাংলাদেশেব কৃষি বিষযক ও প্রাত্যহিক জীবনেব শুভাশুভ বিষযে কিছু ভবিষ্যকথন এঁবা কবেছেন। এঁদেব মধ্যে আদিম যুগেব বাঙালীব আদি ভৌতিক সংস্কৃতিব পবিচয পাওযা যায।

মোট কথা 'ডাকিনী' বা 'ডাইনী' শব্দেব যে অভিধানগত অর্থ পাওযা যায তাতে কোন মন্দ বা খাবাপ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু 'ডাইনী' শব্দেব যে অর্থ আমাদেব দেশে সমাজে প্রচলিত, তা কিন্তু অন্যবকম। 'ডাইনী' বলতে আমবা 'পিশাচী', কোন অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী কোন নব/নাবীকে ভেবে থাকি। আজকাল খববেব কাগজে 'ডাইনী' সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ডাইনী সন্দেহে অনেক নাবী/পুরুষকে পিটিযে মেবে ফেলা হযেছে, খুন কবা হযেছে। আজও বহবমপুব সেন্ট্রাল জেলে গাজল থানাব পূর্ব সদ্দবপুবেব কালীপদ সোবেন যাবজ্জীবন কাবাদন্ডে দণ্ডিত হযে জেল খাটছে। তিবিশ ছুঁই ছুঁই এই যুবক ডাইনী সন্দেহে প্রতিবেশীকে খুন কবেছিল। [সংবাদ—আনন্দবাজাব পত্রিকা ২/৩/৯৬]। ডাইনী সন্দেহে হত্যাব এমন বহু খবব সংবাদপত্রে পাওযা যায।

তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায তাঁব গল্পে যে 'ডাইনী'ব চিত্র এঁকেছেন তাতে তাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না কবে দেখানো হযেছে। তাব লোভ অনেক কিছু অঘটন ঘটিযেছে। কিন্তু শেক্সপীয়বেব ম্যাকবেথ নাটকে যে ডাইনীদেব (witch) দেখা যায তাবা কিন্তু অস্বাভাবিক বা বীভৎস হলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পাবত। শেক্সপীযব এদেবকে নবকেব জীব কবে এঁকেছেন। এই ডাইনীদেব ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যে বর্ণনা তিনি দিযেছেন তা যেমন বীভৎস তেমনি অস্বাভাবিক। অর্থ কবলে মোটামুটি এইবকম দাঁড়ায—(পাহাড় দেবা জলায ডাইনীদেব কাজেব বর্ণনা)—ডাইনীবা নবকেব আগুন জ্বেলে তাব উপব এক বিশাল কড়াই চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই কড়াইতে সিদ্ধ কবছিল ব্যাং, সাপ, প্যাঁচা, শেয়ালেব নাড়িভুঁড়ি, ড্রাগনেব আঁশ, নেকড়ের দাঁত, মবে যাওয়া ডাইনীদেব শুকনো দেহ, হাঙবেব চোয়াল আব বিষাক্ত হেমলকেব শিকড়। ম্যাকবেথ এসে প্রশ্ন কবতেই ডাইনীবা আগুনের উপব কড়া উলটে দিয়েছিল। আব সেই আগুনেব ভিতব থেকে ছায়া মূর্তিব আবির্ভাব ঘটেছিল।

আমবা ডাইনী হিসাবে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নর/নারীকে ভেবে থাকি যাবা পৈশাচিক কাজকর্ম কবে মানুষেব অমঙ্গল সাধন কবে। তাবা মায়াবী/মায়াবিনী হয। এদেব সম্পর্কে যাঁবা যাঁরা চর্চা বা সাধনা কবেন তাঁরা গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এইবকম কিছু কিছু ডাইনী সাধকেব খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এঁরা পৈশাচিক কাজকর্ম করেন। এঁরা ডাইনীদেব নিয়ে চালনা কবেন। শোনা যায় এই সাধকরা ডাইনীদেব সাহায্যে এক রাত্রের মধ্যে একটি বড় গাছকে উড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র পুঁতে দিতে পারেন। অবশ্য এর কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি।

(২) গুপ্তবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এইরকম আর একটি বিষয় হল—ইন্দ্রজাল বিদ্যা বা মায়াবিদ্যা (Sorcery)। আমাদের দেশে ভোজবিদ্যা, যাদু, ভেলকি প্রভৃতি নামে যে বিষয়গুলি প্রচলিত সেগুলি Sorcery-অন্তর্গত। গৌরীতন্ত্রে এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে ব্যাধি, দারিদ্র্যহারক ও জরামৃত্যুবিনাশক বলে আখ্যাত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে তেজঃ পদার্থের মধ্যে যেমন সূর্য, শীতল বস্তুর মধ্যে যেমন চন্দ্র এবং গাম্ভীর্য বিষয়ে যেমন নদী প্রধান; সেইরকম সকল শাস্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রজাল শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রজাল বলতে আমরা ম্যাজিক বা যাদুপ্রদর্শন ভেবে থাকি। কিন্তু যাদুদ্বারা রোগ শোক নিবারণ করা যায়। এই অর্থে ঝাড়-ফুঁক করে রোগ সারায় যে সব ওঝা গুণিন তাদেরকে আমরা ঐন্দ্রজালিক বলতে পারি।

(৩) গুপ্তবিদ্যা বলে ভাবা হয়ে থাকে এইরকম আর একটি বিষয় হলো ভূত ছাড়ান বিদ্যা (Exorcism)।

ভূত ছাড়ান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচুর ওঝা গুণিন আছে যারা ভূত ছাড়ানোর ব্যাপারে ভীষণভাবে দক্ষ। কিন্তু জিন, পরী, যক্ষ, দুষ্ট আত্মা প্রভৃতিদের নিবারণ করা বেশ শক্ত ব্যাপার।

(৪) গুপ্তবিদ্যার আর একটি বিষয় হলো শাকুন বিদ্যা (Augury)। শাকুন বিদ্যা হলো একপ্রকার গণনাকার্য। এই বিদ্যা যাঁরা চর্চা করেন তাঁদেরকে কাকচরিত্রজ্ঞ বলা হয়। এঁরা পশুপক্ষীর রব দ্বারা মানুষের শুভাশুভ নির্ধারণের ব্যাপারে গণনা করেন।

(৫) সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) কে অনেকে গুপ্তবিদ্যার বিষয় বলে মনে করেন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি লোপ করে সম্পূর্ণভাবে পরের পরিচালনাধীন করা হয় সাধারণভাবে তাকে সম্মোহন বলা হয়। অনেকে একে মোহন বিদ্যা বলে। ওঝা-গুণিনগণ বাণ মেরে মানুষকে মুগ্ধ করেন কিংবা বশ করে ফেলেন। এর বিভিন্ন প্রকার ও প্রক্রিয়া আছে।

এই গুপ্তবিদ্যার চর্চা ভারতবর্ষে এমনকি সমগ্র পৃথিবীতেও বহুযুগ ধরে চলে আসছে। সুতরাং এটা কোন আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম মানবজাতি, উপজাতি প্রভৃতির মধ্যে এই বিদ্যার বিশেষ প্রচলন। আফ্রিকার উপজাতি, নিউগিনি ইতালীয় বিভিন্ন উপজাতি, সিসিলিতে, চীনে, তিব্বতে ও ভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে এই বিদ্যার চর্চা হয়ে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে আজও গুপ্তবিদ্যার বহুল চর্চা হয়ে থাকে। এটাকে নিছক অন্ধবিশ্বাস কিংবা সম্পূর্ণভাবে দুষ্টবিদ্যা বা কুবিদ্যা বলা চলে না। এর দ্বারা মানুষের কল্যাণকর/মঙ্গলজনক কাজকর্ম ও হয়ে থাকে। সবশেষে বলা যায় এগুলি ভারতীয় লোকসংস্কৃতির/ সমাজসংস্কৃতির (Socio-cultural/Folk-cultural) অঙ্গ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বনে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং দুষ্টবিদ্যা, কুবিদ্যা—যাই হোক না কেন, একে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করলে বোধ হয় অনুচিত হয় না।

গুপ্তবিদ্যা ও [illegible] : আলোচনা ও পর্যালোচনা-৪

গুপ্তবিদ্যার চর্চা কবে থেকে শুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আজও জানা যায়নি। তবে কেবল বাংলাদেশে কিংবা ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চর্চা সীমাবদ্ধ এমন কথা বলা কখনই সঙ্গত নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বছর ধরে এই বিদ্যার চর্চা চলে আসছে ইতিহাস খুঁজলে তার প্রমাণ মেলে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আদিম জাতি বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন—একথা পণ্ডিত মনীষীগণ বলে থাকেন। আর গুপ্তবিদ্যার চর্চা এই কুসংস্কারের অঙ্গ। ভূত, প্রেত,

জিন, পরী, ডাইনী, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য; দুষ্ট আত্মা প্রভৃতির চিন্তাধাবা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব অলৌকিক, অতি প্রাকৃত, অশরীরী শক্তি হিসাবে কল্পিত অবাঞ্ছিত জীবগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মস্তিষ্কে ভর করে আজও বেঁচে আছে। আদিম মানুষের কল্পনা ও কুসংস্কার তাদেব বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে এবং তাদের ছোঁযাচ হিসাবে বর্তমান সভ্য সমাজের কোথাও কোথাও এরা বেঁচে আছে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তাব করে চলেছে। ৭ই মার্চ ১৯৯৬ আনন্দবাজার পত্রিকার একটি খবব থেকে জানা যায় যে সংস্কৃতির পীঠভূমি বলে খ্যাত খাস কলকাতার বুকে বৌবাজার থানার কলুটোলা লেনে আব্দুল জব্বার শাহ্ (৭০) এবং মিহির মণ্ডল (৩৫) নামক দুজন ব্যক্তি খুন হয়েছেন। এঁরা দুজনে ঝাড়ফুঁক কবে পয়সা উপার্জন কবতেন। জব্বাব ছিলেন ফকিব বাবা আবার মিহির ছিলেন কালী সাধক। এ থেকে বোঝা যায় ভূত প্রেত ঝাড় ফুঁক তন্ত্রসাধনা আজও সভ্য সমাজে বেঁচে আছে।

গুপ্তবিদ্যাকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার কিংবা দুষ্ট বিদ্যা যাই বলা হোক না কেন, এটা যে ভারতের নিম্নশ্রেণীর এবং কোথাও কোথাও উন্নত সমাজের সংস্কৃতিব চর্চার একটা অঙ্গ একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। এই রহস্যবিদ্যার প্রয়োজন হিসাবে যে সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র, দেবদেবী, পূজাপার্বন, বিধিনিষেধ আমাদের সমাজে চলে আসছে সেগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। বরঞ্চ এটা বলা যায় দিন দিন আমরা অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃতের দিকে ঝুঁকছি। আজকাল সিনেমাতে টিভিতে মঞ্চে অলৌকিক কিংবা অতি প্রাকৃত বিষয় নিয়ে কাহিনী দেখানো হচ্ছে। রামানন্দ সাগরের 'আলিফ লায়লা'র মধ্যে গুপ্তবিদ্যা কিংবা রহস্যচর্চার বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে।

গুপ্তবিদ্যাব কিংবা রহস্যবিদ্যার চর্চা কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনকি সুসভ্য দেশ বলে গর্বিত ইংলন্ড, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে আজও গুপ্তবিদ্যার চর্চা বহাল তবিয়তে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। A. Macfarlane প্রণীত Witchcraft in Tudor and Stuart England.", A. C. Haddon-এর 'Magic and Fetishim', '. Hutton-এর "Primitive Secret societies". প্রভৃতি গ্রন্থ গুপ্তবিদ্যাচর্চার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। ম্যাকফারলেন সাহেব ইংলন্ডের রহস্যবিদ্যার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও সুস্থ সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর বহু দেশে ডাকিনীবিদ্যা, মাযাবিদ্যা, গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বহুল প্রসাব ঘটে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এই গুপ্তবিদ্যাচর্চার রমরমা। শুধু চর্চা নয়, এই সব উপজাতিরা বংশপরম্পরায় এই সম্বন্ধে বিশ্বাস গড়ে তুলেছে। কেবল ডাইনী, জিন, পরী, যক্ষ, রক্ষ নয়—বাদুড়, রক্তচোষা বাদুড়, কালো বিড়াল, শকুন, মাকড়সা, পেঁচা প্রভৃতি জীব-জন্তু, পাখি, প্রাণীদের নিয়ে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

ইউরোপের কিছু কিছু প্রাচীন উপজাতি রক্তপায়ী ভয়ঙ্কর, পক্ষিজাতীয় প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই সমস্ত প্রাণীরা রাতের আকাশে উড়ে বেড়ায়, একস্থান থেকে আর একস্থানে যাতায়াত করে, পেঁচার মত কর্কশ স্বরে ডাকে। মানুষের এবং অন্যান্য জীবজন্তুর রক্ত এদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য বস্তু। এদের পালক আছে, এরা ডিম পাড়ে; সন্তানের স্তন্যপান করায়। কিন্তু এদের দুধ বিষাক্ত। মানুষের রক্তমাংস এদের প্রিয় বলে এরা মানুষের শত্রু। মানুষ এদেরকে ভয় করত, এড়িয়ে চলত; এদেরকে নিধনের জন্য অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী মানুষদের দ্বারস্থ হত।

ইতালির কিছু কিছু উপজাতির মনে এক ধরনের সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে যে কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা প্রয়োজন অনুযায়ী রূপ বদল করতে পারে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দরী

রমণীর রূপ ধরে আর এগুলি সম্ভব হয়েছে ডাইনী বিদ্যা জাতীয় কিছু গুপ্তবিদ্যা বা রহস্যবিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা। অনেক সিসিলিয়ান কৃষক এদের রহস্যময় অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এরা মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী তা কিন্তু কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে এরা মানুষের রূপ ধরে মানুষের সমস্ত কাজ করতে পারে। এরা মানুষের রূপ ধরে যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এমনকি সন্তানেরও জন্ম দিতে পারে। এরা দল বেঁধে বাস করে, দিনে বের হয় না, রাত্রে সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে দলনেত্রীর পরিচালনায় দূরদূরান্তে অভিযান করে। কোন সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি দেখলে তার দরজার ফাঁক, ঘুলঘুলি, চাবির ফুটো দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। গৃহস্থ যদি এদেরকে অভ্যার্থনা করে তাহলে এরা গৃহস্থের মঙ্গল করে, অভ্যার্থনা না করলে এরা গৃহস্থের ক্ষতি করে। সেই গৃহস্থের গৃহে রোগ, দারিদ্র্য, শোক প্রভৃতি ডেকে আনে। গৃহস্থকে এরা ভয় দেখায়, অলৌকিক কাণ্ড করে— কিন্তু এরা একেবারে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নয়।

তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি আছে গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, যাদু প্রভৃতি চর্চার ব্যাপারে। আজও সম্মোহন বিদ্যার পীঠস্থান হিসাবে ভারতকে ধরা হয়। কামরূপ-কামাক্ষ্যা অঞ্চলে ডাইনী বিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, অতীন্দ্রিয় সাধনা, রহস্যচর্চার ব্যাপক প্রসার ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। এছাড়া উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আজও এই সব গুপ্তবিদ্যার ব্যবহার বেশ চলছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তবিদ্যাচর্চা বা রহস্যবিদ্যা চর্চার সন্ধান পাওয়া যায়। দূর গ্রামগঞ্জে, আবাদ অঞ্চলে, সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে গোপনে এই সব মন্ত্র-তন্ত্র ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা হয়ে থাকে। এগুলি এত গোপনে করা হয় যে বাহির থেকে কিছু বোঝা যায় না।

তবে একটা কথা প্রথম থেকেই বলে রাখা ভাল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত গুপ্ত-ক্রিয়াকর্ম হয়ে থাকে তার আলাদা কোন অভিধা কিংবা বৈশিষ্ট্য নেই। এগুলি তন্ত্রাচারের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছে। এখানে ওঝা-গুণিন, সাপুড়ে, হেতুড়ে বদ্যি, তান্ত্রিক, পুরোহিত, যাদুকর, হেতুড়ে গনক—সবই তন্ত্রচর্চার দোহাই দেয়। এমনকি পথে ঘাটে হাটে-বাজারে, স্টেশনের প্লাটফর্মে, ট্রেনের কামরায়, মেলা পার্বনে যারা নানারকম গাছ গাছড়া, চর্মরোগের মলম, হাঁপানীর ঔষধ, দেবদেবীর স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ প্রভৃতি বিক্রি করে তারাও নিজেদেরকে তান্ত্রিক বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। আর একটা মজার কথা হল এখানে জাতিভেদ কিংবা শ্রেণীভেদের কোন বালাই নেই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান— সবাই তান্ত্রিক নামে অভিহিত হতে চেষ্টা করে।

তান্ত্রিক শব্দটির সঙ্গে আমাদের একটা ভয় মেশানো সংস্কার জড়িয়ে আছে। তান্ত্রিক মানেই সে অনেক কিছু অসাধারণ ক্রিয়াকর্ম করতে পারে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নানারকম সাধনা-টাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছে, সাধন বলে দেবদেবীকে তুষ্ট করেছে, প্রেত-পিশাচ, ডান, যক্ষ-রক্ষ তার বশ-অনুগত, দুনিয়ায় হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না ইত্যাদি। তাই যে কোন ঔষধ প্রচারক, গাছগাছড়া বিক্রেতা, মাদুলি-তাবিজ বিক্রেতা প্রভৃতি তান্ত্রিক নাম দিতে ভালবাসে। কারণ 'তান্ত্রিক' কথা শুনলে জনগণ সহজেই গুরুত্ব দেবে। সেদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে একজন সামুদ্রিক নাভি-শঙ্খ বিক্রি করছিল। এই নাভিশঙ্খ কোমরে ধারণ করলে হাওয়া বাতাস লাগে না, বাড়ীর চারপাশে চারটি কোনে এগুলি পুঁতে রাখলে বাস্তুদোষ কেটে যায়। বাড়ীতে ডান-ডাইনী, জিনপরী, যক্ষ, রক্ষ, ভূত-প্রেতের উপদ্রব ঘটতে পারে না। সেই ঔষধ প্রচারকের নাম জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—তাঁর নাম

তান্ত্রিক বাজু, ঠিকানা দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বাকইপুব থানাব অন্তর্গত দুর্গাপুব গ্রাম। ইনি অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিযায়ও পাবদর্শী। এইববম কুলপীব কাছাকাছি কবগুলিতে থাকেন এক মুসলমান (তিনি নিজেকে ফকিব নামে পবিচয দেন), জযনগব মজিলপুব স্টেশানেব প্লাটফর্মে প্রাযদিন তিমি মাছেব চোযাল, বিভিন্ন জন্তুজানোযাবেব হাড, নখ, লোম, এবং মন্ত্রপূত মাদুলী বিক্রি কবেন। ইনিও অনেক তান্ত্রিক ক্রিযাকর্ম জানেন আব জানেন ম্যাজিক। এইবকম দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বিভিন্ন বেলওযে প্লাটফর্মে, বাজাবে, বটতলায, মেলাপার্বনে বহু তান্ত্রিক (¹) অভিধাধাবীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে—যেখানে কালী সাধনা, জন্তুজানোযাব বলি, বিভিন্ন ববম পূজা অর্চনা এবং অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিযাকর্ম হযে থাকে। কিছু কিছু তান্ত্রিক আছেন যাঁরা শ্মশানে মড়া জাগানো থেকে শুরু কবে নানাবিধ গুহ্যাচাব অনুশীলন কবেন। এখানে Black Magic এব মত তন্ত্রাচাবেব গোপন ক্রিযাকলাপেব সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যৌনাচাবও কবে থাকেন। এঁদেব অনেক ক্রিযাকর্ম ব্যক্তিব স্বার্থপূবণেব জন্য অপবেব অনিষ্ট সাধনেব জন্য ব্যবহৃত হয। মানুষেব মনে ভয ও আতঙ্ক সৃষ্টি কবতে এঁবা সিদ্ধহস্ত। কাউকে জব্দ কবাব জন্য এঁবা তান্ত্রিক ক্রিযাব সাহায্যে তাব বাডিতে ঢিল, জীবজন্তুব হাড, মডাব মাথা ফেলে থাকেন। কারুব বাডিতে পিশাচ লেলিযে দেন। এমনি ধাবা মানুষেব ক্ষতি কবে থাকেন।

তবে একটা কথা ঠিক আদিম মানুষেব প্রাচীন সংস্কাব, আব বিশ্বাস থেকে উঠে আসা এই গুপ্তবিদ্যা এবং ভাবতীয প্রাচীন তন্ত্রসাধনাকে আজও বিভিন্ন গোষ্ঠীব মানুষ ঐতিহ্য হিসাবে বহন কবে আসছে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনা সেদিক দিযে পিছিযে নেই।

১. বশীকবণ :

গুপ্তবিদ্যাব চর্চা যাঁবা কবেন তাঁদেবকে তন্ত্রসাধনা জানতে হয আবাব তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিকগণ গুপ্তবিদ্যাব অনুশীলন কবেন। ক্রিযাপদ্ধতিব দিক থেকে গুপ্তক্রিয়া ও তন্ত্রসাধনা মোটামুটি একই প্রকাবেব। উভয ক্রিযাপদ্ধতিতেই দেবদেবী, পূজাঅর্চনা, হোমযাগ, বিভিন্ন দ্রব্যগুণেব ব্যবহাব, মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণাযাম, বিভিন্ন প্রকাব শাবীবিক অঙ্গ সঞ্চালন ও অন্যান্য গুহ্যক্রিয়া বর্তমান থাকে। এই সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, স্থান-কাল ও উপলক্ষ্য নির্দিষ্ট ও নির্ধাবিত হয়ে থাকে। বিশেষ ক্ষমতা অর্জন কিংবা বিশেষ ক্ষমতা প্রযোগ কবাব জন্য সময সময ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিব সাহায্য নেওয়া হয়।

গুপ্তবিদ্যাব মধ্যে যে বিষযটি খুবই পবিচিত তাব নাম হল 'বশীকবণ'। বহু প্রাচীনকাল থেকে বশীকবণ বিদ্যাব প্রযোগ ও প্রচলনেব কথা জানা যায়। গৌবীতন্ত্রে এই বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আছে। প্রাচীনকালে বাজা, রানী, বাজকুমার, রাজকুমাবী, সুন্দব সুন্দবী, প্রেমিক প্রেমিকা, সম্পদশালী ব্যক্তি, শক্তিমান মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি জনেব ভালোবাসা, আনুগত্য, কৃপা, আধিপত্য লাভ কবার জন্য এই বিদ্যাব প্রয়োগ করা হয়। অথর্ববেদে এই বিষয়ে বহু মন্ত্র এবং বিধান পাওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় বশীকবণ বিদ্যার বহুল প্রচলন আছে। অনেক তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও গুণিন আজও এই পেশায় রত এবং তাঁদের জীবিকা অর্জনেব অন্যতম প্রধান উপায় হলো বশীকরণ মন্ত্রের সাহায্যে স্ত্রী-পুরুষকে বশ করা। এর সহায়করূপে বিভিন্নরকম মাদুলি, তাবিজ, করজ সিঁদুর পড়া, পানপড়া, জলপড়া ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। বশীকরণ বিদ্যা ভালো এবং খাবাপ দুপ্রকার কাজেই ব্যবহাব করা হয়। বিবাগী পুরুষকে এই বিদ্যার দ্বাবা বশ করে তাকে

গৃহমুখী করে যেমন ভাঙা সংসার জোড়া দেওয়া যায় কিংবা বহির্মুখী স্ত্রীলোককে সংসারে ফিরিয়ে এনে শান্তি বজায় রাখা যায়। তেমনি আবার পরস্ত্রী, কুমারী, পরপুরুষকে বশীভূত করে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা যায়। এছাড়া মানুষকে বশীভূত করে তার অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা যায়। আবার হিংসা চরিতার্থ করার জন্য, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রভৃতি কাজে বশীকরণ বিদ্যার প্রযোগ করা হয়। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বশ করার কাজে বশীকরণের প্রযোগ বেশি হয় বলে মনে হয়। এখানকার বিভিন্ন গুণিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, কিংবা বিভিন্ন প্রকারে যে খবর সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে স্ত্রী-পুরুষের বশ করার কাজই বেশি এবং এইগুলি হয় মাদুলি, তাবিজ, সিঁদুর পড়া প্রভৃতির সাহায্যে।

বশীকরণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। স্ত্রী-বশীকরণের ক্ষেত্রে— নিজের স্ত্রী, পরস্ত্রী, বালিকা, বিধবা নারী, কুমারী প্রভৃতি বশ করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপ্রকরণ ও মন্ত্র আলাদা। তেমনি পুরুষ বশীকরণের ক্ষেত্রে— বিবাগী স্বামী, পরপুরুষ এবং গুণীজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বশ করার পদ্ধতি এবং মন্ত্র আলাদা। তেমনি সর্বজন বশীকরণের মন্ত্রও আছে।

গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীগণ কিংবা গুণিনগণ বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে দ্রব্যগুণ ব্যবহার করেন। অনেক সময় তিথি-নক্ষত্র যোগ পালন করাহয়। এর সঙ্গে আবার মাস কিংবা বার যুক্ত হয়। অর্থাৎ এক এক মাসে এক এক বারে কোন কোন তিথি এবং নক্ষত্র এক এক রকম ফল হয়। যে বশীকরণ মন্ত্র বৈশাখ মাসে অধিক ফলদায়ী তা হয়ত আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে ফলপ্রদ নয়। তেমনি রবিবারে যে কাজ হয়, শনিবারে তা নাও হতে পারে।

বশীকরণ ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, গাছগাছড়ার মূল, পাতা, ফুল, ফল বিভিন্ন প্রকার ধাতু, জন্তুজানোয়ারের হাড়, পালক, দাঁত, নখ, পাখিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন—ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুড, পান, বটগাছের মূল, পুনর্নবার মূল, অপামার্গের মূল, গোরোচনা, যজ্ঞ ডুমুরের মূল, তাম্বুল, দেবদানী, শ্বেত সরিষা, কুঙ্কুম, টগর কাষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা, পদ্মপত্র, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, শ্বেত কুঁচ, বিল্বপত্র, ছোলঙ্গ লেবু, ছাগী দুগ্ধ, ঘৃতকুমারীর মূল, সিদ্ধিবীজ, অশ্বগন্ধা, কলাগাছের রস, আমলকীর রস, শ্বেত অপরাজিতার মূল, বদরী মূল, কাল ধুতুরার ফুল, চিতাভস্ম, নাগকেশরের মূল, গোরুর দাঁত, মানুষের বীর্য, দারুহরিদ্রার মূল, পদ্মগাছের মূল, মানুষের রক্ত, সিঁদুর, মৃগনাভি, চাঁপাফুল, খয়ের কাঠ, ব্যাঙ প্রভৃতি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত বশীকরণ মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটে তা মোটামুটি দু-প্রকারে হয়—(১) গৌরীতন্ত্র, সিদ্ধতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র কিংবা অন্যান্য প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া সংস্কৃত মন্ত্রের ব্যবহার করা যায়। (২) বাংলা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি গুণিনরা তাঁদের গুরুর কাছ থেকে পান, নিজেরা সৃষ্টি করেন কিংবা অন্য কোন প্রকারে সংগ্রহ করেন। এই মন্ত্রের ভাষা বাংলা এবং সাধারণতঃ পদ্যে লেখা।

গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীগণের মতে বশীকরণ মন্ত্রের প্রয়োগ করার আগে প্রয়োগকারীকে মন্ত্রসিদ্ধ হতে হবে। গুরু নির্দেশিত নানাপ্রকার শারীরিক কলাকৌশল, জপ-ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির সাহায্যে নিজেকে সিদ্ধ করে তুলতে হবে তারপর বীজমন্ত্র আবৃত্তি করতে হবে। শেষে বশীকরণ মন্ত্র একশত আটবার জপ করে সিদ্ধ হলে তবেই বশীকরণ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে। অন্যথায় এই কাজের কোন ফললাভ করা সম্ভব হবে না। মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় হোক কিংবা বাংলা ভাষায় হোক মন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট গাছের মূল, শিকড়, অন্যান্য দ্রব্যাদি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

সর্বজন বশীকরণ: গৌবীতন্ত্র অনুযাযী সর্বজন বশীকবণেব মন্ত্র হলো "ওঁ নমো সর্বলোকবশঙ্কবায় কুরু কুরু স্বাহা।" এই মন্ত্র এক শত আটবাব জপ কবতে হবে। এবপর দ্রব্যগুণাদি ব্যবহাব কবতে হবে।

(ক) অশ্বগন্ধা ও মনঃশীলা একত্রে আমলকীর বসে ভাবনা দিতে হবে, তাবপব সেই মিশ্রণ দিয়ে কপালে সুন্দব কবে তিলক অঙ্কন কবতে হবে। এই সঙ্গে সঙ্গে সুন্দব বেশভূষা কবতে হবে। এই তিলকেব দিকে যে তাকাবে সেই বশীভূত হযে যাবে। বিশেষ কবে নাবীগণ সর্বাগ্রে বশীভূত হবে।

(খ) হবিতাল, কুড, টগব কাঠ, কুঙ্কুম ও মনঃশীলা চূর্ণ কবে অনামিকা থেকে বক্ত বাব কবে তাবপব এই সকল চূর্ণদ্রব্য একত্রে মিশিযে কপালে তিলক দিলে এবং সুন্দব সাজসজ্জা কবলে নাবীগণ ও সর্বজন বশীভূত হবে।

(গ) শ্বেত কুঁচ ছাযাতে শুকনো কবে কপিলা দুধেব সঙ্গে বেটে কপালে তিলক দিলে কিংবা বেলপাতা, ছোলঙ্গ লেবু (মোটা ছালযুক্ত লেবু) এবং ছাগীদুগ্ধ একত্রে পেষণ কবে কপালে তিলক দিলে সর্বলোক বশীভূত হযে যাবে।

(ঘ) যজ্ঞ ডুমুবেব মূল, গোবোচনা, অপামার্গেব মূল একত্র পেষণ কবে কপালে তিলক দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতবাস পবিধান কবলে বশীকবণ হয়। উক্ত ব্যক্তিকে যে দর্শন কববে সেই বশীভূত হযে যাবে।

(ঙ) প্রিযঙ্গু লতা, পদ্মপাতা, বক্ত চন্দন গোবোচনাব সঙ্গে মিশিযে তা শুষ্ক কবে বড়ি তৈরী কবতে হবে। এবপব এই বড়ি কর্পূবেব সঙ্গে কাজল তৈবী কবতে হবে। এই কাজল চোখেব পাতায পবে মনোহব বেশভূষা কবলে সর্বজন বশীভূত হযে যাবে। বিশেষ কবে নাবীগণ এই কাজল ধাবণ কবলে সহজেই পুরুষ বশ কবতে পারবে।

(চ) বক্ত গোলাপ শুষ্ক কবে চূর্ণ কবতে হবে, তাবপব তা বক্তচন্দন ও কুঙ্কুমেব সঙ্গে মিশিযে কপালে তিলক কাটলে এবং বক্তাম্বব পবিধান কবলে সর্বজন বশীভূত হবে।

(ছ) অপামার্গেব মূল ও পুনর্নবাব মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন কবতে হবে। তাবপব ছায়াতে শুষ্ক কবে চূর্ণ কবতে হবে। ঐ চূর্ণ পানেব মশলাব সঙ্গে মিশিযে পানে ভবে দিযে প্রদান কবলে এবং মিষ্ট বচনে আপ্যাযিত কবলে উপস্থিত সর্বজন বশীভূত হয়ে যাবে।

(জ) কর্পূব সুবাসিত জলে এলাচ, ঘৃত কুমাবীব মূল, সিদ্ধিবীজ, অশ্বগন্ধা একত্র পেষণ করে মিশিয়ে দিতে হবে। তাবপব ঐ জলে প্রয়োজনমত চিনি মিশ্রিত কবে শববত তৈবী কবতে হবে। এদিকে ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও কুড় চূর্ণ কবে পানের মশলার সঙ্গে দিয়ে পান সাজতে হবে। এই বাব ববিবার দিন কোন নৃত্যগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে উক্ত শববত ও পান প্রদান করে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত কবলে উপস্থিত সবাই বশীভূত হয়ে যাবে।

(ঝ) [illegible], অশ্বগন্ধা, চন্দন ও কলাগাছের রস, সিঁদুর গুলে তাব সঙ্গে মিশ্রিত করে কপালে তিলক ধারণ করে মিষ্ট ব্যবহারে সুবচনে মানুষকে আপ্যাযিত করলে সকলকে বশীভূত কবা যায়। এই বকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পাবে।

বশীকরণ এবং সর্বজন বশীকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় মন্ত্র এবং দ্রব্যগুণ এই সব ক্ষেত্রে যত ক্রিয়া করে সুমিষ্ট বচন, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর বেশভূষাও মানুষকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। কর্কশ স্বর, রূঢ় ব্যবহার, মলিন পোষাক পরিচ্ছদ, কুদর্শন মানুষ, অপরিষ্কার, অগোছালো [illegible]—এসব কিছু মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে না। উপরে যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ

কবা হযেছে মানুষেব শবীবে ও মনে তাদেব ক্রিযা আছে। এব সঙ্গে মানুষকে প্রভাবিত কবাব সহজাত ক্রিযা-কৌশলগুলি ব্যবহাব কবলে সাফল্যলাভ কবা যায়। প্রাচীনকালে যাঁবা মানুষকে বশীভূত কবাব কাজ কবতেন, তাঁবা স্থান কাল ও পাত্র অনুযাযী মন্ত্র এবং ঔষধ ব্যবহাব কবতেন। বশীকবণ ক্রিয়াব সঙ্গে মনস্তত্ত্বেব সুদৃঢ় যোগ বর্তমান। একজন গুনিনকে পবিস্থিতি, ব্যক্তি, সময অনুযায়ী মন্ত্র কিংবা ঔষধেব প্রযোগ ঘটাতে হবে সেই সঙ্গে বেশবাস সুমিষ্ট ব্যবহাবেব দিকে নজব দিতে হবে, যাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব মনে প্রতিফলন ঘটানো যায।

বশীকবণ সর্বকালেব সমাজে প্রচলিত ও বহু বিতর্কিত বিষয। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায উত্তবাধিকাব সূত্রে প্রাপ্ত এই বিদ্যা তাব লোক সংস্কৃতিব অঙ্গ হিসাবে আজও ব্যবহৃত হযে চলেছে, মনে হয ভবিষ্যতেও চলবে।

বশীকরণ (২) :

অথর্ববেদেব দ্বিতীয কাণ্ডেব পঞ্চম অনুবাকেব চতুর্থ সূক্তেব মন্ত্রগুলি স্ত্রীবশীকবণ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। এখানে প্রার্থনাকাবী অশ্বিনীকুমাবদ্বযেব কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে— যেন তাব অভিলষিত স্ত্রীকে তাব কাছে এনে দেওযা হোক এবং তাব সাথে যুক্ত কবাব ব্যবস্থা কবা হোক। শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পাবাবতগুলি যে স্ত্রী-বিষযক বাক্য বলতে ইচ্ছাকবে, নীবোগ দৃপ্তকামীজন যা বলতে চায, স্ত্রীবিষযক তাব সেই বাক্য শুনে স্ত্রী তাব বশীভূত হোক- এটাই তাব কামনা। এই বশীকবণ কর্মে বৃক্ষেব ত্বক, শবখণ্ড, বাঞ্জন-কুষ্ঠ দ্রব্যাদি পেষণ কবে ঘৃতেব দ্বাবা মিশ্র কবে স্ত্রীব অঙ্গে লেপন কবতে হবে- তবেই স্ত্রী বশীভূত হবে।

এইবকম তৃতীয় কাণ্ডেব পঞ্চম সূক্তে মিত্র ও বকণেব কাছে স্ত্রীব বশীকবণেব জন্য প্রার্থনা কবা হযেছে। এখানে মন্ত্র জপ কবে স্ত্রীব বশীকবণ কামনায তাকে অঙ্গুলিব দ্বাবা তাড়না কবতে হবে আব একবিংশতি বদবীকণ্টক ঘৃত সিক্ত কবে তাদেব প্রান্তভাগ সূতা দিযে বেঁধে একবাব হোম কবতে হবে।

আবাব চতুর্থকাণ্ডেব প্রথম সূক্তে স্ত্রী-বশীকবণেব মন্ত্র আছে। এখানে যে স্ত্রীব কথা বলা হয়েছে— সে সম্ভবত পবস্ত্রী। তাই প্রার্থনাকাবী আদিত্য, বাযু প্রভৃতি দেবতাব কাছে প্রার্থনা জানিযেছে চাবদিকেব সকল স্ত্রী, কুকুবদেব ঘুম পাড়িয়ে দেওযা হোক ; প্রাঙ্গণে, খট্টায যে বমণীগণ শযন কবে আছে তাদেবকে ঘুমিযে বাখতে হবে, তাদেব অভিসাবকালে যে থাকবে, যে বিচবণ কববে, যে বসে থাকবে অথবা যে চাবদিক দেখবে, তাদেব সকলেব চক্ষু দর্শনশক্তিশূন্য অট্টালিকাব মত নিমীলিত কবে দিতে হবে। আব যে স্ত্রীকে বশীভূত করতে চায় তাব মা, তাব পিতা, দ্বারে নিযুক্ত কুকুব, গৃহপতি, তাব জ্ঞাতিগণ এবং বাইবে নিযুক্ত বক্ষক- সকলে যেন নিদ্রাভিভূত হয়। আব এখানে মন্ত্রদ্বাবা জল অভিমন্ত্রিত কবে ছিটিয়ে দিতে হবে, শযন গৃহে জল ছিটিযে অবশিষ্ট অভ্যন্তবেব দ্বাবে আনতে হবে। নগ্ন হয়ে উদূখল অভিমন্ত্রিত কবতে হবে। গৃহেব উত্তর দিকে স্ত্রীব খাটের দক্ষিণ পায়ে মন্ত্র দ্বাবা অভিমন্ত্রিত কবতে হবে।

অথর্ববেদে উল্লিখিত বশীকরণ মন্ত্র ও তাদেব ব্যবহারের প্রক্রিয়া থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে বশীকবণ বিদ্যাব বিশেষ প্রচলন ছিল এবং নিজস্ত্রী পবস্ত্রী উভয়প্রকার নাবীকে বশীভূত কবাব ব্যবস্থা কবা হোত। সুতবাং বশীকবণ বিদ্যা ভালো এবং মন্দ উভয়প্রকাব কার্যেই ব্যবহৃত হোত। অবৈধ কামনা বাসনা চবিতার্থ কবাব ব্যাপাবে প্রাচীন ভাবতীয় ঋষিগণ মন্ত্রশক্তিব ব্যবহার ঘটাতেন এতে তৎকালীন সমাজেব নীতি নিয়মেব শিথিলতাব পবিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালেব এই বশীকবণ বিদ্যা কালপ্রবাহে লুপ্ত হয়ে যায়নি বরঞ্চ তা পরিবর্তিত আকারে নূতনভাবে রূপান্তবিত হয়ে আমাদেব সমাজে প্রবেশ করেছে। আজও মানুষ বিবাগী পুরুষ, দুষ্টা

স্ত্রী, পরস্ত্রী, কুমারী কন্যা প্রভৃতিকে বশ করার জন্য বশীকরণ বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এর প্রচলন দেখা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সমস্ত বশীকরণ প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে, তাদের মধ্যে সর্বজন বশীকরণের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন বশীকরণের অন্যান্য প্রক্রিয়া ও মন্ত্রগুলি আলোচনা করা হবে।

স্ত্রী বশীকরণ: সর্বজন বশীকরণ অপেক্ষা কোন একজন স্ত্রীলোককে বশ করা অনেক সহজ ব্যাপার। তবে এখানেও দ্রব্যগুণের প্রয়োগ করতে হয়। স্ত্রীবশীকরণকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) নিজের স্ত্রী (২) পরস্ত্রী (৩) কুমারী অথবা বিধবা নারীকে বশীকরণ বিদ্যার সাহায্যে বশ করা যায়। নিজের স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হলে কিংবা সংসারে অনাসক্তি জন্মালে অথবা কলহাদি কারণে স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধা, রুষ্টা হলে বশীকরণ বিদ্যার সাহায্যে তাদেরকে সংসারে ফিরিয়ে আনা যায়। এই সকল স্ত্রীলোক সাময়িকভাবে বিপথগামিনী হয়। তাদের সংসারে ফিরিয়ে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু দুষ্টা প্রভৃতির স্ত্রীলোককে সংসারে ফিরিয়ে আনা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে বশীকরণ বিদ্যার কৃতিত্ব এখানে, দুষ্টা বা দুশ্চরিত্রা যেমনই হোক না কেন মন্ত্র আর দ্রব্যগুণের সাহায্যে এদেরকে বশ করা যায়—গুণিনগণ এই কথা বলে থাকেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নিজ স্ত্রীকে বশীভূত করার জন্য গুণিনগণ দু ধরনের মন্ত্র ব্যবহার করেন। এক প্রকার হল সংস্কৃত মন্ত্র। অথর্ববেদ, গৌরীতন্ত্র, কামাক্ষ্যাতন্ত্র প্রভৃতি থেকে মন্ত্র সংগ্রহ করে তার সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্য প্রয়োগ করে বশীকরণ করা হয়। আর অন্য প্রকার হল বাংলা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি গুণিনগণ উত্তরাধিকার সূত্রে গুরুর কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। এই বাংলামন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতির সম্পদ।

নিজ স্ত্রী বশীকরণ: বিল্ব পত্র, কুঙ্কুম, নিজের হাতের অনামিকার রক্ত, কুড়, বচ, কাকজঙ্ঘা এবং রক্ত চন্দন একত্র করে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করে (তিনবার) কপালে তিলক কাটতে হবে। তারপর সুবেশ ধারণ করে স্ত্রীকে মিষ্ট সম্ভাষণে ভূষিত করতে হবে। এমন করলে যে স্ত্রী স্বামী বিমুখী, সে স্বামী-সোহাগিনী হয়ে ওঠে।

"বচ কুষ্ঠং কাক জঙ্ঘা বিল্বপত্রঞ্চ কুঙ্কুম রক্তচন্দনম্।
স্বরক্তসংযুক্তং ভালে তিলক দার বশ্যকৃৎ॥"
ওঁ নম কামদেবায। দারবশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

সাপের খোলস, এরণ্ড তৈল, ডালিম কাঠ, গুগগুল সমপরিমাণে নিয়ে ধূপের মত জ্বালাতে হবে এবং শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, খদির, খেজুর, পেস্তা আর চটকপাখির মাথা সরবতের সঙ্গে গুলে পান করাতে হবে এবং সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে সুগন্ধিদ্রব্যের দ্বারা অঙ্গ লেপন করে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে রত হতে হবে—তাহলে পরপুরুষে আসক্তা স্ত্রী পরপুরুষ ত্যাগ করে নিজের আয়ত্তে চলে আসবে। সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে—

ওঁ নমঃ কামদেবায়, ওঁ হ্রীং, ক্লীং, ক্লিং,
কালি কপালি স্বাহা। মম ভার্যাং বশং ভবেৎ।
মঞ্জিষ্ঠা খদিরং শালে দত্তে কান্তাং বশং নয়েৎ॥

এই মন্ত্রগুলি সঠিক কিনা জানা যায় নি। যেখান থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাঁরা এর সম্বন্ধে বিশদ কিছু বলতে পারেননি। স্ত্রী বশীকরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনগণ বিভিন্ন বাংলামন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এই সকলের মধ্যে ধুলাপড়া, ফুল পড়া, সিঁদুর পড়া,

তেল পড়া, পান পড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগ করলে অধিক ফল দেয়।

ধূলা পড়া

ধূলি ধূলি ধূলি
ধরনীর ধূলি, স্বর্গের ধূলি, দেবতা-মানুষের পদধূলি।
হাতেতে নিলাম তুলে তিন অঙ্গুলি।
বাবা মহাদেবের বরে, কামদেবের বরে
এই ধূলি হয়ে যাক মোহিনী ধূলি।
স্বামী-সংসারে মনে নেই যে নারীর
আমার এই ধূলাপড়া দিলাম অঙ্গে তার।
হর হর বাবা মহাদেব
হর হর বাবা মহাদেব।
মতিগতি ফেরে তার মন কেড়ে আনে এ ধূলি।
বশ্যতা স্বীকার করে যায় সব ভুলি।
কার আজ্ঞে——বাবা মহাদেবের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে——
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

সবাই চলাচল করে যে পথ দিয়ে সেই পথের ধূলি তিনটি আঙুল দিয়ে তুলে নিতে হবে। এই ধূলির সঙ্গে মৃগনাভি, কুঙ্কুম, চন্দন মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে। তারপর গোধূলি বেলায় এই ধূলাপড়া গোপনে স্ত্রীর অঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই ধূলা পড়া দেবার পূর্বে বচ, কুড়, কাকজঙ্ঘা, কিচমিস, মিছরি, কথিলা মিশ্রিত করে বৈকালিক আহারের সঙ্গে ভক্ষণ করাতে হবে। তারপর নূতন বস্ত্র পরিধান করাতে হবে এবং সুগন্ধি দ্রব্যে ভূষিত করতে হবে। এরপর গোধূলি বেলায় সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করে গোপনে ধূলাপড়া দিতে হবে।

স্ত্রীবশীকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় মন্ত্র প্রয়োগ কিংবা দ্রব্যগুণের প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। সাংসারিক মনোমালিন্য, কলহ ইত্যাদি কারণে যে স্ত্রী বিবাগী হয়, দেশীয় গুণিনগণ সেইসব ক্ষেত্রে একটা মীমাংসা বা সমঝোতার ব্যবস্থা করে দেন। গুণিন-নামক ব্যক্তিটি মন্ত্র-ব্যবসায়ী হলেও তিনি গ্রামের মানুষ, দেশের মানুষ তাই গ্রাম-গঞ্জের মানুষদের ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা খুবই ফলপ্রদ।

ফুল পড়া

ফুল ফুল ফুল ফুলের কুঁড়ি।
তোমার মহিমা বর্ণিতে না পারি।
মানুষের গলে থাক, দেবের চরণে
তোমার রূপগুণে মোহিত জগৎ জনে।
মহাদেবের বরে আমি মন্ত্র দিলাম পড়ে
জগৎ সংসার ছার হোক, মন্ত্র যেন না নড়ে।
আমার এই ফুল পড়া দিলাম অমুকের মাথায়।
আমা ছাড়ি তার মন অন্যত্র না যায়॥

কাব আজ্ঞে—
বাবা মহাদেবেব আজ্ঞে।
কাব আজ্ঞে
কাঁউবেব কামিক্ষে মাযেব আজ্ঞে॥

একটি কিংবা দুটি চাঁপা ফুল, গোলাপ ফুল কিংবা সুগন্ধি বনকুসুম নিযে মন্ত্রপড়ে তিনবাব ফুঁ দিতে হবে। তাবপব বৈকালিক প্রসাধনেব সময় স্ত্রীব খোঁপায গুঁজে দিতে হবে। মনে বাখতে হবে স্ত্রীকে সব সময নানা অলংকাব, প্রসাধন দ্রব্য, বেশভূষায সজ্জিত কবে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যাযিত কবতে হবে।

নিজেব স্ত্রীব উপব বশীকবণ মন্ত্রেব প্রযোগ কবে বিবাগী স্ত্রীকে বশে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপাব। মতপার্থক্য, মনোমালিন্য, অভাব-অনটন, কলহ প্রভৃতি কাবণে স্ত্রী কষ্ট হযে স্বামী-সংসাব বিবাগী হলে সেই স্ত্রীকে বশে আনাব জন্য অনেক সময় মন্ত্র প্রযোগেব প্রযোজন হয না। স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিব মীমাংসা হযে গেলে বিবাগী স্ত্রী ঘবে ফেবে। এই সব ক্ষেত্রে ক্রোধ এবং অভিমান বিচ্ছেদ ঘটায। সুতবাং ক্রোধ এবং অভিমান দূব কবাব কাজে গুণিনগণ সাহায্য কবেন। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রামে গঞ্জে এগুলি খুবই পবিচিত ঘটনা। অভাব-অনটন পীড়িত দুঃখ দুর্দশায জর্জবিত মানুষেব জীবনেব এই অশান্তি দূব কবাব কাজে বশীকবণ বিদ্যা সামাজিক কর্তব্য পালনে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ কবে।

বশীকরণ (৩) :

কিছুদিন আগে এক বন্ধুববাড়ি গিযেছিলাম। ঘবে ঢুকতেই দেওযালে টাঙানো কাঁচবাঁধানো সুন্দব এক সেলাইযেব কাজ চোখে পড়ল। সাদা কাপড়েব উপব আকাশী (নীল) বঙেব সূতোয বোনা একটি লেখা 'সংসাব সুখেব হয বমণীব গুণে।' কথাটা খুবই সত্য। এটি প্রায প্রবাদেব পর্যায়ে চলে এসেছে। মানুষেব ঘবে ঘবে খবব নিলে দেখা যাবে সুন্দব এবং সুখী গৃহেব তথা সংসাবেব মূলে আছে নাবীব কল্যাণহস্ত। শ্রম দিযে, স্নেহ প্রেম ভালবাসা দিযে সংসাব ভবিযে বেখে দেয সেই কল্যাণমযী নাবী। তেমনি এব উল্টো দিকটা আছে। যে নাবী সংসাবকে গড়ে তোলে সেই নাবী আবাব সংসাবকে ভেঙে তছনছ কবে দেয। জীবনকে মরুভূমি কবে তোলে।

একদিকে কল্যাণমযী নাবী অন্যদিকে ধ্বংসকাবিনী, সর্বনাশী—নাবীব এই দুই রূপ নিযে সংসাবে শান্তি এবং অশান্তি। সর্ব অশান্তিব কাবণ যে নাবী তাকে নিযে যত চিন্তা ভাবনা। এই নাবীকে সংশোধন কবে, বশ কবে সংসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবাব কাজে গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ ও তান্ত্রিকগণ চিবকাল নানা প্রচেষ্টা কবে আসছেন। সেই প্রচেষ্টাব ফলস্বরূপ দুষ্টা স্ত্রী বশীকবণ মন্ত্রেব ব্যবহাব উল্লেখ কবা যায়।

মানুষেব জীবনে অশান্তি যেমন থাকবেই, তেমনি সংসাবে দুষ্টা স্ত্রীলোক থাকবেই। এই দুষ্টা স্ত্রীলোককে বশ কবাই ওঝা-গুণিনেব কৃতিত্ব। প্রাচীনকাল থেকে মন্ত্রচর্চাকাবীগণ দুষ্টা স্ত্রীলোককে বশীকবণ মন্ত্রের সাহায্যে বশ কবে আসছেন। অথর্ববেদে এই মন্ত্রেব ব্যবহাবেব অনেক উল্লেখ আছে। ভাবতবর্ষেব প্রায় সর্বত্রই এই বশীকবণ মন্ত্রেব প্রয়োগেব কথা জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব ওঝা-গুণিন, তন্ত্র-সাধকবাও এই মন্ত্রেব ব্যবহাব কবে থাকেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র ও তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে, তাতে জানা যায় যে দুষ্টা স্ত্রী বশীকবণের জন্য বিশেষ মন্ত্র ও নানাবিধ দ্রব্যগুণেব ব্যবহাব করা হয়। সংস্কৃত এবং বাংলা দুরকমের মন্ত্রেব ব্যবহার হয়ে থাকে। সংস্কৃত মন্ত্রের মধ্যে সাধারণ বশীকরণ মন্ত্র ও বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সংস্কৃত মন্ত্রের সঙ্গে

গৌরীতন্ত্রে উল্লিখিত মন্ত্রের মিল দেখা যায়। মনে হয় এখনকার গুণিনগণ গৌরীতন্ত্র কিংবা অন্যান্য তন্ত্র গ্রন্থ থেকে বশীকরণ মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন এবং শিষ্য পরম্পরায় তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণের জন্য যে সংস্কৃত মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় তার মধ্যে বীজমন্ত্রের ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওঝা গুণিনগণ এই বীজমন্ত্রের মধ্যে দুটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন এবং গুণিনগণ এই দুটিকে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এই দুটি মন্ত্র হল—

(১) **সাধারণ বশীকরণ** (ক) "ওঁ হ্রুং হ্রুং স্বাহা। ওং হ্রী সঃ অমুকং বশং কুরু কুরু স্বাহা।" অথবা (খ) গ্রৌং গ্রৌং ব্রং ব্রৌং ব্রৌং। ওঁ নমঃ কট-বিকট ঘোর-রূপিনী অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।"

(২) **বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র** (ক) "ওঁ হ্রীং হ্রুং রক্তচামুণ্ডে অমুকং বশমানয় স্বাহা।"
অথবা (খ) "ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং বশমানয় স্বাহা।"

এই বীজমন্ত্রগুলি বিভিন্ন মন্ত্রের ধ্রুপদী পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওঝা-গুণিনগণ এই বীজমন্ত্র আবৃত্তি করে তবে অন্য মন্ত্র পাঠ করেন। কখনো কখনো বশীকরণের জন্য হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি করে থাকেন। তখন এই বীজমন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে হোমে আহুতি দেওয়া হয়। আর 'অমুকং' শব্দের স্থলে যে নারীর জন্য বশীকরণ তার নাম উল্লেখ করতে হয়।

এই বীজমন্ত্র পাঠের পর অন্য মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্যগুণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন, ভার্যা যদি দুষ্টা চরিত্রের হয়ে যায়, পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হয়, স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কিংবা গৃহত্যাগ করার সংকল্প করে তাহলে তাকে নিম্নলিখিতভাবে বশীকরণ করতে হবে। যেমন নিজের রক্ত ও শুক্রের সঙ্গে বচ, কুড়, কাকজঙ্ঘা, কিসমিস, মধু মিশ্রিত করে খেতে দিতে হবে এবং পূর্বে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে তিনবার—
"কাকজঙ্ঘা বচা, কুষ্ঠং শুক্র শোনিতং মধুং
ভক্ষণে রোদতে জায়া শ্মশানে অরণ্যে চ পতি বিরহ্ সংযুক্তং।"
পতিবিরহে কাতর হয়ে সেই স্ত্রী (দুষ্টা স্ত্রী) স্বামীর মৃত্যুতেও শ্মশানে, অরণ্যে নিরন্তর রোদন করবে—এমনই বশীভূতা হয়ে যাবে সে। আর স্বামীর ঘর তো করবেই কিংবা স্বামী সোহাগিনী হয়ে উঠবে একথা বলাবাহুল্য। এছাড়া বিভিন্ন তিথি নক্ষত্র যোগেও বশীকরণ মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। যেমন—কৃত্তিকা কিংবা ভরণী নক্ষত্রে কোন সুমিষ্ট ফল, স্বাতী নক্ষত্রে মুক্তা ইত্যাদির অলংকার ধোওয়া জল, পুষ্যা নক্ষত্রে কৃষ্ণ ধুতুরার ফুল, বিশাখা নক্ষত্রে অশোক শাখা, হস্তা নক্ষত্রে যজ্ঞ ডুমুরের মূল, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে অপরাজিতার মূল, কর্পূর, কুঙ্কুম, গোরোচনা, মৃগনাভির সঙ্গে মর্দন করে শরীরে লেপন করে বশীকরণ মন্ত্র (চামুণ্ডা মন্ত্র) একুশ বার জপ করলে স্ত্রী কুলটা হয়ে গেলেও বশীভূতা হবে এবং স্বভাবচরিত্র সংশোধিত হবে।

ওঝা গুণিনগণ বলেন কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অক্ষমতার জন্য, স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য, অভাব অনটনের জন্য, কিংবা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে বিপথগামিনী হয়, চরিত্রভ্রষ্টা হয়, পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহলে বশীকরণের সাহায্যে তাদের সংশোধন করা যায় কিংবা স্বামীর বশীভূতা করে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিগতভাবে কিংবা স্বভাবগতভাবে যারা কুচরিত্রের তাদেরকে সংশোধন করা বেশ কষ্টসাধ্য। দেখা যায় সমস্তরকম সুখ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু স্ত্রীলোক ব্যভিচারিনী হয়ে থাকে। এই সমস্ত নারীরা basically perverted। এক ধরনের স্ত্রীলোক দেখা যায় যাদের শরীরে একপ্রকার দাহ থাকে; কোন প্রকারে তাদের যৌনতৃপ্তি ঘটে

না। এরা বহুপুরুষগামিনী হয়েও তৃপ্তি পায় না। এই সমস্ত মেয়েরা ঘর সংসার করতে পারে না। এদেরকে বশীকরণ মন্ত্রের সাহায্যেও বশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দুষ্টা স্ত্রীলোক বশীকরণের বাংলা মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এই মন্ত্রগুলির সঙ্গে দ্রব্যগুণেরও ব্যবহার করা হয় এবং বীজমন্ত্র জপ করার পদ্ধতির প্রচলন আছে। অন্যান্য গুণিনমন্ত্রের মত বশীকরণের মন্ত্র পদ্যে লেখা। আদেশ কাড়ার ধুয়া আছে। এই মন্ত্রগুলি কতখানি কার্যকরী সে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ পূর্বেই বাংলা গুণিনমন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হয়েছে। বশীকরণ মন্ত্রের বেলায়ও সেই পর্যালোচনা প্রযোজ্য। মন্ত্রের ভাষা মামুলি কিংবা অসংলগ্ন হলে তা শক্তিহীন হবে এমন কথা মানতে রাজী নন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনরা। তাঁদের মতে এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। বিশ্বাস না করলে মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক-সমস্তই অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র। তবে তাঁদের মন্ত্র-তন্ত্রে কাজ হচ্ছে বলে তাঁরা পয়সা উপার্জন করতে পারছেন এবং মন্ত্রব্যবস্থাও বেঁচে আছে। কেবলমাত্র ভণ্ডামি হলে কবে ওঝা-গুণিনদের দিন শেষ হয়ে যেতো। তবে এমনও হতে পারে যে মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে—সেগুলিই শেষ কথা নয়, এর পিছনে আরও কিছু ক্রিয়াপদ্ধতি বা অন্য কোন মন্ত্র বা আসল মন্ত্র আছে—যার হদিশ পাওয়া যায়নি।

দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্রের মধ্যে পানপড়া, সবিষাপড়া, তেল পড়া, বাতাসা পড়া, সিঁদুর পড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় উপরোক্ত সব মন্ত্রগুলি কমবেশি প্রচলিত। তবে পানপড়া, তেলপড়া এবং সিঁদুর পড়া বেশ চলে।

পান পড়া

পান পান বাংলা পান, সাঁচি-মিঠা পান
আর দেবদেবী খায় মহাপান।
এই পান খায় যে নারী
মহাদেবের বরে তার দুষ্ট স্বভাব যায় দূরি।
রাম টলে লক্ষ্মণ টলে মহাবীর হনুমান টলে
গুরুর আজ্ঞায় এই পানপড়ায় নারী টলে।
পীর পয়গম্বর দেয় ডাক
কু-নারী দূরে যাক্।
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের বরে
দুষ্টা নারীর সুমতি আসুক ফিরে।
স্বামীর বশ হয়ে সুখে করুক সংসার
ডাকিনী যোগিনী প্রেত্নিনি হোক ছারখার।
কার আজ্ঞে—
বাবা শিব্ মা চামুণ্ডার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে।

ওঝা-গুণিনদের ধারণা ডাকিনী, যোগনী প্রেত্নিনীর প্রভাবে পড়ে নারীর মতিচ্ছন্ন হয়, তাই স্বামী-সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে যায়, পরপুরুষে আসক্তা হয়ে গৃহত্যাগ করে। বশীকরণ মন্ত্রের সাহায্যে অন্তরের সেই ডাকিনী প্রেত্নীদের মেরে ফেললে দুষ্টা স্ত্রীলোকের মন আবার সুস্থির হয়ে যাবে।

শনিবার সকালে বউনির সময় পান, সুপারি, খয়ের, চুন ও সুগন্ধি মশলা কিনতে হবে। তারপর এই সমস্ত দিয়ে সুন্দর করে পান সেজে শনিবার বিকালে অর্থাৎ বারবেলায় উপরোক্ত মন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করে ফুঁ দিতে হবে। অতঃপর এই পান দুষ্টা স্ত্রীকে খেতে দিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হয়ে যাবে।

মন্ত্র খাঁটি হোক বা নকল হোক, তাতে শক্তি থাকুক বা না থাকুক সে কথায় না গিয়ে বলা যায় স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করে, বিপথগামিনী স্ত্রীলোককে সংশোধন করে ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর যে মহৎ প্রচেষ্টা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনগণ করে চলেছেন, এর জন্য তাঁরা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হয়ত জীবিকা উপার্জনের এই পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন, কিন্তু পয়সা উপার্জনের বাইরে তাঁদের মানবিক সত্তা এক মহৎ প্রচেষ্টায় জেগে ওঠে। বিপদে আপদে পাড়া প্রতিবেশীটির মত, উপকারী বন্ধুটির মত তাঁরা যে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান—অন্তরের এই শুভ প্রেরণাই তাঁদেরকে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। প্রকৃত সংস্কৃতিবোধের পরিচয় এখানেই। সূক্ষ্মবিচারে অনেক ত্রুটি চোখে পড়তে পারে, কিন্তু লোকমনের মিলন মেলায় যাঁরা বন্ধুত্বের পশরা নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাঁরা মন্ত্রব্যবসায়ী হলেও লোক সমাজের হিতৈষী। তাঁদের স্থান জনমনের মন্দিরে। সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে তাঁদের আসন আজও টলেনি।

বশীকরণ (৪):

রামায়ণ কাহিনী থেকে জানা যায় রাম-সীতা লক্ষ্মণের বনবাসকালে একদিন লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের বোন শূর্পণখা লক্ষ্মণের কাছে প্রণয়ভিক্ষা করেন। এতে লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে শূর্পণখা রাক্ষসী, মায়াবিনী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে লক্ষ্মণের মনোহরণ করতে পারেনি। সে নিশ্চয়ই বশীকরণ বিদ্যা জানত না। যদি জানত তাহলে সে সহজেই লক্ষ্মণকে বশ করতে পারত। এই বশীকরণ মন্ত্র নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গুণিনের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সেই গুণিনের মতে বশীকরণ মন্ত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফল হতে বাধ্য। অধিকাংশ গুণিন সঠিক মন্ত্র কিংবা যথার্থ প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞাত। তাঁরা ভূয়ো মন্ত্র কিংবা মনগড়া প্রয়োগবিধি ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা সফল হতে পারেন না। বশীকরণ মন্ত্রের সাহায্যে ইপ্সিত পুরুষ কিংবা নারীকে বশ করা যায়। যেখানে অবিবাহিত পুরুষ কিংবা অবিবাহিতা নারীকে এই বিদ্যার সাহায্যে বশ করা অতি সহজ ব্যাপার। অথচ এই অতি সহজ ব্যাপারটি শূর্পণখা ঘটাতে পারেনি কেন ভাবতে অবাক লাগে। পিছনে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে— সে আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বশীকরণ মন্ত্রের বেশ চলন আছে। তবে অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যত বেশি, অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা নয়। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের জের হিসাবে বিবাগী স্বামী কিংবা সংসার থেকে বেরিয়ে আসা স্ত্রীকে বশ করার জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই বশীকরণের সাহায্য নেয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ। এসব ক্ষেত্রেই গ্রাম্য শালিসীতেই ব্যাপারগুলো মিটে যায়। তবে কুচরিত্রের বারমুখো পুরুষ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গালাগালের ভাষায় যাকে 'বারভ্যামনা' বলে) কিংবা দুশ্চরিত্রা নারীকে বশে আনার জন্য বশীকরণ বিদ্যার খুবই প্রয়োজন। আর বিয়ে না হওয়া ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। এমনিতেই তারা প্রেমে গলে আছে, সেখানে বশীকরণ-করলে তো সোনায় সোহাগা।

গুণিনদের ভাষায় বশীকরণ মানেই মদনদেবের কারসাজি। দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কামদেবের কামবাণের সাহায্যে স্ত্রী-পুরুষকে বশ করা হয়। অনেকে একে তাই

বাণমারা বা কামবাণমারা বলে। তাই দক্ষিণ চাব্বিশ পরগনা থেকে সংগৃহীত বশীকরণের বাংলা মন্ত্রে মদনদেবের উল্লেখ আছে। অনেক জায়গায় মদনদেবের নামে আজ্ঞা কাড়া হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে শাস্ত্রে-পুরাণে, কাব্যে-সাহিত্যে-নাটকে-গল্পে মদনদেব হলেন প্রেম-প্রণয়-কামনা পূরণের দেবতা। প্রাচীন কবি কালিদাস থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিগণ কাব্য-সাহিত্যে মদনদেবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বশ করার বশীকরণ মন্ত্রেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনগণ মদনদেবকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিবাহ না হওয়া স্ত্রী পুরুষকে বশ করার জন্য সংস্কৃত মন্ত্র আছে। সেখানে নানাবিধ দ্রব্যগুণের সঙ্গে বীজমন্ত্র পাঠ করে বশীকরণ মন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। অন্যান্য পর্যায়ের বশীকরণ মন্ত্রের সঙ্গে এদের বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু বাংলা মন্ত্রে বেশ তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের মন্ত্রগুলির মধ্যে ফুলপড়া, জল পড়া, আঁচলে গিঁট বাঁধা, চন্দন-তিলক ও অন্যান্য তিলক মন্ত্র, বিভিন্ন প্রকার জপ, মদনসাধন, কাজল পড়া, অনুরাগিনী মন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গৌরীতন্ত্র অনুযায়ী মদন সাধন মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোককে বশীভূত করা যায়। তা হল—"ওঁ ঐং মদনে মদন বিডম্বিনি আলিঙ্গয় আলিঙ্গয় সঙ্গমং অনন্তসঙ্গমং সন্দেহি দেহি ক্লীং ক্লীং স্বাহা।" এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা একশত আটবার জপ করে জপ শেষে ঈপ্সিতা নারীকে দর্শন করলে ও মিলিত হলে সে নারী অবশ্যই বশীভূতা হয়ে যাবে। এছাড়া অশ্বিনী নক্ষত্রে অর্জুন বৃক্ষের মূল কিংবা ভরণীনক্ষত্রে অশোক বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করে তা হাতে নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র এক সহস্রবার জপ করে কাম্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হলে সে স্ত্রীলোক আমৃত্যু বশীভূতা হয়ে থাকবে। এইভাবে বিভিন্ন সংস্কৃত মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়।

অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর বশীকরণের বাংলা মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সম্পদ। এখানকার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ফুল পড়া

ফুল রে ফুল ফুল ধনুর ফুল
এই ফুল তুই সর্বনাশের মূল।
কামদেবের ধনুক থেকে ফুল ছিটকে পড়ে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে মানুষ নড়ে চড়ে।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় যতেক পুরুষ নারী
ফুলবাণ বুকে বিঁধে জ্বলে কুমার কুমারী।
আমার এই ফুল পড়া বাণ হয়ে যায়।
অমুকার/অমুকীর বুকেতে সেঁধায়।
আমার এই ফুল পড়া জ্বালাক আগুন
অমুকার/অমুকীর পুড়ুক মন।
নারী বশ পুরুষের পুরুষ নারীর
আমার এই ফুল পড়া বুকে মারুক তীর।
শ্রী অমুক/শ্রীমতী অমুক বশ হোক
কামদেবের বরে তার মন মতি ঘুরে যাক।
কার আজ্ঞে—

বাবা মহাদেবের আজ্ঞে আর গুরুর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—
মা চণ্ডীর আজ্ঞে
আমি ফুলেতে দিলাম ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ

কোন সাদা সুগন্ধী ফুল, পলাশ কিংবা অশোক, বর্ষাকাল হলে কদম ফুল অথবা ডালিম ফুল কিংবা চাঁপাফুল নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র একুশ বার জপ করে তিনবার ফুঁ দিয়ে ফুল অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তারপর ঐ ফুল যে নারীকে কামনা করা যাবে তার খোঁপায় কিংবা যে পুরুষকে চাওয়া হবে তার কানে গুঁজে দিতে হবে। এতে ঐ ঐ স্ত্রী/পুরুষ বশ হয়ে যাবে।

বশীকরণের তিলক মন্ত্র :

সাধারণভাবে বশীকরণের জন্য বীজমন্ত্র জপ করলে শীঘ্র ফললাভ হয়। তিলকমন্ত্র পাঠ করার পূর্বে চণ্ডমন্ত্র (বীজমন্ত্র সহ) দশ হাজার বার জপ করে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়। তারপর অশ্বগন্ধার মূল, শ্বেত অপরাজিতার মূল, গোরোচনা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন একত্র মিশ্রিত করে কপালে তিলক ধারণ করে, মন্ত্রপাঠ করে আকাঙ্ক্ষিতা রমণীর সঙ্গে সহবাস করলে সেই রমণী অতি শীঘ্রই বশীভূতা হবে এবং চিরকাল অনুগতা হয়ে থাকবে।

মন্ত্র

তিলক তিলক তিলক
দেবতার কপালে তিলক সাধুর কপালে তিলক শয়তানের কপালে তিলক।
এই তিলকে জয় করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীরে,
তিলক পরে রাবণ ভোলায় সীতারে।
এই তিলকে ভুলে যায় পঞ্চসতীর মন
এই তিলকে সাধু ভোলায় অপ্সরার মন।
আমার এই তিলকে অমুকীর মন ভুলে যাক।
গুরুর আজ্ঞায় অমুকার বশ হয়ে যাক।
ওঁ কুরু কুন্দো ক্রৌ ক্রৌ স্বাহা
ওঁ ঘুং ঘুং ঘুং হ্রীং
ওঁ বিশ্ববসুনাম ওঁ হ্রুং স্বাহা।।

এখানে লক্ষ্য করা যায় বাংলা মন্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত বীজমন্ত্র জুড়ে দিয়ে মন্ত্রের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত মন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দুর কম বেশি দুর্বলতা আছে। সেখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মত দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার অন্যান্য জায়গার তুলনায় কম— গ্রামাঞ্চলের মানুষ সংস্কৃত মন্ত্রের ধ্বনিগাম্ভীর্যে সহজেই প্রভাবিত হয়ে যাবে এই কথা মাথায় রেখে এই অঞ্চলের গুণিনগণ বাংলা মন্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত মিশিয়ে দিয়েছেন। বাংলা মন্ত্র অংশটুকুর মধ্যে পুরানকাহিনীর ছায়াপাত আছে। প্রায় সমস্ত গুণিনমন্ত্রে এই ধরনের পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় পুরাণকাহিনীর ছায়াপাত ঘটিয়ে গুণিনগণ জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

সংস্কৃত বশীকরণ মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিজস্ব সম্পদ নয়, এগুলি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ কিংবা তন্ত্রমন্ত্রের বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ওঝা-গুণিনগণ হয়ত এগুলি গুরুর কাছ থেকে পেয়েছেন, তবুও এগুলি তাঁদের নিজস্ব নয়। বাংলা মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিজস্ব হতে পারে। এগুলির মধ্যে বাইরের প্রভাব একেবারেই নেই

একথা বলা যায না। তবে যেগুলি বহিবাগত সেগুলি আবাব গুণিনদেব হাতে পড়ে কালে কালে পবিমার্জিত পবিবর্তিত রূপান্তবিত হতে হতে নূতন রূপ পবিগ্রহ করেছে। সুতবাং সব মিলিযে এগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব নিজস্ব সম্পদ একথা বললে অত্যুক্তি হয না।

বাংলা মন্ত্রগুলিব ভাষা সহজ সবল। পদ্যেব আকাবে মন্ত্রগুলি বচিত হলেও বাক্যগুলি সুগঠিত নয। ছন্দ দোষ তো আছেই। তবে দক্ষ গুণিনেব হাতে পড়লে এই সব ত্রুটি ধবা যায না। বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুব কবে কবে সহজ সবল ভাষাকে এমন দুর্বোধ্য কবে তোলেন তাঁবা যাতে মন্ত্রগুলিব মর্যাদা, মূল্যমান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায। মন্ত্রগুলিব লিখিতরূপ অপেক্ষা ব্যবহাব কালে উচ্চাবিত রূপটি অনেক বেশি আকর্ষণীয ও গুরুত্বব্যঞ্জক। সুব সহযোগে উচ্চাবণ কবাব ভঙ্গীই মন্ত্রসম্বন্ধে মানুষেব মনে সম্ভ্রমবোধ জাগিযে বেখেছে।

এই মন্ত্রগুলি ছাড়া যে সমস্ত দ্রব্যগুণ ব্যবহাব কবা হয সেগুলি ভেষজগুণে ভবা। বিশেষ কবে বিভিন্ন বৃক্ষেব মূল, পাতা, ছাল, ফুল, বিভিন্ন লতাপাতা প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন বোগেব ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হযে আসছে। বাংলাদেশেব জড়িবুটিব খ্যাতি চিবকালেব। গুণিনদেব মন্ত্রে যদি কাজ না হয তাহলে গাছগাছড়াব শিকড়বাকড ও অন্যান্য বিভিন্ন দ্রব্যে কাজ হযে থাকে। সব মিলিযে বশীকবণবিদ্যাব প্রযোগ সফলতা একেবাবে অস্বীকাব কবা যায না। আব সর্বশেষে একথা বলা যায এই বিদ্যাব গহ্বরে আবও কত বহস্য লুকিযে আছে কে জানে, সে বহস্যেব সন্ধান হযত আজও আবিষ্কৃত হযনি। কিছু সংখ্যক গুপ্ত বিদ্যাচর্চাকাবীব কাছে তা হযত সংগোপনে গুপ্ত হযে আছে।

বিশ্লেষণ (১) :

সমগ্র ভাবতবর্ষ জুড়ে যেমন মঠ, মন্দিব, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি এবং নানা তীর্থস্থান ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি বিভিন্ন ধর্মেব ও বিভিন্ন সম্প্রদায়েব মানুষেব ধর্মস্থান আছে। হিসাব কবলে দেখা যায হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রায সকল সম্প্রদায়েব মানুষেব তীর্থস্থান আছে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতাব কালীঘাট থেকে আবম্ভ কবে বর্ধমানেব কেতুগ্রাম, ক্ষীবগ্রাম, বীবভূমেব কংকালীতলা, মালদহেব জহুবা কালীবাড়ী, তাবাপীঠ, একচক্রা, দক্ষিণেশ্বব, বক্রেশ্বব, তাবকেশ্বব, নবদ্বীপ, প্রভৃতি অগনিত তীর্থস্থান জাগ্রত হয়ে আছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। তেমনি দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায বিভিন্ন ধর্মেব ও সম্প্রদাযেব মানুষেব তীর্থস্থান তথা ধর্মস্থান এবং মঠ মন্দিব, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি আছে—যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ আজও ছুটে চলেছে। ময়দাব কালীবাড়ি, ধপধপিব দক্ষিণেশ্বব, কাশীনগবেব চক্রতীর্থ, ঘুটিয়াবীশবীফেব পীবগাজিব স্থান, মড়াপাইয়েব খৃষ্টানবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়েব মানুষেব বহু তীর্থস্থানেব উল্লেখ কবা যায়। এই সমস্ত তীর্থস্থানে হাজাব হাজাব মানুষ যায় হিন্দু পুরোহিত, মুসলমান মৌলবী, পীব খৃষ্টান ধর্মযাজকদেব কাছ থেকে রোগ ব্যাধি বিপদ আপদের, দুঃখ দুর্দশাব নিবাময়েব চবণামৃত, প্রসাদ, মাদুলী, তাবিজ, কবচ প্রভৃতি সংগ্রহ কবাব জন্য। পবিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শুধু গ্রামগঞ্জের নিবীহ সরল, ভীতু, দুর্বল, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত মানুষবাই নয়, শহুব, শহরতলী ও নগরের সমৃদ্ধ, শিক্ষিত বাস্তববাদী মানুষরাও এই সব ধর্মস্থানে ফুল বেলপাতা, মাটি, মাদুলি, চরণামৃত প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য দলে দলে যায়। এই ব্যাপারকে ধর্মীয় সংস্কাব, লোকবিশ্বাস (folk belief) বললে অত্যুক্তি হয় না। এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষেব ধারণা দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগভোগ, বিভিন্ন বিপর্যয়, সাংসারিক দুঃখ দুর্দশা, অভাব-অনটন, আকস্মিক দুর্ঘটনা, মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, পাগলামি, আত্মিক দৌর্বল্য প্রভৃতির মূলে দেবতাব

ক্রোধ, বোষ, কিংবা অপদেবতাব কু দৃষ্টি। সমগ্র জগতে বিভিন্ন প্রকৃতিব বিদেহী আত্মা (spirit), অলক্ষ্যচাবী শক্তিসমূহ অহবহ ঘুবে বেড়াচ্ছে। এবা কেউ ইষ্টকাবী, কেউ অনিষ্টকারী। ইষ্টকাবী (benevolent) শক্তিকে যেমন পূজাঅর্চনা, স্তবস্তুতি, উপবাস, হত্যা দেওযা প্রভৃতিব দ্বাবা সন্তুষ্ট করে কৃপা বা করুণা অর্জন কবতে হয, তেমনি অশুভ বা বিরুদ্ধ বা অনিষ্টকাবী (malevolent) আত্মা কিংবা শক্তিকে যাগযজ্ঞ, বলি, হোম, নৈবেদ্য, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতিব সাহায্যে তুষ্ট, বশ বা শান্ত বাখতে হয। আব এই সমস্ত কবতে গিযেই মানুষ ছুটছে বিভিন্ন মঠ মন্দিবে, দ্বাবস্থ হচ্ছে পুবোহিত মৌলবীদেব আব শেষ আশ্রয় হিসাবে গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী, তান্ত্রিক কিংবা গুণিনদেব শবণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু তান্ত্রিক বা গুণিনবা অপদেবতা, দুষ্ট আত্মা, কুগ্রহশান্তি প্রভৃতি কাজেব জন্য গোপনীযতাব আশ্রয নিযে থাকেন, কাবণ সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এদেবকে ভাল চোখে দেখে না। এইভাবে গুপ্তক্রিয়াচর্চাব আসব বেড়ে যায।

মানুষ জন্মেব সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রবৃত্তি নিযে জন্মায। মানুষেব সেই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিব মধ্যে অনেকগুলি মন্দ কাজে সহাযতা কবে, জীবনে অতৃপ্তি, অচবিতার্থতা ডেকে আনে; মানুষকে দুঃখদুর্দশাব অন্ধকারে ঠেলে দেয়। মানুষ এইসব প্রবৃত্তিব শিকার হযে যেমন নিজে অধঃপতনেব দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি অপবেব অমঙ্গল, ক্ষতি কবে। এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি মোটামুটিভাবে হল কামনা, বাসনা, ভয, জুগুপ্সা, হিংসা, দ্বেষ, লিপ্সা, আত্মসাৎ কবাব ইচ্ছা, হনন কবাব ইচ্ছা প্রভৃতি।

প্রবৃত্তিব তাড়নাই মানুষকে চিবকাল অস্থিব কবে তোলে এবং ছুটিযে নিযে বেড়ায়। এই প্রবৃত্তি চবিতার্থ কবতে মানুষ বাঁকা পথেব আশ্রয় নেয। আমাদেব দেশেব এক শ্রেণীর গুণিন, গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী কিংবা তান্ত্রিক এই পথে সহায়তা কবে। এবা শুধু সহায়তা করে না, কিভাবে মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাবও চেষ্টা করে। কুপ্রবৃত্তিব সহায়ক এইবকম গুপ্তবিদ্যাগুলি হল—বিদ্বেষণ, মারণ, উচাটন, মোহন ও আকর্ষণ।

গৌরীতন্ত্রে বিদ্বেষণকে মহাকৌতুকজনক গুপ্তবিদ্যা বলে বর্ণিত করা হযেছে। প্রাচীনকালে রাজতন্ত্রে এই বিদ্যাব বিশেষ প্রচলন ছিল। বাজা-মন্ত্রীব মধ্যে, বাজা বানী কিংবা বাজপুত্রেব মধ্যে আবাব মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, পাত্র, মিত্রের মধ্যে বিদ্বেষণ ঘটানো হত। এক বাজাব সঙ্গে অন্য বাজাব বিদ্বেষণ ঘটানো হত। এইভাবে যে কোন দুই ব্যক্তিব মধ্যে বিদ্বেষণ ঘটানো সম্ভব। সমাজে, সংসারে, পবিবারে এবং বাষ্ট্রে এইভাবে বিদ্বেষ ঘটিযে কার্য সিদ্ধি কবত এক শ্রেণীর মানুষ তাদের স্বার্থ পূরণেব জন্য। এইজন্য তারা গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীদের সাহায্য গ্রহণ করত।

অন্যান্য গুপ্তবিদ্যার মত বিদ্বেষণ-এ বিভিন্ন গাছগাছড়ার শিকড়, মূল, পাতা, ফুল বিভিন্ন প্রকার লতাগাছ, জন্তুজানোয়ারের দাঁত, নখ, হাড়, লোম এবং অন্যন্য দ্রব্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিদ্বেষণ-এর সংস্কৃত ও বাংলা উভয় প্রকার মন্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ দুইভাবে বিদ্বেষণবিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হয়। (১) বাণ মারা (২) তিলক ধারণ। তবে বাণ মাবা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ বেশি। কারণ যাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটানো হবে তাদের অজ্ঞাতে এইসব ক্রিয়া-কৌশল করাই শ্রেয়। তাই দূর থেকে বাণ মারা পদ্ধতির সুবিধা ও উৎকৃষ্টতা বেশি। আর তিলক দেওয়া ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা আছে। যাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদের কপালে তিলক দিতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। ছলনা কিংবা অভিনয়ের দ্বারা তিলক

দেওযাব ব্যবস্থা কবতে হবে। কাবণ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জানতে পাবলে সে তিলক নিতে চাইবে না বা বাধা সৃষ্টি কববে।

গৌবীতন্ত্র অনুযাযী বিদ্বেষণেব বীজমন্ত্র সহ সংস্কৃত মন্ত্র হল—'ওঁ নমো নাবাযণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষ কুরু কুরু স্বাহা।" এই মন্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী জপ কবে তাবপব অন্যান্য মন্ত্র আবৃত্তি বা পাঠ কবতে হয।

বাণমারা পদ্ধতি :

বিদ্বেষণ-এ বাণমাবা পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। গুণিনগণ সাধাবণতঃ এই পদ্ধতিব প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট ক্রিয়া কৌশলেব প্রযোজন।

প্রথম পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটিব গৌবীতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতিব সঙ্গে কিছু মিল আছে। তবে মন্ত্র আলাদা।

কাকেব পালক ও পেঁচাব পালক নিযে অদেব আগা (অগ্রভাগ) দুটি কালো সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ কবতে হবে। এবপব এই দুটি পালক, কৃষ্ণ সবিষা ও তিল সহ সাতদিন এক শত আটবাব মন্ত্র পড়ে জলে তর্পণ কবতে হবে এবং বিদ্বেষণ মন্ত্র জপ কবতে হবে। সাতদিন পবে যে দুজনেব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদেব নাম মড়াব মাথাব খুলিব উপর সিঁদুব দিযে লিখে জবাফুল দিয়ে সাজিযে একুশবাব মন্ত্র জপ কবে সেগুলি মাটিব মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এবপব মড়াব মাথা যেখানে পোঁতা হযেছে সেখানকাব মাটি নিয়ে দুটি পুতুল তৈবী কবতে হবে এবং বাঘ ও সিংহেব লোম দিযে তাদেব ঢেকে দিতে হবে। এবপব দুটি সুঁচ নিযে তাদেব মস্তকে পুঁতে দিতে হবে। এখন হোমেব অগ্নি প্রজ্বলিত কবে মালতী ফুল দিযে আহুতি দিতে হবে এবং শেষে ঐ পুতুল দুটি আগুনে নিক্ষেপ কবতে হবে। এইরূপ কবলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়েব মধ্যে চিব বিদ্বেষ ঘটানো সম্ভব।

বিদ্বেষণেব এই প্রথম পদ্ধতিটি অতিশয জটিল, সমযসাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া এই পদ্ধতিব মধ্যে কিছুটা অপ্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ থাকায গুণিনগণ এই পদ্ধতিটি প্রায়শই এড়িয়ে চলেন। বিশেষ কবে বাঘ ও সিংহেব লোম সংগ্রহ কবা কষ্টসাধ্য ব্যাপাব। আব মডাব মাথা নিযে ক্রিয়াকলাপ চালালে আশেপাশেব মানুষেব মনে বিরূপ প্রতিক্রিযা ঘটতে পাবে। তাই এই পদ্ধতিটি কোন নির্জন স্থানে অতি সংগোপনে সংঘটিত কবতে হয।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ। যে দুজন ব্যক্তিব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদেব পায়েব ধুলি কিংবা তাবা যেস্থান দিয়ে হেঁটে যায় সেই স্থানেব ধুলি বা মাটি সংগ্রহ কবতে হবে। এবপব ঐ মাটিব সঙ্গে বিড়ালেব বিষ্ঠা, ইঁদুবেব বিষ্ঠা, কাকেব বিষ্ঠা, শকুনেব বিষ্ঠা মিশিয়ে দুটি পুতুল তৈবী কবতে হবে। ঐ পুতুল দুটিকে তিল জল দিয়ে স্নান কবিযে কপালে সিঁদুবেব ফোঁটা, গলায় নীল অপবাজিতাব মালা পবাতে হবে তাবপব একশত আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র পাঠকবে নীল বস্ত্রখণ্ড দিয়ে আবৃত কবতে হবে। এবপব মালতী পুষ্পেব দ্বাবা হোম করতে হবে এবং পুতুল দুটিকে কোন গোপন স্থানে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঐখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে হবে। যতদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো হবে ততদিন ঐ ব্যক্তিদ্বয়েব মধ্যে বিদ্বেষ থাকবে। এই পদ্ধতিতে ভাইযে ভাইয়ে, পিতা পুত্রে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে বিদ্বেষ ঘটানো হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি আবও সহজ।

যে ব্যক্তিদ্বয়েব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদেব ব্যবহৃত কোন দ্রব্য, ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ কবতে হবে। তাবপব সেগুলি কেটে, ছিঁড়ে বা অন্য কোন প্রকারে চূর্ণ কবতে হবে। এর সঙ্গে

সাপেব দাঁত, কালো বাদুড়েব হাড়, বেজিব লোম, শকুনিব পালক এবং চিতাভস্ম চূর্ণ অবস্থায় মিশিযে গঁদেব আঠাব সাহায্যে গুলি (গুটিকা) প্রস্তুত কবতে হবে। এই গুলি নিয়ে একশত আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র জপ কবে তিল সবিষা দিযে তর্পণ কবতে হবে। তাবপব উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বযেব নাম কবে মালতী পুষ্পেব হোম কবতে হবে এবং যজ্ঞ ডুমুবেব সমিধ দিযে ব্যক্তিদ্বযেব নাম কবে একশত আটবাব আহুতি দিতে হবে। এবপব ঐ গুলি নিযে ঐ ব্যক্তিদ্বয যেখানে বাস কবে, সেই বাসস্থানেব সীমানাব মধ্যে গোপনে পুঁতে দিযে আসতে হবে। এতে এই ব্যক্তিদ্বযেব মধ্যে চিব বিদ্বেষ ঘটবে।

চতুর্থ পদ্ধতি ; বেজিব লোম, কৃষ্ণ সর্পেব খোলস, কুকুবেব লোম, কালো বিড়ালেব লোম এবং শকুনিব পালক একত্র কবে বৌদ্রে শুকিযে কিংবা অন্য কোন উপাযে গুঁড়ো কবে ধুনোব আঁটাব সঙ্গে মিশিযে ধূপ প্রস্তুত কবতে হবে। এবপব যে ব্যক্তিদ্বযেব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদেব নাম কবে দুটি গোববেব পুতুল তৈবী কবে অপবাজিতা ফুল দিযে পূজা কবতে হবে এবং গোচোনা দিযে স্নান কবাতে হবে। এবপব একশত আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র জপ কবে সবিষা বাণ মাবতে হবে এবং ঐ ধূপ জ্বালিযে দিতে হবে। এতে ঐ ব্যক্তিদ্বযেব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটবে।

বিদ্বেষণেব বাণমাবা পদ্ধতি খুবই ক্রিযাশীল। গুণিনগণেব মতে এই পদ্ধতি সঠিকভাবে নিষ্ঠা সহকাবে পালন কবতে পাবলে ক্রিযা ঘটতে বাধ্য। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কিছু কিছু গুণিন পয়সাব জন্যে মানুষেব অনিষ্টকব এই মন্ত্রেব প্রযোগ ঘটিযে থাকেন। এই সকল গুপ্তবিদ্যা যদিও লোকসংস্কৃতিব অঙ্গ তবুও বলা যায যে সংস্কৃতিচর্চা মানুষেব অনিষ্ট কবে তাকে অপসংস্কৃতি বললে অযথার্থ হয না। মানুষেব প্রবৃত্তি পূবণেব জন্য গুণিনবা যদি সাহায্য না কবতে, তাহলে মন্ত্রতন্ত্র মানুষেব যথার্থ কল্যাণ কাজে নিযোজিত হত।

বিদ্বেষণ (২) :

বশীকরণমন্ত্রে যেমন তিলক ব্যবহাব কবাব পদ্ধতি আছে তেমনি বিদ্বেষণ ক্রিযায তিলক ব্যবহাব প্রক্রিয়া আছে। তবে পূর্বেই বলা হযেছে এই পদ্ধতিতে খুব সতর্কতাব সঙ্গে অগ্রসব হতে হয। কাবণ যে ব্যক্তিকে তিলক ধাবণ কবাতে হবে, তিনি পূর্বে জেনে ফেললে সব ভণ্ডুল হযে যাবাব সম্ভাবনা। কাবণ বিদ্বেষণ বিদ্যা গুপ্তভাবে প্রয়োগ কবতে হয।

বিদ্বেষণ প্রক্রিয়াব তিলক ধাবণ কবাব পদ্ধতিতে যেমন মন্ত্র ব্যবহাব কবতে হয, তেমনি দ্রব্যগুণেব ব্যবহাব কবতে হয়। এখানে যে সকল দ্রব্যগুণেব ব্যবহাব কবা হয় সেগুলি সহজলভ্য নয় এবং প্রস্তুতিও গোপনে সম্পন্ন করতে হয়। কাবণ সাধারণ মানুষ এগুলিকে খুব ভাল চক্ষে দেখে না।

প্রথম পদ্ধতি : সাপেব দাঁত সংগ্রহ করে তাকে দীর্ঘদিন রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে সেঁকে এবং শেষে গরম জলে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোটাতে হবে। গুণিনরা বলেন এতে যদি ঐ দাঁতের মধ্যে কোন বিষ থাকে তা নষ্ট হয়ে যাবে অথবা ওর বিষক্রিয়াকারক ধর্ম বিনষ্ট হবে। এইবাব ঐ দাঁত, ময়ূরের বিষ্ঠা, শকুনির বিষ্ঠা, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, কালো বিড়ালের হাড় একত্রে পেষণ করে তার সঙ্গে সেই জাতীয় কোন পদার্থ মিশিয়ে যাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদের কপালে তিলক প্রদান কবতে হবে। তবে তিলক প্রদানেব পূর্বে তা বিদ্বেষণ-মন্ত্র দ্বারা একুশবাব, কিংবা একান্নবার অভিমন্ত্রিত কবে নিতে হবে এবং অভিনয়ের দ্বারা কিংবা চালাকির সাহায্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কপালে লেপন করতে হবে। তবে একটা মনে রাখতে হবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পূর্বে যদি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় তাহলে এর ক্রিয়া নিষ্ফল হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: সিংহের দাঁত, হাতীর দাঁত, ঘোড়ার দাঁত ও শৃগালের দাঁত চূর্ণ করে একত্র মিশ্রণ করে তাতে কলকে ফুলের ফলের শাঁস চূর্ণ ধুতুরা ফলের বীজ চূর্ণ, হাতীশুঁড়গাছের পাতা ও শুঁড় চূর্ণ রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশ্রিত করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। তারপর একশত আটবার বিদ্বেষণ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এইবার কৃত্তিকা নক্ষত্রে তা যে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষণ ঘটাতে হবে তাদের কপালে তিলক প্রদান করতে হবে। এও পূর্ব পদ্ধতির মত অজ্ঞান্তে দিতে হবে। এইবার সজারুর কাঁটা সংগ্রহ করে তা একুশবার বিদ্বেষণ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের বাসগৃহের সীমানার মধ্যে গোপনে পুঁতে দিয়ে আসতে হবে। এইভাবে করলে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যহ কলহ ও বিদ্বেষ ঘটবে।

তৃতীয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতিটি অতি জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ এবং সাবধানে প্রয়োগ করতে হয়। শ্মশানের মাটি দিয়ে একটি দেবীমূর্তি নির্মাণ করতে হবে। তাকে কৃষ্ণবসন পরাতে হবে। দীর্ঘ একমাস কাল গভীর রাত্রে প্রত্যহ অপরাজিতা ও রক্তকরবী ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে এবং প্রত্যহ দশ সহস্রবার বিদ্বেষণের বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। তারপর নিজের অঙ্গুলি কেটে কিংবা সূঁচ ফুটিয়ে পাঁচ ফোটা রক্ত একটি পাত্রে জমা করতে হবে। মাসের শেষে ঐ জমানো রক্তের সঙ্গে রক্তচন্দন মিশ্রিত করে যে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদের কপালে তিলক দিতে হবে।

গুণিনদের কাছে জানা যায় তাঁরা কখনও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেননি বা করেন না। তবে তাঁদের মতে এটি নাকি উত্তম পদ্ধতি এবং ফল হতে বাধ্য। তবে এই পদ্ধতি অনুযায়ী একমাস ধরে সঠিক নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য।

চতুর্থ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিটি আরো জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। কোনো গুণিন আজও পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে কিনা সন্দেহ।

ময়ূরের বিষ্ঠা দ্বারা একটি মূর্তি নির্মাণ করতে হবে। এরপর মড়ার মাথা চূর্ণ, মহিষের শিং চূর্ণ, বেজির হাড় চূর্ণ গোমূত্রের সঙ্গে মিশ্রিত করে ঐ মূর্তিকে স্নান করাতে হবে। তারপর একচল্লিশদিন ধরে প্রতিদিন গভীর রাতে নগ্ন হয়ে এক লক্ষবার বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। একচল্লিশ দিন পরে মূর্তিটি চূর্ণ করে অন্যান্য চূর্ণ ও গোমূত্রসহ লেই প্রস্তুত করতে হবে। তবে দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য মৃগনাভি কিংবা চন্দন ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর ঐ লেই নিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের কপালে তিলক প্রদান করলে তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য বিদ্বেষ ঘটবে।

এখন বিদ্বেষণের বাণমারা মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

বিদ্বেষণের বাণ মারার মন্ত্র

অষ্ট দেবদেবীর কাছ থেকে নিলাম অষ্টবজ্র
তার সাথে মিশালাম তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর শক্তি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের যত শক্তি করলাম জড়
সব শক্তি এক করে বাণ দিলাম ছুঁড়ে
গুরুর আজ্ঞায় বাণে মন্ত্র দিলাম পুরে।
চলে যা বান অমুক অমুকের শরীরে
বিষের জ্বালা, আগুনের জ্বালা, বিদ্বেষের জ্বালা
জ্বলুক জ্বলুক জ্বলুক
মেঘ এসে জল ঢাললেও না নিভুক।

কার আজ্ঞে—
বড় গুরুব আজ্ঞে।
দেবী চামুণ্ডার আজ্ঞে।

বাণ মারার এই বাংলা মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় পদ্ধতির বিবরণের সঙ্গে মন্ত্রের কোন সঙ্গতি নেই। প্রথম পদ্ধতিতে হোম করতে হয় এবং মালতী ফুলের আহুতি দিতে হয়। এছাড়া মড়ার মাথার খুলির উপর সিঁদুর দিয়ে একুশ বার জপ করতে হয়। এই সকল কার্যকলাপের সঙ্গে উপরোক্ত বাংলামন্ত্রটি একেবারে অসঙ্গত বলে মনে হয়। মনে হয় বিদ্বেষণের যে সমস্ত পদ্ধতির কথা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে সংস্কৃত বীজমন্ত্র যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। সম্ভবতঃ গুণিনগণ সংস্কৃত মন্ত্র বেশি ব্যবহার করেন। মনে হয় বাংলা মন্ত্রগুলি প্রাচীন নয়, অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। বিদ্বেষণের যে মন্ত্র অথর্ববেদ কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ, তন্ত্র গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় সংস্কৃত মন্ত্রগুলি সেই ধারা অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। কিন্তু বংলা মন্ত্র পরবর্তীকালের ওঝা-গুণিনদের সংযোজন। ভাষার মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ নেই। বাংলা অন্যান্য মন্ত্রের যা tradition সেই অনুযায়ী পৌরানিক ঘটনা বা কাহিনীর ছায়াপাত আছে। ভাষাও যেমন প্রাচীন নয়, তেমনি সরল সহজ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভাষার তথা মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় জাগতে পারে।

বিদ্বেষণের বাণমারা পর্যায়ের আরও বহু বাংলামন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বিভিন্ন ধরনের বাণ মারার মন্ত্র আছে—তাদের প্রত্যেকের চেহারা প্রায় এক কেবল প্রসঙ্গ অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন হয়। বাণমারা মন্ত্রের অধিকাংশই মানুষের অনিষ্টসাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উদ্দেশ্য মোটামুটি এক বলে মন্ত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে।

বিদ্বেষণের তিলক ধারনের মন্ত্র :

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, বিদ্বেষণের তিলক ধারণ পর্যায়ের মন্ত্র খুব বেশি পাওয়া যায়নি। মনে হয় এই পর্যায়ের বাংলা মন্ত্রের ব্যবহার খুব কম। ওঝা গুণিনগণ সাধারণতঃ দ্রব্যগুণ এবং সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা বীজমন্ত্রের বেশি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া পদ্ধতিতে দেখা যায় বীজমন্ত্রের ব্যবহারের কথা বেশি করে বলা হয়েছে। কোন পদ্ধতিতে দশ সহস্রবার আবার কোন পদ্ধতিতে এক লক্ষ বার বীজমন্ত্র জপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দশ হাজার কিংবা এক লক্ষ বার বাংলামন্ত্রপাঠ করা কারও পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। এমনকি বীজমন্ত্র ছাড়া সংস্কৃত অন্যান্য মন্ত্র এই পর্যায়ে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না।

বিদ্বেষণ মন্ত্রের মধ্যে 'ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষ কুরু কুরু স্বাহা।" মন্ত্রটি যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনি আবার 'হুং হুং স্বাহা হ্রীং' কিংবা 'ঐং হ্রীং হ্রীং হং যং বং লং স্বাহা' মন্ত্রগুলিও বীজমন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি যেমন বাণ মারার ক্ষেত্রে, তেমনি তিলক দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। শুধু প্রকরণকে আলাদাভাবে বলতে হয়।

পূর্বে বশীকরণ পর্যায়ে এবং অন্যান্য পর্যায়ে তিলক মন্ত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্বেষণের জন্য সেইরূপ একটি বাংলামন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এটিকে ঠিক বিদ্বেষণের মন্ত্র বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। এখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে, ভাষা সহজ সরল। আদেশ কাড়া, গুরুর দোহাই, দেবদেবীর দোহাই প্রভৃতি সবই আছে।

বিদ্বেষণের তিলক মন্ত্র

বালি আর সুগ্রীবে বিভেদ করতে রাম মারলেন তীর
সপ্ততাল ভেদ করে গেল সমুদ্র তীর।

বালি মবল, সুগ্রীব বাজা হল রাঁঢ় হল তারা
মনষ্কাম সিদ্ধ হল রাম সীতা হারা।
গুরুব আজ্ঞায় তিলক দিলাম কপালে
মনের বিষ মুখে গেল, মুখের বিষ মনে গেল।
স্বর্গের বিষ গেল পাতালে।
কার আজ্ঞে——
গুরুর গুরু মহাগুরুর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
দেবী চামুণ্ডার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে——
রাম লক্ষ্মণের আজ্ঞে।

এখানে যে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে তা বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। রামায়ণের কাহিনী থেকে জানা যায় রামচন্দ্র সুগ্রীব আর বালির মধ্যে কেবল বিদ্বেষ ঘটানটি, তিনি বালিকে বধ করেছিলেন। সুতরাং এটি বিদ্বেষ মন্ত্র কি মারণ মন্ত্র তা সঠিক বোঝা যায় না।

যাই হোক, মানুষের মনে বিদ্বেষ ঘটাতে মানুষেরই কত না প্রয়াস। এই কাজকে যথাযথভাবে অনিষ্টকর কিংবা অমঙ্গলকর বলা যায়। আমাদের দেশের ওঝা গুণিন এই অহিতকর কাজে সাহায্য করছে ভাবলে চমকে উঠতে হয়। মানুষের অমঙ্গল ঘটানোর জন্য এত আয়োজন! এক মাস ধরে কিংবা একচল্লিশ দিন ধরে কি দুঃসাধ্য কষ্টকর কাজই না করতে হয় মন্ত্রচর্চাকারীদের। এর অর্ধেকের অর্ধেক কষ্ট যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য করার চেষ্টা হত, তাহলে জগতে মানুষের চেয়ে সুখী জীব বোধ হয় আর কেউ থাকত না। চিন্তায় আর বুদ্ধিতে যেমন মানুষ জগতের মধ্যে উন্নততর কিংবা উন্নততম জীব, তেমনি হিংসা দ্বেষ, কলহ, ইষ্টনাশ প্রভৃতিতে মানুষ জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতর বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের গুণিনগণ যদি বিদ্বেষণ মন্ত্রকে ভালবাসার মন্ত্রে পরিবর্তিত করতে পারতেন, তাহলে দেশটা সোনার দেশ হয়ে যেত।

উচাটন (১) :

খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা অবগত আছি যে পাকিস্থান প্রভৃতি দেশ বিভিন্ন প্রকারে আমাদের দেশেব আভ্যন্তরীণ শান্তি, স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে চলেছে আমাদের দেশকে অস্থির, উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। এটা একটা কৌশল। শত্রুকে যদি ঠিকমত জব্দ করতে না পারা যায়, তাহলে অন্তত তাকে অস্থির করে তোল কিংবা বিপন্ন করে দাও। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা যেমন কূটনৈতিক কৌশল, মানুষের জীবনেও তেমনি দুষ্টবুদ্ধি। এইভবে অস্থির, উৎকণ্ঠিত কিংবা ব্যাকুল কিংবা বিপন্ন করে তোলাকে একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সেই শব্দটি হল 'উচাটন'। শব্দটি সংস্কৃত 'উচ্চাটন' থেকে এসেছে। চলিত ভাষায় কিংবা কথ্য ভাযায় বলা যায় 'আনচান'।

'উচাটন' শব্দটি বৈষ্ণবপদাবলীতে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনে তার অদর্শনে রাধার মন উচাটন হয়ে ওঠে। গৃহস্থালীর কাজ, বন্ধন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই উচাটনের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব কিছু আছে, কিন্তু শত্রুকে যখন উচাটন করে তোলা যায় তখন তার মধ্যে উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শত্রুকে ব্যাকুল, অস্থির কিংবা উৎকণ্ঠিত করে তুলতে পারলে একপ্রকার বিজাতীয় তৃপ্তি লাভ করা যায়। শত্রু তো দূরের কথা, যে মানুষটাকে আমরা পছন্দ করিনা, সে যদি কোনপ্রকারে বিব্রত কিংবা বিপন্ন হয় আমরা

তা দেখে একপ্রকার তৃপ্তি অনুভব করি। এটা মানুষ নামক উন্নত জীবের এক মানসিক ধর্ম। মানব চরিত্রের এই গূঢ় রহস্যের পথ ধরে শত্রুকে অস্থির করে তোলা, ব্যাকুল কিংবা উৎকণ্ঠিত করে তোলা, সব শেষে বিপন্ন করে তোলার জন্যে অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা এই ক্রিয়া সমাধা করার উপায় ওঝা গুণিনগণ আবিষ্কার করেছেন— এই উপায়কে বলা হয় 'উচাটন' বা 'উচ্চাটন'।

অথর্ববেদে এই উচাটন কর্ম সম্বন্ধে বিধি আছে। প্রাচীনকালে এই উচাটন বিদ্যার বহুল ব্যবহার ছিল। রাজারা প্রতিবেশী রাজাকে কিংবা শত্রু রাজাকে এই বিদ্যার সাহায্যে অস্থির করে তুলতেন। রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে রাজ্যকে বিব্রত করে তুলতেন। যাতে রাজ্যকে জয় করে নেওয়া সহজ হয়। পরবর্তীকালে সমাজে এই বিদ্যারও প্রয়োগ হতে থাকে। বর্তমানকালে এই বিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। একশ্রেণীর মন্ত্র ব্যবসায়ী গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী গুণিন অর্থের লোভে মানুষের অমঙ্গল সাধনের জন্য 'উচাটন' নামক আভিচারিক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

অন্যান্য গুপ্তবিদ্যার মত 'উচাটন' ও একপ্রকার গুপ্তবিদ্যা। গুপ্তভাবে এই বিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগ হয়ে থাকে। গ্রামে গঞ্জে মন্ত্রচর্চার যেসব গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে, সেখানেও উচাটন বিদ্যার চর্চা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু কিছু স্থানে কিছু গুণিন এই বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। তবে বশীকরণ, সম্মোহন কিংবা বিদ্বেষণ প্রভৃতির মত উচাটনের ব্যাপক প্রয়োগ নেই। তবে কিছু কিছু প্রেত-সিদ্ধ তান্ত্রিক এই ক্রিয়া করে থাকেন।

উচাটন-বিদ্যাতে সংস্কৃত মন্ত্র, বাংলা মন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি করা হয়। এছাড়া নানাপ্রকার আভিচারিক কর্মের সাথে সাথে বিভিন্ন দ্রব্যেরও ব্যবহার হয়। সিদ্ধতন্ত্রে কিংবা গৌরীতন্ত্রে উচাটন কর্মের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির বিবরণ আছে। এই বিদ্যার সাহায্যে মানুষের সঙ্গে এবং পশুর সঙ্গে উচাটন ঘটানো যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে দেখা যায় সেখানে সিদ্ধতন্ত্র কিংবা গৌরীতন্ত্র অনুযায়ী বীজমন্ত্রের ব্যবহার, বিভিন্ন দ্রব্যগুণের প্রয়োগ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ হোমের কথা আছে। তিথি ও নক্ষত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রকম ক্রিয়ার নির্দেশও পাওয়া যায়। কিছু কিছু বাংলা মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি যথার্থ উচ্চাটন মন্ত্র কিনা সঠিক বোঝা যায় না। যেমন মন্ত্রের সাহায্যে কারো বাড়ীতে ঝগড়া-কোঁদল ঢুকিয়ে দেওয়া হল কিংবা মন্ত্রের সাহায্যে কারো বাড়ীতে ইট, পাথর, জীবজন্তুর হাড়, মড়ার মাথা প্রভৃতি ফেলে দিয়ে তাকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপন্ন করে তোলা হল কিংবা কারোর বাড়ীতে নানারকম শব্দ, নাকি সুরে কান্না, বিভিন্ন ধরনের চীৎকার ঘটানো হল।

বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে ও সিদ্ধতন্ত্রে যে সমস্ত সাধনমন্ত্র এবং বীজমন্ত্র আছে, উচ্চাটন পদ্ধতির জন্য অনেক গুণিন সেগুলি ব্যবহার করে থাকেন। এতে ভয়, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি ঘটানো যায়। যেমন—

ওঁ হ্রীং ক্রীং মহাভয়ে ক্লীং স্বাহা।'
'ওঁ হ্রীং রক্ত কম্বল মহাদেবী মৃতকমুত্থাপয়
প্রতিমাঞ্চালায় পর্বতান কম্পয় নীলয় বিলসৎ
হুং হুং।"

"ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখী দেবী অমুক
মুচ্চাটয় অমুক মুচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা।"

এগুলি বীজমন্ত্র। বিভিন্ন তিথি নক্ষত্রযোগে এগুলি নির্দেশ অনুসারে জপ করতে হয়। কিংবা এই মন্ত্রপাঠে বিধিপূর্বক হোম করতে হয়। গুণিনদের কাছ থেকে মন্ত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে।

এখন উচাটন বিদ্যার পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তবে দেখা যায় সিদ্ধতন্ত্র কিংবা গৌরীতন্ত্রে যে পদ্ধতির বর্ণনা আছে, এই পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তাদের কিছু কিছু মিল আছে। মনে হয় এই সব প্রাচীন গ্রন্থ থেকে পদ্ধতিগুলি প্রথমে সংগৃহীত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেগুলির কিছু কিছু পরিবর্দ্ধন পরিমার্জন করা হয়েছে অথবা কিছু কিছু নূতন বিষয় তাদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি : শনিবার কিংবা মঙ্গলবার রাত্রে (অমাবস্যা হলে সব চেয়ে ভালো হয়) শ্মশান থেকে চিতাভস্ম সংগ্রহ করে তা কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ের মধ্যে রেখে কৃষ্ণবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ সূতা দ্বারা বাঁধতে হবে। এরপর "ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখী ..." মন্ত্র দ্বারা একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তারপর পঞ্চমুখী জবাফুলের সাহায্যে শ্মশানকালীর পূজা করতে হবে। এরপর গভীর রাত্রিতে নির্জনে গুপ্তভাবে যে ব্যক্তির উচ্চাটন ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির গৃহের সীমানার মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। তাহলে এক সপ্তাহ কিংবা নয়দিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হবে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে কাকতুণ্ডি মন্ত্রে 'অমুক মুচ্চাটয়' শব্দ আছে। এখানে 'অমুক' স্থলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি কিংবা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে জাগ্রত শ্মশান থেকে লুকিয়ে মৃতদেহের (পুরুষ) নখ, চুল, পরিহিত বস্ত্রের টুকরা, ফুল, যে খাটে করে মৃতদেহ বহন করা হয়েছে তার একটি টুকরা নিয়ে একটি মাটির কোণা ঘটে ভরে দিতে হবে। এরপর গোবর দিয়ে একটি পুতুল নির্মাণ করে তাকে জবাফুল, অপরাজিতা, সিঁদুর ও অশ্বত্থ পাতা দিয়ে অর্চনা করতে হবে। এই ফুল, সিঁদুর মাখানো পাতা ও একটি লোহার পেরেক ঘটের মধ্যে দিতে হবে। এরপর তিন প্রহরে প্রতিবার শ্মশানে বসে একুশবার উচচাটন মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘটটি অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এরপর চতুর্থ প্রহরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহমধ্যে ঐ ঘটটি পুঁতে দিতে হবে। তাহলে তৃতীয় দিন থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাটন হবে। তবে ঐ ঘটটি তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে বিসর্জন করলে উচ্চাটন বন্ধ হয়ে যাবে।

তৃতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি অতিশয় জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া এটি খুব সাবধানে গোপনে করতে হবে। গুণিনদের মতে এটি জানাজানি হয়ে গেলে নিষ্ফলা হবে। আবার জানাজানি হয়ে গেলে আশেপাশের মানুষজনের কাছ থেকে বিরোধিতাও আসতে পারে।

নিমপাতার উপর কাকের পাখার পালকের কলম দিয়ে ঘোড়া ও মহিষের বিষ্ঠায় শত্রুর নাম উল্লেখ করে কাকতুণ্ডি মন্ত্রটি লিখতে হবে। এরপর দশ হাজার বার মন্ত্রটি জপ করতে হবে। তবে এই জপ একদিনে শেষ করতে না পারলে আরও সময় নেওয়া যেতে পারে। জপের শেষে শ্মশানের আগুন এনে ধুতুরার কাঠ দিয়ে সেই আগুন জ্বালাতে হবে। এরপর নিমগাছের ডালে বাঁধা কোন কাকের বাসা পেড়ে এনে ঐ আগুনে ফেলে দিতে হবে। মহাতেল, মরিচ, সরিষা এবং অন্যান্য কটুদ্রব্য দ্বারা কাকতুণ্ডি মন্ত্রে যথা নিয়মে হোম করতে হবে। হোমের আগে পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করতে হবে। এখন হোম থেকে ভস্ম নিয়ে একটি লৌহপাত্রে সংরক্ষিত করতে হবে। এরপর পূজার ফুল, নির্মাল্য ও ভস্মপূর্ণ লৌহপাত্র একটি রক্তবর্ণ কাপড়ে বেঁধে শত্রুর ঘরের আঙিনায় পুঁতে দিতে হবে এবং তিনদিন গভীর রাত্রে সেখানে একুশবার

করে উচ্চাটন মন্ত্র জপ করতে হবে। তিনদিন পর থেকে শত্রুর উচাটন শুরু হবে এতে শুধু শত্রু একাই নয়, তার বাড়ীর অন্যান্য লোকজন এমনকি গৃহপালিত পশুরও উচাটন হবে। সংসারে নানাপ্রকার ক্ষতি,কলহ, অশান্তি ও ঘটতে পারে।

চতুর্থ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গুণিনগণ 'ঢিলপড়া' বলে থাকে। শত্রুকে জব্দ করার জন্য কিংবা তাকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিব্রত করে তোলার জন্য এই পদ্ধতি খুবই উৎকৃষ্ট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এর বেশ চল আছে। তবে এই পদ্ধতির রকমফের আছে। এক এক গুণিন এক একরকম ভাবে ব্যবহার করেন। এতে শত্রুর বাড়ীতে সারারাত ছোট বড় নানাপ্রকার ঢিল, ইটের টুকরো, জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি পড়তে থাকে।

একটি মড়ার মাথাকে পরিষ্কার করে নির্জনে ঘরের এক কোণে মাটিতে গণ্ডী কেটে স্থাপন করতে হবে। তারপর তাতে ভাল করে সিঁদুর মাখাতে হবে। এরপর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে জবা ফুল, অপরাজিতা ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে এবং এক হাজার এক বার মন্ত্র জপ করতে হবে। এবার একটি চণ্ডালের হাড় নিয়ে তাকেও ঐভাবে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এখন চণ্ডালের হাড় দিয়ে মড়ার মাথাকে একশত আটবার প্রদক্ষিণ করতে হবে। তারপর কয়েকটি ছোট ছোট ঢিল মন্ত্রপূত করে আদেশ কাড়িয়ে নিতে হবে এবং গোপনে গভীর রাত্রে শত্রুর বাড়িতে নিক্ষেপ করতে হবে। তাহলে প্রতিদিন শত্রুর বাড়িতে নানাপ্রকার ঢিল, হাড় প্রভৃতি পড়ার উপদ্রব ঘটবে।

অনেক গুণিন অন্যপ্রকারে এই পদ্ধতি প্রযোগ করেন। কেউ পুতুল তৈরী করে মন্ত্রপূত করে তা শত্রুর বাড়ির মধ্যে কোন এক স্থানে লুকিয়ে রাখেন। যতক্ষণ পুতুলটি না সরানো হবে ততক্ষণ অর্থাৎ ততদিন প্রতি রাত্রে শত্রুর বাড়িতে ঢিল পড়ার উপদ্রব ঘটবে।

গুণিনদের কথায় শত্রুকে জব্দ, ভীত কিংবা বিব্রত করার এমন প্রকৃষ্ট উপায় খুব কম আছে। একটা মজার কথা এই যে শত্রুর কোন ক্ষতি হয় না। কারণ ঐ ঢিল কারো গায়ে মাথায় পড়ে না। শোনা যায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তার এক বিঘত দূরে ঢিল পড়ছে অথচ তার গায়ে লাগছে না। তবে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে যে ঐগুলি গুণিনদের কারসাজি। মন্ত্রের নাম করে তারা নাকি লোক দিয়ে লোকের বাড়িতে ঢিল ফেলায় অর্থাৎ সাজানো ঘটনা।

যাই হোক মানুষ কতরকমভাবে মানুষের অনিষ্ট, অমঙ্গল করে বেড়ায় এবং তার পোষকতা করে— বাংলার এক প্রাচীন লোকসংস্কৃতি 'উচাটন' তার নিদর্শন।

উচাটন (২) :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'উচাটন' নামধারী কোন বাংলা মন্ত্র সংগ্রহ করা যায়নি কিংবা বলা যায় পাওয়া যায়নি। তবে 'ঢিলপড়া'র মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এখন 'ঢিলপড়া'কে উচাটন বলে ধরা হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'উচাটন' মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে বলা যেতে পারে।

ঢিলপড়া শত্রুকে জব্দ করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্বে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখন বিশদভাবে বলা হচ্ছে। এই পদ্ধতি শুধু শত্রুকে জব্দ বা বিব্রত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, ক্ষতিকরার জন্য নয়। একটা মজার ব্যাপার এই যে— গৃহের সীমানার মধ্যে সর্বত্র ঢিল পড়ছে, অথচ কারো গায়ে লাগছে না। যেমন, কেউ উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, ঢিল তার চারপাশে পড়বে কিন্তু তার গায়ে পড়বে না। ব্যাপারটা অনেকটা জাদু খেলার মত ব্যাপার। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বিভিন্ন গুণিনদের মতামত থেকে যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে তা হল এই ঢিল পড়া ব্যাপারটা সাধারণতঃ ঘটে রাতে এবং বাড়ীতে একটা ঢিল পড়লেই সেই বাড়ীর লোকজন ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। সুতরাং চারপাশে ঢিল পড়ছে অথচ গায়ে লাগছে না এই ব্যাপারটা সঠিকভাবে যাচাই করা যায়নি।

মন্ত্রবলে ঢিল পড়ার ব্যাপার নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে। অনেকে বলেন এটা গুণিনদের কারসাজি। অনেক গুণিন পয়সার লোভে লোক দিয়ে ঢিল ফেলায়। শুধু ঢিল নয়, ইট, হাড়, মড়ার মাথা, গাছের ডালও পড়ে। যে বাড়ীতে পড়ে সে বাড়ীর লোক ভয়ে বার হয় না। সুতরাং মন্ত্রশক্তির সাহায্যে পড়ছে কি কোন লোক ফেলছে তা জানার অবকাশ থাকে না।

বিতর্ক যাই হোক, 'ঢিলপড়া' মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার এবং ওঝা গুণিনরাই তা ঘটিয়ে থাকেন। বাংলার লোকসমাজে এমন বিশ্বাস আজও প্রচলিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই ব্যাপারে যে বাংলা মন্ত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে তা এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মোটামুটি তিনরকমভাবে এই মন্ত্রের ব্যবহার ঘটিয়ে থাকেন গুণিনরা। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ব্যবহার হয়, পূজো আচ্চাও হয়। কোথাও কোথাও রীতিমত হোমযজ্ঞও করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যগুণেরও ব্যবহার হয়।

ঢিল পড়ার মন্ত্র :

প্রথম পদ্ধতি: মড়ার মাথাকে সিঁদুর মাখিয়ে বিভিন্ন উপচারে পূজা করতে হবে। এইবার মড়ার মাথার সামনে বিভিন্ন আকারের কয়েকটা ঢিল বা ইটের আধলা বা হাড় ইত্যাদি নিয়ে মন্ত্রপূত করতে হবে। তারপর ঐ মন্ত্রপূত ঢিল প্রতি রাত্রে একটা করে উদ্দিষ্ট বাড়ীতে নিক্ষেপ করতে হবে। তাহলে সারারাত ঐ বাড়ীতে ঢিল পড়বে।

ঢিল ঢিল ঢিল
ভূতে মারে ঢিল, দে দেওতায় ফেলে ঢিল।
রামচন্দ্র সাগর বাঁধে বানর বয় পাথর
কাঠ বিড়ালি মাটি বয়, মানবে করে হাঁচোড় প্যাঁচড়।
রাক্ষস খোক্কস মানুষ খায়, জন্তু খায়
হাড় হাবড়া যেখানে সেখানে গড়া গড়ি যায়।
গোভাগাড়ে গরুর হাড় গরুর মাথা কাক শকুনি খায়।
হাড়কুড়োনি ঝোলাবুড়ির বস্তা ভরে যায়।
যত রাজ্যের ঢিল পাথর ইঁট গরুর মাথা গরুর হাড়
ডালপালা পড়ুক অমুকার ঘরে।
শত্তুরটা জব্দ হয় আর যেন না বাড়ে।
দত্যি দানব বা বাতাস ঢিল বয়ে আনে।
ইট বয়ে আনে, ভূতে ফেলুক অমুকার ঘরে।
মড়ার মাথা, চণ্ডালের হাড়, ভেল্কি দেখাক।
কার আজ্ঞে
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে আর
দেবী চামুণ্ডার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—
বড় গুরুর আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র গোপনে নির্জন আওড়াতে হবে। যাতে শত্রু যেন জানতে না পারে। ঢিল, ইট, মড়ার মাথা, গরুর মাথা, গরুর হাড় ইত্যাদি প্রত্যেকটিকে একুশবার করে মন্ত্রপূত করতে হবে এবং সিঁদুর মাখানো মড়ার মাথা ছুঁইয়ে তারপর আদেশ কাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে কাঁকড়ার ঢিলে একটি পুতুল তৈরী করতে হবে। সেই পুতুলকে কালো কাপড় পরিয়ে আর লাল শালু চাদরের মত গায়ে বেড় দিয়ে দিতে হবে। কপালে সিঁদুরের টিপ দিতে হবে। তারপর অপরাজিতা, জবা, কলকে প্রভৃতি ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে। তারপর ঐ মূর্তির সামনে কিছু ইঁদুর মাটি জড় করে সেগুলি মন্ত্রপূত করতে হবে।

ইঁদুর মাটি ইঁদুর মাটি ঢিল চাবড়ার মাথা।
তোমারে আদর করি, শুন মোর কথা
হাতেতে নিলাম তুলে মুঠো মুঠো করে।
মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি মহাদেবের বরে॥
আবার হাতেতে নিলাম তুলে মুঠো মুঠো করে।
আবার মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি গুরুদেবের বরে।
আবার হাতেতে নিলাম তুলে চার আঙুলে করে।
পুনর্বার মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি চামুণ্ডার বরে॥
আমার এই ইঁদুরমাটি পড়া ছুঁড়ে দিলাম অমুকার ঘরে।
সেই মাটি ঢিল ইট পাথর হয়ে পড়ুক ঝরে॥
সেই মাটি মড়ার মাথা, গরুর মাথা হয়ে পড়ুক ঝরে।
শত্রুকে শায়েস্তা করি আমার মন্ত্রের জোরে।
কার আজ্ঞে
বিশ্বনাথ মহাদেবের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—
গুরুদেব বড় কৃপানাথের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
মা চামুণ্ডার আজ্ঞে।

মন্ত্রপূত ইঁদুর মাটি এক মুঠো করে প্রতিদিন রাত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উঠানে, ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে গোপনে। তাহলে ঢিল, ইট, হাড, মড়ার মাথা ইত্যাদি পড়তে থাকবে।

এই মন্ত্রে গুরু বড় কৃপানাথের নামে আজ্ঞা কাড়া হয়েছে। এই বড় কৃপানাথ কে সে পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবত কোন সিদ্ধগুরু হয়ে থাকবেন। তবে যে গুণিনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তিনি বা তাঁর গুরু এঁকে দীর্ঘকাল ধরে বড় গুরু হিসাবে মেনে আসছেন।

তৃতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতেও মূর্তি বানাতে হয়। গোবরের মূর্তি তাতে সিঁদুরের টিপ। আকন্দ, অপরাজিতা, কলকে ফুল, ঘেঁটু ফুল প্রভৃতি দিয়ে পূজা করতে হয়। মড়ার মাথার খুলিতে কারণবারি পূর্ণ করে মূর্তিকে উৎসর্গ করতে হয়। এরপর একটি মুরগি বলি দিয়ে তার রক্ত আর মর্তমান কলা মূর্তিকে উপচার হিসাবে নিবেদন করা হয়। এরপর গুণিন নিজে ঐ কলা আর রক্ত খেয়ে নেয়। এরপর একশত আটবার মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এইবার ঐ মূর্তিকে গোপনে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহের সীমানার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। মূর্তিটি যতক্ষণ যতদিন গৃহে বা গৃহের সীমানার মধ্যে থাকবে ততদিন গভীর রাত্রে ঐ গৃহে ঢিল হাড় মড়ার মাথা বৃষ্টি হবে। মূর্তি সরিয়ে নিলে তা থেমে যাবে। তবে এই পদ্ধতিতে কেবল 'ঢিল পড়া' ঘটানো যায় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যভাবেও অনিষ্টকরা সম্ভব হয়। কিন্তু মন্ত্র আলাদা।

মন্ত্র

আয় আয় আয়
শতেক বাহিনী যত হাজার বাহিনী সবাই চলে আয়।
যে যেখানে আছে ভূত পিশেচ, যক্ষি দানো সবাই চলে আয়।
ঢিল বৃষ্টি কব দোহাই বাবা ভূতনাথেব আজ্ঞে।
মাইবি দোহাই মা চামুণ্ডাব আজ্ঞে।
তেত্রিশ কোটি দেবতাব দোহাই
পৃথিবী তোলপাড় কব। অমুকাব বাড়ী লণ্ডভণ্ড কবে দে
আমাব শত্রুবে জব্দ কব।
দোহাই রামচন্দ্রেব মত বালি বধ কব। এক বাণে সপ্ত
তাল ভেদ করে তীব চলে যাক স্বর্গ, মর্ত্য।
পাতালে থাকে মহীবাবণ, কোথায় পালাবি তুই।
মা চামুণ্ডার বরে তোমাবে বধিব আমি।
জয় মা কাঁউরেব কামিক্ষ্যেব আজ্ঞে
জয় মা চামুণ্ডার আজ্ঞে
জয় বাবা ভূতনাথেব আজ্ঞে॥

মন্ত্রটি যখন সংগৃহীত হয়, তখন ভুলে ভবা অশুদ্ধ এবং অসংলগ্ন ছিল। কিছুটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। তবুও ক্রটিমুক্ত হয়নি। মন্ত্রটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় মন্ত্রটি সত্যিকারের কিসেব মন্ত্র তা নির্ণয় করা খুবই কষ্টকব। কেবল "ঢিল বৃষ্টিকর" শব্দ কয়টির জন্য একে 'ঢিলপড়া'ব মন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গেব মধ্যে বালিবধ এবং মহীরাবণ বধ করবাব আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলি কিসের ইঙ্গিত সঠিক বোঝা যায় না। তাছাড়া বক্তব্য বিষয় এমনই এলোমেলো যে এটিকে ঠিক মন্ত্র বলে ভাবা যায় না। গঠনটাও আলাদা, দোহাই, মাইরি প্রভৃতি শব্দগুলি গ্রামীণ প্রভাবের প্রমাণ দেয়।

মন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিম জাতি তথা ভারতের আদিবাসীদের ধর্মীয় আচারের ছাপ সুস্পষ্ট। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিবা দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা 'মানসিক' পূরণেব জন্য মুর্গী বলি দেয়। গোবরেব মূর্তি নির্মাণ কবে পূজা কবাব মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব প্রাচীন লোক সংস্কৃতিব ছাপ আছে। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কালীপূজার রাত্রে গোবরের পুতুল তৈরী করে তাকে ছেঁড়া জুতা ও ভাঙা কুলোর বাতাস দিয়ে অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়। এখানে যে কাজের জন্য গোবরের মূর্তি, তাকে অলক্ষ্মী অনিষ্টকারী বা শয়তান বলে ভাবা যায়।

মন্ত্রের সাহায্যে ঢিল বৃষ্টি করে শত্রুকে জব্দ করার পদ্ধতি বহুকাল ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় চলে আসছে। গুণিনদের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে কমপক্ষে তিন/চারশ বছরের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। আরও কত আগে থেকে চলছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

'ঢিলপড়া' পদ্ধতিটিকে যথার্থভাবে অনিষ্টকর পদ্ধতি বলা যায় না। কারণ এতে শত্রুকে ভয় দেখানো যায়, বিব্রত করা যায় কিংবা জব্দ করা যায়। তবে এতে কারোব শারীবিক কিংবা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বলা যায় শত্রুকে জব্দ কবার এটি কৌতুককব পদ্ধতি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির বিষয়।

সিদ্ধতন্ত্রে 'হরগৌরী সংবাদে' 'ইন্দ্রজালাদি নানা কৌতুক'-এর মধ্যে 'উচাটন' পদ্ধতিটি আছে। সেক্ষেত্রে মনে হয় মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কৌতুক করার জন্য এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবন। দক্ষিণ চব্বিশ

পরগনার 'টিলমারা' পদ্ধতির মধ্যে এর সার্থক রূপায়ণ। মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ওঝা-গুণিনগণ কৌতুকের অবতারণা করে মানুষের আনন্দ বিধানের চেষ্টা হযত প্রাথমিক পর্যায়ে করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তা বিকৃত হতে হতে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনি করে মনে হয় অনেক মঙ্গলকারী মন্ত্র মানুষের অনিষ্টকর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মারণ (১) :

'মারণ' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল 'বধ' বা 'হনন'। কিন্তু ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিক গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীদের কাছে 'মারণ' একটি term, বধের বা হননের উদ্দেশ্যে মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যে তন্ত্রোক্ত অভিচার কর্মাদি করা হয় তাকে 'মারণ' বলে।

মারণ ব্যাপারটি মৃত্যুবিষয়ক। ওঝা-গুণিন, তান্ত্রিক গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীগণ অনেক চিন্তাভাবনা করে কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে অলক্ষ্যে থেকে কোন মানুষের মৃত্যু ঘটানো যাবে। কেউ এর কোন হদিশ পাবে না—কিভাবে মানুষটার মৃত্যু হলো। কোন প্রমাণ থাকবে না, কোন ঝামেলায়ও পড়তে হবে না। শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে, নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করতে, ঈর্ষা-হিংসার জ্বালা মেটাতে এর থেকে ভাল উপায় আর নেই।

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অনিষ্টকর কর্মের মূল প্রক্রিয়া হলো বাণ-মারা। হেন অনিষ্টকর কর্ম নেই, ওঝা-গুণিনগণ 'বাণমারা'র দ্বারা যা করতে পারেন না। সুতরাং 'বাণমারা'র দ্বারা 'মারণ' ব্যাপারটি ঘটানো যায় আর অধিকাংশ গুণিন তাই‌ই করে থাকেন।

অনেক প্রকারের বাণ মারার মন্ত্র আছে। তবে অধিকাংশ মন্ত্রই অনিষ্টকর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়— যার শেষফল মৃত্যু। যেমন কোন একজনকে জ্বালা বাণ মারা হল। তার শরীরে নানাপ্রকার জ্বলুনি/বা জ্বালা শুরু হবে এবং জ্বলতে জ্বলতে শরীর শীর্ণ বা ক্ষীণ হয়ে নানাপ্রকার রোগের কবলে পড়বে এবং শেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিন্তু 'মারণ' ব্যাপারটির জন্য যে বাণ মারা হয় তাতে সরাসরি মৃত্যু ঘটবে। যেমন কোন একজনকে 'মারণ বাণ' মারা হল, তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল, কিংবা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হল এবং সে মারা পড়ল। সুতরাং বাণ মারার সাহায্যে 'মারণ' ঘটালে তা প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যু ঘটায়। অন্য বাণ মারাতে অপ্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর পথ সুগম করে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে 'মারণ' সংঘটিত হয়। প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ ধ্যান ও তপস্যাভঙ্গকারী অনিষ্টকারী রাক্ষস পিশাচদের বিনাশের জন্য মারণমন্ত্র ব্যবহার করতেন। অথর্ববেদের একাধিক সূক্তে এই বিষয়ক মন্ত্র আছে। গৌরীতন্ত্রে, সিদ্ধতন্ত্রে, মায়াতন্ত্রে এই মারণ বিষয়ক মন্ত্র আছে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গুণিনদের কাছ থেকে পাওয়া এইরকম একটি মারণ মন্ত্র হল।

"হ্রীং হুং হুং অমুকং মারয় মারয় স্বাহা

ওঁ শত্রুনাশকার্যো নমঃ। অমুকস্য শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ।

কতকগুলি আভিচারিক কর্মের পর এই মন্ত্রটি একশত আটবার আবৃত্তি বা জপ করতে হবে। তাহলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে। উপরোক্ত মন্ত্রে 'অমুকং' স্থলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম করতে হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর বাণ মারার মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অনিষ্টকর কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে সরাসরি মারণ বাণ খুব বেশি পাওয়া যায়নি। এগুলি গুণিনরা নিজেদের নিরাপত্তার কারণে হাতছাড়া করতে চান না। বলা বাহুল্য এগুলি বাংলা মন্ত্র। তবে কিছু কিছু সংস্কৃত মন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে।

মারণ মন্ত্রের সঙ্গে নানাবিধ দ্রব্য ব্যবহার করা হয় এবং তিনি নক্ষত্র অনুযায়ী এর ব্যবহার করা হয়। যেমন মঘা নক্ষত্রে বিষাক্ত সাপের অস্থির (মেরুদণ্ডের অস্থি) তিনটি গাঁট বা খণ্ড একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর বাড়ীতে (উঠানে কিংবা ঘরে) পুঁতে রেখে দিলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীর সকলের বিষক্রিয়ায় প্রাণহানি ঘটবে। কোন ডাক্তার ভাল করতে পারবে না। এছাড়া বিষাক্ত সাপের কাঁটা অর্থাৎ হাড় কিংবা সজারুর কাঁটা একুশবার মারণ-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর কোন অঙ্গে কায়দা করে ফুটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে শত্রুর শেষ পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটবে।

'মারণ' কার্যের জন্য বহু প্রকারের বাণ-মারা আছে। বাণ-মারা সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে এখন তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। বহু প্রকারের বাণ মারার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যেগুলি বেশি প্রচলিত সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

পূর্বে যদিও আলোচনা করা হয়েছে তবুও পুনরায় বলা হচ্ছে 'বাণ' শব্দের অর্থ যদিও তীর বা শর অর্থাৎ ধনু থেকে যে সূচীমুখ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। ওঝা গুণিনের ভাষায় বাণ হল তান্ত্রিক মারণ মন্ত্র। সোজা কথায় 'বাণ' হল একপ্রকার মন্ত্র যা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট ঘটায়, শারীরিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং প্রাণনাশ করে। এখন কতকগুলি 'বাণ' নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কাঁটা বাণ : একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় যার মাথায় চিরুনির মত লম্বা কাঁটা ফলক থাকে। এই লম্বা জিনিসটার দুই দিকে কাঁটা। এইরকম একটি কাঁটাফলক অথবা শঙ্কর মাছের লেজের গোড়ায় যে কাঁটা থাকে তা সংগ্রহ করতে হবে তবে দেখতে হবে এই কাঁটা যেন অক্ষত অবস্থায় থাকে। এইবার পঞ্চমুখী জবা সহ অন্যান্য উপচার দিয়ে সারারাত্রি ধরে দেবী চামুণ্ডার পূজা করতে হবে এবং এক লক্ষ বার চামুণ্ডা মন্ত্র জপ করতে হবে। চামুণ্ডা মন্ত্র হল—ওঁ ক্রীং হ্রীং আগচ্ছ আগচ্ছ চামুণ্ডে শ্রীং স্বাহা।" পূজার সময় কাঁটাটিকেও উপচারের কাছে রেখে দিতে হবে। এরপর যন্ত্র এঁকে তাতে কাঁটাটিকে রেখে একশত আটবার মারণমন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রতন্ত্রের ভাষায় 'যন্ত্র' শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। একটি চতুষ্কোণ, ষড়কোণ প্রভৃতি রেখা বা মণ্ডল আঁকতে হয় মাটির উপর খড়ি দিয়ে, বালির উপর কাঠি দিয়ে। অনেক সময় বেলে কাগজের উপর লাল কালি দিয়ে আঁকা হয়। এইবার তাতে ঘর কেটে নানাপ্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ও বীজমন্ত্র লেখা হয়। রেখামণ্ডলের চারদিকে পদ্মপাপড়ি আঁকা হয়। একে যন্ত্র বলা হয়। এখন এই মন্ত্রপূত কাঁটাটিকে নিয়ে যন্ত্রের উপর মানুষকে কাটার মত করে আঁচড় দিতে হবে। এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শরীরের অভ্যন্তরে অস্ত্রে কেটে যাওয়ার মত কেটে যাবে এবং মুখ দিয়ে গল গল করে রক্তবমি হবে। এইভাবে বারো দিনের মাথায় তার মৃত্যু ঘটবে। তবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচাতে চাইলে এগারো দিনের মাথায় কিংবা তারও আগে কাঁটাটিকে ভেঙে চুরমার করে পুড়িয়ে দিয়ে কাটান মন্ত্র অর্থাৎ কাটান বাণ মারলে রক্তবমি বন্ধ হয়ে আস্তে আস্তে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

কাঁটা বাণের মন্ত্র

সমুদ্রে জন্মিল মহামৎস
প্রলয়ের কালে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরে রেখেছিল।
ব্রহ্মার দয়াতে সে মৎস্যের দণ্ডে বিষ উপজিল।
সেই দণ্ড সংগ্রহ করি দিলাম মন্ত্র পড়ি।
গুরুর কৃপায় তাতে দিলাম শক্তি ভরি।

যা বাণ যা অমুকের অঙ্গে লাগ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সে যেখানে থাক।।
শরীর ভেদ করি অন্তরে সে বাণ যাক।
রামচন্দ্রের বাণ যেমন রাবণরাজার খাক।।
কুম্ভকর্ণ মহাবীর আইল সমরে।
রামের বাণেতে প্রাণ নাহি ধরে।
আর যত রাক্ষস ছিল লঙ্কায়।
রামের বাণেতে সবাই ধরাশায়ী হয়।
অমুকার মুখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে।
তেব রাত্রি পরে তাহার প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে।
কার আজ্ঞা
দেব পঞ্চাননের আজ্ঞা
কার আজ্ঞা
মা চামুণ্ডার আজ্ঞা
কার আজ্ঞা
শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা।।

কথায় বলে ধান ভানতে শিবের গীত। প্রথমে মৎস্যাবতারের কথা, তারপর কাঁটাবাণকে অমুকের (উদ্দিষ্ট ব্যক্তি) শরীরে বিদ্ধ হবার কথা। তারপর হঠাৎ রাম-রাক্ষস-কুম্ভকর্ণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ চলে এল। প্রায় সব বাংলামন্ত্রে এইরকম অসংলগ্নতা, অসঙ্গতি দেখা যায়। বিভিন্ন গুণিনের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি তাঁরা এর সদুত্তর দিতে পারেনি। তাঁদের কথায় হল গুরুর কাছ থেকে তাঁরা যা পেয়েছেন, তাই নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। সেখানে ভাষার দোষ হল, কি ব্যাকরণের দোষ হল কিংবা প্রসঙ্গ অসংলগ্ন হল—তা তাঁরা জানেন না। তাঁদের কাজ নিয়ে দরকার। তাঁরা যন্ত্র এঁকে মাছের কাঁটাতে এইভাবে মন্ত্রপূত করে কাজ পেয়েছেন। তবে এই বাণ মারার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তা হল, যে ব্যক্তিকে বাণ মারা হবে তার নাম ঠিকানা, গোত্র প্রভৃতি ঠিক ঠিক না হলে বাণ ফিরে আসবে এবং যে প্রয়োগ করেছে তার শরীরে বিদ্ধ হবে। এই ফেরৎ বাণকে আবার কোনমতে কাটান করা যায় না। সুতরাং যে গুণিন প্রয়োগ করবে তাকে খুব সাবধানে এটা করতে হবে।

সাধারণতঃ বাণমারাকে গুণিনরা এড়িয়ে চলেন। কারণ ঠিকমত প্রয়োগ করতে না পারলে প্রয়োগকারীর ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়ত, এতে কষ্ট প্রচুর এবং ব্যয় সাপেক্ষ, নির্জনে গোপনে এ সব কাজ করতে হয়, জনরোষের ভয় আছে। জনগণ এইসব অনিষ্টকর গুপ্ত কাজকে ভাল চোখে দেখে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল গুণিনরা এ কাজ করতে চান না, তার মূল কারণ হল, তাঁরা মানুষের প্রাণহানি চান না। কয়েকদিন আগে একজন গুণিনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, যে প্রাণ আমরা দিতে পারি না, সে প্রাণ নেওয়াটা পাপ, অন্যায়। ভগবাণ তাকে কখনো ভাল করে না। খুব সত্যি কথা। মানুষের অন্তরের কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনরা পয়সার লোভে অনেকে অনেক কাজ করেন। কিন্তু অনেক সময় বিবেক বাধা দেয়। কারণ গুণিন হলেও তাঁরাও তো মানুষ। এইরকম মনুষ্যত্বের যদি জাগরণ ঘটে, তাহলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কেন, পৃথিবীর বুক থেকে অনিষ্টকারী মন্ত্র দূর হয়ে যাবে।

মারণ (২) :

জ্বালাবাণ :

জ্বালা বাণ-এর উদ্দেশ্য হল শরীরে জ্বালা ধরানো। জ্বলতে জ্বলতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। মৃত্যু না হলেও মৃতপ্রায় হয়ে অথর্ব অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। জীবনের সব স্বাদ আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে জড় পদার্থের মত হয়ে যায়। এই অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। অনেকে জ্বালা-বাণকে মারণবাণ বলেন না। শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে কলুর বাড়ী থেকে এক ডাকে আড়াই পোয়া (বর্তমানে ৬২৫ গ্রাম) সরিষার তেল কিনতে হবে। সেই তেল কড়াইতে ফোটাতে হবে। আর এর সঙ্গে কোন জন্তুর চর্বি, বিষ ধুতুরার মূল, মহিষীর রক্ত, ভেরেণ্ডার আটা দিয়েও ফোটাতে হবে। এইবার একটি চতুষ্কোণ যন্ত্র আঁকতে হবে। প্রথমে একটি বর্গক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্রের ভিতরে আড়াআড়িভাবে আর একটি বর্গক্ষেত্র। প্রথম বর্গক্ষেত্রের কোণগুলিতে যথাক্রমে ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং চারটি বীজমন্ত্র লিখতে হবে। ভিতরের বর্গক্ষেত্রের কোণগুলিতে যথাক্রমে ক্লিং, হুং ফট, স্বাহা শব্দগুলি লিখতে হবে। বলাবাহুল্য যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে, অন্যথায় বালি কাগজে লালকালিতে আঁকতে হবে।

এইবার একটি জ্যান্ত সন্ন্যাসী কাঁকড়াকে পরিষ্কার করে ধুয়ে গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে যন্ত্রের মধ্যে বসাতে হবে। এখন উপরোক্ত তপ্ত তেল মিশ্রণটি একটি ঝিনুকে করে ফোঁটা ফোঁটা করে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার উপর ঢালতে হবে এবং এক শত আটবার মন্ত্র পাঠ করতে হবে। সন্ন্যাসী কাঁকড়াটি যত জ্বালা পেয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়বে, উদ্দিষ্ট শত্রু (যার নাম করে বাণ মারা হচ্ছে) সেই রকম জ্বালা অনুভব করবে। তার সারা শরীর জ্বলবে কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না কিংবা কোন ডাক্তার কোন রোগ-লক্ষণ খুঁজে পাবেন না। সন্ন্যাসী কাঁকড়াটি মারা গেলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরও মৃত্যু ঘটবে। তবে সন্ন্যাসী কাঁকড়া দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। সহজে এরা মরে না বলে গুণিনরা বলে থাকেন।

এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করার পূর্বে ধূমাবতী বা ছিন্নমস্তার (মহাশক্তির এক একটি রূপ) মূর্তি নির্মাণ করে অহোরাত্র নীল অপরাজিতা ফুলে পূজা করতে হবে ও কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বার সংশ্লিষ্ট বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। ধূমাবতী মন্ত্র হল—"ধূং ধূং স্বাহা।" কিংবা ছিন্নমস্তা মন্ত্র হল 'হুং হুং স্বাহা হ্রীং।'

জ্বালা-বাণের মন্ত্র

কড়াতে তৈল ফোটে টগবগ করে।
সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রাণ নড়াচড়া করে।
দেবীর বরেতে আমি নাম গোত্র স্মরি।
এর মধ্যে দিলাম আমি জ্বালা-বাণ ভরি॥
যা রে বাণ চলে যা অতি ত্বরা করি।
অমুকার শরীরে প্রবেশ কর ত্বরা করি।
রাম লক্ষ্মণ বাণ মারে সমুদ্রের তীরে।
সমুদ্রের শরীরে জ্বালা ধরায় ধীরে ধীরে।
সমুদ্র দেবতা আসি রামলক্ষ্মণ পাশে।
করজোড়ে মিনতি জানায় পেয়ে মহাত্রাসে॥
জ্বালা রে জ্বালা।

জ্বালাতে দেবতা টলে, রাম টলে, লক্ষ্মণ টলে।
রাবণ টলে পৃথিবী টলে॥
গুরুর কৃপায় আমার শত্রুর অঙ্গ টলে।
ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ—
তিন ফুয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতালের জীব টলে।
কার আজ্ঞে
মা ভবাণীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে—
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্যান্য মন্ত্রের মত একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রের মধ্যে অসংলগ্নতা বিদ্যমান। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া, পুরাণের কিংবা রামায়ণের কাহিনীর ছায়াপাত, ছন্দের অমিল, গঠনে শৈথিল্য—সবকিছুই বর্তমানে আছে। তাছাড়া সংগ্রহকালে মন্ত্রগুলিতে প্রচুর বানান ভুল এবং শব্দের অশুদ্ধি দোষ ছিল প্রয়োজনবোধে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে।

কোচা বাণ/কাটা বাণ : কোচা বাণ নামটি বড় অদ্ভুত। যে গুণিনের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁর কাছ থেকে 'কোচা' শব্দটির স্বপক্ষে কোন সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বাণটিতে পান কুচে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার একটি পদ্ধতি আছে। সেই জন্য একে 'কোচাবাণ' বলা হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী কেটে যায় বলে একে 'কাটাবাণ'ও বলা হয়। এই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোন গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে এমন হতে পারে, হয়ত এটির অন্য কোন নাম আছে কিন্তু এই গুণিন তা জানেন না। তিনি তাঁর মনোমত নাম বসিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমে মহাকালী মূর্তি নির্মাণ করে অমাবস্যায় মহাকালীমন্ত্রে চার প্রহর পূজা করতে হবে। যথাবিধি উপচার সাজিয়ে পূজা করাই উচিত। তবে পঞ্চমুখী রক্তজবা অবশ্যই প্রয়োজন। মহাকালীসাধন মন্ত্র হল—

"হুং হুং হুং স্বাহা ক্রীং কালি কালি মহাকালি স্বাহা।
ক্রীং মহাকালি স্বাহা। ক্রীং ক্রীং শ্রীং হ্রীং স্ফেং নমঃ।

[এখানে দেখা যাচ্ছে 'কালি' বাণান হ্রস্ব-ই। হয়ত সম্বোধনের জন্য 'কালী'র পরিবর্তে 'কালি' হয়েছে।] এই মন্ত্রগুলি বীজমন্ত্র। চার প্রহরের মধ্যে কমপক্ষে দশ হাজার বার জপ করতে হবে।

মহাকালী পূজার পরদিন কোন নদীতে প্রতিমাটি বিসর্জন দিতে হবে। এখন সেইদিন হাট/বাজার থেকে এক গোছা পান কিনতে হবে। সেই পান একশত আটবার 'কোচাবাণ'-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এরপর যে নদীতে মহাকালীমূর্তি বিসর্জন করা হয়েছে, সেই নদীর জলে প্রথমে তর্পণ করতে হবে। একটা কথা বলে রাখা দরকার যে ব্যক্তির সর্বনাশ করার জন্য বাণ মারা হচ্ছে—সেই ব্যক্তির নাম ঠিকানা ও গোত্র সঠিকভাবে প্রতিটি পানের উপর লিখতে হবে এবং এটি করতে হবে পানের গোছাটি অভিমন্ত্রিত করার পূর্বে। এইবার জলতর্পণের পর পানের গোছাটি নিয়ে আর একটি কাঁচি নিয়ে জলে একবার ডুব দিয়ে কাঁচি দিয়ে সমস্ত পান কেটে বা কুচে দিতে হবে। এরপর সেই পান নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে।

এইবকম কবার পাঁচ মিনিটেব মধ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যেখানেই থাক তাব ভেদবমি শুরু হবে এবং তা একুশবাব চলবে। একুশবাবেব পব নাড়ী কেটে তাব মৃত্যু ঘটবে। কোন ডাক্তাব বা বৈদ্য তাকে বাঁচাতে পাববে না। তবে বাঁচাতে গেলে গুণিনী প্রক্রিয়া কবতে হবে। তা হল——নদীতে ভেসে পাওয়া কোচা পান কয়েকটি সংগ্রহ কবতে হবে। তবে তা তিনটিব কম হলে চলবে না। এইবাব বোগীব একুশবাব ভেদবমি হবাব পূর্বে ঐ কোচা পানে 'কাটান বাণ' মন্ত্র পড়ে তা মাটিতে পুঁতে ফেললে বোগী বক্ষা পাবে।

তবে একটি কথা খুব যত্ন কবে মনে বাখতে হবে তা হল পানেব উপবে যে নাম ঠিকানা এবং গোত্র লেখা হবে তা সঠিক হওয়া চাই, ভুল হলে ঐ বাণ ঘুবে এসে যে প্রযোগ কববে তাব উপব পড়বে। আব এক ডুবে সমস্ত পান না কুচতে পাবলে মন্ত্র বিফল হবে।

কোচাবাণ কে সাধাবণত গুণিনবা এড়িয়ে চলেন। এই বাণ-প্রয়োগেব পদ্ধতি বড জটিল এবং কষ্টসাধ্য। তাছাড়া বোগীকে বাঁচাতে চাইলে তা প্রায় সময সফল হয না। কাবণ স্রোতে ভেসে যাওযা পানেব টুকবো সংগ্রহ কবা সব সময সম্ভব হয না এবং একুশ বাব ভেদবমিব পূর্বের কাটান মন্ত্র না পাঠ কবতে পাবলে বোগীকে বাঁচান যায না।

কোচাবানের মন্ত্র :

কোচাবাণেব মন্ত্রটি অনেকটা পান পডাব মন্ত্রেব মত। এতে পানেব ব্যবহাব আছে বলে হযত 'পানপড়া'ব মন্ত্রেব প্রভাব পডে থাকতে পাবে।

পান পান পান।
মহাপান ভেসে যায নদীব জলে।
জলে মাছ জীয়ে তো জলেতে বাম টলে।
শ্মশানে মহাদেব টলে তো মশানে ঘাতক টলে।
পদ্মেব পাতাতে জল টলে তো জীবনে আয়ু টলে।
হামাবা এই মহাবাণ নাহি লাগে তো
পীব পয়গম্বব খোদাতালাব নামে তিন তালাক।
অমুকাব শবীবে নাড়ী নাহি কাটে তো
তেত্রিশ কোটি দেওতাকে তিন সেলাম।
কাব আজ্ঞে
পীব পয়গম্বব আব তেত্রিশ কোটি দেবতাব আজ্ঞে।
কাব আজ্ঞে
দেবী মা মহাকালীব আজ্ঞে।

এই মন্ত্রটিব মধ্যে হিন্দীভাষা এবং মুসলমান আচারের ও ধর্মেব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন মনে পড়ে—'আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।'

মন্ত্র যাই হোক, মন্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের সার্থকতার বিচাবে তব গুণাগুণ। যে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ভিত্তিব উপর এব প্রতিষ্ঠা তা প্রবহমান কালধাবায় দীর্ঘকাল প্রবাহিত বলেই লোক মানসে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে আসছে এবং পেয়ে আসবে। মানুষ যতই আধুনিক কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক হোক না কেন দীর্ঘকাল সঞ্চিত সংস্কারকে উপড়ে ফেলা খুবই কঠিন। তাই বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মন্ত্রের জোরে বাণ মেরে দূর থেকে মানুষকে মেরে ফেলা যায় এ বিশ্বাস বহুকাল বেঁচে থাকবে, তা পবীক্ষা কিংবা প্রমাণেব অপেক্ষা না রেখে।

মারণ (৩) :

পচাবাণ : মন্ত্রের জোরে বাণ মেরে মানুষের শরীরে পচন ধরিয়ে দেওয়া কিংবা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পচিয়ে দেওয়া, অসাড় করে দেওয়ার চমৎকার উদাহরণ হল পচাবাণ। শত্রুকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে, দীর্ঘদিন ধরে জীবন্মৃত করে শেষে মৃত্যু ঘটানোর জন্য গুণিনগণ এই বাণ ব্যবহার করেন। তাই 'পচাবাণ'কে 'মারণ' পর্যায়ে ফেললেও এতে তৎক্ষনাৎ মৃত্যু ঘটে না। এই বাণ মারার পর মানুষের শরীরে যে লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে তাতে তাকে রোগগ্রস্ত বলে মনে হয়। প্রথমে বাণমারা হয়েছে বলে বুঝতে পারা যায় না। যেমন—একজন সুস্থ সবল মানুষের শরীরের কোন একটা অঙ্গ হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল, তারপর তাতে ঘা হল, ধীরে ধীরে পচতে শুরু করল। তারপর আস্তে গোটা শরীরে এই লক্ষণগুলি দেখা যেতে লাগল। শেষে খাদ্যপরিপাক যন্ত্র, গলনালী প্রভৃতি আক্রান্ত হল। এইভাবে চলতে চলতে রোগীর খাদ্যগ্রহণ এবং হজম করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। না খেতে পারায় রোগীর শেষে মৃত্যু ঘটল।

'পচাবাণ'-কে গুণিনগণ সাধারণত এড়িয়ে চলেন। কারণ এই বাণমারার পদ্ধতি জটিল, কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এছাড়া মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট দেওয়া অনেকে পছন্দ করেন না। গুণিনদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি অনেক গুণিন এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন না। তাঁদের মতে বিনা দোষে মানুষকে দগ্ধে মারা খুব খারাপ, অন্যায়। অনেক গুণিন পাপের ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন। তাঁদের ধারণা মৃত্যুর পর যমপুরীতে তাঁদেরকেও এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া চোখের সামনে একটা মানুষ অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— এ দৃশ্য সহ্য করা খুবই কঠিন। শুধু পচা বাণ কেন, অনেক গুণিন বাণ মারা কে অপছন্দ করেন। ওঁদের একটা সংস্কার আছে যে যারা পয়সার লোভে নির্দোষ মানুষের মৃত্যু ঘটায়, তারা নির্বংশ হয়ে যায়। তাই 'মারণ' মন্ত্র গুণিনদের কাছে আদৃত নয়। এছাড়া সমাজের ভয়ে অনেকে এপথ পরিত্যাগ করেন।

'পচা বাণ' মারার পদ্ধতি যেমন জটিল, তেমনি পদ্ধতিগত বিভিন্নতা আছে। যেমন—কোন গুণিন দূর থেকে বাণ মারেন আবার কোন গুণিন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শরীরে ওষধি প্রয়োগ করে অভীষ্ট কর্ম করেন।

প্রথম পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে দূর থেকে মন্ত্রের জোরে বাণ মারা হয়। সমস্ত পদ্ধতিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন ক্রিয়াকর্ম থাকে—সেগুলি হল পূজা পাঠ, হোম যজ্ঞ, জপতপ ইত্যাদি। যে কোন গুণিনকে মন্ত্র প্রয়োগের পূর্বে মন্ত্র প্রয়োগের জন্য শক্তি অর্জন করতে হয় এবং নিজেকে শুচি বা শুদ্ধ হতে হয়।

প্রথমে কোন পটুয়া/মূর্তি শিল্পীর কাছ থেকে এক ডাকে (অর্থাৎ দর কষাকষি না করে) কৃষ্ণবর্ণ কালিকা মূর্তি ক্রয় করতে হবে। বর্তমানে নীল বা গাঢ় নীল রঙের কালিকামূর্তি বিক্রি হয়। তারপর ঐ মূর্তিকে রক্তবর্ণ পঞ্চমুখী জবা ও একশত আটটা জবা ফুল দিয়ে তৈরী মালা দিয়ে তিনদিন ধরে পূজা করতে হবে। ত্রয়োদশীর দিন ঘটস্থাপনা ও অন্যান্য কর্ম, চতুর্দশীর দিন সাধারণ পূজা এবং অমাবস্যাতে মূল পূজা, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি করতে হবে। অনেকে কেবল অমাবস্যাতেই পূজা করেন। এক লক্ষবার সিদ্ধিকালী মন্ত্র জপ করতে হবে। সিদ্ধিকালীমন্ত্র হল—"ক্রীং হ্রীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতায়ৈ সিদ্ধিকাল্যৈ নমঃ। হ্রীং ক্রীং সিদ্ধিকাল্যৈ ফট স্বাহা। ক্রীং হ্রীং ঐং হ্রীং কালি কালি সিদ্ধি কালি ফট্। শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং সিদ্ধিকাল্যৈ স্বাহা।" এরপর অষ্টধাতুর একটি মূর্তি তৈরী করে তাকে ভালো করে শোধন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য

অষ্টধাতুর মূর্তিতে যেন পরিমাণ মত সোনা ও রূপা থাকে। এইবার ঐ শোধিত মূর্তি হোম কুণ্ডের সামনের মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। ওই মূর্তির উপরের স্থান পরিষ্কার করে তাতে একটি যন্ত্র আঁকতে হবে। যন্ত্রে একটি মানুষের মূর্তি আঁকতে হবে। এইবার একশত আটবার পচাবাণের মন্ত্র জপ করে একটি সূঁচের সাহায্যে মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্ধ করতে হবে। যে যে অঙ্গে সূঁচ বিদ্ধ করা হবে, সেই সেই অঙ্গ অসাড় হয়ে যাবে এবং পচতে শুরু করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিকে বলা হয় সংস্পর্শ পদ্ধতি। এতে কোন দ্রব্য দ্বারা স্পর্শ করাতে হবে। সোজা কথায় শত্রুর শরীরে কোন দ্রব্য ঘষে দিতে হবে।

প্রথম পদ্ধতির মত যথারীতি পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ, জপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করতে হবে। এইবার এক তোলা পরিমাণ করে কয়েকটি দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতে হবে। দ্রব্যগুলি হল—বিষাক্ত সাপের বিস, বিষাক্ত সাপের দাঁত চূর্ণ, সেঁকো বিষ, ঘোড়ার বিষ্ঠা, গাধার বিষ্ঠা, কাঁকড়া বিছার রস, পারদ এবং সীসাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করতে হবে। এইবার এতে এক হাজার আটবার পচা বাণের মন্ত্র পড়ে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এরপর শত্রুকে সম্মোহন বা ঐ জাতীয় কোন মন্ত্রে অজ্ঞান করে দিতে হবে। শত্রুর কোন অঙ্গ ধারাল অস্ত্র দ্বারা কেটে সজারুর কাঁটার সাহায্যে উপরোক্ত মিশ্রণ রক্তে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে ঐ অঙ্গ পচে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে শত্রুর মৃত্যু ঘটবে।

গুণিনরা এই পদ্ধতিটি কখনো ব্যবহার করেন না। কারণ প্রথমত, উল্লিখিত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করা কঠিন, ব্যয়সাপেক্ষও বটে। দ্বিতীয়ত, প্রয়োগ করা আরো কঠিন। কারণ শত্রুকে মন্ত্রদ্বারা অজ্ঞান করে ফেলতে হবে তারপর কোন অঙ্গ কেটে রক্ত বার করে ঐ বিষাক্ত দ্রব্যের মিশ্রণ মিশিয়ে দিতে হবে। এতে ঝামেলা যেমন প্রচুর, তেমনি risk কম নয়। তাছাড়া এতে শত্রুর অবধারিত মৃত্যু। কোনক্রমে তাকে বাঁচানো যাবে না। প্রয়োগের পরে ইচ্ছার পরিবর্তন হলে কোন মতেই তাকে বাঁচানো যাবে না। প্রয়োগ করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধরা পড়লে গুণিনের শরীরের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না।

তবে একটা কথা এই যে উল্লিখিত বিষাক্ত পদার্থগুলি কোন মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে এমনিতেই তার মৃত্যু ঘটবে। গুণিনের প্রয়োজন হবে না। এই প্রসঙ্গে গুণিনদের প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁরা কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। তাঁদের বক্তব্য হল গুরুর কাছ থেকে তাঁরা এই বিদ্যাই পেয়েছেন। তবে একটা সত্যি কথা তাঁরা বলেছেন— এই দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রয়োগ তাঁরা কোনদিন করে দেখেন নি।

পচাবানের মন্ত্র :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনদের কাছ থেকে পচাবাণের যে মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ সংস্কৃতে লেখা। বলা বাহুল্য সংস্কৃত মন্ত্রগুলি ভুলে ভরা। বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে যে সব গুণিন মন্ত্র চর্চা করে থাকেন, তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি নন। ফলে সংস্কৃত মন্ত্রগুলি তাঁদের হাতে পড়ে বিকৃত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে সেগুলির প্রকৃত চেহারা কি ছিল তা আজ জানা অসম্ভব। প্রথম অবস্থায় কোন তন্ত্র কিংবা অন্য কোন মন্ত্র-গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। দিনের পর দিন স্বল্প শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গুরুশিষ্যের হাতে পড়ে সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

বাংলা মন্ত্র দু একটি পাওয়া গিয়েছে। তাও ভুলে ভরা। বাক্যগুলি অসংলগ্ন। সংশোধন করে এখানে দেওয়া হচ্ছে। একটি মন্ত্র অদ্ভুত। এতে চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। চাষী বিষফলের গাছ

পুঁতেছে, তাতে ফলেছে বিষফল। সেই বিষ ফলের বিষ ফলায় লাগিয়ে বাণ ছুঁড়ছে গুণিন। সেই বাণ শত্রুর যে অঙ্গে বিদ্ধ হবে—সেই অঙ্গ বিষক্রিয়ায় হয়ে যাবে অসাড়। তারপর ক্রমে ক্রমে তাতে পচন ধরবে।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে তুলে আনলুম মাটি।
সেই মাটিতে গাছ পুঁতলাম পরিপাটি।
সেই গাছে হল ফল অতি মনোহর
তার ভেতরে আছে বিষ অতি ভয়ঙ্কর ॥
সেই বিষের খবর জানে ওঝা ধন্বন্তরি
আর জানে সর্বজ্ঞ মাতা বিষহরি।
পরীক্ষিতে কামড়ে দিল বুড়ো তক্ষকে।
সেই বিষ সেঁদিয়ে ফলের ভেতরে ॥
বাসুকির মুখের বিষ মহাদেব নিল।
বিষ খেয়ে শিব ঠাকুর নীলকণ্ঠ হল।
সেই বিষ বাণে পুরি বাণ মারি সেখানে।
শত্রুর শরীরে বাণ লাগে যেখানে সেখানে।
যা বাণ যা, অমুকের শরীরে লাগ।
অঙ্গ হোক অসাড়, শরীর পচে যাক ॥
কার আজ্ঞে—
মা বিষহরির আজ্ঞে
আর, ওঝা-ধন্বন্তরির আজ্ঞে
আর শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে।

লোক সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের মত ওঝা-গুণিনের মন্ত্রও সমাজের দর্পণ। এগুলি যেমন অভীষ্ট কাজে ব্যবহৃত হয়, তেমনি ওঝা-গুণিনগণ কখন অলক্ষ্যে এর মধ্যে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জনজীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলেন তা তাঁরা নিজেরা জানেন না। ইতিহাস পুরাণের কাহিনীর ছায়াপাত যেমন আছে, তেমনি লৌকিক জীবনের রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসের প্রভাব বর্তমান। মন্ত্রগুলি পড়লে জানা যায় যে সমাজে রামায়ণ মহাভারত-পুরাণের খুব চর্চা হত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষই এইগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। মন্ত্র-তন্ত্রের চর্চা সমাজের চাষী, শ্রমিক ও নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে বেশ ছিল। 'গুণিন' নামে আলাদা কোন সম্প্রদায় নেই। কিছু মানুষের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবসা ছিল। কিন্তু আবার অন্যান্য বৃত্তির মানুষ মন্ত্রতন্ত্রের চর্চা করতেন। যার জন্য উপরোক্ত মন্ত্রটিতে চাষের প্রসঙ্গ এসেছে। বাণমারার বিষ সংগ্রহের জন্য তাকে বিষ ফলগাছ চাষ করতে হয়েছে।

মন্ত্রগুলির ব্যবহার, প্রয়োগ কিংবা প্রয়োগের পর ফলাফল ভীষণ বা মারাত্মক যা হোক না কেন, মন্ত্রগুলি যে ওঝা-গুণিনের কবি মনের সৃষ্টি তা হলফ করে বলা যায়। হয়ত কবিতা রচনা করার কিংবা আঙ্গিক গঠনের যথাযথ জ্ঞান তাঁদের ছিল না কিন্তু মন্ত্র রচনা করতে গিয়ে তাঁরা যে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন তা মন্ত্রগুলির প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়। কার্যকারিতার দিক দিয়ে এগুলি কতখানি সফল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলা যায় ওঝা-গুণিনগণ কেবল মন্ত্রব্যবসায়ী নন, সুর তাল যোগ করে মন্ত্রগুলিকে কবিতার স্তর থেকে উত্তীর্ণ করে মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করার কাজে লাগিয়েছিলেন তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে এগুলির সর্বাঙ্গে।

বাণমারা পদ্ধতির বিশেষ ব্যবহার :

ওঝা-গুণিনদের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হল---মন্ত্রবাণ। প্রায় প্রতি গুণিন এই বাণমারার প্রক্রিয়া শিখে থাকেন। মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর উভয়প্রকার কাজই বাণমারাব মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন কবা যায। তাই বাণমারা কেবলমাত্র 'মারণ' পর্যায়ের মন্ত্র নয়, ভূত ছাড়ান, বোগ উপশম প্রভৃতি মঙ্গলকর কাজও এর দ্বারা হয়ে থাকে। বাণমারাব সাহায্যে ওঝা-গুণিনগণ যে সমস্ত কাজ করে থাকেন, মোটামুটিভাবে তার একটা তালিকা প্রস্তুত কবলে এইরকম দাঁড়ায।

মানুষের অনিষ্টকর কর্মের জন্য 'বাণ মারা'র পদ্ধতির ব্যবহার : (১) বশীকরণ (২) স্তম্ভন (৩) আকর্ষণ (৪) বিদ্বেষণ (৫) উচাটন (৬) মারণ (৭) দুর্ভাগ্যকরণ (৮) কলহকরণ (৯) নাশন প্রভৃতি।

মানুষের মঙ্গলকর কর্মের জন্য 'বাণ-মারা' পদ্ধতির ব্যবহার : (১) ভূতপ্রেত ও দুষ্টশক্তি বিতাড়ন (২) পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির নিরাময় (৩) ওঝা-গুণিনেব অনিষ্টকর বাণ মারার বিরুদ্ধে কাটান বাণ প্রয়োগ (৪) ডাইনী, অপদেবতা, বা দুষ্টশক্তির নজর লেগে গবাদি পশু ও মায়েব বুকের দুধ ফিরিয়ে আনার জন্য (৫) সর্পবিষ নিবারণের জন্য ও অন্যান্য বিষক্রিয়া নিবারণের জন্য (৬) চোরধরা ও চুরি করা জিনিসের উদ্ধাব প্রভৃতি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায় এখানকার ওঝা-গুণিনগণ উপরোক্ত সবক্ষেত্রে বাণ-মারা পদ্ধতির প্রযোগ করেন না। তাঁরা মারণ, ভূতপ্রেত ও দুষ্টশক্তির বিতাড়ন, মন্ত্রের কাটান, ডাইনী প্রভৃতির জব্দ করা, সর্পবিষ দূর কবার জন্য, চোরধরা প্রভৃতি কাজে বাণমাবা পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন---কোন চোর চুরি করল। তখন জলদর্পণ, নখ দর্পণ প্রভৃতি করে গুণিন চোরের হদিশ কবলেন। কিন্তু চোবকে চোব বলে প্রমাণ করবেন কিভাবে। চোর হযত চোরাই মাল সরিয়ে ফেলেছে। তখন গুণিনকে জ্বালাবাণ কিংবা কনকনেবাণ, ঝনঝনে বাণ প্রয়োগ করতে হয়। চোব জ্বালার চোটে গুণিনের কাছে চলে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে। ঠিক একইভাবে ডাইনীকে জব্দ কবার জন্য বাণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

কোন মায়ের বুকের দুধ, কিংবা কোন গরুর বাঁটের দুধ ডাইনী শুষে নিচ্ছে; গুণিন কোন যন্ত্রণাদাযক বাণ প্রয়োগ করলেন, ডাইনী যন্ত্রনায় কাতব হয়ে গুণিনেব কাছে এসে স্বীকাব করে। গুণিন তখন তাব যথাবিধি প্রতিকারেব ব্যবস্থা করেন। এসব ছাড়াও কাটান বাণ প্রয়োগ কবে গুণিনরা মানুষের উপকার করেন। হয়ত কোন দুষ্ট প্রকৃতির গুণিন পয়সার লোভে কোন মানুষের খারাপ কিছু করল, তখন অন্য গুণিন মন্ত্রবলে বাণ মেরে পূর্বোক্ত গুণিনের মন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়ে রোগীকে ভাল করে তোলেন।

ভূতপ্রেত বা দুষ্টশক্তির বিতাডনেব জন্য গুণিনগণ যে সকল মন্ত্রবাণ ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে 'অগ্নিবাণ' সর্বাধিক পরিচিত এবং বেশি প্রচলিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ও এই মন্ত্র-বাণটির বেশ প্রচলন আছে।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, পুরাণে, মহাভারতে অগ্নিবাণের কথা জানা যায়। অগ্নিবর্ষণকারী এই বাণ বা তীর যুদ্ধে ভীষণ মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত পুরাণোক্ত অগ্নিবাণের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কথা স্মরণ করে ওঝাগুণিনগণ মন্ত্রের অগ্নিবাণ সৃষ্টি করেছেন। এই বাণকে শক্তিবাণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

অগ্নিবাণের প্রস্তুতি ও ব্যবহারের পূর্বে শক্তিদেবীর পূজা, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি করতে হয়। মূল শক্তিমন্ত্রই হল এই ব্যাপারে যথাযোগ্য মন্ত্র। কিন্তু অনেকে কালী মন্ত্র জপ করে পূজা অর্চনা

করেন। এই ব্যাপারে মূল কালীমন্ত্র কিংবা বীজমন্ত্র হল—'ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। অথবা 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।" এই বীজমন্ত্র একশত আটবার জপ করতে হয়। পূজা অন্তে যে ব্যক্তির ভূত চেপেছে বা কোন দুষ্টশক্তি ভর করেছে তার ঘরের চালের খড় দিয়ে মশাল বানাতে হবে। যদি তার ইটের বাড়ী কিংবা টালির চালের বাড়ী হয়, তাহলে তার বাড়ী থেকে এক আঁটি খড় নিয়ে মশাল বানাতে হবে। এইবার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ করে একুশবার মন্ত্র পড়তে হবে। এইসঙ্গে কিছু হলুদ মন্ত্রপূত করে ঐ মশালে পোড়াতে হবে। এখন ঐ মশালের ধোঁয়া ও হলুদ পোড়া ধোঁয়া ভূতে চাপা মানুষের নাকে দিতে হবে। এই ক্রিয়া কয়েক মিনিট্ করার পর হলুদ বাদ দিয়ে মন্ত্রপূত শুকনো লঙ্কা মশালে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাকে দিতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একবার হলুদ পোড়ার ধোঁয়া ও একবার লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিতে হবে। এতে ভূত প্রেত কিংবা দুষ্টশক্তি রোগীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অগ্নিবাণের বাংলা মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই মন্ত্রে দেখা যায় অষ্টবজ্র সংঘটিত হওয়ার পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াপাত আছে। অষ্টবজ্রের অগ্নি আহরিত করে বাণের শক্তি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই শক্তি দিয়েই ভূত প্রেত, উপদেবতা, দুষ্ট শক্তি, অশুভ আত্মা, ডাইনী, যক্ষ-রক্ষ, জিন, পরী প্রভৃতি অলৌকিক অনিষ্টকারী শক্তিদের প্রতিহত করা যায়। এইবাণ যিনি প্রয়োগ করবেন, তাঁকে শুদ্ধচিত্তসম্পন্ন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া তাঁর কিছুটা আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা দরকার। অসংযমী, মাতাল, লম্পট, কিংবা কুচরিত্রের মানুষদের কাছে এই মন্ত্রবলের প্রয়োগ নিষ্ফল হবে। তবে ওঝা বা গুণিনকে উচ্চবর্ণের মানুষ হতে হবে এবং কোন নিয়ম নেই। যে কোন জাতির মানুষ যিনি শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারবেন ও বীজমন্ত্র জপ করতে পারবেন এমন শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ হবেন, তাঁর পক্ষে এই মন্ত্রবাণ প্রয়োগ করা সম্ভব।

অগ্নিবাণের মন্ত্র

ওঁ অষ্ট দেবতায় নমঃ
ওঁ অষ্ট দেবতায় নমঃ ॥
ওঁ হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং মহামায়ায়ৈ
হুং ফট্ স্বাহা।
আট দেবতার কৃপা নিয়ে অষ্টবজ্র হল।
মহাদেবীর বরে তাহা সংঘটিত হল।
অষ্টশক্তি আমি বাণের মুখে ধরে।
অগ্নিবাণ গঠন করি অষ্ট দেবতার বরে।
শন শন বাণ চলে স্বর্গ মর্ত্য ছেড়ে।
বাণের মুখে রুদ্রদেব জ্বলে অমিত তেজে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে কাঁপে জীবগণ।
বাণ চলে শূন্য পথে হয়ে গনগন॥
যক্ষ রক্ষ নাগ ভূত প্রেত আদি।
কাহারও নিস্তার নাহি না পালাও যদি।
অমুকার অঙ্গে তুমি করেছ ভর।
যেখানেই থাক তুমি বাণ করিবে জর্জর॥

যা বাণ যা তীব্র তেজ হান।
অমুকের শরীরে যে আছে করো খান খান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি তেত্রিশ কোটি দেবতার হুকুমে।
যে দুষ্টশক্তি ভর করে আছে, তাকে পুড়িয়ে ফেল॥
লাগ লাগ লাগ—
কার আজ্ঞে
দেবী মহামায়ার আজ্ঞে।
আর তেত্রিশ কোটি দেবতার আজ্ঞে
আর আমার শ্রীগুরুর আজ্ঞে।

মন্ত্রটির মধ্যে সংস্কৃত বাংলা মিশিয়ে চমক সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বাক্যগুলি সুগঠিত নয়। ছন্দের দোষ তো আছেই।

এক ভূত ছাড়ানোর ঘটনায় দেখেছিলাম—গুণিন কপালে চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে মাথায় লাল গামছা বেঁধে মশাল জ্বেলে তীব্র গন্ধ তৈরী করে রোগীর নাকে ধরছে, আর এক হাতে একটি মোটা কঞ্চি নিয়ে মাটিতে সপাসপ মারছে। মুখে সুর করে কি একটা বলছে। সে যে মন্ত্র তার শব্দ, ছন্দ, বাক্য এবং অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। সুতরাং মন্ত্রটি সুগঠিত না হল কিংবা ছন্দদোষ ঘটল তাতে কিছুই এসে যায় না। গুণিন নামক যাদুকরটির বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, হুঙ্কার, লাফালাফি, আর লঙ্কা-হলুদ পোড়ার তীব্র গন্ধে ভূত কেন, ভূতের চোদ্দ গুষ্টি পালাতে পথ পাবে না। সুতরাং মন্ত্র যাই হোক, তার প্রয়োগই আসল কথা।

বাংলার গ্রামে গঞ্জে আনাচে কানাচে ঝোপে ঝাড়ে শূন্য মাঠে ভূত প্রেত আজও ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সুন্দরবনের সীমানায় ভূত প্রেত দুষ্টশক্তির রাজত্ব। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে তাদের অবস্থান আর এদের ঠিকানা জানে ওঝা গুণিন নামের ধুরন্দর ব্যবসায়ীরা। কোথায় কেমন করে কোন দ্রব্য, কোন মন্ত্র প্রয়োগ করলে কোন রোগ সারবে, কোন ভূত পালাবে তার হদিশ ও তাদের জানা। সুতরাং অগ্নিবাণ কিংবা জ্বালা বাণ কিংবা কাঁটা বাণ যাই হোক না কেন, যে কোনভাবে গ্রামের মানুষের সমস্যার সুরাহা করতে তারা সিদ্ধ হস্ত। দীর্ঘকাল ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সংস্কার বিশ্বাস আমরা বহন করে চলেছি—সেই স্রোতোধারায় অবগাহন করে ওঝা গুণিন নামক মন্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রেণী ফায়দা লুটে নিচ্ছে। সেখানে অগ্নিবাণ কেন, কত রকমের বাণ, কত রকমের প্রক্রিয়া যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এগুলি আলোচনা করলে একটা কথাই বোঝা যায়— এক একটি গুণিন তাঁর কল্পনায় যে ভীষণ, ভয়ানক, উদ্ভট পরিস্থিতির ছবি এঁকেছেন, তাকে রূপ দিতে মন্ত্র এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই এগুলির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, রীতি নেই। এক এক গুণিনের কাছে এক এক রকমের পদ্ধতি। এমনও দেখা গেছে ভূত ছাড়ানোর জন্য অগ্নিবাণ মারণ কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাঁটা বাণ কিংবা জ্বালাবাণের প্রয়োগ হচ্ছে কোন কঠিন রোগ সারানোর জন্য কিংবা চোর ধরার জন্য। তবে সমস্যার সঙ্গে পদ্ধতির মিল থাকতে হবে। না হলে একটি ব্যাপারের মন্ত্র অন্যটিতে প্রয়োগ করা যাবে না। কোন গুণিন কোথায় কেমন করে কিভাবে কাজ করবেন কিংবা কি মন্ত্র প্রয়োগ করবেন তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে তাঁর উপর। তাই মন্ত্রতন্ত্রগুলির কোন নির্দিষ্ট চেহারা নেই। তাই এগুলিকে লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে সে কথা আজ অস্বীকার করা যায় না।

বীরসাধনা (১) :

দুষ্ট প্রকৃতির বা খল স্বভাবের গুণিনরা সাধারণতঃ মানুষের অনিষ্ট করে থাকে। এটাই তাদের প্রকৃতি। জনসমাজের ধারণা এরা মানুষের যে অনিষ্ট সাধন করে থাকে এবং যে ক্ষমতাবলে করে থাকে তা তাদের জন্মগত। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ জন্মসূত্রে কিছু ক্ষমতা অর্জন করে থাকে, যার দ্বারা তারা মানুষের অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত থাকে। বলা বাহুল্য এই কাজের দ্বারা তারা অর্থ উপার্জন করে। এইসব দুষ্ট প্রকৃতির মানুষরাই পরবর্তীকালে মন্ত্রতন্ত্র শিখে গুণিন হয় এবং ধীরে ধীরে দুষ্ট যাদুবিদ্যা (Black Magic) কিংবা মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে পিশাচ বা ডাইনী জাতীয় খল জাদুকরে পরিণত হয়। এরা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।

এই সকল দুষ্ট গুণিন ছাড়া আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন কিংবা দুষ্ট যাদুবিদ্যা (Black magic) তে পারদর্শী হন এবং মানুষের অনিষ্ট করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে। তবে এইসব মানুষেরা মানুষের অনিষ্ট করেন না, উপরন্তু মানুষের অনিষ্টকারী দুষ্টশক্তির প্রতিরোধ করেন। এঁরা সাধারণতঃ লৌকিক দেবদেবীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে থাকেন। বাংলার প্রাচীন কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই জাতীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের কৃপাপুষ্ট লাউসেন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী ছিলেন। তান্ত্রিক মতে যা উল্টাসাধন সেই কঠিন কায়াসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে লাউসেন আধ্যাত্মিক তথা ভীষণ তান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এইরকম মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর কৃপাপুষ্ট কিছু চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা তান্ত্রিকজ্ঞানসম্পন্ন, যাদুশক্তির অধিকারী, অলৌকিক ক্ষমতাধারী ছিলেন। নাথযোগী কাহিনীর চরিত্রগুলি তান্ত্রিক ক্রিয়াকৌশল, তন্ত্রজ্ঞান, দেহসাধনার এবং সর্বোপরি অলৌকিক যাদুশক্তির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

বামমার্গীয় তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপ্রচলিত। এই সাধনপদ্ধতি 'বীরাচার' নামে অভিহিত। আবার কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবী বা অপ্রচলিত ছোটখাটো দেবদেবী—যাঁরা তান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত জগতের শক্তিকে মন্ত্র-তন্ত্রের জগতের ভাষায় 'বীর' বলা হয়। এই 'বীর' শ্রেণীর অলৌকিক জীব(?) অসীম ক্ষমতার অধিকারী। অতি প্রাকৃত জগতের সমুদয় কাজকর্ম এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এক শ্রেণীর গুণিন এই বীরদের পূজা করেন, উপাসনা করেন। এই বীরদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে এবং বীরদের সহায়তায় তাঁরা প্রভূত পরিমাণে অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেন। অনেক গুণিন বলেন 'বীর' হলো আরবীয় 'জিন' কিংবা দৈত্যের মতো অসীম ক্ষমতাবাণ অলৌকিক শক্তিধারী কোন কল্পিত প্রাণী। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য আসুরিক সাধনা দ্বারা এঁদেরকে তুষ্ট করে বশ করতে হয়। এদের দ্বারা হেন লৌকিক অলৌকিক কাজ নেই যা করা যায় না। ওঝা-গুণিনগণ এঁদের সাহায্যে মানুষের অনিষ্টকর কাজের প্রতিবন্ধকতা করে সমাজের মঙ্গল করতে পারেন। এরা এমন সব গুপ্ত ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকেন যার বিন্দুবিসর্গ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশিত হয় না। এই সমস্ত গুণিন Black power-এর অধিকারী হয়েও মানুষের উপকার করেন। এঁদের দ্বারা মানুষের মঙ্গলকর যে সমস্ত কাজকর্ম হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ—

(১) পুরোনো বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ—যেগুলি চিকিৎসা বিভ্রাট বা চিকিৎসা-জটিলতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্ত রোগের প্রতিকার 'বীর'দের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সব বিষয়ে প্রতিকারের উপায় এবং ঔষধের হদিশ পাওয়া যায়।

(২) ডান, ডাইনী, অশুভ আত্মা, মায়াবিনী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী প্রভৃতির কুদৃষ্টির প্রভাব ও প্রকোপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

(৩) অন্যান্য ওঝা-গুণিনদেব অনিষ্টকাবী শক্তিকে প্রতিহত কবা এবং তাদেব বাণ মাবাব বিরুদ্ধে কাটান বাণেব প্রয়োগ।

(৪) ডাইনী, অপদেবতা ও দুষ্ট গুণিনেব নজব লেগে মাযেব বুকে ও গবাদি পশুব বাঁটে দুধ শুকিয়ে যাওয়াব প্রতিকাব কবা।

(৫) সিদ্ধাইকে প্রতিহত কবা।

(৬) বিষক্রিয়াব উপশম ঘটানো।

(৭) চুবি, ছিনতাই, বাটপাড়ি প্রভৃতিব প্রতিকাব।

(৮) গুপ্তধন সন্ধান, অন্যান্য সম্পদ আহবণ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, প্রাত্যহিক জীবনেব সুবাহাব জন্য এবং উন্নতিব জন্য উপায বা পথেব সন্ধান।

বীবসাধনা অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপাব। এই সাধনাকে শব সাধনাব একটি অঙ্গ বলা যায। কিন্তু এই কষ্টসাধ্য ব্যাপাবটি সমাধা কবতে পাবলে প্রভূত ক্ষমতাব অধিকাবী হওযা যায। আববীয 'জিন'-দেব মতো 'বীব' ও গুণিনেব বশ হযে যায।

আদিম জাতি গুপ্তবিদ্যা চর্চা কিংবা বহস্যচর্চাকে বংশগত পেশা হিসাবে গ্রহণ কবেছিল। সেই ধাবা আজও অনেকস্থানে বজায আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কিছু গুণিনেব সন্ধান পাওয়া গিযেছে, যাঁবা কযেক পুরুষ ধবে এই মন্ত্র-ব্যবসা চালিযে আসছেন। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায যথার্থ বীর সাধক অর্থাৎ এই সাধনায সিদ্ধিলাভকাবী ব্যক্তি খুব কমই আছে। বীব সাধনাব প্রক্রিযা এবং মন্ত্র অনেকে জানেন, কিন্তু সাধনায সিদ্ধিলাভ কবেছেন এমন জানা যাযনি। এপর্যন্ত যে কয়জন গুণিনেব সঙ্গে যোগাযোগ কবা সম্ভব হযেছে তাঁদেব মধ্যে অনেকে বীবসাধনাব মন্ত্র ও পদ্ধতি জানেন। কিন্তু সাধনায সিদ্ধিলাভ কবেছেন—এমন এক জনকেও পাওযা যাযনি। অনুসন্ধান চলছে, ভবিষ্যতে হযত সন্ধান পাওযা যেতে পাবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গুণিনদেব কাছ থেকে বীব সাধনা সম্পর্কে যে পদ্ধতি সংগ্রহকবা হযেছে তাব বিববণ এখানে দেওযা হচ্ছে। প্রথমেই বলে বাখা দবকাব যে বীব সাধনাব মূল সাধন অংশ এবং শব সাধনাব প্রক্রিযা এক হলেও বিভিন্ন আচাব-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলি গুণিনভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন পদ্ধতিব উল্লেখ না কবে মোটামুটিভাবে মিল বেখে প্রক্রিযাব বিববণ এখানে দেওযা হচ্ছে।

(১) পূর্বেই বলা হযেছে বীবসাধনা অতি কঠিন সাধনা। যে কোন ব্যক্তিব দ্বাবা এই সাধনা সুসম্পন্ন হতে পাবে না। কাবণ এই সাধনাব জন্য প্রযোজন সৎ, জিতেন্দ্রিয, নির্লোভ, হৃদয়বান, দযালু, স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান, উদাবহৃদয, বুদ্ধিমান, বিবেচক ও নীবোগ শবীব সম্পন্ন মানুষ। অর্থাৎ যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ যথার্থভাবে মানুষ হয সেই সমস্ত সদ্‌গুণ থাকাব দবকাব। অপ্রাকৃত, অলৌকিক শক্তিকে বশীভূত কবতে গেলে দুর্বল চবিত্রেব মানুষ সর্বদাই ব্যর্থ হয়।

(২) অক্ষবজ্ঞানহীন কোন মূর্খ ব্যক্তিব দ্বাবা এই সাধনা সম্ভব নয। কাবণ এতে সংস্কৃত বীজমন্ত্র আছে সেগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চাবণ কবতে হবে। অন্যান্য সংস্কৃত মন্ত্রগুলিও যথাযথ উচ্চাবণ কবতে হবে। সেজন্য তোতলা, জড় ব্যক্তিব দ্বাবা সাধনা হবে না। আবাব অতি উচ্চশিক্ষিত খুব বড় পণ্ডিত ব্যক্তিব দ্বাবা এই সাধনা হবে না। কাবণ তাঁর পাণ্ডিত্যেব অহংকাব থাকবে। সাধককে অহংকাবশূন্য হতে হবে।

(৩) সাধককে অবিশ্বাসী, নাস্তিক হলে চলবে না। অবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিক হলে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তার কাছে অর্থহীন মনে হবে। ফলে সাধনায় চিত্ত সংযোগে ব্যাঘাত ঘটবে। সাধককে অবশ্যই ভক্তিমান, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী হতে হবে।

(৪) জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এই সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত মানুষ এই সব কার্যে রত, পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায় উচ্চবর্ণের মানুষ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের মানুষ এই মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনায় বেশি অন্তর্ভুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা মাহিষ্য, কর্মকার, নাপিত, পৌণ্ড্র, তিলি, সদগোপ প্রভৃতি জাতি ও আদিবাসী সমাজের বহু মানুষ এই মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবসায়ে রত আছেন।

(৫) বালক এবং বৃদ্ধদের দ্বারা এই সাধনা কদাপি সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে পঁচিশ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মানুষ এই সাধনায় অগ্রসর হতে পারেন।

(৬) বীর সাধনায় আগ্রহী ব্যক্তির তন্ত্রমন্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ এই সাধনা মোটামুটিভাবে দেহ নির্ভর। তাই শরীর মধ্যস্থ শিরা, উপশিরা, নাড়ী, ধমনী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। তেমনি সাধককে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতিতে দক্ষ হতে হবে।

বীর সাধনার সাধকগণ তথা গুণিনগণ একটা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের পথ ধরে তাঁদের কর্মপথে এগিয়ে চলেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দেবদেবী যেমন হরি, শিব, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা প্রভৃতিকে বিপদ আপদ পরিত্রাণের দেবদেবী হিসাবে স্মরণ করেন, তেমনি 'বীর' নামক কল্পিত অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারীকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কারণ বীর সাধনায় সংশ্লিষ্ট দেব কিংবা দেবীকে তুষ্ট করেই বীরকে লাভ করেন এবং তাকে সদাসর্বদা সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে থাকেন। অন্ধকার পথে চলতে বিশ্বাসই তাঁদের প্রধান সহায়। শিব, হরি, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কোন সাধক ধার্মিক কেউ কোন দিন এঁদেরকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করেন নি, তেমনি বীর নামক অলৌকিক শক্তিধরকে কোন গুণিন স্বচক্ষে দেখেন নি। সবই অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতির উপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মন্ত্র জগৎ। চিরাচরিত সংস্কার আর বিশ্বাস তার মূলচাবিকাঠি। সমগ্র পৃথিবী কিংবা ভারতবর্ষ কিংবা বঙ্গদেশ কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যেখানেই হোক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির মূল ভিত্তিভূমি হল সংস্কার ও বিশ্বাস। সেখানে দুষ্টশক্তি, অপদেবতা, ডান ডাইনী মায়াবিনীরা যেমন বিচরণ করে, তেমনি তাদেরকে প্রতিহত করতে 'বীর' নামক শক্তিধরেরাও ঘুরে বেড়ান। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের সৌজন্যে গুরু প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে গুণিনরা সেই জগতে প্রবেশের অধিকার অর্জন করেছেন। তাই বিতর্ক যতই থাকুক, ওঝা-গুণিনদের জন্য পৃথক জগৎ তৈরী হয়ে আছে— তা হল লোকবিশ্বাস আর লোক সংস্কারের জগৎ।

বীর সাধনার পদ্ধতি :

অন্যান্য সাধনক্রিয়ার মত 'বীর' সাধনায় তিথি ও নক্ষত্রের যোগ প্রয়োজন হয়। সমগ্র কৃষ্ণপক্ষই 'বীর' সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। তবে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি কিংবা চতুর্দশী তিথি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। নক্ষত্র এবং যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ বলেন কৃত্তিকা কিংবা ভরনী নক্ষত্র আবার কেউ বলেন মাহেন্দ্র মণ্ডল মধ্যগত অনুরাধা ও রোহিনী নক্ষত্র আর যোগ হল মাহেন্দ্র যোগ উৎকৃষ্ট। অনেকে অবশ্য পূর্ব ভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্রে অমৃতযোগ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে থাকেন। শরৎ কিংবা হেমন্তকাল এই কার্যের জন্য প্রশস্ত।

লোকালয়ের মধ্যে বীরসাধনা করা উচিত নয়। কারণ যে সমস্ত গুহ্য ক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রয়োজন তা জনবহুপূর্ণ স্থানে সফল হয় না। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনে কৌতূহল জাগতে পারে তাতে কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, এই সমস্ত সাধন প্রক্রিয়াকে আমাদের দেশের লোকজন ভাল চোখে দেখেন না। সেজন্য নির্জন বনমধ্যে নদীতীরে শ্মশানে, লোকালয় থেকে দূরে পোড়ো বাড়ীতে এই কার্য করা উচিত। নদীতীরের নির্জন শ্মশান এই সাধনার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

বীবসাধনাব জন্য অনেক জিনিসের প্রয়োজন—(১) শব (চণ্ডালেব শব হলে ভাল হয়)। (২) চিতা (যে চিতায দাহকার্যেব জন্য চণ্ডালেব শব আনা হযেছিল)। (৩) সামিষান্ন, গুড়, সুবা, পাযস ও পিষ্টক, ভুট্টাব খই, পূজাব সামগ্রী ও নৈবেদ্য, জবাফুল, বিভিন্নবকমেব ফল।

(৪) বলিব জন্য কৃষ্ণবর্ণেব ছাগ।

(৫) মৃগ চর্ম কিংবা ব্যাঘ্র চর্মেব আসন।

(৬) হোমেব সামগ্রী, সমিধ, ঘৃত প্রভৃতি।

(৭) আকন্দ তুলাব সলিতাসহ কর্পূবেব প্রদীপ, পঞ্চগব্য।

প্রথমে সাধককে নির্জন স্থানে দক্ষিণাকালীব পূজা কবতে হবে। এবপব এক লক্ষ আটবাব বীজমন্ত্র জপ কবতে হবে। এই বীজমন্ত্র হল— ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

দ্বিতীয পর্যাযে সাধককে নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্র ও যোগ অনুযাযী শবকে প্রথমে স্নান কবাতে হবে। গঙ্গাজলে স্নান কবালে ভাল হয। তাবপব পঞ্চগব্য দ্বাবা আবাব স্নান কবাতে হবে। তাবপব চিতাব উপব শবকে স্থাপিত কবে তাকে ভাল কবে চিতাব সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে। চিতাটাকেও চাবটি খোঁটা দিযে মাটিব সঙ্গে ভালভাবে আটকাতে হবে। এবপব শবেব উপব বসে একাগ্র চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ কবতে হবে৷ বলাবাহুল্য জপেব পূর্বে দেহবন্ধন মন্ত্রে নিজেব শবীবকে বন্ধন কবতে হবে যাতে বাহিবেব কোন বিপদ শবীবকে স্পর্শ কবতে না পাবে।

তৃতীয পর্যাযে ইষ্ট মন্ত্র জপ কবাব পব বীব সাধন মন্ত্র জপ কবতে হবে।

বীব সাধন মন্ত্র

ও হ্রীং হ্রীং ক্লিং কালিকে মহাকালিকে
কবাল বদনে ঘোবদ্রংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনাযিকে
বীবায বীবায দাবায হন হন শব শবীবং
চৈতনং জাগ্রত কবয হুং ফট স্বাহা।

এই মন্ত্র সঠিক কিনা জানা নেই। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব তান্ত্রিক গুণিনেব কাছ থেকে সংগৃহীত মন্ত্র এখানে তুলে দেওযা হল। তবে হাতেব লেখা খাবাপ থাকাব জন্য কিছু কিছু জাযগায পডতে অসুবিধা হযেছে, সেখানে সামান্য সংশোধন কবা হযেছে।]

বীবমন্ত্র বহুক্ষণ জপ কবাব পব চাবদিকে নানাপ্রকাব ধ্বনি, বিকট শব্দ, হাসি ও কান্নাব স্বর, বীভৎস চীৎকাব শুনতে পাওয়া যাবে। সাধককে এতে ভীত বা বিচলিত হলে চলবে না। কোনদিকে না তাকিয়ে বীবাসনে উপবিষ্ট হযে এক মনে মন্ত্র জপ কবে চলতে হবে। কিছুক্ষণ পব মুখব্যাদন কববে, তখন তাব মুখে সুবা, গুড়, সামিষান্ন, পায়স, পিষ্টক ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে দিতে হবে। শব মাঝে মাঝে বাঁধন ছিঁড়ে উঠে বসতে চাইবে। তাকে জোব করে গাযেব শক্তি দিয়ে আবাব শুইয়ে দিতে হবে। যদি শব একবাব বাঁধন ছিঁড়ে উঠে বসে কিংবা দাঁড়ায় তাহলে সে সাধককে মেবে ফেলবে।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলাব পব চাবদিকেব শব্দ থেমে যাবে এবং শব ও নিস্তেজ হবে অর্থাৎ শব অবস্থায় ফিবে আসবে। এইবাব শবকে বন্ধনমুক্ত কবে পুনবায পঞ্চ গব্য দ্বাবা স্নান কবাতে হবে এবং সারা শবীবে ঘৃতেব প্রলেপ দিতে হবে ও নূতন বস্ত্র দ্বাবা শবীব আচ্ছাদিত কবতে হবে।

এখন শ্মশানের অধিপতি চার ভৈরবকে যথাবিধি পূজা করতে হবে ও ছাগবলি দিতে হবে। বলিকে দেবী কালীর নামে উৎসর্গ করতে হবে। এইবার ব্যাঘ্রচর্মের কিংবা মৃগচর্মের উপরে শবকে স্থাপন করে বীরাসনে বসে তার চৈতন্য উৎপাদন করতে হবে।

পুনরায় শবকে চিতার উপর রেখে ভালকরে বন্ধন করতে হবে এবং কর্পূরের প্রদীপ জ্বেলে দিতে হবে। এই প্রদীপ যেন না নিভে যায়। নিভে গেলে সাধকের মৃত্যু অনিবার্য। এইবার চিতার চতুর্দিকে গণ্ডী কেটে বন্ধনমন্ত্রে স্থান বন্ধন করতে হবে এবং দেহবন্ধনমন্ত্রে শরীরকে বন্ধন করতে হবে। তারপর প্রেতশুদ্ধি আসন শুদ্ধি করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে। পুনরায় শবের বুকের উপর বসে বীরসাধন মন্ত্র জপ করতে হবে। এইবার চতুর্দিকে বিচিত্র শব্দ আরও জোর হবে এবং নানারকম ছায়ামূর্তি চারদিকে নৃত্য করতে থাকবে ও ভয় দেখাবে। এতে ভীত ও বিচলিত হলে চলবে না। প্রয়োজনে সাধক নূতন কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলতে পারেন ও কানে তুলো গুঁজে দিতে পারেন। কিন্তু একাগ্রচিত্তে জপ করে যেতে হবে। বীর সাধন মন্ত্র যদি অনেক বড় মনে হয় এবং জপ করতে অসুবিধা হলে বীর সাধন মন্ত্রে সংকল্প করে কেবলএকাক্ষরী কিংবা দ্যক্ষরী ইষ্ট বীজমন্ত্র জপ করা যায়। জপের সঙ্গে সঙ্গে দেবী মহামায়ার ধ্যান করতে হবে। এইরকম কিছুক্ষণ চলার পর চারদিকের শব্দ ও ছায়া নৃত্য থেমে যাবে। তখন নানাবিধ সুস্বর ও সংগীত লহরীতে স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সুগন্ধে ভরে যাবে। এরপর সুন্দরী রমণীদের ছায়া শরীর আবির্ভূত হবে এবং নৃত্য করবে। এরা সাধককে প্রলোভিত করার চেষ্টা করবে। এই প্রলোভনে ভুললে চলবে না। সাধক যদি একবারের জন্য ভুল করে আসন ছেড়ে গণ্ডীর বাইরে চলে আসে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

এই সমস্ত চলার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি শব ও মুখব্যাদন করবে এবং দড়ি ছিঁড়ে উঠে বসার চেষ্টা করবে। তখন তার মুখের মধ্যে গোটাগোটা ফল দিয়ে দিতে হবে। তাকে জোর করে শুইয়ে রেখে দিতে হবে। তবে একটা কথা— কোন অবস্থাতেই মন্ত্রজপ থামানো বা বন্ধ করা চলবে না।

যদি সমস্ত কাজ নিষ্ঠাভাবে যথারীতি পালিত হয় তাহলে শেষরাত্রে দেবী এসে দেখা দেবেন এবং শবের প্রাণদান করবেন। এই জাগ্রত শব হলো বীর। সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য এই বীর সাধকের বশ ও অনুগত হয়ে থাকবে। দেবী সাধককে মনোমত বরও প্রদান করবেন।

এই বীর কিন্তু স্থূল দেহেতে থাকবে না। অদৃশ্যভাবে অবস্থান করবে। সাধকের প্রয়োজনে, বিপদে আপদে সে দেখা দেবে। দেবীর আশীর্বাদপুষ্ট এই বীর মহাশক্তিধর। এর সাহায্যে সাধক বহু অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

বরপ্রদানের পর দেবী অন্তর্হিত হয়ে গেলে সাধক দেবীর উদ্দেশ্যে হোম করবেন এবং নিজের বুক চিরে কয়েক ফোঁটা রক্ত হোমে আহুতি দেবেন। এরপর ঈশান কোণে কিছু তিল এবং সর্ষে নিক্ষেপ করে বীর সাধন সমাপ্ত করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধনভঙ্গ মন্ত্র পাঠ করতে হবে। এই সাধনভঙ্গ মন্ত্রটি কি তা অবশ্য জানা যায়নি। বীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই কিন্তু সাধকের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যায় না। সাধক যতদিন 'বীর'কে বশে রাখতে চান ততদিন প্রতিরাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ইষ্টমন্ত্রে দেবীর জপ ধ্যান করবেন। কমপক্ষে এক হাজার বার মন্ত্রজপ করতে হবে এবং শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বীবসাধনা এক ধবনেব শব সাধনা। এই সাধনা কঠিন, কষ্টকব বলেই অধিকাংশ তান্ত্রিক কিংবা গুণিন একে পবিত্যাগ কবে থাকন। তবে সাধনায সিদ্ধিলাভ কবলে যে শক্তি ও আনন্দ লাভ হয তা অতুলনীয।

একটা আশ্চর্যেব কথা হল—এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান যা কবতে পাবেনি মন্ত্রতন্ত্রেব পক্ষে তাই সম্ভব। সে ব্যাপাবটা হল মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চাব কবা। এই প্রাণ সঞ্চাবিত হবাব পব দেহটি আব স্থূলভাবে থাকে না, অদৃশ্য ভাবে অবস্থান কবে। পুবো ব্যাপাবটাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাব পবিপন্থী। দ্বিতীযত, দেবীব আবির্ভাব ও সাধককে বব প্রদান কবা ব্যাপাবটি অলৌকিক অপার্থিব কিংবা অপ্রাকৃতিক পর্যাযে পডে।

বিভিন্ন পুবাণেব কাহিনীতে সাহিত্যে গল্পে আমবা দেবদেবীব দর্শনেব কথা পডেছি। বিভিন্ন সাধক চবিত কাহিনীতেও সাধনান্তে দেবী দর্শন ও বব প্রদানেব কথা জানা যায। তবে এগুলি কতখানি পবীক্ষিত সত্য তা বলা যায না কিন্তু আমাদেব আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয সংস্কাবে নিঃসংশয়ে এগুলি সত্য বলে গৃহীত হযে আসছে। এসব কিছুব মূলে হল আমাদেব ধর্মবোধ ও প্রচণ্ড বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসেব উপব দাঁড়িযে আছে সমগ্র জগৎ, ধর্ম, জ্ঞান, ঈশ্বব, দেবদেবী। আমাদেব ওঝা-গুণিনদেব মন্ত্র সেই বিশ্বাসেবই অনুবর্তন কবছে। সুতবাং মন্ত্র বলে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চাব কবাব ঘটনা বিশ্বাসেব জগতে অসম্ভব কিছু নয। শবসাধনা বহু প্রাচিনকাল থেকে আমাদেব দেশে চলে আসছে। শব দেহে প্রাণসঞ্চাব কবে তাকে যদি অতিপ্রাকৃতিক কিংবা অলৌকিক শক্তিতে পবিণত কবা যায এবং তাকে যদি মানুষেব মঙ্গলেব কাজে লাগানো যায তাহলে এব থেকে ভালোকাজ আব কি হতে পাবে! আমাদেব দেশেব তন্ত্রসাধক, ওঝা-গুণিনগণ মানুষেব মঙ্গলজনক সেই কাজই কবে চলেছেন।

ভূতিনী সাধন (১):

ভাবতীয তন্ত্রসাধনাব মূলকথা হল দেহ সাধনা। অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন কবে এই সাধনাব ক্রিযাপদ্ধতি আবর্তিত হয। তেমনি এই সাধনাব লক্ষ্য হল ইষ্টলাভ। এই 'ইষ্ট' কি? 'ইষ্ট' সাধক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তবে তন্ত্রসাধকগণ সাধাবণতঃ জগজ্জননী মহাশক্তিব কৃপালাভেব জন্য সাধনা কবে থাকেন। এই মহাশক্তিকে আমবা পাই অসুবনাশিনী চণ্ডী হিসাবে। আবাব এই দেবী হলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভযদাযিনী অভয়া, মঙ্গলকাবিনী সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি। তবে স্থান কাল পাত্র অনুসাবে আকৃতিতে, প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক রূপে পবিচিতা হলেও এই সকল দেবী যে মূলতঃ এক এবং অদ্বিতীয- ভাবতীয় দর্শনে একথা সর্বজন স্বীকৃত। ইনি হলেন আদ্যাশক্তি সনাতনী মহাদেবী। এই মহাদেবী থেকে সকল দেবী প্রসৃতা— উমা, পার্বতী, দক্ষকণ্যা সতী, দশমহাবিদ্যা, একান্নপীঠেব একান্নদেবী প্রভৃতি। সবই মূল দেবীব রূপভেদ মাত্র। আবাব আঞ্চলিক দেবীগণ যেমন চণ্ডী, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি এঁবা এই মহাদেবীব সঙ্গে অভিন্নারূপে পবিগণিতা হয়ে জনসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছেন। উচ্চকোটিব সাধকগণ তাই মূল দেবীকে সাধনাব 'ইষ্ট' রূপে লাভ কবতে চেযেছেন। কারণ মূল দেবীব কৃপলাভ করতে পাবলে সকল দেবীর কৃপা লাভ কবা হবে।

আমাদেব দেশেব গুণিন ও তান্ত্রিকগণেব মধ্যে এইবকম সাধনাব একটা ধারা লক্ষ্য কবা যায়। সাধনাব দ্বাবা তাঁরা উদ্দিষ্টা দেবীকে সন্তুষ্ট কবে তাঁব কৃপালভ কবে যে ক্ষমতা অর্জন কব্রেন তার দ্বারাই তাঁবা জনসমাজের মঙ্গল করে থাকেন। মন্ত্র-তন্ত্র তাঁদেব সেই ক্ষমতা প্রয়োগের

উপায় এবং সহায়ক মাত্র। সুতরাং প্রকৃত তান্ত্রিক কিংবা গুণিন হতে গেলে তাঁকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। অবশ্য এই সাধনার মূল ভিত্তি হল দেহ অর্থাৎ শরীর।

তন্ত্রমতে এই দেহসাধনা তথা কায়া সাধনা বড়ই জটিল ও কষ্টকর। একে গুপ্তসাধনা, গুহ্যসাধনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধনাও বলা চলে। তন্ত্রসাধক ও দার্শনিকগণের মতে মানুষের শরীরের দুই দিকে নিম্নগামী দুই নাড়ী প্রবাহিত। এরা হল ইড়া ও পিঙ্গলা। এই দুই নাড়ীকে শরীরস্থিত নিম্নতম চক্র মূলাধারে মিলিত করেই সাধকগণেব সাধনার শুরু। এই মূলাধারেই সুপ্ত আছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তিকে প্রথমে জাগরিত করে সাধনার দ্বারা উর্ধ্বগা কবে শরীরস্থিত অন্যান্য চক্রের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে সহস্রার পদ্মে উপনীত করাতে পারলেই সাধকের সিদ্ধিলাভ। মূলাধারচক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে শরীরস্থিত অন্যান্য চক্র স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ চক্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করানো ভীষণ কঠিন সাধনা। জপতপ, ন্যাস, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি ও অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্ধ্বগামী করতে হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির এক চক্র থেকে আর এক চক্রে, এক পদ্ম থেকে আর এক পদ্মে গমনের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নব নব অনুভূতি ঘটে। এই অনুভূতিব সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের যোগ আছে।

প্রকৃত তান্ত্রিক ও গুণিনকে এইরকম সাধনপথে অগসর হয়ে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ক্ষমতা অর্জন করতে হয় একথা পূর্বে বলেছি। তবে সাধনায় উপায় এবং পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মূল তত্ত্ব হল একটিই— শরীবস্থিত শক্তিকে জাগরিত করা। এই জাগরিতা শক্তিই হলেন জগজ্জননী মহাশক্তি, মহাদেবী, মহামায়া, আদ্যাশক্তি সনাতনী। দশমহাবিদ্যাব দেবীগুলি এই মহাদেবীর অংশ কিংবা অন্যরূপ। গুণিন তান্ত্রিকগণের সাধনায় এই দশমহাবিদ্যার দেবীগণের যোগ আছে। এক এক প্রকার সাধনার উদ্দিষ্টা এক এক দেবী। অর্থাৎ প্রকারান্তরে যাকে মহাশক্তিরই সাধনা বলা যেতে পারে।

উচ্চমার্গের তন্ত্রসাধনায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে সহস্রারে উপনীত করাতেই সাধকেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও অপরিমেয় আনন্দলাভ ঘটে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে এইসব সাধকের কাছে জগজ্জননীর কৃপালাভ এবং পরমানন্দলাভ শ্রেয় এবং প্রেয় কিংবা ইষ্টলাভ বলে পরিগণিত হতে পারে, কিন্তু সব সাধক এই অপার্থিব সম্পদ লাভে তুষ্ট নয়। কিছু কিছু যোগী বা সাধক পার্থিব সম্পদ ও জাগতিক ভোগসুখ লাভের প্রত্যাশী। এঁদের লক্ষ্য হল সাধনাতেও কেবল দেবীর কৃপালাভ নয়, দেবীকে বশ করে নিজের কাছে বেঁধে রাখা এবং সেই দেবীর দ্বারা পার্থিব ভোগ সুখের সামগ্রী লাভ করা। আমাদের দেশের তান্ত্রিক ও গুণিনদের অধিকাংশের মধ্যে সেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের একপ্রকার সাধনা হল 'ভূতিনী সাধন'। এখানে 'ভূতিনী' মানে ভূতের স্ত্রী নয়। এখানে 'ভূতিনী' হল এক দেবী। এই দেবীকে দশমহাবিদ্যার অংশ কিংবা মহাশক্তির কোন অংশ বা রূপ বলে ভাবার চেষ্টা হয়ে থাকে। গুণিন কিংবা তান্ত্রিকদের কাছে ইনি মহাশক্তির অংশ হলেও আসলে হয়ত ইনি কোন লৌকিক দেবী, কিংবা দেবযোনি কিংবা গুহ্যজ্ঞানসম্পন্না শক্তি। তবে কোন কোন গুণিন বা তান্ত্রিক বলেন ইনি শরীরস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি।

ভারতীয় দেবদেবীর রূপ কল্পনায় যেমন বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি কল্পনার উদ্ভট আতিশয্যও দেখা যায়। ব্রহ্মা কিংবা বিষ্ণুর কল্পনায় যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি মহাদেব কিংবা গণেশের রূপ কল্পনায় উদ্ভট আতিশয্যের প্রভাব বেশি। আবার শিবলিঙ্গ কোন মূর্তিই

নয়। দেবীরূপ কল্পনায় এই বৈচিত্র্য ও উৎকটতা প্রবল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী থেকে আরম্ভ করে দুর্গা, কালী, প্রভৃতি দেবীগণ, দশমহাবিদ্যার দেবীগণ, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবীগণ বৈচিত্র্য ও উদ্ভট কল্পনার সমাহার। সেক্ষেত্রে শরীরস্থিত বিভিন্ন চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণেব নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। ষটচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ডাকিনী, রাকিনী লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনীর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। সাধকের কল্পনানুযায়ী তাঁদেব রূপ প্রতিভাত হয়। সেইরকম কুণ্ডলিনী শক্তিস্থিত 'ভূতিনী' দেবীর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অনেকে এঁকে বরাভয়দায়িনী প্রসন্না মূর্তিতে দেখেছেন। আবার অনেকে এঁকে ভয়ঙ্করীরূপে কল্পনা করেছেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিন এবং তান্ত্রিকদের সঙ্গে আলোচনায় এই ভূতিনী দেবীব নির্দিষ্ট কোন রূপ জানতে পারা যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন একটা অনুভূতি, কেউ বলেছেন এক ধরনেব ছায়ামূর্তি, যার পরিস্ফুট কোন অবয়ব নেই। একজন বলেছেন কিছু আলো— যেন আলোব একটা অস্পষ্ট অবয়ব সামনে এসে দেখা দেয়। আসলে তান্ত্রিক সাধক ও দার্শনিকগণ উল্লিখিত শরীরস্থিত ষট্ চক্রের অবস্থান যেমন কাল্পনিক, তেমনি কুণ্ডলিনীশক্তি এবং ষটচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণও কাল্পনিক। এই ধরনের কোন দেবী আছেন কিনা সন্দেহ। সাধনক্রিয়ায় সাধকের অনুভূতিই এখানে বড় কথা। মনে হয় সাধকের অনুভূতিকে সর্বজনগ্রাহ্য প্রত্যয় যোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই সমস্ত দেবীগণের পরিকল্পনা কবা হয়েছে।

'ভূতিনী সাধন' যাই হোক, এই সাধনা সাধকের বড় অন্তরঙ্গ সাধনা। এখানে কুণ্ডলিনীস্থিত দেবী প্রসন্না হয়ে সাধকের কাছে ধবা দেন এবং সাধকের মর্জিমত চিবকাল সাধকের বশে থাকেন। অনেক সাধক আবার দেবীকে কিঙ্করীরূপে প্রার্থনা করেন। আরব্য উপন্যাসের 'জিন'দের মত এই দেবী মহাশক্তিধরী। ইনি কিঙ্করীরূপে সাধকের হুকুম তামিল করেন আবার সাধকের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ এবং ভোগেব সামগ্রীবও সংস্থান কবে থাকেন। কেউ কেউ এই দেবীকে জননীরূপে আবার কেউ কেউ এঁকে কন্যারূপে দেখে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শাক্ত সাধক কবিগণের কালীসাধনার তুলনা ও আলোচনা করা যায়। এই শাক্ত সাধকগণ জগজ্জননী মহাশক্তিকে কন্যারূপে দেখেছেন। রামপ্রসাদ সেনের কাহিনীতে পাওয়া যায়— দেবী কন্যারূপে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ অন্যান্য তান্ত্রিক সাধকগণের মত শ্মশানে শবসাধনা, ভৈরবীচক্র সাধনা কিংবা অন্য প্রকার পশ্বাচার সাধনার পথকে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেননি। তিনি ভাব সাধনার পথ গ্রহণ করেছিলেন যদিও তিনি মহাশক্তিকে দেহাবস্থিত শক্তিরূপে অনুভব করেছিলেন। তাঁর গানগুলিতে দেহসাধনার তত্ত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আমাদের দেশের গুণিন ও তান্ত্রিকগণের 'ভূতিনী সাধন' কোন উচ্চমার্গের সাধনা নয়। যদিও সাধন পদ্ধতিতে দেহসাধনার কথা আছে, কিন্তু এ নেহাৎই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা। কিছু শারীরিক প্রক্রিয়া এবং কিছু মন্ত্র জপ করার পর কুণ্ডলিনীস্থিতা দেবী আবির্ভূতা হন এবং প্রসন্না হয়ে সাধককে বর দান করেন। শেষে কিঙ্করীরূপে সাধকের গৃহে অবস্থান করেন। ব্যাপারটি যেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, তেমনি অসঙ্গত বলে মনে হয়। প্রথম কথা, কোন দেবদেবী কিংবা অলৌকিক শক্তির শারীরিক অস্তিত্ব অসম্ভব ও অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, দেহনির্ভর তন্ত্রসাধনার সিদ্ধিতে সাধকের অনুভূতি যেখানে শেষ কথা সেখানে দেবীর আবির্ভাবের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃতীয়ত, সত্যিকারের সাধনার মধ্যে পার্থিব ভোগসুখের কোন প্রসঙ্গই থাকে না। চতুর্থত, জগজ্জননী মহাশক্তি কিঙ্করীরূপে সাধকের গৃহে চিরকাল বাঁধা থাকবেন ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

'ভূতিনী সাধন' ব্যাপারটি 'বীরসাধন' এর মত মন্ত্র-তন্ত্রের একটি পর্যায় বলে মনে হয়। গুণিনদের ক্ষমতালাভের একটি উৎস। জনসমাজে তান্ত্রিক ও গুণিনদের গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার একটি উপায় মাত্র। তবুও এসবের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। যে বিশ্বাস ও সংস্কার দীর্ঘকাল ধরে জনসমাজে প্রবহমান তাকে এককথায় বাজে বা ভূয়ো বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত এর পিছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে, যা আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হয়ত 'ভূতিনী' নামে কোন অলৌকিক শক্তি আছে যার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি, সহজিয়া সাধকগণের 'সহজ সাধনার' মত যা আজও গভীর গোপন। আমরা শুধু বহিরঙ্গের দিকটাই দেখছি আর সম্ভব-অসম্ভের, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, যৌক্তিক-অযৌক্তিকের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছি। শুধু এইটুকুই বলা যায়—আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা দীর্ঘকালের সংস্কার-বিশ্বাসের প্রবহমান ধারাটির পোষকতা করে চলেছেন নিজেদের অজান্তে। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে আমাদের লোক-ঐতিহ্যকে পুষ্ট ও রক্ষা করে চলেছেন। তাঁদের মন্ত্রসাধন যতই মিথ্যা কিংবা অসারত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তাঁরা যে লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করে চলেছেন সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

ভূতিনী সাধন (২): তন্ত্রসাধক এবং গুণিনগণ বলেন জগতের মানুষের জন্য, দুঃখী, দীন-দরিদ্রের জন্য ভূতিনী সাধনের প্রয়োজন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে দেবী সাধককে ধনরত্ন দান করেন। যা তিনি দীন দরিদ্রের জন্য ব্যয় করতে পারেন। অনেক গুণিনের মুখে শোনা গিয়েছে যে ভূতিনী সাধনে সিদ্ধ সাধককে দেবী প্রতিদিন পঁচিশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। তবে এই স্বর্ণমুদ্রা সাধকের নিজের ভোগ সুখের নয়, জগতের দীন দরিদ্রের উপকারের জন্যে। তবে ভূতিনী দেবী অর্থাৎ দেবী জগজ্জননী মহামায়া সাধকের আহার বিহার ভোগাদির ব্যবস্থাও করে থাকেন।

ভূতিনী সাধন পদ্ধতি:

তন্ত্র সাধনার জন্য নির্জন শ্মশান, জনশূন্য নদীতীর, বন উপবন, পর্বত, গুহা প্রভৃতি প্রকৃষ্ট স্থান। অর্থাৎ জনমানবের সংস্পর্শের বাইরে নির্জনে ও গোপনে এই সাধনা করা প্রয়োজন। যে কোন তান্ত্রিক কিংবা গুহ্য সাধনা গোপনে সম্পন্ন করাই রীতি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বিষ্ণুপুরস্থিত মহাশ্মশানে অনেকে এই ধরনের সাধনক্রিয়া করেছেন বলে শোনা যায়। তবে ভূতিনী সাধনা বড় বিচিত্র সাধনা। এই সাধনায় নিম্নলিখিত স্থানগুলি সাধন ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন—

(১) নির্জন নদীরতীর, শ্মশান, বন-উপবন ইত্যাদি

(২) সাধকের নিজের গৃহের দ্বার।

(৩) নির্জন দেবগৃহ।

রাত্রি— বিশেষ করে অন্ধকার-রাত্রি এই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। সাধক সিদ্ধিলাভ করলে দেবী ভূতিনী তথা দেবী মহামায়া মহাশক্তি সাধককে তিনরকম রূপে ধরা দেন।

(ক) মাতা বা জননীর ন্যায়। এখানে দেবী সাধকের গর্ভধারিনীর মত স্নেহে যত্নে সাধককে পালন করেন।

(খ) সাধকের গৃহে দাসী বা কিঙ্করীর ন্যায় অবস্থান করে সাধকের গৃহকার্য সমাধা করে দেন।

(গ) দেবালয়স্থিতা দেবীর ন্যায়। এখানে দেবী ভগবতী বা ঈশ্বরী রূপে আবির্ভূতা হন।

ভূতিনী সাধনার বীজমন্ত্র হল—"ওঁ হ্রীং ক্রীং ভূতিনী স্বাহা" কিংবা "ওঁ হুং হুং ক্রং ক্রং কটু কটু ক্রীং ওঁ অং অঃ।" ভূতিনী সাধনার কোন বাংলা মন্ত্র পাওয়া যায়নি। গুণিন/তান্ত্রিকদের মতে সাধনক্রিয়ায় বাংলা মন্ত্র চলে না। শরীরকে বিশেষ আসনে স্থাপিত করে, বিভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বীজমন্ত্র জপ করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

ভূতিনী সাধনার পূর্বে সিদ্ধিকালীর পূজা করতে হবে। সিদ্ধিকালীর মূর্তি নির্মাণ করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে একশত আটটা পঞ্চমুখী জবা দিয়ে পূজা করতে হবে। সিদ্ধিকালী পূজার মন্ত্র হল "ক্রীং হ্রীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতায়ৈ সিদ্ধিকাল্যৈ নমঃ। হ্রীং ক্রীং সিদ্ধিকালে ফট্ স্বাহা। ক্রীং হ্রীং কালি কালি সিদ্ধিকালি ফট্। শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং সিদ্ধিকাল্যৈ স্বাহা।" সিদ্ধিকালী পূজার পর সাধক ভূতিনী সাধনা শুরু করবেন।

ভূতিনী সাধনা : প্রথম প্রকার।

প্রথম প্রকার ভূতিনী সাধনা হল—সাধনান্তে দেবীকে মাতা বা জননী হিসাবে লাভ করা। নির্জন শ্মশানে, জনশূন্য নদীতীরে, বনে, উপবনে, কিংবা অন্য কোন নির্জন স্থানে ঘোর নিশীথে একাকী শুদ্ধ বস্ত্রে, পবিত্র চিত্তে, নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র হয়ে বীজমন্ত্র আট হাজারবার জপ করতে হবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে গুরু নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতিতে মূলাধারচক্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করতে হবে। প্রথমে ইড়া ও পিঙ্গলা—নাড়ীদ্বয়কে মূলাধারে মিলিত করে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে এবং সহস্রার চক্রে পৌঁছাতে হবে। এই প্রক্রিয়াতে সফল হলে দেবী ভূতিনী সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন। তখন সাধক নিজের বক্ষের রক্ত নিয়ে দেবীকে অর্ঘ্য দেবেন। এতে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে সাধককে বরদান করবেন এবং তাঁকে মাতার ন্যায় পালন করবেন। এছাড়া জগতের দীনদরিদ্রের মঙ্গলার্থে সাধককে প্রত্যহ পঁচিশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান করবেন। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার পদ্ধতি জানা যায় না। সেটা কেবল গুরুই সাধককে বলে দেবেন এবং সম্পূর্ণভাবে তা অনুভূতির ব্যাপার। ভাষা দিয়ে এই পদ্ধতি প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু এই সাধন ক্রিয়া এতই কঠিন যে এতে সফল হওয়া দুঃসাধ্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে সমস্ত গুণিন এই ভূতিনী সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন বলে জানা যায়—তাঁরা যে কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেছেন তা বোঝা যায় না। তাঁদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল নয়— কোনরকমে দিন কেটে যাওয়ার মত। তাছাড়া দেবী যে প্রত্যহ পঁচিশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেন তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। দীন দরিদ্রের মঙ্গল করা দূরে থাক, কিভাবে কৌশল করে লোকের কাছ থেকে পয়সা রোজগার করা যায়—তাঁদের সর্বদাই সেই ফিকির। সুতরাং এই সমস্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়—

(১) ভূতিনী সাধনায় সিদ্ধ হওয়া খুব কষ্টকর। না হওয়াই সম্ভব।

(২) যাঁরা এই সাধনায় সিদ্ধ বলে প্রচার করেন তাঁরা মিথ্যা বলছেন কিংবা সিদ্ধ সাধকের খোঁজ আমরা পাইনি।

(৩) হয়তো ভূতিনী সাধনা বলে কিছু নেই। এ কেবল তান্ত্রিক ও গুণিনদের নিজেদেরকে জাহির করার চাল।

ভূতিনী সাধনা : দ্বিতীয় প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকারের সাধন ক্রিয়া নিজের গৃহের দ্বারে বসে করতে হয়। গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে শুদ্ধ বস্ত্রে (নূতন বস্ত্র হলে ভাল হয়) এক মনে যে কোন আসনে (কিংবা গুরু নির্দিষ্ট আসনে) বসে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্মত (পূর্বে কথিত হয়েছে) উপায়ে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভূতিনী সাধনের বীজমন্ত্র আট হাজারবার জপ করতে

হবে। এইভাবে রাতের পর রাত প্রক্রিয়া চালালে দেবী বাধ্য হয়ে সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন এবং সাধককে মনোমত বর প্রদান করবেন। গুনিন/তান্ত্রিকগণ বলেন যে ঠিকমত পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা করলে তৃতীয় দিবসেই দেবী আবির্ভূতা হন। এই প্রকার সাধনায় দেবী দাসী বা কিঙ্করীরূপে সাধকের সংসারে বাঁধা থাকেন এবং নানাবিধ গৃহকর্ম সমাধা করে থাকেন।

দ্বিতীয় প্রকার ভূতিনী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এমন তান্ত্রিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দেবীর দাসীর ন্যায় সংসারে আবদ্ধ থাকার ব্যাপারটা রূপক হতে পারে—বাস্তব নয়। বাস্তবে এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভূতিনী সাধনা : তৃতীয় প্রকার।

এই সাধনায় নির্জন দেবগৃহে প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করতে হবে। এই প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপারে সমস্যা আছে। যে প্রতিমা নির্মাণ করা হবে তার রূপ কেমন হবে? দেবী ভূতিনী মূর্তি কেমন, কেউ সঠিক বলতে পারে না। তাহলে কোন মূর্তির পূজা করা হবে? তবে সাধারণ মতামত হল এই যে—যে কোন দেবী হোক না কেন, সকলেই জগজ্জননী মহাশক্তির অংশ কিংবা মহাশক্তির রূপভেদ মাত্র। সুতরাং মহাশক্তির প্রচলিত কোন রূপ নির্মাণ করলে হবে। তবে তান্ত্রিক সাধকরা বলেন যে কালীমূর্তিই সর্বোৎকৃষ্ট।

এইভাবে কালীমূর্তি নির্মাণকরে, নির্জন দেবগৃহে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে বিধিমতে পূজা করতে হবে। পূজার উপচার হিসাবে রক্তজবা (পঞ্চমুখী জবা হলে ভাল হয়), রক্তচন্দন ও রক্তকরবী ফুল থাকা আবশ্যক। পূজার পূর্বে সাধককে দুইদিন উপবাস করতে হবে। এইবার পূজার শেষে সাধককে বিধিসম্মত আসনে উপবেশন করে মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে এবং যে মূর্তির পূজা করা হল সেই মূর্তির ধ্যান করতে হবে। এছাড়া ভূতিনীসাধনের বীজমন্ত্র আট হাজারবার জপ করতে হবে। এই সব ক্রিয়ার অবশ্য গুরুর সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতেই হবে।

এইভাবে সাধনায় সফল হলে দেবী সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মূর্তি নির্মাণ করে পূজা হয়েছে, এই মূর্তিই দেবীরূপে সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন এবং সাধককে মনোমত বর প্রদান করবেন। তখন ঐ দেবগৃহে ঐ মূর্তির মধ্যে দেবী সাধকের কাছে চিরকালের জন্য বাঁধা থাকবেন। এই দেবী সাধকের আপদ-বিপদ পরিত্রাণ করবেন এবং সাধককে সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে ভরণ পোষণ করবেন।

ভূতিনী সাধনের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য আরওকতকগুলি নিয়ম মেনে চলা আবশ্যক। যেমন, হেমন্তকালে এই কাজ করলে শীঘ্র ফল লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা কিংবা রোহিনী নক্ষত্রে এই কাজ শুরু করা উচিত। মেষ, কন্যা, ধনু কিংবা মীন লগ্নে সাধনা শুরু করলে ভাল হয়। দেবীকে বসা অবস্থায় চিন্তা করতে পারলে ভাল হয়। পদ্মমুদ্রা ও পদ্মাসন এই সাধনার জন্য বিধেয়। হরিণ চামড়ার আসনে বসে সাধনা শুরু করা উচিত।

ভূতিনী সাধন কিংবা অন্যপ্রকার তান্ত্রিক সাধনা বাস্তবতার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক কিংবা অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের দিক থেকে এগুলি অস্বাভাবিক কিংবা অযৌক্তিক নয়। যে ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার আবহমানকাল ধরে সমাজের মর্মমূলে বাসা বেঁধে আছে, সেখানে দেবদেবী, ভূত, প্রেত, যক্ষরক্ষ, ডান ডাইনী সবাই সম্ভাব্যতার সীমারেখার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আমাদের চেনাজানা জগতের বাইরে, জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে যে অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিকতার জগৎ বিদ্যমান, তার সঙ্গে চেনাজানা জগতের সমন্বয় সাধন করে এই ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার। গ্রামগঞ্জের মানুষের চেতনায় এই বিশ্বাস ও সংস্কার বেশি মাত্রায় বদ্ধমূল।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায এব প্রভাব আবও বেশি। তান্ত্রিক গুণিনগণ আমাদেব ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কাবকে পুষ্ট কবতে সাহায্য কবে মাত্র। এঁবা সুকৌশলে মানুষেব মনকে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডেব, অতিপ্রাকৃত আচাব আচাবণেব প্রতি টেনে আনাব চেষ্টা কবে। এই ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কাবকে যতদিন মানুষেব মনে ধবে রাখতে পাববে, ততদিন অর্থ উপার্জনেব পথ মসৃণ থাকবে।

তবে তান্ত্রিক ও গুণিনগণ দেবদেবী কিংবা বিভিন্ন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তিব প্রতিভূ হযে একদিক থেকে সমাজেব অনেক উপকাব কবছেন। নানা কাবণে আমাদেব সমাজ দিনেব পব দিন বহুধাবিভক্ত হযে পডছে। কুসংস্কাব হোক কিংবা প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস হোক, সেগুলি দ্বাবা তাঁবা মানুষেব মধ্যে সমন্বয ঘটাতে প্রযাস পেযেছেন। এই সমন্বয সাধনেব বড প্রযোজন। ভবিষ্যতে হযত মানুষেব মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস আব কুসংস্কাব দূব হযে যাবে, তখন আজকেব দেশেব গুণিন তান্ত্রিকদেব সমন্বযী সাধনাব সুফল পাওযা যাবে। ভূতিনী সাধনা মিথ্যা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু ভূতিনী সাধনাব নাম কবে মানুষেব মনে বিশ্বাস উৎপাদনেব ঘটনা সত্যি। এই বিশ্বাসেব অনুশীলনেব মধ্যে ভবিষ্যতেব মানব সমাজেব সংস্কৃতি সমন্বযেব বীজ যে লুকিযে আছে তা অস্বীকাব কবাব উপায নেই।

যোগিনী সাধনা :

'যোগিনী' শব্দেব অর্থ 'তপস্বিনী'। যোগসাধন কাবিনী। আবাব যোগী শব্দেব স্ত্রীলিঙ্গে 'যোগিনী' হয। কিন্তু তন্ত্র এবং পুবাণ মতে দুর্গাদেবীব চৌষট্টি সহচবীব যে কোন একজনকে 'যোগিনী বলা হয। যদিও এবা দেবী দুর্গাব সহচবী, কিন্তু এদেবকে দেবী দুর্গাব অংশরূপে ভাবা হযে থাকে। কিন্তু অনেকে আবাব যোগনীকে আদ্যাবিদ্যারূপে ভেবে থাকেন। মন্ত্র দ্বাবা এই যোগিনীদেবীকে তুষ্ট কবে সাধনা কবা যায। একে যোগিনী সাধন বলা হযে থাকে।

অন্যান্য তান্ত্রিক সাধনাব মত যোগিনী সাধনাও দেহনির্ভব সাধনা। কঠিন সাধনা দ্বাবা দেহস্থিত শক্তিকে জাগ্রত কবাই হল সাধনাব পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রাণাযাম খুবই প্রযোজন। বেচক, কুম্ভক ও পূবকেব সাহায্যে শবীবমধ্যস্থ পঞ্চবাযু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানকে নিয়ন্ত্রিত কবে শক্তি অর্জন কবতে হয। এই সাধনায সিদ্ধ হলে সাধক পার্থিব এবং অপার্থিব অনেক কিছুই আযত্তে আনতে পাবেন এবং দেবদেবী, যক্ষ, বক্ষ, নব, বানবাদি ও অপ্রাকৃত শক্তিকে বশ কবতে পাবেন।

যদিও সাধনাব নাম যোগিনী সাধনা। কিন্তু এই যোগিনী দেবীকে সাধক সুবসুন্দবী, কনকাবতী, কামেশ্ববী, পদ্মিনী, নটিনী, চন্দ্রিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত কবে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই দেবী আদিভূতা মহাবিদ্যা মহামাযা দুর্গা।

'দুর্গা' শব্দেব গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা কবতে গিযে পণ্ডিতগণ বলেন দুর্গা হলেন দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নবক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভব এবং অতিবোগ প্রভৃতিকে হনন কবেন যে দেবী। যোগিনী সাধনাতেও দেখা যায় সাধক পার্থিব দুঃখ, কষ্ট, বোগ, শোককে দূর কবাব জন্য দেবী যোগিনীব শবণাপন্ন হন। তান্ত্রিক দুর্গাপূজাবিধিব সঙ্গে যোগনী সাধনাব পূজা বিধিব মিল আছে।

যোগিনীদেবীব ধ্যানমন্ত্রে দেখা যায় দেবীকে 'পূর্ণচন্দ্রনিভাননং গৌবী' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

"পূর্ণচন্দ্রনিভাননং গৌরীং বিচিত্রাম্ববধারিনাম্।
পীনতুঙ্গকুচাং ব্যমাং সর্বেবষামভযপ্রদাম্॥"

আবাব অন্যত্র 'বহ্নিভার্যা' বলে সম্বোধন কবা হয়েছে। ঋকবেদে দেবী দুর্গাকে অগ্নিস্বরূপিনী বলে বর্ণনা কবা হয়েছে। 'দেবী পুরাণে'র মধ্যে বহ্নিস্থা দেবীকেই দেবীগণেব সর্বোত্তমা বলা

হয়েছে। এই দেবী হলেন দুর্গা। ইনি মানুষকে বিজয়, ভূমিলাভ, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পুত্রাদি ও দান করেন। যোগিনী সাধনাতেও দেখা যায় সাধনাশেষে দেবী সাধককে ধন, বস্ত্র, সৌভাগ্য, যশ, সম্মান, পুত্র-পরিজন পূর্ণ সংসার সুখের বর প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেবী যোগিনী দুর্গার সহচারীগণের মধ্যে একজন হলেও ভক্তের প্রতি আচার-আচরণ, পূজাবিধি, বরপ্রদান প্রভৃতি দিক দিয়ে দেবী দুর্গার সমপর্যায়ের। অবশ্য দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়ে সব দেবীই মূল শক্তিদেবীর অংশ।

যোগিনী সাধনার পদ্ধতি

যোগিনী সাধনা দীর্ঘ সময়ের সাধনা। এক মাস, দুই মাস এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত এই সাধনা চলে। অনেকে বলেন, যতদিন পর্যন্ত সাধক সিদ্ধিলাভ না করেন ততদিন পর্যন্ত এই সাধনা চালানো যায়। দুর্গাপূজার মত মাষকলাই এবং চালকুমড়া বলি পূজাবিধির অঙ্গ। ত্রিসন্ধ্যা, জপ, প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা, ধ্যান এই সাধনার বিভিন্ন অঙ্গ। "ওঁ হ্রীং ক্রীং স্বাহা"—এর মূল বীজ মন্ত্র। এরপর দেবীর যেরূপ ধ্যান করা হবে সেই রূপবাচক নাম মূল বীজমন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।

শুক্ল প্রতিপদ থেকে সাধনার শুরু। শুক্ল প্রতিপদ থেকে পরবর্তী মাসের শুক্ল প্রতিপদের পূর্ব পর্যন্ত এই একমাস কাল সাধনার সময়। এই এক মাসে সিদ্ধি না এলে পরবর্তী এক মাস নিতে হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে সাধনা করে চলতে হবে। সিদ্ধিলাভ হলে সাধনার সমাপ্তি। শুক্ল প্রতিপদের শুরুতে (প্রাতে হলে উৎকৃষ্ট হয়) যথারীতি নিত্যকর্ম, স্নান তর্পণাদি সমাপ্ত করে আসবাবশূন্য নির্জন গৃহে হরিণ চামড়ার সামনে উপবেশন করতে হবে পূর্ব দিকে মুখ করে। সামনে শ্বেত পাথরের সমতল পাত্র কিংবা তামার সমতল পাত্রের উপর লোহিত বর্ণের অর্থাৎ রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, আলতা, অশোক ফুল চূর্ণ, পলাশফুল চূর্ণ, গোরোচনা, সিঁদুর এবং মৃগনাভি দিয়ে একটি মনোহর অষ্টদল পদ্ম আঁকতে হবে। পদ্মফুলের মাঝখানে গোলাকার শূন্যস্থানে শ্বেতদ্রব্য দিয়ে একটি স্বস্তিকাচিহ্ন আঁকতে হবে। এইবার প্রথমে প্রাণায়াম, পরে ন্যাস ও জপ ধ্যান করতে হবে। সাধারণত মূল বীজমন্ত্র ও দেবীরূপের নাম সংযোজক মন্ত্রের জপ করতে হবে। যেমন—

"ওঁ হ্রীং ক্রীং যোগিনী স্বাহা।"

"ওঁ হ্রীং ক্রীং সুরসুন্দরী স্বাহা।" ইত্যাদি।

এইরকম দশ হাজার বার জপ করতে হবে। এরপর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের পর বিভিন্ন ফলমূল, পুষ্প, বিভিন্ন শস্য, উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দ্রব্য, নূতন বস্ত্র, গন্ধদ্রব্যাদি, বিভিন্ন রত্ন-অলঙ্কার, মূল্যবান ধাতু প্রভৃতি দেবীকে উৎসর্গ করতে হবে। এই ভাবে দেবীর পূজা সমাধা হবে। পূজার শেষে সন্ধ্যা আরতি করতে হবে এবং পরে এক লক্ষবার জপ করতে হবে। এই জপের শেষে সাধক নির্জনে সকলের অলক্ষ্যে সাত্বিক আহার করবেন। এইভাবে এক মাস সাধনা করার পর শেষদিনে যোড়শোপচারে দেবীর পূজা ও বলিদান ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। রাত্রে দেবীর ধ্যান ও একলক্ষ বার জপ করার পর সাধনায় সিদ্ধ হলে দেবীর আবির্ভাব ঘটবে। তখন সাধক দেবীর কাছে ধন জন যশ অর্থ সৌভাগ্য কামনা করে বর চাইবেন এবং জগতের মঙ্গলার্থে শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করবেন। যোগিনী দেবী তা পূরণ করবেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে অল্প সংখ্যক যোগনী সাধকের নাম জানা গিয়েছে। তবে তাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

কাম্যসিদ্ধি : ধন মান যশ সৌভাগ্য প্রাপ্তির আর এক প্রকার সাধনা হল কাম্যসিদ্ধি। এখানে অবশ্য সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করতে হয়। যোগিনী সাধনার মত একমাস ধরে এই সাধনা

চলে। তবে তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র ও বাব এই সাধনায বিশেষ গুরুত্ব পেযে থাকে। জ্যেষ্ঠা, উত্তবাষাঢা, বোহিনী কিংবা পুষ্যা নক্ষত্র ও ববিবাব এবং বৃহস্পতিবাব এই কাজেব পক্ষে ফলপ্রদ।

জ্যেষ্ঠা, উত্তবাষাডা, বোহিনী কিংবা পুষ্যা নক্ষত্রে ববিবাব কিংবা বৃহস্পতিবাবে শ্বেতআকন্দ, শ্বেত বেডালা, কিংবা শ্বেত অপবাজিতাব মূল সংগ্রহ কবে, ঐ মূল পিষ্ট কবে তাব সঙ্গে আতপ চালেব গুঁডো, শ্বেতচন্দন গুড়ো, মৃগনাভি, শ্বেতকববী ও শ্বেত জবা চূর্ণ মিশ্রিত কবে একটি শ্বেত গণেশ মূর্তি নির্মাণ কবতে হবে। এবপব আতপ চালেব গুঁড়ো, শ্বেত তিলচূর্ণ, শ্বেতশঙ্খ চূর্ণ ও হস্তিদন্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত কবে একটি শতদল পদ্মেব মণ্ডল আঁকতে হবে। এই মণ্ডলেব মধ্যস্থলে গণেশ মূর্তিকে বসিযে শ্বেত কববী, শ্বেতজবা, শ্বেত অপবাজিতা ও অন্যান্য শ্বেতপুষ্প দিযে বিধিমতে পূজা কবতে হবে। পূজা শেষে শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত শঙ্খেব অলংকাব এবং শ্বেতবর্ণেব বত্ন গণেশ দেবকে উৎসর্গ কবতে হবে। এইবাব 'ওঁ হ্রীং ক্রীং ক্লীং পূর্বদযাং হুং ফট স্বাহা''—এই বীজমন্ত্র পঞ্চাশ হাজাব বাব জপ কবতে হবে। জপেব শেষে গণেশ জননী দেবীদুর্গাব ধ্যান কবতে হবে এবং শ্বেতকববী, ঘৃত, মধু ও গোদুগ্ধ দ্বাবা হোম কবতে হবে। হোমেব শেষে দেবীদুর্গাকে ধ্যান কবতে হবে এবং এক হাজাব বাব প্রাণাযাম কবতে হবে। প্রাণাযামে সিদ্ধিলাভ কবলেই দেবীদুর্গা গণেশকে কোলে নিযে অবির্ভূতা হবেন এবং সাধকেব কামনা পূবণেব জন্য বব প্রদান কববেন।

যোগিনী সাধনা কিংবা কাম্যসিদ্ধি সাধনা যাই হোক না কেন সব কিছু সাধনাই হল মূলে মহাশক্তিব সাধনা। ভাবতীয তন্ত্র সাধনায দীর্ঘকাল ধবে শক্তিসাধনাব ধাবা চলে আসছে। কামাক্ষ্যা থেকে শুরু কবে বিভিন্ন শক্তি পীঠ ও অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা হয়েছে—তা সব কিছুই শক্তিসাধনা ছাডা আব কিছু নয। সাধক বামাক্ষ্যাপা, তাবাক্ষ্যাপা, শ্রীবামকৃষ্ণদেব, বামপ্রসাদ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সাধকগণ জগজ্জননী মহাশক্তিব সাধনাই কবে এসেছেন। ভাবতীয সাধকগণেব এই সাধনা ও সাধনপদ্ধতিব অপভ্রংশ ঘটিযে তাব সঙ্গে স্বকোপল কল্পিত কিছু পদ্ধতি ও অস্বাভাবিক কিছু ক্রিয়াকর্ম যুক্ত কবে আমাদেব দেশেব ওঝা-গুণিনগন নানাবকম গুপ্তসাধনা সৃষ্টি কবেছেন। জনসমাজে এগুলি বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে প্রচলিত। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র পদ্ধতিব বিববণ সংগ্রহ কবা হযেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্য এক হলেও বিভিন্ন গুণিন বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহাব কবছেন। শুধু প্রয়োগ পদ্ধতিব বিভিন্নতা নয, তাঁবা যে দ্রব্যগুলি ব্যবহাব কবছেন তা এক এক গুণিনেব কাছে এক এক বকম। এতে মনে হয আমাদেব দেশে তন্ত্রমন্ত্রেব নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিব প্রচলন নেই। এক এক জন গুণিন তাঁদেব সুবিধামত এক এক বকম মনগডা পদ্ধতি তৈবী কবে নিয়েছেন।

জগজ্জননী মহাশক্তি কিংবা তাঁব বিভিন্ন রূপ নিযে যেমন দার্শনিক তান্ত্রিকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কবেছেন, সেইবকম তাঁদেব সহচব-সহচবী, অনুচব-অনুচবীদেব নিযে আমাদেব দেশেব তান্ত্রিক গুণিনগণ বিভিন্ন বহস্য এবং Myth এব সৃষ্টি কবেছেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে রূপকথা, উপকথা এবং অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত গল্পকাহিনী চলে আসছিল। সেগুলি ওঝা-গুণিনদেব এইসব বহস্য চর্চা ও Myth-এব সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অদ্ভুত, অবাস্তব, অপ্রাকৃত কল্পলোকেব মাযাময় জগৎ সৃষ্টি কবেছে। বিভিন্ন প্রকাব সাধনা—যেমন, বতিপ্রিয়া সাধনা, সুবসুন্দরী সাধনা, বটযক্ষিনী সাধনা, কামেশ্বরী সাধনা, মহানটিনী সাধনা, জয়া-বিজয়া সাধনা, জয়াবতী সাধনা, স্বর্ণমালা সাধনা, কনকাবতী সাধনা, সুরঙ্গিনী সাধনা, কর্ণপিশাচ-কর্ণপিশাচী সাধনা, চিঞ্চী পিশাচী সাধনা, পদ্মিনী সাধনা, মহাভৈরবী সাধনা, তাল বেতাল সাধনা প্রভৃতি সেই কল্পনাব জগতের অবদান। তান্ত্রিক গুণিনগণ সেই জগতের দ্বারবক্ষী। আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার

আর অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই রহস্যজগৎ দিনের পর দিন বর্ধিত হয়ে চলেছে— একথা ভাবলে অবাক লাগে।

তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১) : গ্রামীণ সমাজে ওঝা-গুণিন, জানগুরু, তন্ত্রসাধক প্রভৃতি মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে যেমন মনে করা হয়ে থাকে, তেমনি তাঁরা যে মানুষের উপকার করেন একথা অনেক সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মন্ত্রসিদ্ধ কিংবা তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে এমন মানুষকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়। জনমানসে এঁদের একটা বিশেষ ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়ে যায়।

মানুষ জন্মের সময় থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এক নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে। কখনও নিজের জীবন রক্ষার জন্য, কখনও গোষ্ঠীর, সমাজের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য আবার কখনও বা জগতের কল্যাণের জন্য মানুষের সংগ্রাম আজও অব্যাহত। এই সংগ্রাম পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিকূল পরিবেশ, বিরুদ্ধশক্তি, হিংসাশ্রয়ী ও অপকারী জীব-জন্তু এবং মানুষের বিরুদ্ধে। কিন্তু এর বাইরে, মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে যে অপ্রত্যক্ষ, অজানা জগৎ— যা মানুষ নাম দিয়েছে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক—তার সঙ্গে মানুষ লড়বে কিভাবে?

আদিমযুগে মানুষ সব সময় নানাপ্রকার ভয়ে ভীত, নানা দুশ্চিন্তায় সন্ত্রস্ত থাকতো। কারণ তখন তার জ্ঞান ছিল সীমিত ও অপরিণত। এছাড়া সেই সময়কার পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভূকম্পন, বন্যা, মহামারী, দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত, বাঘ, সিংহ, ম্যামথ, ডাইনোসর প্রভৃতির সঙ্গে মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হয়েচে। এছাড়া খাদ্যবস্তুর অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভারের অপর্যাপ্ততা, নানারকম ভীতি, শংকা, নিদ্রা ও স্বপ্নের বিকার সেদিনের অজ্ঞ মানুষের মনে নানা বিশ্বাস ও কল্পনার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। এই বিশ্বাস ও কল্পনার পথ ধরে দৈবশক্তি, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ধ্যান ধারণার উদ্ভব হয়েছিল সেদিন। তারপর বহুকাল কেটে গেছে, মানুষ সুসভ্য হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, অনেক অজানা রহস্য উদ্ঘাটন করেছে—কিন্তু প্রাচীনকালের কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসকে একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। তাই আজও অলৌকিক আর অপ্রাকৃতের জগৎ মানুষের চারপাশে বেষ্টন করে আছে। আজও বিভিন্ন রোগ-মহামারীর দেবদেবী, নানা বিপদ আপদের দেবতা; সাপ, বাঘ, ভূত-প্রেতের অধীশ্বর অধীশ্বরী এবং সর্বোপরি সুখ-সৌভাগ্যের দেবদেবী আমাদের সমাজে বিদ্যমান। শুধু বিদ্যমান বললে ভুল হবে, তাঁরা বহাল তবিয়তে আমাদের পূজা-অর্চনা, ভক্তি, প্রার্থনা, মানত, বলি, উৎসর্গ, উপোস, ব্রত, দণ্ডিকাটা প্রভৃতি গ্রহণ করে আমাদের চেতনায় দিনের পর দিন দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছেন। আর এগুলিকে ধর্মাচরণ নাম দিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।

যাইহোক, আমরা যাকে ধর্মাচরণ বলি, সেই ধর্মাচরণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, সংস্কার প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এগুলির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস ও সংস্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন গ্রামে বা অঞ্চলে কলেরা বা বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিলে আমরা চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দেবী শীতলার পূজা এবং এই সম্বন্ধীয় নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করি। এর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত, গুণিন প্রভৃতি ডেকে নানাবিধ অ-লৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে থাকি, তেমনি সাপে কাটলে যেমন দেবী মনসার পূজা দেওয়া হয় আবার ওঝা-গুণিনও ডাকা হয়। পুরোহিত, ওঝা-গুণিন প্রভৃতি ব্যক্তিরা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা বলে মানুষের সমাজকে নানাপ্রকার অঘটন ও আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন। কারণ আমাদের রোগ-ব্যাধির ধারণার সঙ্গে নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে রোগ-ব্যাধি, শোক-দুঃখ, দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ, অঘটন প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের বহু বিচিত্র ধারণা বিদ্যমান। যেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কয়েকটি কারণের উপর মানুষের এই ধারণা আজও ক্রিয়াশীল। সেগুলি হল—

(১) অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তির প্রভাব।

(২) বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন দুষ্ট মানুষের কারসাজি।

(৩) কিছু কিছু দেবদেবীর ক্রোধ, কোপ এবং অপ্রসন্নতা।

এই সব কারণ দূর করতে কিংবা সুরাহা করতে পারলে মানুষের জীবনে দুঃখ অশান্তি রোগ শোক অভাব অনটন দূর হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ আনন্দের ব্যবস্থা করতে পারলে জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। মানুষের জীবনের এই প্রলোভনের ছবি দেখিয়ে ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাধারী বলে পরিচিত কিছু মানুষ—যাঁরা সমাজে আজও বর্তমান এবং অপ্রতিহতভাবে তাঁদের কাজকর্ম করে যাচ্ছেন এবং মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে চলেছেন। এঁরা হলেন—পুরোহিত, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণিন, জানগুরু প্রভৃতি। এঁরা নিজেদেরকে তন্ত্র-মন্ত্র সিদ্ধ, দেবদেবীর করুণা ধন্য অলৌকিক ক্ষমতাপ্রয়োগে পারদর্শী, ভূত-প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধ, সমস্তরকম দুষ্টশক্তিকে বশ করতে ওস্তাদ প্রভৃতি বলে প্রচার করেন। এর জন্য তাঁরা নানারকম যজ্ঞ, হোম, বলি, পূজা-অর্চনা ও বিভিন্ন প্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অপ্রচলিত দুষ্প্রাপ্য কিছু দ্রব্য, গাছগাছড়া, শিকড়বাকড়, ধাতু, রত্ন, প্রভৃতি ব্যবহার করে মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সমস্ত দ্রব্য, শিকড়বাকড়েরও কিছু কিছু গুণ আছে, যেগুলি দ্বারা সময় সময় মানুষের শরীরের ও মনের উপর কিছু ক্রিয়া হয়, মানুষ কিছু সুফল লাভ করে। ফলে মানুষ অনেক সময় বিশ্বাসও করে।

মানুষের জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ আপদ, অঘটন-দৈব দুর্বিপাক, অভাব-অনটন, রোগ-শোক দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ছোট ছোট ক্লেশ, উপদ্রব প্রভৃতি ও বিনাশ করার জন্য যেমন সচেষ্ট থাকেন, তেমনি হঠাৎ প্রাপ্তি ঘটানো কিংবা সাংসারিক জীবনের অল্পস্বল্প সুখ সমৃদ্ধির দিকেও মানুষের লক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকেন এই সব ওঝা-গুণিনরা। ছোটখাট যে সমস্ত কাজকর্ম এঁরা করে থাকেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করলে এইরকম দাঁড়ায়—

(ক) দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপদ দূর ও গৃহক্লেশ নিবারণ

(১) শত্রুজয়, (২) মামলা-মোকদ্দমা জয় (৩) ভূতগ্রহ নিবারণ (৪) দোষপীড়া দূরীকরণ (৫) চোর-ডাকাতের প্রতিরোধ, (৬) যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর দুষ্টশক্তির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে পারা ও প্রতিকার (৭) ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা। (৮) উন্মাদ কুকুর, শৃগাল প্রভৃতিদের হাত থেকে রক্ষা, (৯) গৃহক্লেশ নিবারণ—ইঁদুর, মাছি, ছারপোকা, উকুন, মশা, বিছা, জোঁক প্রভৃতি বিনাশ, (১০) রোগপোকার আক্রমণ দূর, (১১) সর্পভয় নিবারণ (১৩) অগ্নিভয় নিবারণ।

(খ) সাংসারিক উন্নতি ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি

(১) শস্য বৃদ্ধি (২) গো-মহিষাদির দুগ্ধ বৃদ্ধি (৩) স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি (৪) ধনধান্য অক্ষয়করণ (৫) গুপ্তধন সম্পর্কে জানতে পারা (৬) অনাহার করণ। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর (৭) অত্যাহার করণ (৮) বাক্যসিদ্ধি (৯) শ্রুতিধর কবিত্বাদি করণ, (১০) ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি (১১) শরীরকে কর্মক্ষম রাখা, (১২) যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি, (১৩) খেলাধূলায় পারদর্শিতা (১৪) সঙ্গীত, কলা বিষয়ে পারদর্শিতা (১৫) সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি (১৬) মোহন, (১৭) রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

ওঝা গুণিন তান্ত্রিকগণ বলেন যে, দুঃখদুর্দশা দূর, বিপদ আপদ নিরশন, গৃহক্লেশ দূর ইত্যাদি কিংবা সাংসারিক উন্নতি, সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সফল করে তুলতে সিদ্ধসাধকের প্রয়োজন; কোন সাধারণ ওঝা-গুণিন এগুলি পারেন না। তন্ত্রমন্ত্র সাধক, দেবদেবীর কৃপাধন্য কোন পুরোহিত, অলৌকিক কিংবা অপ্রাকৃত শক্তিধারী কোন জ্ঞানগুরু বা ভেল্কি পুরুত (Shaman) এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাতে সক্ষম। এঁরা সারাজীবন ধরে নানাপ্রকার সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন করেছেন, তার সাহায্যে এঁরা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের সিদ্ধসাধকদের নাম করা যায়। তৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষ্যাপা, তারাক্ষ্যাপা, জটিয়াবাবা, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি সাধকগণ এমনকি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

দুঃখ দুর্ভাগ্য দূর এবং সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির বিষয়গুলিকে সার্থক করে তুলতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, যজ্ঞ, হোম, বলিদান ও বিভিন্ন সাধনমন্ত্র জপ ধ্যান করে ও নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে সিদ্ধি অর্জন করতে হয়। শত্রুজয়ে 'শত্রুৎসাদনম্' মন্ত্র জপ করতে হয়। এই মন্ত্র হল 'ওঁ অজিত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনার্দন হংস নারায়ণ স্বাহা। হুং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা নমঃ'। তেমনি মামলা মোকদ্দমা জয়ে বিবাদে বিসম্বাদে 'বিবাদে বিজয় মন্ত্র' জপ করতে হয়। এই মন্ত্র হল "ওঁ হ্রীং সুদর্শনায় হুং ফট্ স্বাহা।' তবে এই মন্ত্র জপ করার পূর্বে সাধককে সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। তবে এই জপ সফল হবে এবং সেই সঙ্গে কিছু তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে পারলে শত্রুকে জয় করা, মামলা মোকদ্দমায় বিজয় কিংবা ঝগড়া-বিবাদে সফল হওয়া যায় কিংবা অন্যের জন্য সফলতা আনা যায়।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, অন্যান্য দেশেও যেমন আছে, তেমনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও দেখতে পাওয়া যায়—কিছু ওঝা-গুণিন নামধারী মানুষ এই ব্যাপারগুলিকে ব্যবসার পর্যায় নামিয়ে এনেছেন। ভারতীয় তন্ত্রসাধনার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যকে নস্যাৎ করে তাঁরা বিষয়গুলিকে ছেলেখেলার স্তরে এনে ফেলেছেন। এই সমস্ত ব্যবসাদার মানুষ—কেউই তন্ত্র-মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ নয়। এঁরা কিছু সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে এবং নিজেরা কিছু মন্ত্র বানিয়ে বিচিত্র সুরে আবৃত্তি করে আর ভেল্কি জাতীয় কিছু ক্রিয়াকর্ম করে সহজ সরল গ্রামের মানুষকে ঠকায়। আলিপুর কোর্টের আশেপাশে, ডায়মন্ডহারবার কিংবা বারুইপুর কোর্টের আশেপাশে অনেক সময় এই ধরনের গুণিন ও জ্যোতিষীদের দেখতে পাওয়া যায়।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আজও অবহেলিত দেশ। যদি রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে যথার্থ সুযোগ সুবিধা এ দেশের মানুষ লাভ করত, যদি রোগ ব্যাধি চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদীক্ষার যথার্থ সুযোগ থাকত এবং অন্যান্য বিষয়ে সরকারী যথাযোগ্য সহযোগিতা লাভ করতে পারত, তাহলে অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের মানুষ এতখানি অজ্ঞ এবং গরীব থাকত না। তাহলে দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং স্বল্পশিক্ষার সুযোগ নিয়ে গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারীরা তাদেরকে ঠকাতে পারত না।

তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (২):

'যোগিনী সাধন', 'ভূতিনী সাধন', 'বীর সাধন' প্রভৃতির মত 'সিদ্ধিকালীসাধন' একপ্রকার সাধনা। এই সাধনাও দেহনির্ভর। এই সাধনায় 'সিদ্ধি' লাভ করলে সাধকের শরীরে এক অলৌকিক, অপার্থিব ক্ষমতা জন্মায়—যার দ্বারা সাধক নানা প্রকার কঠিন, কিংবা দুঃসাধ্য কাজও সমাধা করতে সমর্থ হন। দেবীর কৃপালাভ করে সাধক মানুষের দুঃখদুর্দশা, বিপদ-আপদ, ক্লেশ প্রভৃতি নিবারণ করতে যেমন সফল হন, তেমনি সাংসারিক উন্নতি ও সুখ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে মানুষের উপকার করতে পারেন।

তন্ত্রোক্ত কালীসাধনার মত সিদ্ধি কালীসাধনার ক্রিয়া পদ্ধতি। নির্জনে শরীরস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এই সাধন কার্য করতে হয়। সিদ্ধিকালী সাধনার মন্ত্র হল—-

"ক্রীং হ্রীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতায়ৈ সিদ্ধিকাল্যৈ নমঃ। হ্রীং ক্রীং সিদ্ধিকাল্যৈ ফট্ স্বাহা। ক্রীং হ্রীং ঐং হ্রীং কালি কালি সিদ্ধি কালি ফট্। শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং সিদ্ধিকালে স্বাহা"। অনেক তান্ত্রিক বলেন, মহাকালী সাধনা কিংবা শ্মশানকালী সাধনা করলেও এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়।

সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর সাধক নানাপ্রকার দ্রব্য, ধাতু, শিকড়, গাছগাছড়া প্রভৃতির সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে কার্য করে মানুষের মঙ্গল করতে পারেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার—সাধক কখনও নিজের জন্য কিছু করতে পারবেন না। নিজের ভোগ সুখের জন্য তিনি এই দৈবক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারবেন না কিংবা অপরের ক্ষতি বা অকল্যাণের জন্য তিনি তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন না। এছাড়া এই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না, তবে অর্জিত অর্থ যদি মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। সাধককে শুদ্ধাচারী, জিতেন্দ্রিয়, মহৎ অন্তঃকরণসম্পন্ন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, উদার নিরহংকারী, সত্যবাদী, সাহসী ও বলবান পুরুষ হতে হবে। স্ত্রীলোকগণ এই কার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

(ক) দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ দূর ও গৃহক্লেশ নিবারণ :

(১) শত্রুজয় ও শত্রুর অকল্যাণ : শনিবার বার বেলাতে (কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে হলে ভাল হয়) অশ্লেষা, মঘা, কিংবা মূলা নক্ষত্রে একটি কৃকলাশকে মন্ত্রপূত করতে হবে। মন্ত্রটি হল—'ওঁ হ্রীং হ্রীং দ্রীং দ্রংষ্ট্রা করালায় অমুকং শীঘ্র মুচ্চাটায় হুং ফট স্বাহা।' এই মন্ত্রটি চারহাজার বার জপ করতে হবে। এরপর ঐ মন্ত্রপূত কৃকলাশ শত্রু যেখানে প্রস্রাব করে সেখানে পুঁতে দিতে হবে। কয়েকদিন পর কৃকলাশটিকে তুলে এনে অগ্নিতে দাহ করলে শত্রু জব্দ হবে, তার মূত্রঘটিত রোগ হবে ও যৌনক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

রোহিনী, ভরনী ও শতভিষা নক্ষত্রে কাক ও পেঁচার ডানা, পেঁচার হাড়, গুঞ্জামূল, চিতাভস্ম, কালো বিড়ালের হাড়, বিষাক্ত সাপের দাঁত, ঘোড়ার হাড়, বেজীর লোম, কৃষ্ণসর্পের খোলস, ময়ূরের বিষ্ঠা, বিড়ালের নখ, যজ্ঞডুমুরের শিকড়, শ্বেত অপরাজিতার মূল, খদির মূল প্রভৃতির যে কোন তিনটি নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র একশত আটবার পড়তে হবে তারপর শত্রুর নাম গোত্র নিয়েও জপ করতে হবে। শেষে গোপনে শত্রুর ঘরের দ্বারদেশে পুঁতে দিলে শত্রু ঘরছাড়া হয়ে যাবে। আর পোঁতা জিনিষ উত্তোলন করে যদি আগুনে পোড়ানো হয় তাহলে শত্রুর গৃহ বিনষ্ট হবে।

কৃত্তিকা, রেবতী, বিশাখা, কিংবা পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে কুকুরের লোম, বিড়ালের নখ, পেঁচার ডানা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, ময়ূরের বিষ্ঠা একত্রে পিষ্ট করে গুলি প্রস্তুত করতে হবে। তারপর আতপ চালের গুঁড়ার সঙ্গে কৃষ্ণ ধুতুরার ছাই মিশিয়ে কৃষ্ণবর্ণের একটি কালিকামূর্তি নির্মাণ করতে হবে। তখন ঐ মূর্তিকে যথোপযুক্তভাবে পূজা অর্চনা করার পর সামনে একটি চতুষ্কোণ যন্ত্র আঁকতে হবে। ঐ যন্ত্রে উক্ত গুলি বসিয়ে শত্রুগণের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের নাম গোত্র জপ করে সংকল্প করতে হবে। এরপর "ও হ্রীং রক্ত চামুণ্ডে কালিকে রক্ষ রক্ষ হুং ফট স্বাহা"—বীজমন্ত্রটি পাঁচ হাজার বার জপ করতে হবে। এইবার এক একটি গুলি শত্রুর বাড়ীতে নিক্ষেপ করলে শত্রু কোনমতে কোন প্রকার অনিষ্ট করতে পারবে না। এছাড়া উক্ত গুলি একটি পঞ্চমুখী রক্ত জবার সঙ্গে নিয়ে দুহাতে অঞ্জলি করে গোপন শত্রুর উদ্দেশ্যে সংকল্প করে দেবীমূর্তিকে উৎসর্গ করলে আর কেউ গোপন শত্রুতা করতে পারবে না।

রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে মধ্যরাতে পূর্বোল্লিখিত কালীমূর্তির পূজা করে মহালক্ষ্মী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ঐন্দ্রী, ঈশ্বরী, কৌমারী, বগলামুখী, চামুণ্ডা এবং ভদ্রকালীর স্তব পাঠ করতে হবে। তারপর শ্বেত অপরাজিতার মূল, শ্বেত বেড়ালার মূল, জাতী বৃক্ষের শিকড়, শ্বেত কুঁচের মূল এবং অষ্টধাতু একত্র করে একটি মাদুলিতে ভরতে হবে। তারপর "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে, কালিকে কালিকে মহাকালিকে শত্রুং মে বশমানয় স্বাহা।" বীজমন্ত্রটি এগারো হাজার বার জপ করে কৃষ্ণবর্ণের সূতা দিয়ে বেঁধে বাম হস্তে ধারণ করলে সমস্ত শত্রু বশীভূত হয়ে যাবে।

বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা জয়: বিবাদ-বিসংবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমা জয়ের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তির সাহায্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। নতুবা কোন ফল পাওয়া যাবে না।

প্রথমে কোন ভাল পটুয়া দ্বারা কৃষ্ণবর্ণের কালিকামূর্তি নির্মাণ করে যথা নিয়মে সেই মূর্তির পূজা, হোম, বলিদান, জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি করতে হবে। তারপর শুক্র চতুর্দশী তিথিতে কিংবা কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে দেবী মূর্তির সম্মুখে একটি অষ্টদল পদ্ম সমেত একটি ষড় কোণাকৃতি যন্ত্র আঁকতে হবে। যন্ত্রের মধ্যস্থলে সপ্ত সমুদ্রের জলের মধ্যে একটি চুম্বক ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর দেবী কামাখ্যা, দেবী মহাকালী কিংবা দেবী বগলমুখীর বীজমন্ত্র তিনলক্ষবার জপ করতে হবে। তারপর শ্বেত অপরাজিতার মূল, শ্বেত কুঁচ, শ্বেত সরষে, শ্বেত চন্দন, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত বেড়ালা এবং শ্বেত জবা একত্র চূর্ণ করে ললাটে তিলক পরতে হবে। এরপর চুম্বকটি তামার পাতের সঙ্গে যুক্ত করে হাতে ধারণ করতে হবে। এতে মামলায় জয় সুনিশ্চিত।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে বীজমন্ত্র জপ করার পর অপামার্গের মূল অষ্টধাতুর সঙ্গে হস্তে ধারণ করলে বিবাদে জয়লাভ করা যায়। এই সঙ্গে অবশ্য "ওঁ সুদর্শনায় হুং ফট স্বাহা" বীজমন্ত্রটি এক হাজার বার জপ করতে হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে তিন লক্ষবার বীজমন্ত্র জপ করার পর কালো বিড়ালের হাড়, পেঁচার হাড় এবং বাদুড়ের হাড় একত্র করে তা কৃষ্ণবর্ণের সূতা দ্বারা বাঁধতে হবে। এইবার তা কৃষ্ণবর্ণের সাপের খোলস দিয়ে জড়াতে হবে। তারপর তার উপর কাগজ বা কাপড় দিয়ে পেটিকা প্রস্তুত করে পাচ হাজার বার ধূমাবতী মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ধূমাবতী মন্ত্র হল "ধুং ধুং স্বাহা" এইবার ঐ মন্ত্রপূত পেটিকা গোপনে বিরোধীপক্ষের উকিল এবং হাকিমের গৃহে ফেলে দিলে মামলায় জয় সুনিশ্চিত হবে বলে মনে করা হয়।

(৩) **ভূতগ্রহ নিবারণ:** ভূতগ্রহ নিবারণে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই সিদ্ধিকালী, মহাকালী কিংবা শ্মশানকালীর সেবক হতে হবে। যিনি বারোমাস প্রত্যহ কালীপূজা না করে জলগ্রহণ করেন না—সেই ব্যক্তি এই কার্যের পক্ষে যথাযোগ্য। এছাড়া সেই ব্যক্তিকে সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে।

ভূতপ্রেত যক্ষ রক্ষ দানব জিন পরী প্রভৃতি অপ্রাকৃত জগতের বাসিন্দা মানুষের অকল্যাণ করে। এরা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। মানুষ এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আগে থেকে ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয়। যথার্থ সিদ্ধ সাধক নানাপ্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষকে ভূতগ্রহভয় নিবারণ করতে সমর্থ হন।

প্রথমে নিয়ম অনুযায়ী রক্ষাকালী বা শ্মশানকালীর পূজা করতে হবে। পূজা অন্তে ভূতনাথ মহাদেবকে স্মরণ করে ক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রথমে একটি ভূত চক্র নির্মাণ করতে হবে। আটঘর বিশিষ্ট একটি যন্ত্র আঁকতে হবে। মাঝখানে চক্র চিহ্নের মধ্যে একটি মড়ার মাথার খুলি বসাতে হবে। তাতে সিঁদুর দিয়ে একটি খড়্গ চিহ্ন করতে হবে। এরপর শিরীষ গাছের পাতা

ও ফুল, ধুতুবা ফুল, আকন্দ ফুল,পেচকেব বিষ্ঠা, উটেব লোম, বাদুড়েব ডানা, কুকুবেব বিষ্ঠা. বিড়ালেব বিষ্ঠা, ঘোটকেব বিষ্ঠা, গোবব, কোলাব্যাঙেব মাথা, গন্ধক, শ্বেত গুঞ্জাব মূল, কৃষ্ণ তুলসী এবং বেড়িব তেল একসাথে পাক কবে শুকিয়ে ধূপ তৈবী কবতে হবে।.এই ধূপ জ্বালিয়ে বীজমন্ত্র পাঠ কবতে হবে। বীজমন্ত্রটি হল—"ওঁ হ্রীং বক্ষ বক্ষ মহাদেবী শ্মশান কালিকে মহাকালিকে হুং ফট স্বাহা। ওঁ দেবী শ্মশান বাসনে ভূতাদি অশবীবীং যক্ষ বক্ষ দানবাদি পলায়নং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র এক লক্ষ বাব জপ কবতে হবে। এতে ভূতগ্রহ নিবাবিত হবে। ভূত, বেতাল, দানব, যক্ষ, বক্ষ, ডাকিনী, প্রেতিনী, জিন, পবী এবং অনিষ্টকাবী খেচব প্রাণীগণ বাড়ীব ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পাবে না। শুধু তাই নয কাবো ভূতে চাপলে এই ধূপেব গন্ধ উক্ত ব্যক্তিব নাকে ধবলে ভূত দেহ ছেড়ে পলায়ন কবে। অনেক ভূতেব ওঝা এই প্রকাব ধূপ ব্যবহাব কবেন। হলুদ পোড়াব গন্ধ অপেক্ষা এই ধূপেব গন্ধ তীব্রতব। হিষ্টিবিযা বোগগ্রস্ত বোগীকে এই ধূপেব সাহায্যে সময সময আবাম দেওয়া যায।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত্রু জয, মামলা-মোকদ্দমা জয এবং ভূতগ্রহ-নিবাবণ সম্বন্ধীয অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনাব মধ্যে সেই সমস্ত তথ্য পবিবেশন কবা হযেছে। তবে বাংলা ভাষায কোন মন্ত্র এই বিষযে পাওয়া যাযনি। শুধু ক্যানিং অঞ্চলেব এক গুণিনেব কাছ থেকে বাংলায় লেখা একটি স্তব পাওয়া গিয়েছে। এটিকে ঠিক মন্ত্র বলা যায না। দেবীব কাছে ভক্তেব প্রার্থনা গোছেব একটি স্তব বা কবিতা। তা নীচে তুলে দেওয়া হল—

জয মা জগন্মাতা সনাতনী আদ্যাশক্তি।
কৃপাকব যেন চিবকাল তোমাতেই থাকে ভক্তি।
তুমি মা জগতেব সাব অভাগাকে কব পাব।
তোমাব প্রসাদে মাগো ভব সংসাব চমৎকাব॥
আমাবে দযা কবো কবো মোবে শক্তিধব।
তোমাব কৃপাতে জিনি ভূত প্রেত নব বানব।
যক্ষ বক্ষ দত্যি দানব আছে যত পৃথিবীতে।
তোমাব শক্তিতে মাগো দূব কবে পাবি দিতে।
আমাব মন্ত্রেব গুণ যেন বিফল না হয।
সর্বত্র সম্মান যেন মা পাই তোমাব কৃপায়॥
ত্রিসন্ধ্যা তোমাবে পূজি তোমাবেই কবি স্মবণ।
অন্তিমে যেন মাগো পাই তব বাতুল চবণ।

এই বকম ভক্ত ওঝা-গুণিন দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় অজস্র পাওয়া যায়। সাধাবণভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব মানুষদেব মধ্যে ভক্তিভাব ও ধর্মবিশ্বাস একটু বেশি। তাব উপব যেখানে জীবনেব বিপদ আপদ এবং সংকটের ব্যাপার, সেখানে ঠাকুর দেবতাব উপব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে তাবা পিছপা হয়না। কেবলমাত্র ঠাকুরেব থানের মাটি আব ঠাকুরেব নাম করে তেল নিয়ে বোগ সারাবাব, ব্যথা বেদনা আঘাত, কাটা ছেঁড়া সাবাবাব চেষ্টা কবতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে এমন বহু ঘটনা দেখা গিয়েছে। ডাক্তাব না ডেকে কেবলমাত্র চবণামৃতের উপর নির্ভর কবাব ঘটনাও বিবল নয়। আজকাল যদিও এই মানসিকতার কিছু পবিবর্তন ঘটেছে, তবে ঠাকুর দেবতায় অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস দক্ষিণ চব্বিশ পবগনার মানুষের মনে আজও দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। সেই 'দেশের' ওঝা-গুণিনদের দেবীর কাছে মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ সফলতার জন্য শক্তি প্রার্থনা কবতে

এ আব বড় কথা কি। তবে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবলে যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওযা যায, তা ওঝা-গুণিনবা মনে প্রাণে বিশ্বাস কবেন এবং এই শক্তিদ্বাবা শত্রুজয, মামলা মোকদ্দমায় জয় কিংবা ভূত প্রেত ডাইনীদেব বিতাডন কবা যায় একথা দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনবাও আন্তবিকভাবে বিশ্বাস কবেন। তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপাব। তা সকলেব ভাগ্যে জোটে না, তাই অর্থলোলুপ ও নাম যশ প্রার্থী কিছু মানুয অসাধুতাব আশ্রয় নিয়ে মানুষ ঠকায়। তাতে মন্ত্রতন্ত্রকে দোষ দেওয়া যায না কিংবা এদেরকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায না। হযতো সত্য কোথাও লুকিয়ে আছে আমরা আজও তাব সন্ধান পাই নি।

তন্ত্রমন্ত্রে বিচিত্র ব্যবহার (৩) : 'আতঙ্ক' শব্দটিব অর্থ হল—ভয বা শঙ্কা। 'আতঙ্ক' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—সং আ + √ তন্‌ক্‌ (=দুর্দশা) + অ। মানুষের দশা তথা অবস্থাব ব্যত্যয অর্থাৎ অবস্থাব ব্যতিক্রম বা বৈপবীত্য ঘটলেই কিংবা দশা বা অবস্থার বিচ্যুতি ঘটলেই মানুষেব মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জন্মায় তাকে আতঙ্ক বা ভয় বা শঙ্কা বলা চলে। সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ নানাভাবে নানা অবস্থায় শঙ্কিত, ভীত বা আতঙ্কগ্রস্ত হযে আসছে। আদিম মানুষ জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, তুষারপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ঝড, বৃষ্টিকে ভয় করতো। সেই সঙ্গে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, মৃত্যু যন্ত্রনাতেও শঙ্কিত হয়েছে। বর্তমান যুগের মানুষও নানা পবিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকাব অবস্থাব পরিবর্তনে নানা কাবণে ভীত কিংবা সন্ত্রস্ত হযে থাকছে। সুতরাং বলা চলে ভয, শঙ্কা বা আতঙ্ক মানুষের জীবনযাত্রার পরতে পবতে জড়িয়ে আছে।

নিরাপদে নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকা আব দুঃখকষ্টবিহীন সুখী জীবন যাপন কবার প্রবৃত্তি মানুষেব জন্মগত। কিন্তু জীবনযাত্রাব পথে যখন বাধা-বিপদ আসে, রোগ ব্যাধি আক্রমণ করে, নানাপ্রকার বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয, মানুষ তখন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই শঙ্কা হল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং সর্বোপরি মৃত্যুব। তখন মানুষ এগুলির প্রতিকার আর প্রতিরোধের উপায় খোঁজে। কিন্তু এই দুঃখকষ্ট যন্ত্রনা কিংবা মৃত্যুব কারণগুলি যদি কোন অজানা বা অপরিচিত উৎস থেকে আসে, তাহলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন হাতের কাছে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধবে।

সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা অবস্থার চাপে পড়ে দিশেহাবা। রোগ-শোক, বাধা-বিপদ, দুঃখ-যন্ত্রনায় জর্জবিত হয়ে প্রতিকারের আশায় মাথা খুঁড়ে মবে। আর্থিক অসচ্ছলতা আব স্বল্পশিক্ষা কিংবা শিক্ষাহীনতাব অন্ধকার তাব চাবদিকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে। এই অবস্থা থেকে পবিত্রাণের জন্য প্রতিকারের আশায় হাতের কাছে সহজে পাওয়া কিছু মানুষকে আঁকড়ে ধবে। যারা নিজেদেরকে অসীম শক্তির অধিকারী বলে এবং সমস্তরকম রোগ ব্যাধি, বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে বলে প্রচার করে— এই সমস্ত মানুষই গুণিন, তান্ত্রিক, জানগুরু প্রভৃতি। এরা আতঙ্কগ্রস্ত, শঙ্কিত, ভীতগ্রস্ত মানুষকে আশ্বাসের বাণী শোনায়। রোগ ব্যাধি বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু তাই নয়, রোগ শোক, বিপদ আপদ, দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ নির্বিঘ্ন এবং সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখায় এই সব মানুষেরা। আর এই সবগুলি করে গ্রামেব গঞ্জের দরিদ্র স্বল্পবিত্ত মানুষের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে। ফলে অতি সহজেই আতঙ্কিত, শঙ্কিত ভীত মানুষেব দল এই সব ওঝা-গুণিনদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকের ধারণা বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের অধিকাংশ মনে করে রোগ ব্যাধি, বিপদ আপদের মূলে কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবীর অসন্তোষ, অশুভ আত্মার কোপদৃষ্টি কিংবা চতুর্দিকে সঞ্চরমান গ্রহরাজির রোষ বর্তমান। এদেরকে শান্ত

করতে নানাপ্রকার পূজা, ব্রত, যজ্ঞ, বলি, নৈবেদ্য স্তবস্তুতির প্রচলন করতে হয়েছে। এই সব ক্রিয়া কর্ম সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত, ওঝা-গুণিন, তান্ত্রিকরাই মানুষের মঙ্গলার্থে এই সমস্ত আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন এবং মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে রুষ্ট দেবদেবী দুষ্ট আত্মাদের শান্ত করতে সমর্থ হন। কারণ তাঁরা অলৌকিক শক্তিবলে দেবদেবী, দুষ্ট আত্মা, গ্রহরাজির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাঁদের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং সর্বোপরি তাঁদের শান্ত করার উপায় বাতলাতে পারেন। এই সমস্ত ওঝা-গুণিন, তান্ত্রিক বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং দেবদেবীর বরপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। দেবদেবীর কৃপায় এঁরা মানুষের মঙ্গল করতে পারেন।

সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধতান্ত্রিক সাধক যেমন শত্রুজয়, মামলা মোকদ্দমা জয় এবং ভূতগ্রহ ভয় নিবারণ করতে পারেন, তেমনি গ্রহদোষ পীড়া দূর, দুষ্টশক্তির অনুপ্রবেশ রোধ ; জীবজন্তু, মানুষ, অপদেবতা, যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নরগণের ভয় দূর, অগ্নিভয় নিবারণ প্রভৃতি করতে সমর্থ হন। এঁরা এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জন্য যেমন মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করেন, তেমনি তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য গাছগাছড়ার শিকড়, ধাতু, রত্ন, প্রভৃতি ব্যবহার করেন। সঙ্গে সঙ্গে পূজাঅর্চনা, হোম যাগ ও করতে হয়।

গ্রহদোষপীড়া নিবারণ : ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী গ্রহ নয়টি। এরা হল—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। মানুষের শরীরে এই গ্রহগুলির প্রভাব অসীম। গ্রহের অশুভ দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে নানা বিপদ, দুর্বিপাক, রোগ-ব্যাধি অশান্তি, দারিদ্র্য প্রভৃতি ঘটে থাকে। জ্যোতিষগণ নানা উপায়ে এই গ্রহদোষ বিনষ্ট তথা গ্রহশান্তি করে থাকেন। জ্যোতিষীদের মত মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন ও তান্ত্রিকগণ গ্রহদোষ নিবারণ করে থাকেন।

প্রথমে নবগ্রহ মূর্তি নির্মাণ করে বিধিমতে পূজা, হোম, আরতি প্রভৃতি করতে হবে। এরপর নবগ্রহ মূর্তির সম্মুখে একটি যন্ত্র আঁকতে হবে। ঐ যন্ত্রে নয়টি ত্রিভূজ এবং মধ্যখানে ফাঁকা স্থানে একটি মাটির পাত্র থাকবে। নয়টি ত্রিভূজের মধ্যে লেখা থাকবে—হ্রীং, ক্লীং, হুং, ক্রীং, ব্লীং, ব্লুং, দ্রীং, ঠং, লং। এখন শ্বেত অপরাজিতার মূল, কৃষ্ণধুতুরার বীজ, অপামার্গের মূল, অশ্বত্থ মূল, বট মূল, দুর্বা মূল, শ্বেত আকন্দের মূল, শমীপত্র, আম্র পল্লব, অর্জুন বৃক্ষের শিকড়, অশ্বগন্ধা, অশোক মূল, হরিতকী, গুড়ুচীর মূল, করবীর মূল, সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, কয়েকটি কড়ি, শঙ্খ, গোরুর লেজের পুচ্ছ, সিঁদুর, তিল, যব, আতপ চাল, গোধূম, গোমূত্র, গোময়, শ্বেত সর্ষপ, পলা, পোখরাজ, চুনি, পান্না, গোমেধ, চন্দন কাঠ, মৃগনাভি, এক টুকরো হরিণচর্ম এবং পাঁচ রঙের পাঁচটি ফুল যন্ত্রমধ্যস্থ মাটির পাত্রে রাখতে হবে। এরপর পদ্মাসনে বসে' ওঁ নমো ভাস্করায় অমুকস্য সর্বগ্রহানং পীড়া নাশনং কুরু কুরু স্বাহা।" মন্ত্রটি এক আসনে নয়বার জপ করতে হবে। এরূপ দশ হাজার বার জপ করে মাটির পাত্রের সমুদয় দ্রব্য একটি নতুন বস্ত্রে বেঁধে যে ব্যক্তির দোষ পীড়া দূর হবে তাঁর গৃহের সীমানার মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। সেই স্থলে একটি বট বা অশ্বত্থ চারা রোপণ করে তাকে প্রতিদিন জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে এক মাস সন্ধ্যা দিতে হবে। মাসান্তে পুনরায় নবগ্রহ পূজা করতে হবে। এরূপ করলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গ্রহদোষ দূর হবে।

দুষ্টশক্তি বা অশুভ আত্মার অনুপ্রবেশ রোধ : দুষ্ট শক্তি, অশুভ আত্মা মানুষের জীবনে নানা বিঘ্ন অমঙ্গল, বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য, মৃত্যু, মহামারী, ধ্বংস প্রভৃতি ডেকে আনে। দুষ্টশক্তি কিংবা অশুভ আত্মা মানুষের কোন ত্রুটির সূত্র ধরে শরীরে প্রবেশ করে নানারকম রোগ উৎপাদন করে, গৃহে প্রবেশ করে নানাবিধ বিঘ্ন বিপর্যয় ঘটায়। এছাড়া গন্ধর্ব, যক্ষিনী

প্রভৃতি কিংবা প্রেতযোনি গুপ্তবেশে মানুষেব গৃহে প্রবেশ করে। গুণিন তান্ত্রিকগণ সাধনবলে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এদেব উপস্থিতি সম্বন্ধে জানতে পাবেন এবং অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারেন। শেওড়া গাছের পবগাছা, বেড়েলার মূল, পদ্মমূল, দাড়িম্ববীজ, গোক্ষুর, অড়হর পাতা ও যজ্ঞডুমুরের পরগাছা একত্রে ছাগদুগ্ধ ও চন্দনেব সঙ্গে পেষণ করে কপালে তিলক ধাবণ করে 'ওঁ হ্রীং অন্তরীক্ষায় যক্ষরক্ষ দানবাদি দর্শনায় কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্রটি দশ হাজার বার জপ করলে এদের উপস্থিতি জানতে পাবা যায়। পবে "ওঁ নম অন্তবীক্ষবাসিনে যক্ষরক্ষ দানবাদি পলায়নং কুরু কুরু স্বাহা" মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ কবলে যক্ষরক্ষ দুষ্ট আত্মা পলাযন করে।

চোর, ডাকাত, দুষ্ট ও খল ব্যক্তির প্রতিরোধ : চোর, ডাকাত, দুষ্ট ব্যক্তিবা মানুষেব সর্বনাশ ঘটায়। মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এদেব প্রতিরোধ করা যায। কালী সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তি অতি সহজেই তা করতে পারেন। প্রথমে যথাবিধি ষোড়শোপচারে রক্ষাকালীর পূজা কবতে হবে। পূজাতে যথারীতি হোম এবং হোমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব নাম গোত্র ধবে এক শত আটবার আহুতি দিতে হবে। এইবাব হোমেব ছাই, কৃষ্ণ চতুর্দশী কিংবা অমাবস্যার রাত্রে সংগৃহীত চিতাভস্ম, শ্মশানে জন্মানো কোন বৃক্ষেব পাতা, পুষ্যা নক্ষত্রে সংগৃহীত অপামার্গের মূল ও সুদর্শনার মূল একটি মাটির সরাতে বেখে তাব উপর আর একটি সবা চাপা দিযে তা বক্তবর্ণ সূতা দ্বাবা বাঁধতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব গৃহের মূল দ্বারপথে পুঁতে দিতে হবে। তাব পূর্বে "ওঁ ব্রহ্মবে শিনিশিরে রক্ষ রক্ষ ঠ ঠ" মন্ত্রটি দশ সহস্রবার জপ করতে হবে। এইরকম কবলে চোর, ডাকাত, দুষ্ট ব্যক্তি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না।

উন্মাদ কুকুর, শিয়ালের থেকে রক্ষা : উন্মাদ কুকুর কিংবা শিয়ালে কামড়ালে জলপড়া কিংবা ধূলপড়ার সাহায্যে আবোগ্য করা যায়। কিন্তু যাতে না কামড়াতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যায়। মন্ত্রসিদ্ধ ওঝা-গুণিনের ধূলাপড়া ও লাঠিপড়ার সাহায্যে তা করা যায়।

ধূলপড়া

ধূলি ধূলি ধূলি তোমারেই জানি।
সর্বলোকে জানে আর জানে দেব শূলপাণি॥
মহাদেবের ত্রিশূল স্পর্শ করে যায় এতে।
সমস্ত শক্তি এসে জড়ো হয় বিধিমতে।
এই মাটি ছড়িযে দিলাম গৃহেব দ্বাবে।
হিংস্র জীবজন্তু সব চলে যা দূরে॥
কার আজ্ঞে——
বাবা মহাদেবের আজ্ঞে। আর মা চণ্ডীর আজ্ঞে।
আর মা নারায়ণীর আজ্ঞে॥

এই ধূলা পড়া গৃহের চারপাশে ছড়িয়ে দিলে হিংস্র জীবজন্তু পাগলা কুকুর, শিয়াল ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না। আর এই ধূলা কোন বাঁশের লাঠিতে মাখিয়ে 'ও নমো ভগবতে রুদ্রায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং ক্রীং মহাভয়ে ক্রীং স্বাহা।' মন্ত্রটি পাঁচ হাজার বার জপ করে লাঠির গায়ে তিনটি ফুঁ দিয়ে সেই লাঠি হাতে নিয়ে পথে বাহির হলে পাগলা কুকুর, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তু কাছে আসতে পারে না। সাধারণতঃ দূরদেশে গেলে এই মন্ত্রপূত লাঠি কাছে রাখতে হয়। বনে জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর থেকে রক্ষা পেতে গেলে এই ধূলাপড়াতে কাজ হয়। তখন বনের মধ্যে দেবী নারায়ণীর মূর্তি নির্মাণ করে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে এবং আকন্দ তুলোর সলতে দিয়ে আরতি করতে হবে। তারপর ঐ পূজা স্থানের মাটিতে এই মন্ত্র পড়ে নিতে

হবে এবং ঐভাবে মন্ত্রপূত লাঠি কাছে রাখতে হবে. তা হলে বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু কাছে আসতে পারবে না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে বাওয়ালী, মউলে, দেয়াসী, কাঠুরে প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের কাছে এই ধূলা পড়া ও লাঠিপড়া খুব প্রয়োজনীয়। সুন্দরবনের মানুষের কাছে ওঝা-গুণিন সাক্ষাৎ রক্ষাকর্তা। যারা কাঠ কাটতে যায়, মধু সংগ্রহ করতে যায়, মাছ ধরতে যায়, তাদের কাছে এই ধরনের মন্ত্র রক্ষাকবচের মত।

তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (৪): দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল সাধারণ মানুষের মধ্যে আজও ওঝা-গুণিন, তান্ত্রিক প্রভৃতি মন্ত্রব্যবসায়ীর প্রভাব যথেষ্ট প্রবল। তবে সাধারণত নিম্নবর্ণের অর্থাৎ দলিত শ্রেণীর মানুষরা মন্ত্র-তন্ত্রে বেশি বিশ্বাস করে এবং দায়ে-বেচারে ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয়। এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে—মাহিষ্য, সদগোপ, করণ, গোয়ালা, তাঁতি, জেলে, ধোপা, নাপিত, নমশূদ্র, কাওরা, হাড়ি, বাগদী, মুচি, মেথর, মালি(মালাকার), বারুই, তিলি, স্বর্ণকার, কর্মকার, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ডোম, ছুতোর, বেহারা, মাহাতো, মাঝি, লোধা, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বৈষ্ণব, মুসলমান, বেনে প্রভৃতি বর্ণের মানুষরাই বেশি। তুলনামূলকভাবে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের সংখ্যা কম। পাঁচশতের কাছাকাছি জনসংখ্যাসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে—চারশ কিংবা তার কিছু কম মানুষ ঝাড়, ফুঁক, তুকতাক, বাণমারা, বশীকরণ, জলপড়া, ধূলাপড়া, গৃহবন্ধন, স্তম্ভন, বিষঝাড়া, ভূতছাড়ান প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে এবং বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল এবং এদের মধ্যে আবার তিনশতের বেশি মানুষ নিম্নবর্ণের।

নিম্নবর্ণের তথা দলিত শ্রেণীর মানুষের মন্ত্রতন্ত্রের উপর এই বিশ্বাস ও নির্ভরতার কারণস্বরূপ বলা যায় হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা এবং সর্বোপরি উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের শিকার হয়ে এরা এদের মানসিক শক্তির স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছে। তার উপর ধর্ম, ইহকাল-পরকাল, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির ভয় এদের বুদ্ধিভ্রংশ করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে মনুবাদী সমাজব্যবস্থা একসময় এই সমস্ত মানুষকে এমনভাবে মগজ ধোলাই করেছিল যে তারা নিজেদেরকে দাস হীন শ্রেণী ইত্যাদি বলে ভাবা ছাড়া আর উন্নত কিছু ভাবতে পারেনি।

গত ২৮শে জুলাই ১৯৯৬, দলিত সাহিত্য একাডেমীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে ভাষণ দেবার সময় পশ্চিমবঙ্গের একজন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনন্দগোপাল ভট্টাচার্য দলিত শ্রেণীর মানুষের পূর্বেকার অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁদের বাড়ীতে নিম্নবর্ণের কোন মানুষ যদি বারান্দা ছুঁয়ে ফেলত কিংবা বারান্দার কাছাকাছি এসে দাঁড়াত তাহলে তাকে খড়মপেটা করা হত। এইরকম যখন অবস্থা ছিল, তখন এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের মানসিক বিকাশ কি হতে পারে? সুতরাং উন্নত কিছু ভাবতে ভাল কিছু ভাবতে নূতন কিছু চিন্তা করতে এরা শেখেনি কিংবা শিখতে দেওয়া হয়নি কোন দিন।

যাই হোক, এতখানি প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য হল গ্রাম-গঞ্জের যে সমস্ত মানুষ মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল, কোন আর্থসামাজিক অবস্থায় তাদের চিন্তাধারা, মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির অবনমন ঘটেছিল তা বুঝিয়ে দেওয়া। মূলতঃ এই মানসিক নিম্নগামিতা ও দারিদ্র্যের জন্য গ্রামগঞ্জের মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ বিশ্বাসপ্রবণ, অন্তঃসারশূন্য ধর্মবোধগ্রস্ত হয়ে বিচার বুদ্ধির স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিক নামক কিছু চতুর মানুষ সহজেই এদের কুক্ষিগত করতে পেরেছিল, আজও সেই ট্রাডিশন সমানে বয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষ কিভাবে ওঝা-গুণিনকে বিশ্বাস করে, বিপদে আপদে এদের উপর নির্ভরশীল হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ অগ্নিভয় নিবারণ সর্পভয় নিবারণ, গৃহক্লেশ নিবারণ প্রভৃতির জন্য গুণিন-তান্ত্রিকের শরনাপন্ন হওয়া। এই সমস্ত আপাততুচ্ছ কাজের জন্য ওঝা-গুণিনের দরজায় যাবার প্রয়োজন নেই। একটু সাধারণজ্ঞান থাকলেই এই সমস্ত ব্যাপারের হাত থেকে যে রেহাই পাওয়া যায়—গ্রামের লোক তা ভুলে গেছে বা ভুলতে বসেছে তাদের গুণিন নির্ভরতার অভ্যাসের জন্য। হাতের কাছে সহজে পাওয়া ও অল্প পয়সার এমন মুশকিল আসান কে ছাড়তে চায়?

এখন অগ্নিভয় নিবারণ, সর্পভয় নিবারণ ও গৃহক্লেশ নিবারণ প্রসঙ্গে আসি।

অগ্নিভয় নিবারণ: ব্রহ্মশাপ কিংবা ব্রাহ্মণের অভিশাপ থাকলে ঘরে আগুন লাগে এমন সংস্কার ও বিশ্বাস গ্রামের মানুষের মধ্যে আজও বর্তমান। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়ে কিংবা অন্য অনেক কারণে মানুষের মনে অগ্নিভয় ঢুকে যায়। গ্রামাঞ্চলে এই ভয় বেশি দেখা যায়। গ্রামের অনেক লোকের খড় কিংবা পাতায় ছাওয়া ঘর। সেগুলিতে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি। সতর্ক থাকা ছাড়া আগুনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। কিন্তু ওঝা-গুণিন অগ্নির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রলোভন দেখায়। তাই সহজ সরল গ্রামের মানুষ এই পরিত্রাতার কাছে ছুটে যায়।

অগ্নিভয় নিবারণের মন্ত্র আছে। সেই সঙ্গে কিছু দ্রব্যগুণ ব্যবহার করতে হয়। রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত করবীর মূল তুলে তাকে শোধন করতে হয়। তারপর এক তোলা স্বর্ণভস্ম সহ ঐ মূল একটি তামার মাদুলির মধ্যে ভরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতে হবে দশ হাজার বার।

ওঁ নম অগ্নি দেবতায়ৈ হ্রীং নমঃ।
ওঁ হ্রীং ক্রীং অগ্নিভয়ে মহাভয়ে ক্লীং স্বাহা।
ওঁ হ্রীং মহিষবাহিনী স্তম্ভয় অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।

তারপর ঐ মাদুলি ডান হাতে ধারণ করলে অগ্নিভয় থাকে না।

সর্পভয় নিবারণ: সাপে কামড়ালে মানুষ সাধারণতঃ হসপিটাল কিংবা ওঝা-গুণিনের কাছে ছুটে যায়। সাপে কাটা চিকিৎসার বহু চিকিৎসাপদ্ধতি ও অজস্র মন্ত্র আছে। ওঝা-গুণিনগণ সর্পবিষ নিবারণের চিকিৎসা বিভিন্ন প্রকারে করে থাকেন। নানারকম দ্রব্যগুণ ব্যবহার করে, ঝাড়ন, জলপড়া, মনসা সার, কৃষ্ণসার, তাগা বাঁধা, গেঁটেল প্রভৃতি নানাধরনের মন্ত্র চিকিৎসা করে রোগীকে সারাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সাপে যাতে না কামড়াতে পারে কিংবা সাপের ভয় মন থেকে দূর হতে পারে—এ ধরনের চিকিৎসা কম।

গোবিন্দ দাসের বৈষ্ণবপদাবলীতে দেখা যায় শ্রীরাধিকা সাপের মুখ বন্ধন করার মন্ত্র শিখছেন গুরুর কাছে যাতে সাপে না কাটতে পারে। বিবাহ রাতে যাতে পুত্র লখীন্দরকে সর্পে দংশন না করতে পারে তার জন্য ওঝা-গুণিনদের জড়ো করেছিলেন এবং বিভিন্ন ওষধি রেখেছিলেন সাঁতালি পর্বতে বণিক চাঁদ সদাগর। কিন্তু তবুও তিনি সর্পদংশন নিবারণ করতে পারেন নি। আমাদের দেশে বহুরকমভাবে সর্পদেবী মনসার পূজা করা হয় সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। ভাদ্র মাসে অরন্ধন, সিজ পূজা, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি এর উদাহরণ। তবুও প্রতি বৎসর বহু মানুষ সর্পদংশনে প্রাণ হারাচ্ছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কোন পূর্ব পরিকল্পনা করে কোনভাবেই সর্পদংশন আটকানো যায় না। ঘটনাচক্রে সাপের হাতে পড়লেই সাপ কামড়ে দেয় একথা ধ্রুব সত্য। মানুষ তবুও ছোটে ওঝা-গুণিনের কাছে সর্পদংশন নিবারণের জন্য, সর্পভয় দূর করার জন্য। এমনই অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার! আর এর সুযোগ নেয় অর্থলোভী মন্ত্রব্যবসায়ীরা।

ওঝা-গুণিনদের মতে সর্পদংশন নিবারণ কিংবা সর্প ভয় দূর করার বহু মন্ত্র ও পদ্ধতি আছে। এখানে দু-একটি উল্লেখ করব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে মন্ত্র ও পদ্ধতির বেশি প্রচলন, তার উল্লেখ করব এখানে। এগুলি কষ্টসাধ্য, এমনকি ব্যয়সাধ্যও বটে।

প্রথম পদ্ধতি: শনিবার মা মনসার মূর্তি একটি উঁচু বেদীর উপর বসাতে হবে। চারপাশে মনসা গাছের ডাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। তারপর বিধিমতে সারা রাত্রি ধরে পূজা অর্চনা করতে হবে। পূজার সময় অন্য মন্ত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। মন্ত্রটি হল—

"আস্তিকস্য মুনির্মাতা বাসুকি ভগিনীস্তথা
জরৎকারু মুনি-পত্নী মনসা দেবী নমোহস্তুতে।"

এরপর দশ লক্ষ বার মা মনসাকে ও এক লক্ষবার মুনি রাজ আস্তিকের নাম স্মরণ করে বা উচ্চারণ করে প্রণাম করতে হবে। পরদিন রবিবার সারাদিন ভিজাভাত (পান্তাভাত) খেয়ে থাকতে হবে। ঐদিন অর্থাৎ রবিবার অমৃত যোগে শ্বেত আকন্দের মূল তুলতে হবে এবং গুলঞ্চের মূল তুলতে হবে। এরপর ঐ দুইটি মূলের উপর জল ছিটিয়ে দিয়ে মহাভয় সাধন মন্ত্র পাঠ করতে হবে। সেটি হল—"ওঁ হ্রীং ক্রীং মহাভয়ে ক্লীং স্বাহা।" মোট একানব্বুই হাজার বার পাঠ করতে হবে। এরপর মূল দুটি মালা করে গলায় ধারণ করলে আর সর্পভয় থাকবে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ। দেবী মনসার মূর্তি নির্মাণ করে একটি উঁচু বেদীর উপর স্থাপন করে বিধিমতে পূজা করতে হবে। পূজার শেষে বেদীর সামনে একটি অষ্টদলপদ্ম সমেত যন্ত্র আঁকতে হবে। এই যন্ত্রের মাঝখানে একটি সাপের মূর্তি অঙ্কণ করতে হবে। এরপর রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে তোলা শ্বেত আকন্দের মূল সর্পমূর্তির উপর রেখে প্রতিদিন দশ লক্ষবার করে তিনদিন মহাভয় সাধন মন্ত্রপাঠ করে তারপর ঐ মূলটি বাহুতে বা কোমরে বেঁধে রাখলে সর্পভয় থাকবে না।

গৃহক্লেশ নিবারণ:

মাছির উপদ্রপ থেকে রক্ষা: একটি মাটির পুতুল তৈরী করে তার গায়ে ঘোল বা দুধের ছাঁচির সঙ্গে হরিতাল মিশিয়ে লেপন করতে হবে। ওটা শুকিয়ে গেলে পুনরায় লেপন করতে হবে। এইভাবে বহু বার লেপন করার পর একটি পুরু আস্তরণ তৈরী হবে এবং তা থেকে একপ্রকার গন্ধ বার হবে। এইবার পুতুলটিকে মন্ত্রপূত করে জল ছড়িয়ে দিতে হবে। মন্ত্রটি হল—

মাছি মাছি মাছির পো, ছানা পোনা
গেরস্তের বাড়ি থেকে দূর হয়ে যানা।
হাঁড়শালে বাকুলে পদ্দাবায় সেতখানায়।
যেখানে যত তোর বংশ আছে নিব্বংশ হয়ে যা।
সাত বিবি সাত পীরের দিব্যি, মা ওলা বিবির দিব্যি
ঝাড়ে বংশে নিব্বংশ হয়ে যা।
মা চণ্ডীর আজ্ঞে, সাতপীরের আজ্ঞে।

এইভাবে বারেবারে মন্ত্রপাঠ করে পুতুলের গায়ে জল ছড়িয়ে দিলে পুতুলের গা থেকে যে গন্ধ বের হবে তাতে মাছি দূর হয়ে যাবে।

এই রকমভাবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে মশা তাড়ানো যায়। কেবল মন্ত্রপাঠের সময় মাছির বদলে মশা বলতে হবে। এ সকল ছাড়া তেজপাতা ভেজে গুঁড়ো করে, আর সঙ্গে গুগগুল, ভেলা, কুড়, সর্ষে, বেনার মূল, মুথোর মূল, লাক্ষা, ধূনো, বিড়ঙ্গ, রেনুকা, পানের রস, সজিনার

মূল, মৃগনাভি, একত্র করে শুষ্ক করে তারপর গুঁড়ো করে তা দিয়ে মোটা ধূপ প্রস্তুত করে ঘরের মধ্যে জ্বালালে মশা পালিয়ে যায়।

তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (৫) :

ইঁদুর গৃহস্থের খুব ক্ষতি করে। ইঁদুরের উপদ্রবে ও উৎপাতে সংসার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইঁদুর নিয়ে বহু গল্প কাহিনী কবিতা প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যে বহুভাবে ইঁদুরের প্রসঙ্গ এসেছে এবং ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ মানুষের প্রতিকারের চেষ্টার কথা হ্যামিলটনের বাঁশিওয়ালার গল্প থেকে শুরু করে বহু বিচিত্রভাবে দেশ-বিদেশের গল্প-নাটক-কবিতা উপন্যাস প্রভৃতিতে বারে বারে লক্ষ্য করা গেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের কাছে ইঁদুর বিভীষিকা স্বরূপ। এখানকার মানুষ ইঁদুরের উপদ্রবে এতই অতিষ্ঠ এবং বিব্রত যে ইঁদুর নিধনের জন্য তারা বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করেছে। গৃহের কাপড়-চোপড়, বইপত্র, বেত-বাঁশের জিনিসপত্র, চটের বস্তা থলে, খড়ের তৈরী নানা জিনিস, পাতার তৈরী বিভিন্ন জিনিস প্রভৃতি যেমন কেটে নষ্ট করে তেমনি ঘরের ও রান্নাঘরের নানা দ্রব্যও চুরি করে ইঁদুর। এখানকার অধিকাংশ ঘর মাটির। সেই মাটির ঘরে গর্ত করে মাটি তুলে গৃহস্থকে জ্বালাতন করে তোলে। এগুলি যদিও সহ্যকরা যায়, কিন্তু ইঁদুর যখন শস্যের ক্ষতি করে তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ আর চুপ করে থাকতে পারেনি। ইঁদুর বংশ ধ্বংস করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ইঁদুর মারার নানা কৌশল প্রচলিত আছে। সেগুলি হল—

(১) কেঁড়ে কল—ভুলি বাঁশের ফাঁপা লম্বা পাউ(পাব)কে কেটে নিয়ে কেঁড়ে তৈরী করা হয়। এই কেঁড়ের মুখে জাল লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই জালের মধ্যে একটা ফাঁক থাকে, যার মধ্যে দিয়ে ইঁদুর ঢুকতে পারে। কেঁড়ের মধ্যে কিছু খাবার রাখা হয়। এই খাবারের গন্ধে ইঁদুর ভেতরে ঢুকলে জালে জড়িয়ে যায়।

(২) হাঁড়ি কল—মাটির হাড়ির মধ্যে খড়ের তৈরী আলটা (বেড়) দিয়ে সাজানো হয়। ভেতরে ঘুলঘুলি থাকে। হাঁড়ির মুখ থেকে তলা পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ রাখা হয়। যার মধ্যে দিয়ে ইঁদুর ঢুকতে পারে। এইবার ভেতরে কিছু খড় রাখা হয় এবং খড়ের মধ্যে খই-চাড়া, ধান প্রভৃতি রাখা হয়। এরপর হাঁড়িটাকে উপুড় করে গর্তের মুখে রাখা হয়। খইচাড়া ধানের গন্ধে ইঁদুর হাঁড়ির মধ্যে ঢুকলে আলটার ঘুলঘুলিতে পথ হারিয়ে ফেলে, আর বের হতে পারে না।

(৩) জাঁতিকল—এটি লোহার তৈরী। জাঁতির মত দুটি দাঁতওয়ালা পাত দুদিকে থাকে। মাঝখানে একটি লোহার পাত খুব আলগাভাবে উঁচু করে লাগানো থাকে, তাতে ন্যাকড়ার পুঁটলি করে কিছু খাবার বেঁধে দেওয়া হয়। সমস্ত যন্ত্রটি এমনভাবে সাজানো থাকে যে ইঁদুর এসে খাবারে মুখ দিয়ে টানাটানি করলেই মাঝখানের লোহার পাতটি পড়ে যায় আর দুদিক থেকে দাঁতওয়ালা পাত এসে ইঁদুরকে জাঁতিতে সুপারী কাটার মত চেপে ধরে।

সুতো কল—এটি মূলতঃ শক্ত সুতো দিয়ে তৈরী ফাঁস বা ফাঁদ। এই ফাঁদ ইদুরের গর্তের চারপাশে বিছিয়ে রাখা হয়। ইঁদুর গর্ত থেকে বের হয়ে চলতে গেলেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। আর ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে না।

গর্ত তাড়া—ইঁদুর ধরা এবং ইদুর ধরে মেরে ফেলার এ এক প্রকার পদ্ধতি। মুসাহর/মুষাহর নামের এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পেশা ছিল ইঁদুর ধরা। এই আদিবাসী মানুষরা যে পদ্ধতিতে ইঁদুর ধরে, সেইরকম পদ্ধতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্যবহৃত হয় না। এখানকার মানুষ প্রধানত

গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে ইঁদুর ধরে। শুধু ইঁদুর ধরার জন্য নয়, ইঁদুর গর্ত খোঁড়ার অন্য কারণ আছে। ইঁদুর মাঠ থেকে ধানের শিস কেটে নিয়ে গর্তের মধ্যে থরে থরে সাজিয়ে রাখে। গর্ত খুঁড়ে সেই ধান বের করা হয়। সময় সময় এক একটা গর্ত থেকে দশ/পনেরো পালি ধান পাওয়া যায়। গর্ত খুঁড়ে ইঁদুরের দেখা না পেলে জল ঢেলে দেওয়া হয়। ক্রমাগত জল ঢালার পর ইঁদুর আর গর্তের মধ্যে থাকতে পারে না, বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাকে জাল দিয়ে জড়িয়ে আর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

এছাড়া বিষ দিয়ে ইঁদুর মারার সনাতন পদ্ধতি অন্যান্য দেশের মত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়ও প্রচলিত আছে।

ইঁদুর ধরার এবং ইঁদুর মারার এইসব পদ্ধতি যখন যথেষ্ট কার্যকরী হয় না তখন মানুষ ইঁদুরের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য ওঝা গুণিনের শরনাপন্ন হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের বিশ্বাস এবং সংস্কার হল এই যে —ওঝা গুণিনরা মন্ত্রবলে সব কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারেন, সমস্তরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তাই ইঁদুরের উপদ্রব নিবারণের জন্য ওঝা গুণিন ধরে। ওঝা গুণিনরা সহজেই আশ্বাস দেন এবং মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্য ব্যবহার করে ইঁদুরের উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা করেন।

ইঁদুর হল গণেশ ঠাকুরের বাহন। আবার গণেশ ঠাকুর হলেন সর্বসিদ্ধিদাতা। তাই ইঁদুর মারলে গণেশ দেবতা ক্রুদ্ধ হতে পারেন এমন একটা ধারণা এবং বিশ্বাস সূক্ষ্মভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনসমাজে ও ওঝা গুণিনদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাই ওঝা গুণিনগণ ইঁদুর মেরে ফেলা অপেক্ষা ইদুর তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাতে ইঁদুর বিতাড়নের ব্যাপারটি বলা আছে। এছাড়া যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তাদের গন্ধে ইঁদুর পালিয়ে যায়, মারা পড়ে না।

ইঁদুর তাড়ান মন্ত্র ও পদ্ধতি: ইঁদুর গণেশ দেবতার বাহন বলে গণেশ দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিধিমতে গণেশ পূজা করা প্রয়োজন। গণেশ পূজার শেষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একত্র করে মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

(১) অশ্লেষা কিংবা হস্তা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দর মূল তুলতে হবে। এই মূলের সঙ্গে বেনার মূল, মুথোর মূল, শ্বেত আকন্দের আটা, তিল, মাষ কলাই, পলাণ্ডু, ছাগল নাদি ও হরিতাল একত্র পেষণ করে কিছু ইঁদুর মাটিতে মাখিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তারপর ঐ ইঁদুর মাটি সমস্ত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট মাটি একটি পাত্রের মধ্যে রেখে ঘরের একস্থানে রাখতে হবে।

(২) ছাগলনাদি, ছাগমূত্র, পেঁয়াজ, বিড়ালের বিষ্ঠা, হরিতাল একত্র করে পিষে লেই করতে হবে। এরপর কোন প্রকারে একটা ইঁদুর ধরে ইঁদুরের গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে আর ইঁদুরের মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। ঐ ইঁদুর দেখে আর সব ইঁদুর পালিয়ে যাবে।

(৩) কৃত্তিকা, কিংবা মঘা কিংবা রেবতী কিংবা অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল তুলতে হবে। এর সঙ্গে যষ্টি মধু, অর্জুন বৃক্ষের ফল ও পুষ্প, রক্ত চন্দন, মুথোর মূল একত্র করে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। এরপর মন্ত্রপূত ঐ সকল দ্রব্য শস্যক্ষেত্রের চারিকোণে ও মাঝখানে পুঁতে দিলে ইঁদুর শস্যের ক্ষতি করতে পারবে না। ঐ সকল দ্রব্য ঘরের মধ্যে রেখে দিলে ঘরে আর ইঁদুর ঢুকবে না। এ ছাড়া ঐ দ্রব্যগুলি গোলা, মরাই, রান্নাঘর, পড়ার ঘর ইত্যাদিতে রেখে দিলে ইঁদুর আসবে না।~

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ইঁদুরের তিনরকম শ্রেণীর কথা প্রচলিত আছে—ছোট, মাঝারি, আর বড়। ছোট ইঁদুরকে বলা হয় নেংটিকে (নেংটি), মাঝারিদের কেবল

ইঁদুর বলা হয়, আর বড় ইঁদুরদের বলা হয় ধেড়ে। ধেড়েরা ফল ও শস্যের বেশি ক্ষতি করে. ধানের মাঠে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। মাঝারি ইঁদুর ঘরের রান্নাঘরের জিনিসপত্র কেটে দেয়, চুরি করে নিয়ে যায়। গুটকেগুলি বইপত্র কাটে, কাপড়চোপড় কেটে যায়, অন্যান্য ছোটখাট জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়।

মূষিক বিতাড়ন মন্ত্র

ঘরদুয়ারে মন্তর দিলাম, গোলাঘরে ভাঁড়ার ঘরে দিলাম চাবি।
বন্ধন দিলাম ধানের মাঠ
যারে মূষিক তুই এবে পুয়া বাট।
ঘুরিস ফিরিস, পালিয়ে যা ঢুকিস না।
ঘরের কবাট ঠেলিস না, আমার কথা ফেলিস না।
ঘর দুয়ারে যদি দেখি
খেয়ে নেবে শ্যেন পক্ষী॥
এতে যদি না হয় ডর।
মার্জারের হাতে তবে মর॥
ঘরে আছে গন্ধগুলি আছে ফাঁদ পাতা।
গণেশ ঠাকুরের দিব্যি দিস না ওতে মাথা॥
চৌদুয়ারী বাঁধলাম দিয়ে ভীষণ জোর।
এলেরে মূষিক নিস্তার নেই তোর।
গণেশ ঠাকুরের ধড়ে আছে হাতির মাথা।
নিব্বংশ হবি তুই বলে দিলাম কথা॥
কার আজ্ঞে—
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—
গণেশ দেবতার আজ্ঞে।

মন্ত্রটি ছড়া ধর্মী। আদেশ কাড়া অংশটি বাদ দিয়ে একে দিব্যি লোকছড়া বলে চালান যায়। তুচ্ছ ইঁদুরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে তাকে নির্ব্বংশ হবার জন্য গাল দিচ্ছে মানুষ এ চিত্র বড় দুর্লভ। ইঁদুরের অত্যাচার গৃহস্থের জীবনকে কতখানি দুর্বিষহ করে তুলতে পারে, এটি তার প্রমাণ। ইত্যাদি।

এছাড়া ঘুনপোকা, উকুন এবং ছারপোকা বিনষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার টোটকার কথা পাওয়া গিয়েছে।

কলকে ফুলগাছের যে ফল হয় তার বীজের মধ্যেকার শাঁস, তুঁতে চূর্ণ আর তেঁতুল জল একত্র করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। এরপর "ওঁ হ্রীং হ্রাং হিং ক্লৌং ক্লৌং ক্ষঃ ক্ষঃ" মন্ত্রটি এক হাজারবার পাঠ করে লেইতে জলের ছিটা দিতে হবে। এরপর ঐ লেই কাঠে লাগালে ঘুন পোকা চলে যায়।

ইনাচিরনি (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই নামটি প্রচলিত) গাছের পাতা 'ওঁ শাং শিং শ্রিং শৌং শৌং স্বং সঃ স্বাহা" মন্ত্রটিতে পাঁচ হাজার বার অভিমন্ত্রিত করে গোলা বা মরাইয়ের মধ্যে রেখে দিলে ধানে পোকা লাগে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য একপ্রকার সাদা ছোট ছোট পোকা (যাদেরকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পুঁতি পোকা বলে) গোলার ধান নষ্ট করে দেয়।

মাকাল ফলের বীজ, বকুল বীজ, বহেড়া গাছের কাঠ, সোমরাজী গাছের পল্লব, অর্জুন গাছের ফল, রক্ত চন্দন, গুগগুল, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী গাছের পাতা শুষ্ক করে একত্র চূর্ণ করে সেই চূর্ণ এক হাজার আটবার 'হ্রীং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে বিছানায় আসবাব ইত্যাদিতে ছড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে ছারপোকা দূর হয়। আবার ঐ চূর্ণ 'ক্রীং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে বাড়ী থেকে পিঁপড়ার উৎপাত দূর হয়।

কনক ধুতুরার বীজ চূর্ণ, রিঠা ফলের শাঁস চূর্ণ, ক্ষুদে কেষ্ট গাছের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক প্রকার শাক জাতীয় উদ্ভিদ) রস একত্র মিশ্রিত করে ওঁ হ্রৈং ক্লৌং মন্ত্রটি পঞ্চাশ হাজার বার পাঠ করতে হবে। এরপর মন্ত্রপূত মিশ্রণটি মাথায় রেখে তিনঘণ্টা অতিবাহিত করতে হবে। এইভাবে তিনদিন পালন করলে মাথা থেকে উকুন দূর হয়ে যাবে। আর সাতদিন ব্যবহার করলে মাথা থেকে 'নিকিনি' (ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি ডিম) দূর হয়ে যাবে।

তন্ত্র মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (৬) :

পৃথিবীর সব দেশের সব কালের মানুষের মতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের আদি ও অকৃত্রিম কামনা ও বাসনা হল ভালভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকা। কিন্তু এটাই তাদের কাছে স্বপ্ন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ মানুষ মূলতঃ কৃষি নির্ভর এবং শ্রমনির্ভর। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী। সেখানে সুখ কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান কালের ব্যবস্থায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় ও ভোগের উপকরণ তাদের কাছে দূরগ্রহের মত সুদূরস্পর্শী। কিন্তু তবুও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির আহ্বানে তারা সাড়া দেয়— খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব অনটন নিবারণের উপায়। কোথায় আছে সুখ-সমৃদ্ধি, কোথায় আছে ভোগ-আরামের উপকরণ। কিন্তু কে জানাবে তাদের সেই ঠিকানা—বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনসংখ্যার অধিকাংশ যেখানে কৃষক, কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর প্রভৃতি বৃত্তিধারী ও মাহিষ্য, কৈবর্ত, পৌণ্ড্র, সদগোপ হাড়ি, মুচি, বাগদী, ডোম, নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণীয় মানুষ, যারা বহুকাল ধরে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার, অবিচার, অবহেলা, বঞ্চনা, ঘৃনা সহ্য করে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে আছে। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কে ভাববে? অথচ মজার কথা হল—এরাই সমাজের বৃহত্তর অংশ, এরা খাদ্য-পণ্য উৎপাদন করে রসদের যোগান দেয়, মানুষের ভোগসুখের উপকরণ তৈরী করে। যাই হোক, এই সব মানুষেরা যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে না, তখন নিজেরাই নিজেদের বাঁচার পথ অন্বেষণ করে। একটুখানি সুখ-শান্তির আশায় হাতের কাছে পাওয়া মোটামুটিভাবে সহজলভ্য ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয়। আর ওঝা-গুণিনগণ তাদের সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখায়।

ওঝা-গুণিনগণ যেমন মন্ত্র ও দ্রব্যগুণের সাহায্যে দুঃখদুর্দশা দূর করার চেষ্টা করেন, তেমনি সাংসারিক উন্নতি ও সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। এঁরা কেউ মন্ত্রসিদ্ধ, কেউ সিদ্ধ সাধক কিংবা তান্ত্রিক, আবার কেউ কেউ দেবদেবীর কৃপাধন্য স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী। এঁরা মন্ত্র, দ্রব্য, শিকড়-বাকড়, ধাতু, পাথর প্রভৃতির সাহায্যে তাদের ক্রিয়াকলাপ চালায়। এখন বিভিন্ন উপায়ে সাংসারিক উন্নতি ও সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধির নানা পর্যায় আলোচনা করা হচ্ছে—

(১) **শস্যবৃদ্ধি :** কৃষিনির্ভর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শস্যের ফলন বৃদ্ধি কৃষকের কাছে বড় আকাঙ্ক্ষার, বড় আগ্রহের বিষয়। সারা বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্ট করে, কি অমানুষিক পরিশ্রম করে চাষীরা শস্য উৎপাদন করে। সার দিয়ে, ঘাস-আগাছা নির্মূল করে,

রোগ পোকা নিবারণের ওষুধ ছড়িয়ে তারা অধিক উৎপাদনের স্বপ্ন দেখে। যদি এত সব না করে, প্রচুর পয়সা খরচ না করে সহজে স্বল্পব্যয়ে ওঝা-গুণিনের তুকতাক আর মন্ত্রের জোরে শস্যের বৃদ্ধি ঘটানো যায়, তাহলে এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে।

পদ্ধতি : মন্ত্রসিদ্ধ ওঝা-গুণিন কিংবা তান্ত্রিক শস্যবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ করেন। প্রথমে ক্ষেত্রদেবতার পূজা করা হয়, পরে মা লক্ষ্মীর সাড়ম্বর পূজা করা হয়। অনেক গুণিন ক্ষেত্রদেবতা হিসাবে বেনাকির পূজার কথা বলেন। কিন্তু শস্য ও শস্যক্ষেত্রের দেবতা হিসাবে বেনাকির পূজা হয় অগ্রহায়ন মাসে, কিন্তু শস্যবৃদ্ধির জন্য ওঝা-গুণিনের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাই অনেকে শস্যবৃদ্ধির গুণিনী ক্রিয়াকলাপের জন্য বেনাকি-পূজাকে পছন্দ করেন না। কেবল ক্ষেত্রদেবতার উদ্দেশ্যে ঘটপূজা করেন।

ক্ষেত্রদেবতা পূজা ও লক্ষ্মীপূজার পর মাটিতে একটি গোধিকা মূর্তি অঙ্কন করা হয় খড়ি দিয়ে কিংবা লাল বালি দিয়ে। মূর্তির মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়। একটি বৃত্তের মধ্যে কিংবা চতুষ্কোণ ঘর এঁকে দেওয়া হয় গোধিকা মূর্তির চারপাশে। এই ঘরের মধ্যে রাখা হয় কিছু ধান, স্বাতী কিংবা পূর্বাষাঢ়া কিংবা অনুরাধা নক্ষত্রে সংগৃহীত বহেড়া বৃক্ষের পরগাছা, যবের শীষ, যব, কুড়, হরিতকী বৃক্ষের ছাল, কয়েকটি কড়ি, তিল, শ্বেত সরিষা, মাষ কলাই ও কিছু অশোক ফুল। এইবার এই দ্রব্যগুলিকে মন্ত্রপূত করতে হবে। বলা বাহুল্য এখানে যে মন্ত্রগুলির প্রয়োগ করা হয় সেগুলি বীজমন্ত্র। প্রধানত ভুবনেশ্বরী মন্ত্র কিংবা কমলামন্ত্রের প্রয়োগ এখানে হয়। এই মন্ত্রগুলি হল—"হ্রীং। ঐং হ্রীং শ্রীং" কিংবা শ্রীং। ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং।' এই দুটি মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। তারপর পূজাস্থানের দ্রব্যগুলির উপর তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে।

এইভাবে অভিমন্ত্রিত করার পর দ্রব্যগুলিকে নিয়ে চারটি ভাগ করে জমির চার কোণে পুঁতে দিতে হবে। এই সমস্ত কার্য সমাধা হয়ে যাবার পর জমিতে শুষ্ক তৃণ, আগাছা প্রভৃতিতে পূর্ণ করে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর বৃষ্টির জল পড়লে জমিতে হল কর্ষণ করে নিয়মমত চাষ করতে হবে। এইভাবে করলে প্রচুর শস্যবৃদ্ধি ঘটবে।

ধন ধান্য অক্ষয় করণ : চাষী যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান কলাই, প্রভৃতি ফসল ফলাতে পারে এবং সেই ফসলে তার গোলা কিংবা মরাই ভর্তি থাকে তাহলে তার যা আনন্দ হয় পৃথিবীর আর কোন আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। কিন্তু এই ফসল বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। শূন্য হয়ে যায় শস্যভাণ্ডার। কারণ চাষীর একমাত্র সম্বল হলো এই উৎপাদিত ফসল। এর উপর নির্ভর করে তার অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ এবং সংসার যাত্রার অন্য উপকরণাদি সংগ্রহ করতে হয়। তাই সে এক অলীক আশায় বুক বেঁধে ছুটে যায় ওঝা গুণিনের কাছে—তা হল, তার গোলা যেন খালি না হয়ে যয়, যথেষ্ট ব্যয় করলেও সম্পদের হ্রাস যেন না হয়, ঘাটতি যেন না ঘটে। ওঝা-গুণিন মন্ত্র ও নানাবিধ ক্রিয়া কর্মের দ্বারা তার সেই আশাপূরণ করেন।

পদ্ধতি : এখানেও প্রথমে যথোপযুক্তভাবে সমারোহ সহকারে ধনধান্যের দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করা হয় এবং সারাদিন উপোস করে ব্রতকথা পাঠ, প্রসাদ ভক্ষণ প্রভৃতি করে প্রাথমিক কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চারটি ক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজ বা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হয়। গুণিনারা একে যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রের চারটি কক্ষের তিনটিতে তিনটি অষ্টদল পদ্ম ও অপরটিতে একটি পায়রা আঁকা হয়। এবার যন্ত্রটির উপর পঞ্চ শস্য, পঞ্চরত্ন, দাড়িম্ব বৃক্ষের মূল, সসাজ কড়ির চুপড়ি, সিঁদুর মাখানো ছোট কাঠের নৌকা, শ্বেত চামর, আলতা, সিঁদুর, একজোড়া লোহা ও একজোড়া

শাখা, লালপাড় শাড়ী, যবের শীষ, কলার ফুল, ঘৃত, মধু, বক্তবর্ণো ফুল, পদ্ম ফুল, শ্বেত বেড়েলার মূল এবং পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সংগৃহীত যজ্ঞ ডুমুর গাছের পরগাছা রাখা হয়। এইবার 'ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ধনদায় স্বাহা" মন্ত্রটি তিনলক্ষ বার জপ করে তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে। কিংবা প্রতি এক লক্ষ বার জপের শেষে একবার করে মোট তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে। এইবার দ্রব্যগুলিকে একটি লাল চেলিতে বেঁধে গোলার এক কোণে রেখে দিতে হবে। তবে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রতি বৎসর গোলাতে ধান ওঠার আগে এই ব্যাপারটি করতে হবে। অর্থাৎ একবার করলে চিরকালের জন্য হবে না। প্রতি বৎসর উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যাপারটি সংঘটিত করলে ধনধান্য অক্ষয় হবে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি: শস্য বৃদ্ধি এবং জমির উর্বরতাবৃদ্ধি ব্যাপার দুটি একে অপরের পরিপূরক। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে ফসলের ফলন বাড়ে অর্থাৎ শস্যবৃদ্ধি ঘটে। আবার উল্টা দিক থেকে বলা যায় শস্যবৃদ্ধি হওয়া মানে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাওয়া। জমির উর্বরতা না বাড়লে কিভাবে বেশি ফসল ফলবে। তবুও কৃষক চায় সমস্ত দিক থেকে নিঃশঙ্ক হতে। সে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা করে সঙ্গে সঙ্গে বেশি ফসলের আশা করে এবং এই উভয়ের জন্য ওঝা গুণিনের দ্বারস্থ হয়। আর ওঝা-গুণিনরাও উভয় ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করে।

পদ্ধতি: জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ওঝা গুণিনগণ যে পূজার বিধান দেন তা অনেকটা পৃথিবী পূজার মত। অতি প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীকে শস্যোৎপাদিনী দেবী রূপে দেখার ধারা বয়ে চলে আসছে। পৃথিবী হলেন মাতা—প্রাণ ও প্রজনন শক্তির দেবী। বৈদিক সাহিত্যে এর নিদর্শন মেলে। ঋগ্বেদে পৃথিবী দেবী স্তন্যদায়িনী মাতার সঙ্গে অভিন্নার্থে পরিগণিত হয়েছে। অথর্ববেদে সন্তানবৎসলা মাতৃমূর্তির মত পৃথিবী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণে, কালিদাসের কাব্যে এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পৃথিবীর মাতৃমূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। মোট কথা পৃথিবীদেবীর পূজা থেকে শস্য পূজার শুরু হয়েছে বলা যায়। দুর্গাপূজার নবপত্রিকা হল শস্য-বধূ এবং নবপত্রিকা পূজা হল শস্যপূজা।

ওঝা-গুণিনগণ প্রথমে নবপত্রিকার শস্যবধূর মত একটি মূর্তি তৈরী করেন। খড় দিয়ে তৈরী একটি মাতৃমূর্তির গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী ডাল, বিল্বডাল, ডালিমের ফুল, মানকচু, অশোক ফুল, ধানের শীষ, যবের শীষ, আমলকির ডাল, হরিতকীর ডাল, আমের শাখা, বটগাছের ও অশ্বত্থগাছের পল্লব। এরপর মূর্তির কপালে সিঁদুর দিয়ে তাকে যথাযোগ্য সমারোহ সহকারে পূজা করা হয়। পূজা শেষে পূজা বেদীর সামনে একটি লাঙ্গল আঁকা হয়। লাঙ্গল চিহ্নের উপর একটি ছোট কাঠের নৌকাতে একটু গোময়, কিছু ছাই আর পঞ্চ শস্য দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর "ওঁ ঐং ধরিত্রীং হ্রীং ক্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্রীং স্বাহা" মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ করতে হবে। জপের শেষে একটি নতুন লাঙ্গলে জমি কর্ষণ করতে হবে। তারপর নৌকাতে রাখা দ্রব্যগুলি কর্ষিত জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে ওঝা-গুণিনগণ জমির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের আর্থিক জীবন কৃষির উপর নির্ভরশীল। শুধু আর্থিক জীবন নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির নানাদিক কৃষিকর্মকে ঘিরে আবর্তিত হয়। মোট কথা কৃষি এই জেলার মানুষের জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শস্যবৃদ্ধি, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি কিংবা ধান্য-অক্ষয়করণ ব্যাপারগুলি এখানকার মানুষের কেবলমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়, এগুলি যেন তাদের জৈব ও সমাজ জীবনেরও অঙ্গ এবং ধীরে ধীরে কখন অজান্তে এগুলি এখানকার লোক-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে তা কেউ জানে না। আমাদের দেশের ওঝা

গুণিনগণ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এগুলির অনুশীলন করলেও পরোক্ষভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক সংস্কৃতিকে পুষ্ট করছে এমন কথা ভাবলে অযথার্থ হয় না।

তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (৭) :

অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনি-র মুখ দিয়ে বাঙালীর চিরকালের কামনার কথা প্রকাশ পেয়েছিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" অর্থাৎ 'দুধেভাতে' থাকাটাই বাঙালী জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির নিদর্শন। ধন-রত্ন নয়, অলংকার নয়, ঐশ্বর্য নয়—শুধু ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা। বাঙালীজাতি এতেই সন্তুষ্ট ছিল একদিন। গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আর গোয়াল ভরা গরু (গাই)—সম্পন্ন এবং সচ্ছল বাঙালী পরিবারের এই চিত্রটাই একদা বাংলাদেশে খুবই পরিচিত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এর ব্যতিক্রম নয়। কৃষিনির্ভর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ধান, মাছ আর দুধের সংস্থান করাই তো সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ধান, মাছের পরে দুধই এক সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বলে দুগ্ধ উৎপাদনে এই অঞ্চলের মানুষ খুব যত্নবান ছিল। প্রায় লোকের বাড়ীতে চাষের জন্য বলদের সঙ্গে গাভী থাকত। গাভীকে দেবতা হিসাবে পূজা করা হত। গাভীকে ভাবা হত মা ভগবতীর অংশ। আজও এখানকার গ্রামাঞ্চলে পয়লা বৈশাখে গাভীকে স্নান করিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে পূজা করা হয়। শ্রাদ্ধকর্মে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানেও গাভীকে পূজা করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই সংস্কার এখনও প্রচলিত আছে যে মৃত্যুরপর স্বর্গে যেতে গেলে গাভীর লেজ ধরে বৈতরণী নদী পার হতে হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক সংস্কৃতিতে গাভীর একটি পুণ্যময় মঙ্গলজনক এবং শুভকারক ভূমিকা আছে। গাভী শুভ এবং মঙ্গলের প্রতীক। যাত্রাকালে গাভী দর্শন শুভ। এক সময় এমন সংস্কার বিশ্বাস প্রচলিত ছিল—বলা হত, যে বাড়ীতে গরু থাকে না, সে বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকে না। এই গাভী যাতে ভাল থাকে, সুস্থ থাকে সে জন্য মানিকপীরের সিন্নি দেওয়া হয়। গাভী তথা গরুর প্রশস্তি মূলক "গইলে গান" আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। মনে পড়ে আমার ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের বাড়ীতে বিচিত্র পোষাক পরে পীরবাবা (মুসলমান ফকির) আসতেন, গোয়ালের দ্বারে বসে চামর ডুলিয়ে (দুলিয়ে) গান গাইতেন "মুশকিল আসান কর দয়াল মানিকপীর....."।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এক সময় দুধের প্রাচুর্য ছিল। প্রায় সব বাড়ীতে গরু থাকত। আর দুধ, ঘি, ঘোল, মাখন তৈরী হত ঘরে ঘরে। এমনও প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে এই অঞ্চলের লোকেরা 'দুধে আঁচাত আর ঘোলে ছোঁচাত।' কথাটির মধ্যে কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা থাকলেও দুধের প্রাচুর্য বোঝাতে সাধারণ লোক এইরকম ভাষা ব্যবহার করত। দুধের প্রাচুর্যের কারণ হিসাবে দেখা যায় এই অঞ্চলে আবাদী জমি, বনাঞ্চল, গোচারণ ভূমি বেশি ছিল। ফলে গবাদি পশু পালনের আদর্শ স্থান ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। সে কারণে গোচারণ আর দুগ্ধ উৎপাদন যথেষ্ট বেশি হত।

কিন্তু মানুষ যত পায় তত চায়। এত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সমারোহ, তবুও এখানকার মানুষ চায় আরও বেশি উৎপাদন। চাষী-গৃহস্থ সবাই কামনা করত গরু যা দুধ দেয়, তার থেকে যেন আরও বেশি দুধ দিক। সেজন্য পূজা আচ্ছা, টোটকা চিকিৎসা, তুকতাক প্রয়োগের অন্ত নেই। তবে গো-বদ্যিদের চিকিৎসার থেকে মানুষ বেশি পছন্দ এবং নির্ভর করত ওঝা-গুণিনের উপর। এখানকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যে ইচ্ছা করলে ওঝা-গুণিনরা গো-মহিষাদির দুধের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ করে। এক শ্রেণীর ওঝা-গুণিনও ঝাড়-ফুঁকের সাহায্যে এইসব ক্রিয়াকাণ্ড করতেন। এখন গ্রামেগঞ্জে এই ধরনের মন্ত্র-প্রয়োগের কথা জানা যায়।

গো-মহিষাদির দুগ্ধ বৃদ্ধি : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

(১) গো-মহিষাদির দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ হল --এদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন থাকা। সেজন্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ কিছু আচার-সংস্কার পালন করে থাকে। সেগুলি হল—

(ক) গরুর খাদ্যের দিকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।

(খ) বাড়ীর পশ্চিম দিকে গোয়াল ঘর থাকবে। একটা প্রবচন প্রচলিত আছে—পূবে বাঁধি, পশ্চিমে বাঁধি। অর্থাৎ বাড়ীর পূর্ব দিকে রান্না ঘর আর পশ্চিম দিকে গোয়াল ঘর থাকবে।

(গ) এঁটো হাতে গোয়ালে প্রবেশ করা চলবে না।

(ঘ) তেল মাথায় দিয়ে গোয়ালে প্রবেশ করা চলবে না।

(ঙ) অশৌচ অবস্থায় গোয়ালে ঢোকা চলবে না।

(চ) নারীরা রজস্বলা অবস্থায় গোয়ালে ঢুকতে পারবে না।

(ছ) গোয়ালের মধ্যে গলায় দড়ি অবস্থায় কোন গরুর যেন মৃত্যু না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(জ) গরুর ডাবায় চোনা-গোবর যেন না পড়ে।

(ঝ) গোয়াল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে হবে।

(ঞ) প্রতি বৎসর গোয়ালের মাটি কেটে তুলে দিয়ে নতুন মাটি দিয়ে মেঝে করতে হবে।

(ট) প্রতি পয়লা বৈশাখে গোয়ালে পূজা করতে হবে।

(ঠ) মানিকপীরের সিন্নি ও ক্ষীর দিয়ে ভগবতীর পূজা দিতে হবে।

(২) যে সমস্ত মুসলমান ফকির (পীর) মুশকিল আসানের গান গাইতে আসেন তাঁরা যেমন গবাদি পশুর মঙ্গলের জন্য 'গইলেগান' করেন, তেমনি গরুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুগ্ধবৃদ্ধির জন্য দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করেন। মানিকপীরের দোয়া ভিক্ষা করে গোয়ালে শান্তিজল ছড়িয়ে দেন। এই সমস্ত মুসলমান ফকির অনেক সময় নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ ঘটান।

(৩) ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্রের প্রয়োগ করে দুগ্ধ বৃদ্ধি করেন।

প্রথমে কৃষ্ণ ও ভগবতীর পূজা করতে হয়। পূজার শেষে কিছু সবুজ কাঁচা ঘাস এবং খড় খণ্ড খণ্ড করে কেটে মেশাতে হয়। এখন এই ঘাসখড়কে মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হয়। মন্ত্রটি হল— 'ওঁ হ্রীং ক্রীং। ওঁ দুগ্ধাবিনী প্রসব ওঁ শীতলম। ওঁ ক্লৌং ক্লৌং ফট্ স্বাহা'' এই মন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। তারপর ঐ অভিমন্ত্রিত ঘাসখড় গরুকে খেতে দিতে হবে। তাহলে গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি ঘটবে।

আর একটি পদ্ধতি হল—পুষ্যা নক্ষত্রে যজ্ঞ ডুমুর গাছের পরগাছা সংগ্রহ করতে হবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে কিংবা স্বাতী নক্ষত্রে কুলগাছের পরগাছা সংগ্রহ করতে হবে। এই সংগ্রহ করার মন্ত্র হল "ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং পূর্বদয়াং ওঁ হ্রীং ফট স্বাহা।'' এইবার পাঁচরকম পাতা (গরু যে পাতা খেতে ভালবাসে) এদের সঙ্গে মিশ্রিত করে 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' বীজমন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। এরপর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চৈস্বরে সাতবার পাঠ করতে হবে।

ওঁ দেবী ভগবতী দয়া করো মাগো।
তোমার সন্তানে মাগো তুমি একটু দেখো॥
কাঁউরেতে আছে বুড়ি গয়লানী।
সে কেবল তোলে ক্ষীর সর ননী॥
তার গাভীর বাঁটে দুধ না শুকায়।

দিনে দিনে বাড়ে বই কমে না যায়॥
পুরাকালে তপোবনে আছিল কাম ধেনু।
যত খুশি দুধ দোও কখন না কমে॥
সেই সব দুধ চলে আসুক এই গাভীর বাটে।
তোমাকে রাখব মাগো সোনা-মানকের খাটে॥
কার আজ্ঞে —
যাঁউবের কামিক্ষ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে
মা ভগবতীর আজ্ঞে॥

মন্ত্রটিতে বানান ভুল, ভাষার গোলমাল, ছন্দদোষ, প্রসঙ্গের অসঙ্গতি প্রভৃতি থাকলেও পুরাণ-কাহিনীর আভাষ আছে। মন্ত্র হিসাবে কতখানি সঠিক এবং শক্তিশালী কিনা সে বিচার এখানে অবান্তর। যাই হোক মন্ত্রটি সাতবার পাঠ করে তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে পাতাগুলিতে। এইবার উদ্ভিদ গাভীকে খেতে দিতে হবে। তাহলে গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে।

স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি : জমিতে শস্য বৃদ্ধি, পুকুরে মৎস বৃদ্ধি আর গো মহিষাদির দুগ্ধ বৃদ্ধিতে সংসারে সচ্ছলতা বাড়ে, সুখ শান্তি বাড়ে; তেমনি সুলক্ষনা, গুণবতী স্ত্রীর কল্যাণে সংসার সুখে শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, সেই স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটলে গৃহস্থের সংসার ভরে ওঠে। ওঝা-গুণিনের মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটানো যায়।

তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, দুষ্টা দুশ্চরিত্রা, মন্দ স্বভাবের স্ত্রীদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি না ঘটানোই ভালো, কারণ এদের সৌভাগ্য বৃদ্ধিতে সংসারে অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ আসবে না। এদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি মন্দপথে চালিত হবে। তাই সুলক্ষণা, গুণবতী, সুস্বভাবের অধিকারিনী নারী তথা স্ত্রীগণের সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রতন্ত্রের প্রযোগ ঘটানো উচিত।

স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

প্রথম পদ্ধতি: হস্তা কিংবা পুষ্যা কিংবা রেবতী নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দ, শ্বেত অপরাজিতা ও শ্বেত করবীর মূল উত্তোলন করতে হবে। এই ত্রিমূল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। মন্ত্রটি হল "ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং। ওঁ আং হ্রীং ক্রৌং। ওঁ হস কল হ্রী হসকল হ্রীং সকল হ্রীং॥" মন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। জপের শেষে একটি তামার মাদুলিতে ভরে লাল কারে (ঘুনসিতে) বেঁধে বৃহস্পতিবার সকালে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্রে হাতে বাঁধতে হবে কিংবা ঘুনসির বদলে রূপার চেনে গলায় পরতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: কোন বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে কিংবা চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্বেত বেড়েলার মূল,অপামার্গের মূল এবং শ্বেত ধুতুরার মূল উত্তোলন করে তার সঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই ত্রিধাতু একত্র করে রৌপ্য মাদুলিতে ভরতে হবে। এরপর মাদুলিটি তিনদিন একটি পাত্রে গঙ্গাজলের মধ্যে রেখে কমলা মন্ত্রে শোধন করতে হবে। এরপর ঐ শোধন করা মাদুলিতে তিন লক্ষবার তারা মন্ত্র জপ করতে হবে। মন্ত্রটি হল— "ওঁ হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্। ওঁ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ স্বাহা।" এরপর ঐ মাদুলি বৃহস্পতিবার স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্রে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার উপোস থেকে লক্ষ্মী পূজা করতে হবে। তিনদিন নিরামিষ ভক্ষণ করতে হবে। তিনদিন পর কমপক্ষে একশত দীনদুঃখীকে ভোজন করাতে হবে। বলা বাহুল্য মন্ত্রসিদ্ধ গুনিন কিংবা সাত্ত্বিক পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রজপের কাজটি করতে হবে। এইভাবে পালন করলে স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটে এবং স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ ঘটে।

তন্ত্র মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (৮) :

প্রাচীনকালে মুণি ঋষিগণ এবং সিদ্ধ পুরুষগণ ধ্যান যোগে অনেক কিছু জানতে পারতেন, ভূতভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারতেন। কোন এক স্থানে বসে বহু দূরের জিনিস ধ্যান যোগে অবলোকন করতে পারতেন। মহাভারতের যুদ্ধের ধারাভাষ্যকার এইরকম একজন সিদ্ধপুরুষ। ব্যাসদেবের বর প্রভাবে সঞ্জয় দিব্যচক্ষুর অধিকারী হয়েছিলেন। একথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যোগশক্তি তথা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব।

শুধু মহাভারত কেন, বহু পুরাণ কাহিনীতে সাধু-সিদ্ধতান্ত্রিক ও মহাপুরুষগণের জীবনী থেকে এই বিষয়টিও জানতে পারা যায়। ত্রৈলঙ্গস্বামী, জটিয়াবাবা, বামাক্ষ্যাপা, তারাক্ষ্যাপা প্রভৃতি মহাপুরুষগণের এই ক্ষমতা ছিল। তাঁরা ধ্যানযোগে সব কিছু জানতে পারতেন। তাঁরা তাঁদের সাধনক্ষমতাবলে এই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

আমাদের দেশের ওঝা গুণিনগণ মন্ত্রতন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং এখনও এই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনায় গুণিনদের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়টা জানা গিয়েছে যে এমন কোন কাজ নেই যা মন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে করা যায় না। মন্ত্র তন্ত্র এমনই জিনিস যে তার সঠিক প্রয়োগ যদি ঘটানো যায় তবে ফল হতে বাধ্য। সেখানে লৌকিক অলৌকিক বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান যেখানে হার মেনেছে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় বলে দৃঢ় বিশ্বাস এখনও ওঝা গুণিনদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার, পূর্বেও একথা বলা হয়েছে। তা হল— আমাদের দেশে ওঝা-গুণিন বলে যাদের পরিচয় আমরা পাই, প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই গুণিন নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার আশায়, নাম-যশের আশায় এবং অর্থের লোভে কিছুমানুষ কায়দাকানুন শিখে নিজেদেরকে গুণিন বলে চালায়। প্রকৃত গুণিনের কোন প্রচার নেই। তাদের সাধনা অন্তঃসলিলা নদীর মত সকলের অগোচরে নীরবে বয়ে চলেছে। একমাত্র তাঁরাই উত্তর দিতে পারেন মন্ত্র কি ? এর সত্যই কোন শক্তি আছে কিনা এবং এর সাহায্যে কোন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটানো যায় কি না কিংবা কোন অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় কিনা। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের মত এঁদের সাধনা একেবারে গুপ্ত থাকে, যার বাহিরে কোন প্রকাশ নেই।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে গুপ্ত জিনিস জানা যায়, আমাদের দেশে এই বিদ্যার প্রচলনের কথা জানতে পারা যায়, তবে প্রয়োগের কথা জানা যায় না। যেমন— মন্ত্রের সাহায্যে গুপ্তধনের হদিশ পাওয়া যায়—প্রাচীনকালে এই বিদ্যার প্রচলন ছিল। বর্তমান কালে এর পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক গুণিনের জ্ঞান আছে, কিন্তু এই বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে সফল হয়েছেন এমন কথা শোনা যায়নি। তা যদি হত, তাহলে আমাদের দেশের গুণিন প্রথমে গুপ্তধন আবিষ্কার করে ধনী ও বিত্তশালী হয়ে যেত। তাহলে এই বিদ্যার কি কোন ভিত্তি নেই? এটা কি ভুয়ো বা অলীক কল্পনা? এর উত্তরের স্বপক্ষে একটাই কথা বলা যায়—এই ব্যাপারে মন্ত্রতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ করার মত কোন গুণিনের খোঁজ হয়ত আজও পাওয়া যায়নি। প্রকৃত গুণিন যদিওবা আছে—তাঁরা এমনই গুপ্তভাবে থাকেন কিংবা নির্লোভ যে তাঁদের কথা আমরা জানতে পারিনি। আরও একটা বিষয় ভাববার আছে প্রকৃত গুণিন যদি এই ব্যাপারে তাঁর প্রয়োগ সাফল্য দেখান— তাহলে গুপ্তধন আবিষ্কারের জন্য দেশে দেশে মানুষের মধ্যে মারামারি লেগে যাবে।

এখন এই গুপ্তবিদ্যার পদ্ধতি বিষয়ে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছে তার উল্লেখ করছি।

গুপ্তধন সম্বন্ধে জানতে পারা :

প্রথমে পূর্ণিমা তিথিতে যথা নিয়মে ষোড়শোপচারে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করতে হবে। এরপর উপবাসে থেকে পবিত্র হয়ে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি করতে হবে।

(১) হস্তা নক্ষত্রে সংগৃহীত যজ্ঞডুমুর ও শেওড়া গাছের পরগাছা, কৃত্তিকা কিংবা ভরনী নক্ষত্রে উত্তোলিত শ্বেত বেড়ালা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল, কালো ছাগলের দুধ, লালচে রঙের কুকুরের দুধ, গোরোচনা, শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করে তিলক প্রভৃতি প্রস্তুত করতে হবে। এইবার 'ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' বীজমন্ত্রটি দশ লক্ষ বার জপ করতে হবে। জপের শেষে ঐ তিলক কপালে ধারণ করলে গুপ্তধনের হদিশ পাওয়া যায়।

(২) রবিবার চিত্রা নক্ষত্রে দাড়িম্ব বৃক্ষের মূল, মঙ্গলবার মৃগশিরা নক্ষত্রে পদ্মমূল, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল, শতভিষা নক্ষত্রে যজ্ঞডুমুরের মূল আর অনুরাধা নক্ষত্রে নীল অপরাজিতার মূল সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি শুষ্ক করে পেষণ করতে হবে। এর সঙ্গে গুগগুল, কর্পূর, বেল কাঠের কয়লা, স্বর্ণভস্ম এবং রক্তচন্দন মিশ্রিত করে কাজল প্রস্তুত করতে হবে। এরপর "ওঁ ধনদায় স্বাহা। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং শ্রীং ক্রীং ক্লীং।" মন্ত্রটি বিশ লক্ষবার জপ করে ঐ কাজল চোখে পরলে নিশ্চয় করে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায়। সেই দিব্যদৃষ্টির জোরে মাটির তলায় যে সমস্ত ধনরত্নাদি গুপ্ত অবস্থায় আছে তাদের সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

গুপ্তধন আহরণের পদ্ধতি: গুপ্তধন আহরণের পদ্ধতি কিন্তু অতিশয় জটিল, কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাধ্য ও ভীষণ বিপদসঙ্কুল। সাধারণভাবে আমাদের সংস্কার ও বিশ্বাস এই যে কোন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি গুপ্তধনের রক্ষক হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বলা হয় যক্ষ বা যক্ষিনী গুপ্তধনের পাহারা দেয়। এদের হাত থেকে গুপ্তধন উদ্ধার করা খুব বিপদের। যক্ষ বা যক্ষিনী সাধক ব্যক্তি ছাড়া এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। যক্ষ বা যক্ষিনীদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এদের সন্তুষ্ট করতে অনেক সময় মনুষ্য-বলি পর্যন্ত দিতে হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সন্তান বলি, জামাই বলি প্রভৃতি মনুষ্য বলি ঘটিয়ে গুপ্তধন উদ্ধারের জনশ্রুতি আজও প্রচলিত আছে। এখানে যক্ষ যক্ষিনীর অস্তিত্বের সঙ্গে ধনের অধিষ্ঠাত্রী কিংবা রক্ষাকারিনী অন্যান্য দেবদেবীর কথা জানতে পারা যায়। এঁরা স্বপ্নযোগে 'খপ' দিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান দেন। কিন্তু সেই গুপ্তধন পেতে গেলে অনেক কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সাধারণতঃ এই সমস্ত যক্ষ, যক্ষিনী কিংবা ধনরক্ষাকারী দেবতা বা রক্ষাকারিনী দেবী মানুষ বলি চান। সেইজন্য অনেক সময় সন্ধান জানা থাকলেও গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

যাইহোক, গুণিনগণ মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

কোন যক্ষ/যক্ষিনী-মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন বা তান্ত্রিক সাধক একটি যক্ষিনী মূর্তি অঙ্কন করে তিনদিন তিনরাত ধরে যক্ষিনীসাধন মন্ত্র জপ করেন। যক্ষিনী সাধন মন্ত্র হল : 'ওঁ হ্রীং বটবাসিনী যক্ষকুল প্রসূতে বটযক্ষিনী এহ্যেহি স্বাহা।' অবশ্য কোন নির্জন স্থানে এই ক্রিয়া করতে হবে। সাধন পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ ও উপচার সংগ্রহ করতে হবে। এতে যক্ষিনী সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হবেন। তখন তাঁকে নারিকেল দিয়ে পূজা করতে হবে। এই নারিকেল দান করার অর্থ কোন সন্তান বা ঘনিষ্ঠ কাউকে উপহার দেওয়া। সেই সন্তান বা ঘনিষ্ঠজনের নাম করে নারিকেল দান করতে হবে। দানের শেষে সেই সন্তান বা ঘনিষ্ঠজনের মৃত্যু ঘটবে। তখন যক্ষ/যক্ষিনীর নির্দেশমত স্থানে গেলে এবং নির্দেশমত কাজ করলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জামাই বলি দিয়ে, সন্তান বলি দিয়ে গুপ্তধন উদ্ধারের কাহিনী আজও জনশ্রুতি কিংবা কিংবদন্তীর আকারে প্রচলিত আছে। মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত মহেশপুর

গ্রামে, বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামে, সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে এইরকম কাহিনী আজও শোনা যায়। [কিংবদন্তী/লোককাহিনী পর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।]

জনশ্রুতি কিংবা কিংবদন্তী ছাড়া কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই বিষয়ে পাওয়া যায় না। কোন যক্ষিনী সাধক কিংবা যক্ষিনী মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুণিনের সন্ধান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পাওয়া যায়নি। তবে এইভাবে ধনরত্ন উদ্ধারের পদ্ধতি বিভিন্ন গুণিনের কাছে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এই বীভৎস কাজ কেউ হাতে কলমে করে দেখেনি।

তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার : (৯)

শুধু সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা চাষবাসের উন্নতি, শস্যবৃদ্ধি গো-মহিষাদির দুগ্ধবৃদ্ধি প্রভৃতি নয় ওঝা গুণিনগণ মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটাতে পারেন। গ্রাম-গঞ্জের সরল-সাদাসিধা মানুষ এঁদের আশ্চর্যজনক কাণ্ডকারখানায় সহজেই প্রভাবিত হয়ে যায়। এমন কোন জাগতিক ব্যাপার নেই কিংবা এমন কোন ক্রিয়াকর্ম নেই যা ওঝা-গুণিনের দ্বারা সম্ভব হয় না। সে কাজ কিংবা ব্যাপার তুচ্ছ হোক কিংবা মহৎ হোক, আজগুবি হোক কিংবা উদ্ভট হোক, দুঃসাধ্য হোক কিংবা সহজসাধ্য হোক—সব কিছুর জন্য 'মুশকিল আসান'-এর চেরাগ নিয়ে এঁরা তৈরী, সব কিছু সমাধানের জন্য মন্ত্র-তন্ত্র বানানো হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু অঞ্চল ঘুরে বহু ওঝা-গুণিনের সঙ্গে আলোচনা করে এই সত্য আবিষ্কার করা গিয়েছে—এঁদের অভিধানে 'না' বলে কোন শব্দ নেই। কোন গুণিনকে কোন কঠিন ব্যাপার জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি অম্লান বদনে 'হ্যাঁ' বলবেন। তবে সেই ব্যাপারটা ঘটাবেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই কারণ গুরুর নিষেধ আছে, নিজের ক্ষতি হতে পারে, অপরেরর ক্ষতি হতে পারে এই জাতীয় অজুহাত দেবেন।

প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ তপস্যার জোরে অনেক অঘটন, অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারতেন। ওঝা-গুণিনগণ সেই প্রাচীন ধারায় অনুবর্তক হিসাবে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে সেই ব্যাপারগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এতে দুটি দিক সিদ্ধ হয়—একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুশীলন চলে, অন্যদিকে জনগণের মনে শ্রদ্ধার, সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাই হোক, এইরকম অলৌকিক ব্যাপার হল মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা। ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্র এবং তার সঙ্গে কিছু দ্রব্য ব্যবহার করে দীর্ঘদিনের জন্য মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করতে পারেন। ওঝা-গুণিনগণ এই পদ্ধতিতে সফল হলে বর্তমানে খাদ্য সমস্যার অনেক সুরাহা হয়ে যায়। তাহলে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে—কেন তাহলে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বা হচ্ছে না? গ্রামে গঞ্জে অনেক গরীব লোক বাস করে যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ঠিকমত আহার্যের সংস্থান করতে পারেনা। তারা গুণিনদের সাহায্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করতে পারলে একটা বিরাট খরচের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। খাওয়া ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজেই সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু এটা মজার ব্যাপার হল—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র ও তাদের প্রয়োগের পদ্ধতি সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করে দেখা যায়—এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। তাছাড়া এতে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার করা যায়—তাদের মূল্য হিসাব করলে এবং অন্যান্য খরচ ধরলে মোট যে পরিমাণ দাঁড়ায় তা খাওয়ার খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি। সুতরাং অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে এই মন্ত্রের ব্যবহারের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া মন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। সব মিলিয়ে জনমানসে এই মন্ত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব তেমনভাবে আদৃত হয়নি।

দক্ষিণ চাব্বিশ পরগনায় গুণিনদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়—এখানে এই মন্ত্র একেবারে অচল। শুধুমাত্র মন্ত্রের খাতায় এদের স্থান। ওঝা-গুণিনগণ এক সময় হয়ত মন্ত্র-ক্ষমতার নিদর্শন ও বৈচিত্র্যের জন্য এই মন্ত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ একে গ্রহণ করেনি তাই ধীরে ধীরে এই জাতীয় মন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। তবে লোক সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসাবে আমরা এগুলির আলোচনা করব।

মন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর : এই মন্ত্রের প্রয়োগকারীকে মন্ত্রসিদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এমন সাধকই এই মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন। জয়দুর্গাসাধন, মহাকালীসাধন, সিদ্ধিকালীসাধন, মহাযোগিনী সাধন, মহাবজ্রিনী সাধন প্রভৃতি সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই মন্ত্রের প্রয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত।

প্রথমে সাধক একটি বেদীর উপর আরাধ্য দেবীর মূর্তি স্থাপন করে যথাবিধি পূজা অর্চনা হোমাদি করবেন। পূজা শেষে এই মূর্তির পদতলে মাটির উপর পঞ্চগুঁড়ির সাহায্যে একটি অষ্টদল পদ্ম আঁকবেন। এই পদ্মের মধ্যস্থলে স্বস্তিকা চিহ্নের দ্বারা একটি যন্ত্র আঁকবেন। ঐ যন্ত্রের উপর পঞ্চপুষ্প, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, চন্দনচূর্ণ আর অক্ষয় সিঁদুর ছড়িয়ে দিতে হবে। এইবার একটি অষ্টধাতুর পাত্রে কোন শুক্লবর্ণের পাথর তথা রত্ন রেখে এবং সেই রত্নটি ছুঁয়ে হরিণ-চর্মের আসনের উপর বসে, তিনদিন পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দশ লক্ষ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি জপ করতে হবে। মন্ত্রগুলি হল—"ওঁ মণিধারী, ওঁ কাল্যৈ নমঃ। ওং কপাল্যৈ নমঃ। ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ। ওঁ কুরু কুল্লায়ৈ নমঃ। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ। ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ। ও নীলায়ৈ নমঃ। ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। ও ঘটায়ৈ নমঃ।" প্রতিদিন মন্ত্রজপের শেষে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিতে কুশের সাহায্যে জলের ছিটা দিতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন এক লক্ষবার করে তৃষ্ণানাশ ও আহারনাশ মন্ত্র জপ করতে হবে। তৃষ্ণানাশ মন্ত্র হল "ঐং ঐং নাশায় নাশয় তৃষ্ণাং স্বাহা।" আহারনাশ মন্ত্র হল—"ক্লীং ক্ষুয়াশিনি নিবারয় স্বাহা।"

দ্রব্যাদি ও ব্যবহার

(১) বকুলবীজ, করঞ্জবীজ ও সিদ্ধিবীজ—এই ত্রিবীজের সঙ্গে কৃকলাশের হৃদয় ও মজ্জা পেষণ করে বটিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই বটিকা ত্রিলৌহের মধ্যে রেখে মুখে ধারণ করতে হবে এবং প্রতিদিন গঙ্গাজলে বটিকা সমেত ত্রিলৌহের মাদুলি রেখে তা পান করতে হবে। প্রতিদিন সকালে এটি করলে সারাদিন ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকবে না।

(২) পদ্মবীজ, দেধান ও ডাঁটফলের বীজ ছাগীদুগ্ধ, কুক্কুরী দুগ্ধ, কদলী, কিসমিস, পদ্মফুলের রেণু, পেস্তা-ক্ষীর এবং মৃগ-দুগ্ধ একত্র সিদ্ধ করে পায়স প্রস্তুত করে ভক্ষণ করলে দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকা যায়।

(৩) পদ্মরেণু, রক্ত গোলাপ, শিমুল বীজ, অপামার্গের বীজ, কাজু বাদাম, আমলকী বীজ, হরিতকী মার্জার দুগ্ধের সঙ্গে একত্র পেষণ করে হেমন্ত জ্যোৎস্নায় রেখে দিতে হবে। তারপর আগুনে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর প্রস্তুত করতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক্ষীর মন্ত্রপূত করে প্রাতঃকালে আহার করলে এক সপ্তাহ ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়।

(৪) দাড়িম্ব বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, সিদ্ধিবীজ, তুলসী বীজ, হরিতকী চূর্ণ, আমলকির বীজ, পদ্মমধু, আখরোট, বহেড়া, পানের মূল; শুঁট একত্র করে ছাগী দুগ্ধ, পেস্তা ক্ষীর আর মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে একত্র জ্বাল দিয়ে পায়স প্রস্তুত করতে হবে। ঐ পায়স পূর্ববর্ণিত উপায়ে মন্ত্রপূত করে রাখতে হবে। প্রতিদিন সূর্য ওঠার পূর্বে ঐ পায়স এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ করলে সারা দিবারাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়।

(৫) পদ্মবীজ, বকুলবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অপামার্গের বীজ, আমলকি বীজ, করলার বীজ, তুলসী বীজ, করঞ্জা বীজ, বহেড়া বীজ— এই নয় প্রকার বীজ বিশুদ্ধ ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজা করতে হবে। এইবার এর সঙ্গে আমলকি, হরিতকী, বহেড়া—(ত্রিফলা) চূর্ণ, শুঁট চূর্ণ, পানের মূল, দেবদানী, আমের আঁটির শাঁস চূর্ণ, জামের বীজ চূর্ণ, মধু, ছাগী দুগ্ধ, মার্জার দুগ্ধ, কুক্কুরী দুগ্ধ, পদ্মরেণু, গোলাপ রেণু, বামন হাটির মূল এবং শ্বেত আকোড় ফলের মূল একত্র করে জ্বাল দিয়ে পায়স প্রস্তুত করতে হবে। ঐ পায়স পূর্ব নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূত করে প্রতিদিন পাঁচতোলা পরিমাণ করে তিনদিন ভক্ষণ করলে পরবর্তী এক মাস ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়।

(৬) ত্রিফলা চূর্ণ, বচ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, মরিচ, সজিনা বীজ, বটের মূল, কুণ্ডলী বৃক্ষের মূল এবং তাম্বুল একত্র পেষণ করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। ঐ লেই ছায়াতে শুষ্ক করে বটিকা প্রস্তুত করতে হবে। ঐ বটিকা পূর্ব নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূত করার পর ত্রিধাতুর পাত্রে গঙ্গাজলের মধ্যে রেখে "ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করে কুম্ভকাসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে। এইভাবে কুম্ভক যোগে সিদ্ধিলাভ করার পর গঙ্গাজল সহ ঐ বটিকা ভক্ষণ করলে ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটান যায়। যাঁরা অনশন ধর্মঘট পালন করেন তাঁদের পক্ষে ঐ প্রক্রিয়ায় বটিকা গ্রহণ করলে দীর্ঘদিন অনাহারে থাকতে পারবেন।

(৭) মধুর সঙ্গে মকরধ্বজ পেষণ করে তার সঙ্গে ছাগী দুগ্ধ মিলিয়ে পূর্বোক্ত উপায়ে মন্ত্রপূত করে সাতদিন সেবন করলে পরবর্তী সাতদিন অনাহারে থাকা যায়।

(৮) কুণ্ডলীবৃক্ষের পত্রপুষ্প, করঞ্জাবীজ, স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম, কৃকলাশের হৃদপিণ্ড, ছাগী দুগ্ধ একত্র পেষণ করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। ঐ লেইতে তিন ঘণ্টাকাল সীসা ঘর্ষণ করে তিলক প্রস্তুত করতে হবে। ঐ তিলক পূর্ব নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূত করে কপালে, নাভিদেশে ধারণ করতে হবে। এইবার কুণ্ডলীবৃক্ষের মূল এবং দুই তোলা পরিমাণ তাম্বুল নিয়ে 'ওঁ নম সিদ্ধিরূপায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ করে ঐ তাম্বুল মূল ভক্ষণ করলে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়।

(৯) হরিণচর্মের আসনে বসে কেবলমাত্র কুণ্ডলীবৃক্ষের মূল তিনতোলা পরিমাণ ভক্ষণ করে উপরোক্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করে কুম্ভকযোগে অধিষ্ঠিত হলে এবং তাতে সিদ্ধ হলে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়।

(১০) কেবল কুম্ভক যোগ করেই সিদ্ধিলাভ করলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা যায়।

তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১০)

পণ্ডিতগণ বলেন, 'প্রতিভা' ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা বা শক্তি। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বলেন 'প্রতিভা' হল সহজাত প্রাকৃতিক ক্ষমতা। তবে সব মানুষের এই ক্ষমতা বা শক্তি থাকে না। এই ক্ষমতার বলে মানুষ কবি, লেখক, চিত্রকর, গায়ক প্রভৃতি হয়ে থাকেন। যাঁদের প্রতিভা নেই তাঁরা প্রচণ্ড চেষ্টা করলে হয়ত কিছুটা এগিয়ে আসতে পারেন এই পথে, কিন্তু প্রকৃত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক হতে পারেন না।

কিন্তু প্রতিভাধর না হয়ে অনেক মানুষ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক হতে চান, নাম যশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু ভগবান যাকে মেরে রেখেছে, সে কিভাবে সফল হবে। অথচ নাম-যশ তাদের চাই-ই-চাই। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যথার্থ প্রতিভাধর ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিভাহীন ব্যক্তির যশ-খ্যাতি পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ফলে এই সব ব্যক্তিরা নানারকম উপায়

অবলম্বন করে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার কয়েকটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(১) পয়সার বিনিময়ে কোন অসহায়, অভাবগ্রস্ত কবি, সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীর সৃষ্টিকার্য বা শিল্পকর্ম ক্রয় করে নিজের নামে প্রকাশ করা।

(২) নিজের অক্ষম সৃষ্টি বা শিল্পকর্মকে উৎকৃষ্ট বলে চালানোর জন্য পয়সার বিনিময়ে সমালোচক, প্রচার ও প্রকাশ মাধ্যমকে কিনে নেওয়া অর্থাৎ সোজা কথায় ঘুষ দিয়ে নাম কেনা।

(৩) ওঝা-গুণিনের দ্বারস্থ হওয়া অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য নেওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ে বহু বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমানকালে অক্ষম এবং প্রতিভাহীন ব্যক্তিদের সৃষ্টিকর্মে দেশ ভরে গেছে। এই দুটি বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয় বিষয়টি আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য।

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে শ্রুতিধর-কবিত্বাদি করণ :

ওঝা-গুণিনগণ আর কিছু পারুন বা না পারুন মানুষের মনের, গোপন বাসনাটি ঠিকঠাক অনুমান করতে পারেন আর সেই বাসনা চরিতার্থতার ব্যবস্থাও করে দেন। কবি, সাহিত্যিক কিংবা বড় শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সব মানুষের থাকে। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে সবাই সব কিছু হয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই, চেষ্টারও ত্রুটি নেই।

ওঝা-গুণিনগণ এইসব যশলিপ্সু মানুষের কাছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ তুলে ধরেন। মন্ত্রতন্ত্রে যখন সব কিছু হয়, তখন প্রতিভার স্ফুরণ হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে। কিছু মন্ত্র আর তার সঙ্গে গাছ-গাছড়া, মূল, ধাতু, বস্ত্র, অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাঁরা মানুষকে শ্রুতিধর, কবি কিংবা শিল্পী হয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই জাতীয় মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোন গুণিন এর প্রয়োগ ঘটিয়ে সফল হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এঁদের মতে এই সব মন্ত্র অচল হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র মন্ত্রের খাতায় এদের স্থান। বারুইপুর থানার এক গুণিন, জীতেন্দ্রনাথ সরদার বলেন—মন্ত্রের ব্যবহার ঘটাতে গেলে যে ধরনের নিয়ম নিষ্ঠা, বাছবিচার, ধৈর্য্য, পরিশ্রম দরকার তা কেউ করে না। সবাই ফাঁকি দিয়ে মন্ত্র শিখতে চায়। এতে মন্ত্র ফুরবে কি করে? তার উপর তিথি নক্ষত্র দেখে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার করতে বলা হয় তা কেউ করে না। আর আসল জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। ফলে সব মিলিয়ে মন্ত্রের ফলও হয় না।

মন্ত্র ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

কবিত্বশক্তি প্রভৃতি স্ফুরণ বিষয়ে দুরকমের মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এক ধরনের সংস্কৃত বীজমন্ত্র আর বাংলা মন্ত্র। গুণিনরা বলেন, দুরকমের মন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্মাণ করে বিধিমতে পূজা করতে হবে। তারপর বিভিন্ন দ্রব্য একটি শ্বেতপদ্মমণ্ডলের মধ্যে রেখে বীজমন্ত্র পড়তে হবে। পদ্মমণ্ডলটি কেবলমাত্র আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী করতে হবে। বিভিন্ন দ্রব্য ও তার ব্যবহার প্রক্রিয়া নীচে এক এক করে দেওয়া হল। এখন বীজমন্ত্রটি হল—"ওঁ কার মুখে/ বিদ্যুজ্জিহ্বে ওং ক্রুং চেটকে জয় জয় স্বাহা।" বীজমন্ত্র পাঠ করার পর কিছু ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে তারপর বাংলা মন্ত্র পাঠ করতে হবে। বাংলা মন্ত্রটি হল—

কবিত্ব শক্তি স্ফুরণ মন্ত্র।

শিব বলে শিবানী শুন মোর বাণী।
যোগ কালে জপে আছে সরস্বতী রাণী।
তাকে যদি নিয়ে এসো পৃথিবী মাঝারে।

শিল্পকলা বিদ্যা যত সৃষ্টি হবে সংসারে।।
এত বলি শিব তবে মন্ত্র যে আওড়ায়।
মন্ত্রের জোরে দেবী এল যে ধবায়।
যতেক লোকেব জিহ্বায় বসত করি।
বইলেন দেবী সরস্বতী যুগ যুগ ধরি।।
শিবের আজ্ঞায় অধম পরমানন্দ ঝাড়ে।
মন্ত্রের জোরেতে দেবী জিহ্বা কাড়ে।
অমুকের জিবেতে দেবী লিখে দিলেন বব।
বড় বাবা পরমানন্দেব আজ্ঞায় দেবীব পা ধর।।
এস দেবী বস দেবী শক্তি কর দান।
তোমাব শক্তিতে দেবী অমুক হবে মহান।।
হাপাহাপি ডাবা ডুবা সাত সাগবেব পানি।
অধম পবমানন্দেব গুণে এলেন বীণাপাণি।
কাব আজ্ঞে—
বাবা মহাদেবেব আজ্ঞে।
আব কার আজ্ঞে—
দেবী বিশালক্ষীর আজ্ঞে।।
আর বড় বাবা পরমানন্দের আজ্ঞে।।

এখানে দেখা যাচ্ছে পরমানন্দ নামে কোন ওঝা কিংবা গুণিন এই মন্ত্রেব সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তাঁব কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। শিষ্য পরম্পরায় এই মন্ত্র চলে আসছে। পরমানন্দ কে ছিলেন তা জানবার আকাঙ্ক্ষা গুণিন মহলে কারোর হয়নি।

এখন পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিব আলোচনা করা হচ্ছে—

(১) প্রথমে দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্মাণ করে যথাবিধি পূজা।

(২) পূজার শেষে মূর্তিবেদীব সামনে শ্বেত পদ্মমণ্ডল এঁকে বিভিন্ন দ্রব্য রাখতে হবে।

পূর্বোক্ত বীজমন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। জপ শেষে মণ্ডল মধ্যস্থিত দ্রব্যগুলিতে সাতবাব জলেব ছিটা দিতে হবে।

(৪) এরপর সাতবার বাংলা মন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রপাঠের পর দ্রব্যগুলিতে তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে।

(৫) শেষে দ্রব্যগুলি ভক্ষণ অথবা লেহন করতে হবে।

(৬) সবশেষে সাতদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ তিনঘন্টা করে দেবী সরস্বতীর মূর্তি নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করতে হবে। এই ধ্যানে চিত্ত সংযোগ যথার্থভাবে না করতে পারলে কিংবা বীজমন্ত্র জপের সময় ঠিকভাবে মনসংযোগ করতে না পারলে মন্ত্র সফল হবে না। এই সমস্ত করার পর নির্জনে বসে কবিতা রচনায় কিংবা শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং কঠোর অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ ঘটে, শ্রুতিধর হওয়া যায়, শিল্পী হওয়া যায়।

এখন পদ্মমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য রাখতে হয় তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) ত্রিফলা চূর্ণ, বচ, শুঁট, পিপুল, লবঙ্গ, মরিচ, সৈন্ধব লবণ এবং সজিনা বীজ প্রত্যেকটি চূর্ণ একতোলা করে নিতে হবে। এর সঙ্গে বিশাখা নক্ষত্রে অমৃতযোগে উত্তোলন করা ব্রাহ্মীশাকের কাণ্ড এবং মূল রস কুরে প্রত্যেকটি এক তোলা করে নিতে হবে। এইবার বাইশ পল বিশুদ্ধ

গব্য ঘৃত এবং অষ্টআশি (৮৮) পল কপিলা গরুর দুগ্ধ মিশ্রিত করে পাক করতে হবে। পাক করতে করতে যখন উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়ে একাকার হয়ে যাবে তখন এতে কিছু শর্করা চূর্ণ মিশ্রিত করতে হবে। এইবার এই ঔষধ মন্ত্রপূত করে ভক্ষণ করলে কবিত্বশক্তি, স্মৃতি ও মেধা বর্দ্ধিত হয়।

(২) পুষ্যা নক্ষত্রে অমৃতযোগে কাঁচা হরিতকী, হস্তা নক্ষত্রে মহেন্দ্র যোগে কাঁচা আমলকি, অশ্বিনী নক্ষত্রে কাঁচা বহেড়া সংগ্রহ করতে হবে। এতে কোন যোগের দরকার নেই। এইবার এগুলি শুষ্ক করে চূর্ণ করে এক তোলা পরিমাণ প্রত্যেকটি দ্রব্য সংগ্রহ করতে হবে। এর সঙ্গে এক তোলা করে যষ্টি মধু চূর্ণ, কাবাব চিনি চূর্ণ, ব্রাহ্মী ফল চূর্ণ, বচ চূর্ণ, কুড চূর্ণ, তিল চূর্ণ, যব চূর্ণ, শুষ্ক তিল ফুল চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিশ্রিত করে ব্রাহ্মীশাকের রসে একদিন ভাবনা দিতে হবে। এরপর কামধেনুর দুগ্ধ তিন পোয়া এবং গব্যঘৃত আধপোয়া মিশ্রিত করে পাঁচ/ছয় ঘণ্টা আগুনে পাক করতে হবে। সমস্ত দ্রব্য একাকার হয়ে শুকনো শুকনো হয়ে যাবে তখন তা দিয়ে ছোট ছোট গুলি প্রস্তুত করতে হবে। এইবার ঐ গুলি পূর্বোক্ত উপায়ে মন্ত্রপূত করতে হবে। সাতদিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটি গুলি ও এক ছটাক নারিকেল দুগ্ধ ভক্ষণ করলে কবিত্বশক্তি, সঙ্গীত প্রতিভা, চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা জন্মায়।

(৩) অশোক চূর্ণ, বকুল চূর্ণ, হরিতকী চূর্ণ, মেথি চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, যষ্টি মধু চূর্ণ, কাবাব চিনি চূর্ণ, অর্জুন ছাল চূর্ণ, হরিদ্রা চূর্ণ, দারু হরিদ্রা চূর্ণ, বচ-কুড়-পিপুল চূর্ণ, শুঁট চূর্ণ, কালজিরা চূর্ণ, জোয়ান চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ, ব্রাহ্মীফল চূর্ণ, মৌরী ফুল চূর্ণ, এলাচ চূর্ণ, জয়ন্তী চূর্ণ, এবং রামতুলসী চূর্ণ এক তোলা করে একত্র মিশ্রিত করতে হবে। এইবার এগুলি পূর্বোক্ত উপায়ে মন্ত্রপূত করতে হবে। তারপর পাঁচতোলা (গরুর দুধ থেকে তৈরী) মাখন, শর্করা ও মৃগদুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করে লেহন করলে বাক্যশুদ্ধি অভিনয় প্রতিভা সঙ্গীত প্রতিভা জন্মায়।

(৪) সজিনা বীজ চূর্ণ, বকুল বীজ চূর্ণ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্প, শতমূলী, গুলঞ্চ মূল, হরিতকী, তিলপুষ্প, যবচূর্ণ, পদ্মমধু, পদ্মরেণু, শুষ্ক ব্রাহ্মীলতা ও ব্রাহ্মীমূল চূর্ণ, জাঁতি ফল, চাঁদি ফল, আমলকীর রসে তিন দিন জারিত করতে হবে। এরপর ঘৃত মধু, কপিলা দুগ্ধে পাক করে পায়স প্রস্তুত করতে হবে। এই পায়স পূর্বোক্ত উপায়ে মন্ত্রপূত করতে হবে। এই পায়স ভক্ষণ করলে স্মৃতি, বুদ্ধি, কবিত্ব শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

(৫) কেমলমাত্র বচ, কুড় ও ব্রাহ্মীশাক গব্যঘৃতের সঙ্গে পাক করে মন্ত্রপূত করে ভক্ষণ করলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। এক্ষেত্রে বীজমন্ত্র পঞ্চাশ লক্ষবার জপ করতে হবে।

(৬) কেবলমাত্র ব্রাহ্মীশাক ঘিয়ে ভাজা করে ছয়মাস কাল আহার করলে স্মৃতি ও মেধা বাড়ে। প্রতিদিন এক লক্ষ বার বীজমন্ত্র জপ করতে হবে।

তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১১):

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশে ওঝা-গুণিনগণ মহাশক্তিধর বলে গন্য হয়ে থাকে। এমন কোন লৌকিক কিংবা অলৌকিক বিষয় নেই যার সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলতে পারেন না এবং এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান তাঁরা করতে পারেন না। অন্ততঃ এইরকম ধারণা সর্বদেশের জনসমাজে প্রচলিত আছে। আর এইসব কারণের জন্য সমাজে ওঝা-গুণিনগণের জন্য আজও সম্মানের এবং শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। একথা পূর্বে বহু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তবুও এখানে বলার উদ্দেশ্য এই যে ওঝা-গুণিনদের সর্ববিষয়ে পারদর্শিতার ভূমিকার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

কথায় বলে খোদার উপর খোদকারি চলে না। যে যতই কেরামতি দেখায়, ভগবৎ দত্ত তথা প্রকৃতিদত্ত বিষয় কিংবা ব্যাপারের উপর কারোর হস্তক্ষেপ চলে না। যেমন যে মেয়েটা কালো,

শত চেষ্টা করেও তাকে ফর্সা করা যায় না। তেমনি যে লোকটা বেঁটে, হাজার ব্যায়াম করেও কিংবা ওষুধ খাইয়েও তাকে লম্বা লোক বানানো যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা প্রকৃতিদত্ত ব্যাপারের উপরও হস্তক্ষেপ করার সাহস দেখায়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরা কতখানি সফল সে প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা কখনও কোন বিষয়ে না বলেন না। তারা কালো মেয়েকে ফর্সা করতে পারেন আবার প্রয়োজন হলে ফর্সা সুন্দরীকে কুরূপা করে দিতে পারেন। বেঁটে লোককে মন্ত্রবলে লম্বা করে দিতে পারেন তেমনি মন্ত্রবলে লম্বা লোককে ছোট থেকে একেবারে ছোট অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বর করে দিতে পারেন। মানুষকে ভেড়া, ছাগল, পাখি এমনকি পিঁপড়ে পর্যন্ত করে দিতে পারেন। এগুলি অবশ্য ডাকিনী বিদ্যা, বর্তমানে ওঝা গুণিন গণ কিভাবে মানুষের রূপ-সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মন্ত্রের সাহায্যে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি : রূপ কথার গল্পে আমরা দেখেছি একটা কুৎসিত, কদাকার রাক্ষসী কিংবা ডাইনি মুহূর্তমধ্যে রূপ বদল করে সুন্দরী রূপবতী নারীতে পরিণত হয়ে গেল। এটা রূপান্তর গ্রহণ। বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি এইরকম নয়। এখানে রূপ পরিবর্তন নয়, এখানে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মন্ত্রের সাহায্যে রূপহীন মানুষ কিংবা রূপহীনা নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি, রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি করা যায় এবং এই রূপ-সৌন্দর্যের দ্বারা সেই নারী বা পুরুষ সকলকে মোহিত করতে পারবে। তবে কেবল মন্ত্র নয়, মন্ত্রের সঙ্গে নানাপ্রকার গাছ, গাছের শিকড়, ফুল, ফল, ধাতু, বস্তু এবং নানাপ্রকার ওষধি ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাপারগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় মূলতঃ ভেষজ বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ নির্দিষ্ট উপায়ে এই সমস্ত গাছগাছড়া প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে ওঝা-গুণিনদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও মানুষকে মোহিত করার মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে এই মন্ত্রগুলি অপ্রচলিত। বর্তমানে এই ধরনের মন্ত্রের ব্যবহার নেই বললেই চলে। কারণ মানুষ এখন বিপদ-আপদ, নানাবিধ সমস্যা, রোগ-শোক নিয়েই ব্যস্ত। মানুষের মনোরঞ্জন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার সময় তার কোথায়। এগুলির স্থান তাই গুণিনের খাতাতে।

মন্ত্র

আড়কাঠি বাঁধলাম ভারকাঠি বাঁধলাম
কপালে দিলাম ফোঁটা
গায়ে মাখলাম তেল হলুদ পায়ে দিলাম মল
দেখে যা বদ্যির ব্যাটা।।
পূব দক্ষিণে দিলাম সাড়া, স্বর্গে মর্ত্যে পড়ল নাড়া
মুনিজনে ভোলে মন।
আনকুটি বান কুটি থান কুটি সাজে
শরীর পরম ধন।
গোলাপ চন্দন পদ্মফুলে অপরাজিতা অশোক মূলে
দাড়িম ফলে তুলসী পাতা
হরপার্বতীর বরে শরীরের রূপ বাড়ে
শাস্তরে আছে গাঁথা।
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরীর রূপ লাগ
পাতালে নাগ কন্যার, জলে মীন কন্যার রূপ লাগ।
কার আজ্ঞে—

দেবী মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
কামাক্ষ্যা মায়েব আজ্ঞে।

মন্ত্রটির ভাষা, বাক্যবিন্যাস, ছন্দ সবই অসংলগ্ন। এছাড়া প্রসঙ্গের মাথা মুণ্ডু কিছুই নেই। তবে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বর্গ, মর্ত্য পাতালের রূপসীদের রূপ নিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রটিব স্থানে স্থানে অনেক অশুদ্ধি ছিল, সেগুলি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের মন্ত্রগুলি কিছু মামুলি শব্দ ও বাক্যের সমাবেশে তৈরী অসংলগ্ন ছড়া বা পদ্য মাত্র। এর অঙ্গে অঙ্গে অসঙ্গতি। কিন্তু এখানে এর আসল রূপ নয়, আসল শক্তি হল সঠিক প্রয়োগের মধ্যে। যথাযথ নিয়মকানুন মেনে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। একথা ওঝা-গুণিনগণ বলে থাকেন। তবে প্রয়োগ-কৌশল ও প্রয়োগকালীন আচার পদ্ধতি কেবলমাত্র গুণিনরাই জানেন এবং তাঁরাও গুপ্তভাবে শিষ্যদের শিখিয়ে দেন। বাইরেব লোক এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেনা। তাছাড়া এই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে গাছগাছড়া শিকড় বাকড় ধাতু, ওষধি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তারাও যথাযথ প্রয়োগের গুণে খুব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তবে একটা কথা সত্যি, যথাযথভাবে মন্ত্র ও ওষধির প্রয়োগ করার কৌশল জানা গুণিনের খোঁজ পাওয়া দুর্লভ। আমরা যে সব ওঝা- গুণিনের সন্ধান পেয়েছি, তাদের মধ্যে কয়জন সত্যিকারের গুণিন আছেন তা নির্ণয় করা গবেষণার বিষয়।

তখন মন্ত্রের সঙ্গে যে সব গাছগাছড়া শিকড়বাকড়, ধাতু প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) কৃত্তিকা নক্ষত্রে সিদ্ধিগাছের পাতা আহরণ করে তার সঙ্গে গঙ্গাজল, শ্বেতসরিষা, মাখন, গোলাপ রেণু, কাঁচা হলুদ এবং চন্দন মিশ্রিত করে এবং সেগুলি মন্ত্রপূত করে এক মাস গায়ে মাখলে রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এই সৌন্দর্যে সমুদায় জগৎ মোহিত হয়ে যাবে।

(২) পদ্মফুলের পাপড়ি এবং তুলসী পাতা ছায়াতে শুষ্ক করে নিতে হবে। এদের সঙ্গে সিদ্ধিবীজ, বকুল চূর্ণ, অশ্বগন্ধা, শ্বেত চন্দন মিশ্রিত করে কপিলা দুগ্ধে পেষণ করে বটিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই বটিকা মন্ত্রপূত করতে হবে। তারপর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইষ্ট দেবতাব নাম স্মবণ কবে ষোড়শী মন্ত্র জপ কবতে হবে। ষোড়শীমন্ত্র হল—"হুস কল হ্রী হস কল হ্রীং সকল হ্রীং।" এই মন্ত্র এক হাজার একশ একুশ বার জপ করতে হবে। তারপর ঐ বটিকা ভক্ষণ করতে হবে। এরূপ তিনমাস করলে শরীর থেকে একরকম তেজ বা জ্যোতি নির্গত হবে এবং রূপ বৃদ্ধি পাবে। এই রূপে জগৎকে মোহিত করতে পারবে।

(৩) অশোক ফুল এবং অশোক পল্লব সংগ্রহ করে শুষ্ক করে চূর্ণ করতে হবে। এইবার এর সঙ্গে ভরনী নক্ষত্রে উত্তোলন করা শ্বেত কুঁচের মূল ও বিশাখা নক্ষত্রে উত্তোলন করা বামন হাটির মূল এবং শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। এইবার তা যথানিয়মে মন্ত্রপূত করতে হবে। এরপর প্রতিদিন অপরাহ্নে নিম্নলিখিত বীজমন্ত্র দশ হাজার বার আবৃত্তি করে ঐ লেই সমস্ত শরীরে মাখতে হবে। তাহলে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং জগৎ মোহিত হবে। বীজমন্ত্রটি হল—"ওঁ অশোক পল্লব করতলে শোভনে শ্রীং ক্ষঃ স্বাহা।"

(৪) শ্বেত আকন্দের মূল, ভৃঙ্গরাজ, লজ্জাবতীলতা, বেড়েলার মূল, দাড়িমের মূল, গোরোচনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কদলীর রস, কর্পূর, স্বর্ণভস্ম, একত্র পেষণ করে মন্ত্রপূত করে সারা শরীরে মাখতে হবে। এরপর তিক্ত লাউ-এর বীজের তেলে অষ্টধাতুর ছোট গুলি তিনদিন ডুবিয়ে রাখতে হবে।

তারপর "ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গৌ ফট্ স্বাহা।" মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ করতে হবে। এবার ঐ তেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে কস্তুরোতে কাজল তৈরী করে চোখে লাগাতে হবে। এতে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি তো হবেই, সেই সঙ্গে সমগ্র জগৎ মোহিত হয়ে বশীভূত হয়ে যাবে।

(৫) শ্বেত চন্দন চূর্ণ, কুঙ্কুম, কর্পূর, হরিতাল, মৃগনাভি, রৌপ্যভস্ম, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম বচ, কুড়, আমলকীর রসে পেষণ করে তিলক প্রস্তুত করতে হবে। এইবার গোলাপ, পদ্ম, অশোক, দাড়িম্ব ফুল ও পদ্মরেণু পদ্মপাতায় নিয়ে শরৎকালীন জ্যোৎস্নায় সাতদিন রাখতে হবে। এরপর এগুলি মন্ত্রপূত করে সারা শরীরে মাখতে হবে এবং উপরোক্ত তিলক কপালে ধারণ করতে হবে। এই অবস্থায় 'হসক্ষমলবরং যুং আনন্দভৈরবায় বষট্'—মন্ত্রটি পাঁচ হাজার বার করে একমাস জপ করতে হবে, তাহলে জনমনমুগ্ধকর রূপ হবে।

(৬) কেবলমাত্র নবনী এবং চন্দন চূর্ণ শরীরে মাখলে এবং এইভাবে এক বৎসর মন্ত্র অনুশীলন করলে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১২):

'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কোরামতি বাড়ে।" গ্রামাঞ্চলে এই প্রবাদ বাক্য খুবই চলে। আমাদের দেশের ওঝা-গুণিন সম্বন্ধে এই প্রবাদ কি প্রযোজ্য হতে পারে? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন ওষুধ ফেরিওয়ালা। আমারই চেনাজানা মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনে, প্লাটফর্মে দাজ-হাজার মলম বিক্রি করেন। তাঁর কথায় মন্ত্র-টন্ত্র সব মিথ্যে, ওসব ওঝা-গুণিনদের ভড়ং, আসলে যে সব নানারকম গাছগাছড়া, শিকড়বাকড়, ধাতু-টাতু ব্যবহার করে ওরা তাতেই কাজ হয় আর নাম হয় মন্ত্রের।

কিন্তু ওঝা-গুণিনরা একথা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলেন, মন্ত্রের শক্তি আছে কিনা দেখিয়ে দিতে পারেন তাঁরা। প্রকৃত গুণিন এখনও আছে বলে তাঁরা দাবী করেন। কোন কিছু দ্রব্যগুণ ব্যবহার না করে কেবল মন্ত্র পড়ে তাঁরা অঘটন ঘটাতে পারেন। এঁরা হলেন বাক্‌সিদ্ধ।

রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদের সম্পর্কে অনেক কাহিনী জানা যায়। অনেক রাগী মুনি বা ঋষির কথা আমরা জানি যাঁদের মুখের কথায় কত অঘটন ঘটে গিয়েছে। তাঁরা যেমন অভিশাপ দিয়েছেন তেমন ঘটেছে। কপিল মুনির অভিশাপে সগর রাজার বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক মুনির অভিশাপে কৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব মুষল প্রসব করেছিল। দুর্বাশার অভিশাপে শকুন্তলার স্মৃতি ভ্রংশ ঘটেছিল। এইরকম বহু ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়—এমনই বাক-সিদ্ধ ছিলেন যে তাঁরা যা বলতেন, তাই ঘটে যেত। বাক্যসিদ্ধি প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিদের একটা বড় গুণ ছিল।

সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের এই ধারাকে অনুবর্তন করে আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনগণ 'বাক্যসিদ্ধি' নামে মন্ত্রতন্ত্রের এক পর্যায় সৃষ্টি করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই বিষয়ে কিছু মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে এই মন্ত্রের প্রয়োগ সফলতার কথা জানা যায়নি। কোন গুণিন এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। কোথাও এই 'বাক্যসিদ্ধি' বিষয়ে কোন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়নি। কেবলমাত্র মন্ত্রের বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য এই পর্যায়ের মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়।

যাইহোক, আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য এই পর্যায়ের মন্ত্রের কথা বলব। প্রসঙ্গত একথা বলে রাখা ভাল-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই জাতীয় মন্ত্র অচল। গুণিনদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাঁরাও এ বিষয়টাকে ঠিক বিশ্বাসযোগ্যতার পর্যায়ে ফেলেন না।

বাক্য সিদ্ধির মন্ত্র

মাথা খুঁটি মাথা খুঁটি সরস্বতীর পায়।
সর্বলোকের কথা যেন আমার মুখে আয়

কালিদাসের জিবে মাগো লিখে দিলে বর।
সেই বরে কালিদাস হল অমর॥
ত্রিলোকের যত মুনিঋষির বাক্।
সব আমার মুখে থাক॥
ব্রহ্মার বরে আমার মুখের কথা সিদ্ধ হয়ে যাক।
শ্মশান টলে, মশান টলে কৈলাসে আসন টলে।
আমার মুখের কথা না টলে॥
জীয়ে তো রাম টলে।
আবার মুখের বাক্যি না টলে॥
তীর মারি তীর মারি
আমার মুখের বা-তীর স্বর্গ মর্ত্য পাতালে লাগ॥
জয় বাবা মহাদেবের আজ্ঞে—
কামিক্ষ্যে মায়ের আজ্ঞে—
গুরুদেবের বরে আমার বাক্যি লাগ লাগ লাগ।
ফুঃ ফুঃ ফুঃ।

মন্ত্রের শেষ লাইনটি সম্ভবত ফুঁদেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রের শেষে কিছু দ্রব্যের কথা বলা আছে এবং তাদের ব্যবহার বিধির কথা দেওয়া আছে। সেই নির্দেশ অনুসারে দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করে তাকে উপরোক্ত মন্ত্রটি পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং জলের ছিটা দিতে হবে।

মন্ত্রটির মধ্যে পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, কালিদাসের কবিত্বলাভের কাহিনীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বাক্যগুলি সহজ সরল, নানাপ্রকার ভুল ছিল, সেগুলি সংশোধন করে এখানে দেওয়া হয়েছে।

এখন মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের নির্দেশ আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) বৃহস্পতিবার কিংবা রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে কিংবা অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্বেত বেড়ালের মূল সংগ্রহ করতে হবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে সিজবৃক্ষের পরগাছা সংগ্রহ করতে হবে। স্বাতী নক্ষত্রে কুল গাছের পরগাছা ও শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করতে হবে। আর্দ্রা নক্ষত্রে অপরাজিতার মূল সংগ্রহ করতে হবে। এইবার এগুলি একত্র করে "ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ওঁ বাক্যং সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। "ওঁ হ্রীং হুং হুং মালো মালো স্বাহা" মন্ত্রটি একলক্ষবার জপ করতে হবে। তারপর এগুলি একটি তামার মাদুলির মধ্যে ভরে তামার পাত্রে গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং এর সঙ্গে এক টুকরো সীসা ডুবিয়ে রাখতে হবে এইবার বাক্যসিদ্ধি মন্ত্র পাঁচশত একবার পড়ে মাদুলিতে তিনবার ফুঁ এবং জলের ছিটা দিতে হবে। এইবার এই মাদুলি হস্তে ধারণ করলে বাক্যসিদ্ধি ঘটবে।

বাক্যসিদ্ধির মত 'পাদুকা সিদ্ধি' মন্ত্রতন্ত্রের একটি পর্যায়। এখানে একজোড়া কাষ্ঠের খড়ম মন্ত্রপূত করা হয়। এই খড়ম পায়ে দিয়ে চক্ষু বন্ধ করে কোন স্থানে যাওয়ার কথা চিন্তা করলে মুহূর্ত মধ্যে সেইস্থানে চলে যাওয়া যায়।

ঠাকুর মার ঝুলি, দাদা ঠাকুরের সংসার, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি রূপকথার বইয়ে এই ধরনের পাদুকার কথা পাওয়া যায়। কোন যাদুকর মন্ত্র পড়ে দিলে পাদুকা পরিধান করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অভীষ্ট স্থানে গমন করা যায়—এমন কাহিনী আমরা বহু পড়েছি। প্রাচীন কালের মুনি ঋষিগণের এই ধরনের ক্ষমতা ছিল। তাঁরা খড়ম কিংবা কোন পাদুকা পায়ে দিয়ে

জলের উপব দিয়ে হাঁটতে পাবতেন, কিংবা বায়ুতে ভেসে যেতে পারতেন। আমাদেব পুবাণগুলির মধ্যে এই জাতীয় অনেক কাহিনীব নজিব আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনা থেকে এই জাতীয মন্ত্র একটি পাওয়া গিযেছে, সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

পাদুকা সিদ্ধির মন্ত্র

খড়ম পা খড়ম পা
যেথা ইচ্ছা সেথায় যা।
মহাদেবের ববে সর্ব দেবতার ববে পবন দেবতাব ববে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে চলে যা।
খত কাটি খত কাটি খতকাটি।
হনুমান সাগর ডিঙায় গড়ুর উড়ে যায়।
হনুমানের ববে খড়ম পা চলে যা।
গুরুদেব আজ্ঞা দিল,
খড়মা পা খড়মা পা
রণপা—বণপা—
দোহাই গুরু সীতেমাবির আজ্ঞে।

মন্ত্রটি অসংলগ্ন। 'খড়ম পা' শেষে 'খড়মা পা' হয়েছে সেটা মেনে নেওয়া গেলেও কিভাবে 'বণ পা' হয়ে গেল সেটা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। 'রণ পা' অন্য জিনিস। আগেকার দিনে ডাকাতরা ব্যবহার করত। বাঁশেব লম্বা লাঠি দিয়ে তৈরী হত 'বণপা'। বাক্যের মধ্যে মিল নেই।

এখানে দুটি শব্দেব আলোচনা কবছি।

খড়ম পা—এখানে খড়ম পায়ে দেওয়া অবস্থাব কথা বোঝানো হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'খড়ম পা' শব্দটি বেশ কয়েকটি মজাব অর্থে ব্যবহার হয়। কেউ বিষ্ঠা বা কোন নোংবা পাড়ালে (মাড়ালে) সে অশুচি হয়ে যায়। তখন সে যাতে অন্য কাউকে না ছুঁতে পারে, সেজন্য অন্যজন পায়ের আঙুল উঁচু করে হাঁটে। এই অবস্থাকে 'খড়ম পা' বলে। এইভাবে হাঁটলে অশুচি লোকটি আব তাকে ছুঁইবে না। বালক-বালিকাদেব মধ্যে এই ধরনেব গ্রাম্য খেলার প্রচলন আছে। এছাড়া অনেকে পা উঁচু কবে (অর্থাৎ গোড়ালি ঠিকভাবে মাটিতে পড়ে না।) হাঁটে। এই ধবনেব হাঁটাকে 'খড়ম পা' বলা হয়।

খতকাটি—'খতকাটি' শব্দটি অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক পূজাপার্বনে, বার ব্রতে নানা প্রকার দাগ কেটে 'খত কাটা' হয়। দণ্ডীকাটার সময় মাটিতে দাগ কাটাকে অনেকে খত কাটা বলেন। অঙ্গীকার করে কোন কিছু লেখাকেও খতকাটা বলা হয়।

এখন পূর্বোক্ত মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করার নির্দেশ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

(১) কাঁঠাল কাঠ দিয়ে (পাকা গাছের কাঠ হওয়া দরকার) এক জোড়া খড়ম তৈরী করতে হবে। খড়মে কাঠছাড়া অন্য কোন জিনিস থাকবে না। প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যে ধরনের খড়ম ব্যবহার করতেন, সেই ধরনের খড়ম হওয়া দরকার। এখন মৃগশিরা নক্ষত্রে অগস্ত্য কুসুম সংগ্রহ করতে হবে। এর সঙ্গে মজা নদীর শৈবাল, চন্দ্রগ্রহণের সময় সংগ্রহ করা রক্ত চিতা ও রক্ত আকন্দের মূল, অর্জুন বৃক্ষের ফল, শনিবারের অমাবস্যায় সংগ্রহ করা শ্মশান ভস্ম, পেচকের বিষ্ঠা, পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সংগ্রহ করা জাতী বৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করে খড়মে মাখাতে

হবে। এইবার 'ওঁ হ্রীং হুং নমঃ। ওঁ হং ক্ষোং ফট্।' মন্ত্রটি সাত লক্ষবার জপ করতে হবে। জপের শেষে খড়ম দু'টি এক খণ্ড মৃগ চর্মের উপর রেখে তিনশত সাতবার পূর্বোক্ত মন্ত্রটি জোরে জোরে আবৃত্তি করতে হবে। তারপর তিনবার ফুঁ ও জলের ছিটা দিতে হবে। এইবার শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে খড়মটি পায়ে দিয়ে কোন স্থানের নাম বলতে হবে। তখন খড়ম সমেত দেহটি শূন্যে উঠে মেঘের ভিতর দিয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে যেতে থাকবে। এই অবস্থায় চোখ খুললে সেই স্থানে পতন ঘটবে এবং মৃত্যু হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ধরনের মন্ত্রের কোন ব্যবহার নেই। আজও পর্যন্ত কেউ এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানা যায়নি। এই পর্যায়ের মন্ত্রের স্থান কেবল গুণিনের খাতার পাতায়।

পরীসাধনা :

'পরী' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ। কিন্তু আমরা অতি সুন্দরী নারী কিংবা নিখুঁত সুন্দরী নারীকেও 'পরী' বলে থাকি। যেমন সুন্দরী নারীদের উপমা দিতে গিয়ে আমরা বলি ডানাকাটা পরী। তেমনি 'অপ্সরা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল স্বর্গবারাঙ্গনা কিংবা সুর সুন্দরী। আবার 'কিন্নরী' বলতে বোঝায় অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট দেবলোকের গায়িকা।

'পরী', 'অপ্সরা' এবং 'কিন্নরী' শব্দগুলির মধ্যে সুন্দরী নারীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। শব্দ তিনটির আভিধানিক অর্থ আলাদা হলেও মোটামুটি একটি ব্যাপারে প্রগাঢ় মিল আছে—তা হল সবাই সুন্দরী নারী। আমাদের কল্পনায় এই তিন শ্রেণীর নারী প্রায় এক। এরা মায়াবিনী এরা আমাদের বাস্তব পৃথিবী (মর্ত্যলোক) ছাড়িয়ে অন্যত্র বাস করে। সে স্থানের অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায় অর্থাৎ এরা কল্পলোকের বাসিন্দা। এরা যাদুমন্ত্র প্রভৃতি জানে। প্রয়োজনে রূপ বদল করতে পারে। এরা খুব দ্রুতগামী। পাখায় ভর দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে চোখের পলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে পারে। এরা আসঙ্গলিপ্সু এবং এদের সংসর্গ মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর। আমাদের রূপকথা উপকথা প্রভৃতিতে এদের বহু কাহিনী গল্প আছে।

এই স্বর্গলোক, গন্ধর্বলোক তথা কল্পলোকের বাসিন্দারা আমাদের কাছে অধরা। মানুষের পৃথিবীতে এরা বসবাস করতে পারেনা। আমরা স্বর্গনর্তকী, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কাহিনী পাঠ করেছি। স্বর্গনারীরা চিরকাল মর্ত্যের মানুষের কামনার আকাঙ্ক্ষার আর প্রলোভনের ইন্ধন যুগিয়েছে—কিন্তু মানুষের কাছে তারা সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়নি। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করে বলা যায়—তারা কখনও পৃথিবীর মানুষদের একজন হয়ে যেতে পারেনি। তবে একথা বহু প্রচলিত যে মানুষের পৃথিবী সম্বন্ধে এই স্বর্গকন্যা বিদ্যাধরীদের কৌতূহল প্রবল। সেই কৌতূহলতার বশবর্তী হয়ে তারা মর্ত্যে নেমে আসে এবং কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

রূপকথা, উপকথা, পুরাণ কাহিনীতে স্বর্গ এবং স্বর্গের অধিবাসীদের কথা থাকলেও বাস্তবে স্বর্গ বলে কিছু আছে কিনা—তা আজও বিতর্কের বিষয় আর স্বর্গকন্যাদের চরম রূপসৌন্দর্যের কাহিনী কল্পনায় গড়া মানস লোকের ফসল বলা যায়। এগুলি আমাদের চিরায়ত সংস্কারের ফলশ্রুতি। আদিমকাল থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমাদের মনে যে কল্পনা বাসা বেঁধে আছে পরী-অপ্সরা-কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্বকন্যারা সেই কল্পনার প্রতিমূর্তি। বাস্তবে এদের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

যাই হোক, যুক্তি তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ যাই বলুক, ওপথে না গিয়ে আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা চিরায়ত সংস্কারের পথ ধরে তন্ত্র-মন্ত্রের একটি পর্যায় সৃষ্টি করেছেন—যেটাকে তাঁদের ভাষায়

বলা হয সুন্দবীসাধনা বা সুবসুন্দবী সাধনা বা পবীসাধনা/অপ্সবী সাধনা/কিন্নবী সাধনা। এই সাধন বলে তাঁবা কল্পলোকেব বাসিন্দা অপ্সবী-পবীদেব পৃথিবীব মাটিতে টেনে আনতে পাবেন। তাদেব সঙ্গে সংসর্গ কবে বতিসুখ লাভ কবতে পাবেন, আবাব শক্তিশালী গুণিনবা তাদেব নিযে ঘব কবতে পাবেন। অশেষ ক্ষমতাব অধিকাবিনী এইসব নাবীবা তুষ্টা হলে যেমন সাধককে যৌবন সুখ দান কবে, তেমনি অনেক সময প্রচুব ধনবত্নও দিযে থাকে। কিন্তু ত্রুটি হলে এদেব থেকে ভযঙ্কবী আব কেউ হতে পাবে না। গুণিনদেব কথায এবা কষ্ট হলে মানুষেব সর্বনাশ তো কবেই এমনকি বংশ নাশও কবে দেয।

পবীসাধনা, অপ্সবী সাধনা, কিন্নবী সাধনা তাই খুব সতর্কতাব সঙ্গে কবতে হয। একটু এদিক ওদিক হলেই মহাসর্বনাশ। সাধক-গুণিনবা এই সাধনাকে এডিযে চলেন, কেবল কিছু বিছু বদখেযালী লোক থাকে, যাবা বাইবেব বিপদকে ঘবে ডেকে আনতে ভালবাসে, তাবাই এইসব সাধন-প্রক্রিযা কবে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায এই জাতীয সাধনাব সন্ধান পাওযা গিযেছে।

পবীসাধনা/অপ্সবী সাধনা/কিন্নবী সাধনা কষ্টকব সমযসাপেক্ষ এবং ব্যযসাপেক্ষও বটে। ভূতিনী সাধনা, বীবসাধনা প্রভৃতি সাধনাব মত এব ক্রিযা প্রক্রিযা। সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাহসী লোকেবাই এই সাধনাব পথে অগ্রসব হতে পাবে। তবে এই সাধনা অতি গুহ্য ব্যাপাব। খুব সাবধানে, গোপনে এই প্রক্রিযা কবতে হয। কোন নির্জনগৃহে, উন্মুক্ত নির্জন স্থানে, বনমধ্যে, নদীতীবে এই সাধনা কবা উচিৎ। বাত্রিকাল এব প্রকৃষ্ট সময।

পরীসাধনা

নির্জন নদীতীবে, উপবনে কিংবা লোকালয থেকে দূবে কোন নির্জনগৃহে কম্বলাসনে কিংবা হবিণচর্মেব আসনে বসে সাধককে মন্ত্রজপ কবতে হবে। "ওঁ হ্রীং বতিপ্রিযে স্বাহা। ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুবসুন্দবী স্বাহা।" এই মন্ত্র প্রতিদিন এক লক্ষ বাব কবে ত্রিশ দিন জপ কবতে হবে। শুদ্ধ বস্ত্র পবিধান কবে অঙ্গে সুগন্ধি লেপন কবে এবং ঘিয়েব প্রদীপ জ্বেলে পবীদেব জন্য অপেক্ষা কবতে হবে।

সাধক যদি এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে জপ কবেন, তখন একদিন না একদিন পবী এসে উপস্থিত হবে এবং সাধকেব সঙ্গে সহাবস্থান কববে। এই পবীরা সাধাবণতঃ বাত্রিবেলা আসে, তাবপব সাবাবাত্রি কাটিয়ে ভোবেব আলো ফোটাব আগে চলে যায।

অপ্সরা/অপ্সরী সাধনা

পবী সাধনাব মত অপ্সবী সাধনা একান্ত নির্জনে কবতে হয। এখানে কোন নির্জন স্থানে বাত্রিকালে সাধককে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অথবা কোন নির্জন নদীতে নগ্ন হযে নাভি জলে দাঁডিযে মন্ত্র জপ কবতে হবে। মন্ত্রটি হল "ওঁ হুং বতিপ্রিযে অপ্সবে আগচ্ছ আগচ্ছ সাধয সাধয হুং ফট স্বাহা।" মন্ত্রটি প্রতিদিন দশ লক্ষ বাব কবে মোট একচল্লিশ দিন জপ কবতে হবে। এই একচল্লিশ দিন সাধনায সিদ্ধ না হলে পুনবায একচল্লিশ দিন নিতে হবে। এইভাবে ক্রমাগত সাধনা কবে গেলে একদিন অপ্সবীবা ধবা দেবে এবং স্বর্গ থেকে নেমে এসে সাধকেব সঙ্গে সহবাস কববে। তবে অপ্সরীদেব কামনা খুব দুর্বার। সাধক যদি তাদেব কামনা পূবণ না কবতে পাবে তাহলে তাবা সাধককে ছেড়ে চলে তো যাবেই এবং সাধকেব নানাবিধ ক্ষতি কবতে পিছপা হবে না।

কিন্নরী সাধনা

কিন্নবী সাধনা আরও কঠিন। কিন্নরীদেব মুখ ঘোডাব মত শবীবটা মানুষের মত। অনেকে কিন্নবীদের মানুষ না বলে জন্তু বলে থাকেন। এবা সুন্দব গান গাইতে পাবে। কিন্নবী সাধনা সাধাবণতঃ বনে কিংবা উপবনে কবতে হয়। নির্জন উপবনে নগ্ন হয়ে সুগন্ধি কুসুমেব মালা

পরিধান করে মন্ত্রজপ করতে হবে। মন্ত্রটি হল 'ও হ্রীং কিন্নরে হং অঃ ক্রীং ক্রীং স্বাহা'। এই মন্ত্রটিও প্রতিদিন দশ লক্ষ বার করে জপ করতে হবে এবং এক বছর ধরে নিবিষ্ট চিত্রে জপ করতে হবে। কিন্নরী সাধনা করতে হলে বিবাগী হতে হবে। সংসারে বাস করে এই সাধনা করা চলে না। সাধারণতঃ সাধককে নির্জন বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে হবে এবং সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্নরী তুষ্টা হলে সাধকের কাছে ধরা দেবে এবং সাধকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করবে। এরা অপ্সরী বা পরীদের মত কেবল রাত্রিকালে আগমন করে সাধকের সঙ্গে বিহারবিলাস করে আবার রাত্রিশেষে ফিরে যায় না। এরা সাধকের সঙ্গে দিনরাত বসবাস করে এমনকি প্রয়োজন হলে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সহাবস্থান করতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—এই সব ব্যাপার কোন লোকালয় কিংবা কোন জনসমক্ষে হবে না। কিন্নরীরা কেবল তাদের আসঙ্গলিপ্সা পূরণ করে না, এরা সাধককে ধনরত্ন প্রদান করে। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে কোন কিন্নরী সাধককে আর সংসারে ফিরে যাওয়া চলবে না কিংবা অন্য কোন নারীতে আসক্ত হওয়া চলবে না। যদি সাধক অন্য নারীতে আসক্ত হয় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কয়েকজন এই ধরনের সাধক বা গুণিনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে এরা এঁদের সাধনার কথা প্রকাশ হতে দিতে চান না এবং নাম প্রচার করতে চান না। সুতরাং এই সাধন বিষয়ে সফল হয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। এঁরা স্বীকার করেছেন পরী, অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি দেবযোনি বিশিষ্ট জীবদের অস্তিত্ব আছে। ঠিকমত সাধনা করতে পারলে এঁরা ধরা দেন। শোনা যায়, যাঁরা এইসব স্বর্গকন্যাদের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা প্রকৃতিস্থ কিংবা স্বাভাবিক থাকেন নি। তাঁরা ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে গিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে মিলনে যে সুখ অনুভূত হয় তা অতীন্দ্রিয়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

পরী সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন বাংলা মন্ত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পাওয়া যায়নি। কেবল পূর্বোল্লিখিত কিছু বীজমন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এগুলি কোন তন্ত্রসাধনার পুস্তক থেকে সংগৃহীত। যদিও সাধক কিংবা গুণিন তাঁর গুরুর কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন তবুও অনুমান করা যায় কোন গুরুই এই ধরনের মন্ত্র সৃষ্টি করেন নি।

এই ধরনের মন্ত্রসাধনা মানুষের কিংবা সমাজের কোন কল্যাণ করে না। সাধক/গুণিন নিজেদের আত্মসুখ চরিতার্থ করার জন্য এই পর্যায়ের মন্ত্রের চর্চা করে থাকেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের কাছে এই ধরনের মন্ত্রের কোন মূল্য নেই। অলৌকিক কিংবা অতি প্রাকৃতের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ, এই ধরনের মন্ত্রসাধনা সেই কৌতূহল মেটায় মাত্র।

গুটিকা সাধন :

"দি ইনভিজিবল ম্যান" বইটি অনেকের পরিচিত। বইটিকে একজন মানুষের অদৃশ্য হয়ে যাবার কাহিনী আছে। এই রকম অদৃশ্য হয়ে যাবার কাহিনী আমাদের ভারতীয় বিভিন্ন পুরাণেও আছে। প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যোগবলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। রামায়ণ কাহিনীতে দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন এবং মেঘের অন্তরালে চলে যাচ্ছেন, সেখান থেকে বাণ বর্ষণ করে রামচন্দ্রের বাহিনীকে অতিষ্ঠ করে তুলছেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যক্ষ, রক্ষ অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে এই বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। রাক্ষসরা ছিল মায়াবী। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং রূপবদল করাই ছিল তাদের মূল অস্ত্র। অসুরনাশিনী দুর্গাকে মহিষাসুর তো নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের রূপকথার গল্পে, আরবা উপন্যাসের কাহিনীগুলিতে, ড্রাকুলা কাহিনীতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বহু উদাহরণ আছে। প্রাচীনকালে আসাম, মণিপুর, তিব্বত প্রভৃতি দেশে মন্ত্রশক্তির প্রচলন ছিল। সেই মন্ত্রবলে এই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের নানারকম ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হত। মানুষের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে মানুষকে পশুপাখিতে রূপান্তরিত করা প্রভৃতি নানারকম অবিশ্বাস্য ক্রিয়াকর্ম করত এখানকার মন্ত্রসিদ্ধ যাদুকররা। বিশেষ করে আসামের কামাখ্যা তন্ত্র-মন্ত্রের দেশ বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। মহাবিদ্যা বরদায়িনী 'যোনি রূপাই' (আদ্যাশক্তি) দেবী কামাখ্যা সকল মন্ত্রতন্ত্রের মূলাধার। কামাখ্যাতন্ত্রই সকল তন্ত্রের তন্ত্র। এই তন্ত্র-সিদ্ধ সাধক সম্ভব অসম্ভব সব কাজই করতে পারেন। এই কামাখ্যা মন্ত্রের দিব্য প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবতারা, দানবেরা, গন্ধর্বেরা আর কিন্নরবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই বশে আসে। এই মন্ত্রের গুণে অগ্নি, জল, বায়ু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রাচীনকালে কামাখ্যা তন্ত্র সিদ্ধ কিছু সাধক এবং সাধিকা মন্ত্রতন্ত্রকে মানুষের কল্যাণের বদলে নিজেদের কামনা বাসনা চরিতার্থতার কাজে লাগিয়েছিলেন। এঁরা মন্ত্রবলে যা খুশি তাই করতে পারতেন এবং মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তাঁদের কাছে খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। এঁরা অদৃশ্য হয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চক্ষের নিমেষে চলে যেতে পারতেন এবং শূন্যপথে বিচরণ করতে পারতেন। এইভাবে যত্র-তত্র গমন করে তাঁরা তাঁদের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণ করতেন। ওঝা-গুণিনদের কাছে শোনা যায় আমাদের দেশে এখনও এক শ্রেণীর ডাইনী জাতীয়া নারী আছে, যারা নিশাকালে আকাশপথে গমনাগমন করে এবং কোনো সুন্দর পুরুষকে তাদের নজরে লেগে গেলে অদৃশ্য হয়ে তার কাছে চলে আসে। তারপর মোহিনীরূপ ধারণ করে সেই অভীপ্সিত পুরুষকে বশীভূত করে তাদের অতৃপ্ত কাম-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই জাতীয় কিছু মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে এই মন্ত্রের ব্যবহার অচল। ওঝা-গুণিনদের মধ্যে এক ধরনের সংস্কার প্রচলিত আছে এই মন্ত্র শিখলে বংশ নাশ হয়। তাছাড়া এই মন্ত্রের স্বাদ পেলে সেই গুণিন আর সহজ জীবনধারায় ফিরে আসতে পারে না। নিষিদ্ধ জগতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং শেষে চরম সর্বনাশের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাই কোনো গুরু শিষ্যকে এই মন্ত্র দিতে চায় না। দিলেও শপথ করিয়ে নেয় যাতে এই মন্ত্র খারাপ কাজে ব্যবহার না করে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই মন্ত্রকে 'গুটিকা সাধন মন্ত্র' বলে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, শূন্যে বিচরণ করা কিংবা আকাশ পথে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ধাবমান হওয়া প্রভৃতি কার্য এই মন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। কামাখ্যা মন্ত্র বলে যে সকল মন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত, ওঝা-গুণিনগণ এই 'গুটিকাসাধন মন্ত্র'কে কামাখ্যা মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

এই মন্ত্রের বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই। যে কোন নর কিংবা নারী এই মন্ত্রের সাধন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই মন্ত্রসাধনা এতই কঠিন যে আন্তর শক্তিতে পরিপূর্ণ, ধৈর্যশীল দৃঢ়ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি ছাড়া এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয় না। তবে নারীরা এই সাধনায় অংশগ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা তাদের ভাগ্যে জোটে না।

গুটিকাসাধন মন্ত্রের সাধন পদ্ধতি :

এই সাধনার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। নিজের গৃহে, নদীতীরে, বাগানে, জলাশয়ের ধারে, প্রান্তরে, মন্দিরে, শ্মশানে বা বৃক্ষের নীচে জপ করা যায়। তবে স্থান যেমনই হোক, নির্জন হওয়া বাঞ্ছনীয়। গুণিনরা বলে থাকেন নিজের শয্যায় শুয়ে কিংবা বসেও মন্ত্র জপ করা চলে।

প্রথমে কামাখ্যা চক্র আঁকতে হবে। পরিষ্কার জায়গায় কিংবা কাগজে সিঁদুর দিয়ে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে একটি ত্রিকোন ক্ষেত্র আঁকতে হবে। দেখতে হবে ত্রিকোনের কোনো একটি কোন যেন নীচের দিকে থাকে। এটি অন্য রং দিয়ে করা যাবে। এইবার ত্রিকোনের ভিতরের দিকে প্রতি কোনে 'ক্রীং' বীজমন্ত্রটি লিখতে হবে। এটি অবশ্য সিঁদুর কিংবা' লাল কালি দিয়ে লিখতে হবে। এবাব বৃত্তের বাইরে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকতে হবে যাতে বৃত্তটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুকে স্পর্শ করে। বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুতে দু'টি করে পদ্মের দল আঁকতে হবে। তাহলে অষ্টদল পদ্ম হবে। একে 'অষ্টবজ্র যন্ত্র' বলা হয়ে থাকে এই পর্যায়ের মন্ত্রের সাধনার জন্য।

এইবার শনিবার কিংবা মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে শতভিষা, মূলা কিংবা রোহিনী নক্ষত্রে এক তোলা পরিমাণ একটি অষ্টধাতুর গুটিকা প্রস্তুত করাতে হবে। এই গুটিকা তিনদিন গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রেখে যথাবিধি শোধন করতে হবে। তাবপব ঐ গুটিকা অষ্টবজ্রমধ্যস্থ বর্গক্ষেত্রস্থ ত্রিকোণের মধ্যস্থলে স্থাপন করে কামাখ্যাদেবীব ধ্যান করতে হবে। ধ্যানে বসবার পূর্বে সাধককে শুদ্ধ হতে হবে। কোন পুকুরে কিংবা নদীতে জলের উপর তিনবার ক্রীং লিখে সেখানে সাতটি ডুব দিতে হবে। তারপর পট্ট বস্ত্র কিংবা রেশম বস্ত্র পরিধান করে মৃগচর্মের আসনে বসে ধ্যান শুরু করতে হবে। ধ্যানের সময় বাহ্যিক কোন কিছু চিন্তা করা চলবে না। ধ্যান মন্ত্র হল—

"রক্ত বস্ত্রাং বরোদ্যক্তাং সিন্দুরতিলকাম্বিতাম্।
নিষ্কলঙ্কাং সুধাধাম-বদন কমলোজ্জ্বলাম্।'।....

কামাখ্যাদেবীর ধ্যানমন্ত্র তন্ত্র-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। এই মন্ত্র এক লক্ষবার জপ করে দেবীকে কুঙ্কুম, আসন, অন্ন, ব্যঞ্জন, পরমান্ন, অন্যান্য উপাচার, নৈবেদ্য ও পার্দ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে হবে। এইভাবে পূজা করার পর কামাখ্যা কবচ পাঠ করতে হবে। তাহল—

"ওঁ কামাখ্যে প্রসীদ স্ত্রীং স্ত্রীং ত্রীং ত্রীং ত্রীং হুং স্ত্রীং স্ত্রীং হুং হুং স্বাহা।" এই বীজমন্ত্রও এক লক্ষ বার পাঠ করতে হবে তাহলে কামাখ্যা মন্ত্র সিদ্ধ হওয়া যাবে।

এইবার ঐ গুটিকাটিকে নিয়ে একটি তামার পাত্রে রেখে প্রতিদিন 'ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং" বীজমন্ত্রটি একশত আটবার উচ্চারণ করতে হবে এবং উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গুটিকাটিকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাতে হবে। এরূপ করলে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সাধক সিদ্ধিলাভ করবে। তখন ঐ গুটিকা মুখমধ্যে ধাবণ করলে অদৃশ্য হওয়া যাবে এবং অনায়াসে শূন্যপথে যাতায়াত করা যাবে।

গুটিকাসাধনের কোন বাংলা মন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই সম্পর্কিত কোন বাংলা মন্ত্র আছে কি না, সে ব্যাপারে সঠিক কিছু কেউ বলতে পারেনি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা শূন্যপথে বিচরণ করা সম্ভব একথা গুনিনরা স্বীকার করেন কিন্তু এই ব্যাপারে কেউ প্রত্যক্ষ ফলভোগী কিনা তা জানা যায়নি। কারণ এই ধরনের কোন ঘটনা কোনো গুণিন প্রত্যক্ষ করেননি কিংবা 'নিজেরাও করে দেখেননি।

অনেক গুণিন-তান্ত্রিক বলেন কামাখ্যা মন্ত্রে সিদ্ধ হলে সাধকের অসীম ক্ষমতা জন্মায়। তখন সাধক অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন তিনি কোন কিন্নর কিংবা কিন্নরী, বিদ্যাধর কিংবা বিদ্যাধরী কিংবা কোন গন্ধর্বকে আহ্বান করতে পারেন। আহ্বান করলেই এরা নেমে আসতে বাধ্য হয়, এবং তারা সাধককে শূন্যপথে মনোমত স্থানে নিয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন হলে এরা খাদ্য, পানীয়, ধনরত্ন—সব কিছু দিতে পারে। অনেকটা আরব্য উপন্যাসের শক্তিশালী জিনদের মত। তবে অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা সাধনবলে অর্জন করতে হয়। যেমন আমাদের দেশের তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সাধকরা যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন।

সিদ্ধগুটিকা মুখে ধারণ করলে অদৃশ্য হওয়া যায় কিংবা অনায়াসে শূন্যপথে যাতায়াত করা যায়—ব্যাপারটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা তর্কের বিষয়বস্তু, কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গুণিন আমাকে পরিহাস করে বলেছিলেন—আপনি গাঁজা খেয়েছেন কখনো? খেয়ে দেখবেন শূন্যপথে চোদ্দ ভুবন ঘুরে আসা যায়। ধরে নিননা এটা অনেকটা সেই রকম ব্যাপার। জানি না, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা শূন্যপথে বিচরণ করার ভাবার্থকে অবলম্বন করে আমাদের দেশের ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিকগণ সাধন প্রক্রিয়া রচনা করেছেন। বীজ-মন্ত্র ছাড়া অন্যরকম মন্ত্রও হয়ত কেউ কেউ সৃষ্টি করেছেন। এগুলি মানুষের কল্যাণ করা অপেক্ষা বৈচিত্র্য ও চমক সৃষ্টির জন্য রচিত হয়ে থাকতে পারে। জনসাধারণের মনে সম্ভ্রম, বিস্ময় উদ্রেক করানোর জন্য আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনদের চেষ্টার অন্ত নেই।

মন্ত্রশক্তিতে বুঁদ হয়ে থাকা হয়ত গাঁজার নেশার মত এক নেশা। ভারতবর্ষের সাধকগণ এই রসের রসিক ছিলেন। এই নেশার ঘোরে তাঁরা ঘর সংসার, আরামবিলাস ছেড়ে পর্বতে গুহায় অরণ্যে প্রান্তরে সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। সে নেশা কেমন? তার স্বরূপ কি? সে সম্বন্ধে সঠিক কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি।

যাই হোক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুণিনরা গাঁজা খেয়ে মন্ত্র রচনা করুন কিংবা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে শূন্যপথে মানস ভ্রমণ করুন তাতে ক্ষতি নেই—মন্ত্রের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য গুটিকাসাধন প্রক্রিয়ার জন্ম— সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তাঁদের কাজ শেষ। তবে গাঁজার নেশা প্রসঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক লোককবির গাজন গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

এক দমেতে দমাদম,
দু দমেতে চোদ্দ ভুবন
তিন দমেতে গোলোকধাম,
হায়রে—হায়রে—হায়রে ..।"

প্রাণীসিদ্ধি :

এই বিশাল বিশ্বে সমগ্র জীবজগৎ তথা প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র জীব যে কথা বলতে পারে, নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী কথা বলতে পারেনা। কেবল কিছু পক্ষীজাতীয় প্রাণীকে শেখালে কিছু কথা বলতে পারে। তবে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা আকারে, ইঙ্গিতে, শরীর কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত করে তাদের ভাব প্রকাশ করে। এই সমস্ত প্রাণীরা মুখ দিয়ে কিছু শব্দ সৃষ্টি করে, তবে সে শব্দ সহজে বোধগম্য হয় না এবং তা কোন ভাষা দ্বারা আবদ্ধ নয়। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র কিছু ইঙ্গিত বহন করে, যে ইঙ্গিতের সাহায্যে এই সমস্ত প্রাণীকুল তাদের আহার, বলপ্রয়োগ, প্রজনন প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করে।

কিন্তু প্রাচীণকালের গল্পে কাহিনীতে, পুরাণে, রূপকথাতে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায় জীবজন্তু, পক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গরাও কথা বলছে, মানুষের মতো ব্যবহার করছে, বুদ্ধিদীপ্ত কাজকর্মও করছে। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'দাদাঠাকুরের রূপকথা' প্রভৃতি রূপকথা জাতীয় গ্রন্থে এইরকম নানা কাহিনী আছে। সেখানে লাল পাখি, হলদে পাখি, হীরামন তোতা, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভৃতি পাখি ও জীবজন্তু মানুষের ভাষায় কথা বলে। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুকপাখি, বিহঙ্গ-বিহঙ্গী, অজগর সর্প প্রভৃতি নীতি-উপদেশ দেয়, ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারে, মানুষকে আসন্ন অমঙ্গল কিংবা

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। ঈশপের গল্পে, কথামালায়, বাত্রিশ সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে, পঞ্চতন্ত্র আর কথা সরিৎসাগরেব গল্পগুলিতে সমস্ত জীবজন্তু পাখি কথা বলেছে মানুষের মতো কাজকর্ম করেছে। রামায়ণ-মহাভারতেও ইতর প্রাণী জীবজন্তুদের কথা বলার ঘটনা আছে।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন কালের গল্পে কাহিনীতে জীবজন্তু পাখি ও অন্যান্য ইতর প্রাণীদেব মুখ দিয়ে কথা বলানোর কোন তাৎপর্য ছিল। নীতিকথন বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রচয়িতাগণ, রূপকচ্ছলে জীবজন্তুদের মুখো ভাষা দিয়েছিলেন। শুধু তাই না, এই সমস্ত ভাষা, মানুষ বুঝতে পারত এমন প্রমাণও আছে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের এইভাবে 'মানবীকরণ' করার কাজ আজকের সাহিত্যেও আছে এবং শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর সাহিত্যে এই জাতীয় উদাহরণ ভুরি ভুরি মিলবে।

মানুষ কথা বলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তু পশু-পাখি মানুষেব মত কথা বলতে পারে না। তবে তাদের ভাষা আছে। পশু-পাখিরা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মুখে নানা প্রকার শব্দ করে ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে। কিন্তু সে ভাষা মানুষ বুঝতে পারে না। তবে আকার ইঙ্গিতে কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। গোয়ালে বাঁধা একটা 'গরু' যখন 'হাম্বা' রবে ডাকে, তখন তার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ঐ হাম্বা রবের যথার্থ ভাষাগত অর্থ কি, তা কখনোই অনুধাবন করা যায় না। কুকুরে কুকুরে ঝগড়া করার সময় বিচিত্র শব্দে চীৎকার করে, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ে হুংকার ছাড়ে, গাছের ডালে পাখিতে পাখিতে ঝগড়া-মারামারি করার সময় কিচির মিচির শব্দ করে— এগুলির হয়ত কোন অর্থ আছে, তা আমরা বুঝতে পারি না। এমন কি কীট পতঙ্গরাও নিজেদের মধ্যে ভাব আদান প্রদান করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতগ্রন্থে দেখা যায় তিনি পশুপক্ষীর ভাষা বোঝবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে শৈশবে পশু-পাখি পুষতেন। পশু-পক্ষীদের মধ্যে যে ভাব এবং ভাষার আদান প্রদান ঘটে একথা বোঝা যায়— যখন দেখা যায় প্রজননের সময় স্ত্রী-জাতীয়া পশুর ডাকে পুরুষ পশু ছুটে আসে এবং বিপদের সময় একটি পশুর কাতর ক্রন্দনে অন্য পশুরাও দলবদ্ধ হয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে কিংবা প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করে। একদা এক ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চকে ঘিরে ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হয়ে মহাকবির লেখনীতে যে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান......" শ্লোক নির্গত হয়েছিল, সেই কাতর ক্রন্দনের নিশ্চয়ই কোন ভাষাগত অর্থ ছিল— তা মনুষ্যের পক্ষে বোধগম্য ছিল না।

যাইহোক, পশু-পাখিদের যে ভাষা আছে, তা মানুষ সঠিকভাবে না বুঝতে পারলেও আকার-ইঙ্গিতে কিছুটা অনুমান করতে পারে, তেমনি পশু-পাখিরাও মানুষের কথা হয়ত কিছুটা অনুমান করতে পারে বা বুঝতে পারে। কুকুর, বিড়াল, বানর, হাতি, টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পশুপাখিদের শেখালে মানুষের কথা বুঝতে পারে— এ অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই আছে। তবে মানুষের ভাষা সঠিকভাবে বুঝতে পারে কিনা তা জানবার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই মূক পশু-পাখিরা মানুষের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ করতে পারে, এতে তাদের ভাবোদ্রেক ঘটে এবং কান্নার মধ্য দিয়ে কিংবা বিভিন্ন প্রকারে অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তারা তা প্রকাশ করে— এমন ঘটনাও বিরল নয়। মোট কথা মানুষ এবং পশু-পাখির মধ্যে ভাষার আদান-প্রদান না ঘটলেও ভাবের আদান-প্রদান ঘটতে পারে— এ তথ্য সর্বজন বিদিত।

পশু-পাখিরা যে শব্দ করে, তার ভাষাগত কোন অর্থ আছে কিনা— এ জানার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নানাভাবে চেষ্টা করেও যথার্থভাবে সফল

হতে পারে নি। তাই গল্পে, কাহিনীতে পশুপাখির মুখে ভাষা বসিয়ে কিছুটা তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। কিন্তু এ যেন সেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত। আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা মানুষের এই দুর্বলতার সূত্র ধরে, তাদের আগ্রহ আর কৌতূহলের রসদ যোগাবার জন্য এক ধরনের মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। এই মন্ত্র অনুশীলন করলে, নানা প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করলে, পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং তাদেরকেও মানুষের ভাষা বোঝানো যায়। এই ধরনের মন্ত্রকে বলা হয়েছে 'প্রাণী সিদ্ধি'। এই মন্ত্র দ্বারা গরু, হাতি, বিড়াল, ঘোটক প্রভৃতি জন্তু, ইঁদুর, গিরগিটি, ব্যাঙ প্রভৃতি তির্যক প্রাণী এবং পক্ষীদের ভাষা বোঝা যায় এবং তাদেরকে মানুষের ভাষা বোঝানো যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই জাতীয় মন্ত্র কিছু পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখানে এসব চর্চা হয় না। কোন গুণিন বা তান্ত্রিক এই সমস্ত মন্ত্রের কোন পরীক্ষা করে দেখে নি। যেখান থেকে এগুলি পাওয়া গিয়েছে তারা এই সমস্ত মন্ত্রের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন কিছু আশ্বাস দিতে পারে নি।

প্রাণীসিদ্ধি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কেবল উদ্দিষ্ট প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় তা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জ্ঞান ও শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন করা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর রক্ষয়িত্রী দেবী বা দেবতা থাকেন, এই সাধনা দ্বারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাঁদের কৃপায় ধন-রত্ন সুখ সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

গো-সিদ্ধি

বাঙালীর কাছে বিশেষ করে হিন্দু বাঙালীর কাছে গরু কেবল প্রয়োজনীয় জন্তু নয়, উপকারী জন্তু নয়, গরুকে এই দেশের মানুষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। গরু আমাদের কাছে গো-মাতা, গো-দেবতা, গরু আমাদের সম্পদ। এ হেন গো-সম্পদের সাধনায় বাংলাদেশের মানুষ সর্বাগ্রে উৎসাহিত হয়ে উঠবে, এ আর বড় কথা কি। গো সিদ্ধির সাধনায় মানুষের প্রথম লাভ হল— গোধন বৃদ্ধি। এই গরুর ভাষা যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে কত যে সমস্যার সমাধান হয়, তা বলে বোঝানো যায় না। তাই ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিকগণ প্রথমে গো-সাধনা করেন। এই সাধনায় সিদ্ধ হলে দেবী ভগবতী প্রসন্না হন, সাধকের গৃহে সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

গোয়ালে বসে গো-সাধনা করা যায়। তবে নির্জন মাঠে ছায়াবৃত স্থানে যেমন কোন বৃক্ষতলে তৃণাকীর্ণ স্থানে এই গো-সাধনা করা শ্রেয়। তবে পাশে জলাশয় থাকলে ভাল হয়।

প্রথমে গোরোচনার সঙ্গে যবের গুঁড়ো, গো দুগ্ধ, শর্করা, এলাচ, লবঙ্গ, শ্বেত বেড়ালার ও কদলীবৃক্ষের মূলের রস, দাড়িম্ব, তুলসী পাতা, তুলসী দানা, আমলকীর রস একত্র পাক করে জাউ প্রস্তুত করতে হবে। ঐ জাউ একটি রূপার পাত্রে রেখে, মাটিতে একটি অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার মধ্যে রাখতে হবে। এই জাউ হল ভোগ। দেবী হলেন, নীলবর্ণা, সর্বাভরণ ভূষিতা, দ্বিভূজা, পীতবসনা সতী দেবী। এই দেবী মূর্তির সামনে জাউ-ভোগ নিবেদন করতে হবে। এখন সাধক স্নান করে পুষ্যা নক্ষত্রে উত্তোলন করা বামনহাটির মূলের সঙ্গে কৃত্তিকা নক্ষত্রে সংগ্রহ করা শ্বেতবর্ণের কুঁচের রস পেষণ করে সারা অঙ্গে মাখবে, তারপর অশ্বিনী নক্ষত্রে ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতী লতা এবং বেড়ালার মূল সংগ্রহ করে একত্র পেষণ করে তা দিয়ে কপালে তিলক ধারণ করবে। এইবার 'গংলং' বীজমন্ত্রটি প্রতিদিন দশ লক্ষ বার করে তিনদিন জপ করবে।

এইভাবে মন্ত্র জপ শেষ হয়ে গেলে চতুর্থ দিনে একটি হৃষ্টপুষ্ট গরুকে (গাভী হলে ভাল হয়) স্নান করিয়ে কপালে সিঁদুর দিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে

হবে। এইবার গাভীর দুটি পা একত্র বন্ধন করে বিধিমতে পূজা করতে হবে। পূজান্ শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়তে হবে—

গাভী তোরে বেঁধে রাখি।
দুধ-চোনায় পায়েস রাঁধি।।
সেই পায়েসে মন ভোলে।
কৃষ্ণ ঠাকুরের আসন টলে।।
কৃষ্ণের বরে বর ঝরে
কান ঝালাপালা
স্বর্গে লাগল তালা।
নে তালা খোল।
গাভীর মুখে ফুটল বোল।।
কার আজ্ঞে—
মা ভগবতীর আজ্ঞে।

[এই মন্ত্রটি সুর করে দুলে দুলে আবৃত্তি করতে হবে। গানের সুরে বলতে পারলে খুবই ভাল হয়। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজালে সর্বোৎকৃষ্ট হয়]

এইভাবে সাতদিন গো-পূজা করলে দেবী প্রসন্না হন। সাধককে দেবী বরদান করেন। ফলে সাধক গরুদের ডাকের অর্থ বুঝতে পারবেন। শুধু তাই নয়, গরুর কানে কানে কথা বললে তারাও সে কথা বুঝতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে যে গরুর পূজা করা হবে তার সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদান করা যাবে। এছাড়া গৃহে গোধন বৃদ্ধি পাবে এবং মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঘটবে।

গজ সিদ্ধি

গজ অর্থাৎ হাতির বিশাল শরীরের তুলনায় বুদ্ধি কম এমন ধারণা প্রচলিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ঘটনায় হাতির চমৎকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। হাতির বুদ্ধি নিয়ে বহু গল্প ও কাহিনী আছে। তেমনি বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দিয়ে হাতিকে শিক্ষিত করা যায় এবং তাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায়—একথা আজ প্রমাণিত। তবুও 'হস্তিমূর্খ' কথাটি আজও প্রচলিত আছে। মূর্খত্ব কিংবা বুদ্ধি-স্বল্পতা নিয়ে হাতি সম্পর্কে অবজ্ঞেয় ধারণা যে যথার্থ নয়—প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা ঘটনায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তিকুল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে আসছে।

তথাপি হাতি ভয়ঙ্কর জন্তু। বিশেষ করে বুনো হাতি সম্পর্কে আমাদের ভয়ের ধারণা প্রবল। এরা ক্ষেপে গিয়ে বিশাল শরীর নিয়ে কালান্তক যমের মত যখন ছুটে আসে, তখন তার প্রতিরোধ করা কিংবা সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যে ভীষণ কঠিন ব্যাপার—তার বিবরণ অনেক শিকারির কাছ থেকে জানা গিয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এরা অনেক শান্ত, অন্যান্য হিংস্র বন্য জন্তুর তুলনায় কম ভয়ঙ্কর-এ তথ্য অবিদিত নয়। মোটকথা ক্ষেপে গেলে হাতি ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে—হাতির এই স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীনকালে রাজারা তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে তাকে দিয়ে 'হাতির লড়াই' করিয়ে মজা উপভোগ করেছে। আবার হাতিকে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে মাল পরিবহন, তার পিঠে চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন অর্থাৎ যানবাহন প্রভৃতির কাজ করিয়েছে।

বন্য এবং ভয়ঙ্কর জন্তুদের মধ্যে হাতিই একমাত্র জন্তু যে মানুষের ভাব, ভাষা, আচার-আচরণ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারে এবং বহুকাল ধরে আয়ত্ত করে আসছে অর্থাৎ এই বিশালাকার জন্তু মানুষের ভাষা বুঝতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। তেমনি হাতি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলও প্রবল। হাতিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে। প্রাচীন 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' গ্রন্থে হাতি ধরার কৌশল, হাতির নানাবিধ চিকিৎসার কথা আছে। হাতির ভাবভঙ্গি, স্বভাব-আচরণ প্রভৃতি বুঝতে মানুষ বহু চেষ্টা করেছে।

হাতি সম্পর্কে মানুষের এই কৌতূহলকে উপজীব্য করে আমাদের দেশে এক ধরনের গুণিন মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে—যার নাম 'গজসিদ্ধি'। এই মন্ত্রের সাহায্যে যেমন গজকৃত শব্দের অর্থ বোঝা যায়, তেমনি মানুষের ভাষা গজকেও বোঝানো যায়। তাছাড়া গজের সাহায্যে শত্রুজয়, কঠিন এবং দুঃসাধ্য কর্মের সমাধান, বিভিন্ন মঙ্গলকর্মে সাফল্য প্রভৃতি লাভ করা যায়। হাতিকে মঙ্গল, স্বস্তি, সুখ, সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক রূপে ভাবা হয়ে থাকে, সুতরাং হস্তী-সিদ্ধি ঘটাতে পারলে সংসারে সুখ সৌভাগ্যের প্রাবল্য ঘটে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'গজসিদ্ধি' সম্পর্কে কোন বাংলা-মন্ত্র পাওয়া যায়নি, কিংবা বলা যায় বাংলা-মন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখা ভাল—যদিও পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে—তবুও এখানে পুনর্বার বলতে হচ্ছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার আয়তন বেশ বড়, সেখানে প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চল খুঁজে দেখা সম্ভব হয়নি। তাই অনেক মন্ত্রতন্ত্র আমাদের জানার এবং সংগ্রহের বাইরে থেকে যেতে পারে। আমরা যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতেই আলোচনা করতে হচ্ছে। তবে মন্ত্রের সাধনা এবং ব্যবহার সম্পর্কে নানা প্রক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। বেশিরভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে গুণিনদের মুখ থেকে। সাধন-প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত বীজমন্ত্রের ব্যবহার আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'গজসিদ্ধি' মন্ত্রের প্রয়োগের কথা জানা যায় না। এখানে এই মন্ত্রের প্রয়োগের সুযোগ অবশ্য খুব কম—নেই বললেই চলে। এখানকার বনাঞ্চলে হাতি পাওয়া যায় না, হাতি কিনে এনে মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটাবে এমন প্রবণতা ও সামর্থ্য এখানকার মানুষের নেই। তাই শুধু মন্ত্রের জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি।

প্রক্রিয়া ও ব্যবহার

আতপ চালের গুঁড়ো, মাখন, যবের ছাতু, সাদা তিলবাটা, শ্বেতচন্দন, হস্তিদন্ত চূর্ণ, শ্বেত গোলাপের পাপড়ি চূর্ণ, বিল্বমূল, মৃগনাভি, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শ্বেত বেড়ালার মূল, যজ্ঞডুমুরের মূল, শ্বেত পদ্মের পাপড়ি, শ্বেত শঙ্খ চূর্ণ, স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম একত্র মিশ্রিত করে একটি দেবী মূর্তি (সাধারণভাবে জগদ্ধাত্রী মূর্তি) নির্মাণ করতে হবে। এই দেবীমূর্তিকে কাঠের তৈরী কিংবা মাটির তৈরী হস্তিমূর্তির উপর—স্থাপন করতে হবে এমন ভাবে যেন দেবী গজারূঢ়া হন।

এইবার এই মূর্তির নীচে গঙ্গার মাটি দিয়ে তিন হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া ও ছয় আঙুল উচ্চ একটি বেদী প্রস্তুত করতে হবে। বেদীর চারদিকে চারটি যজ্ঞ ডুমুরের কীলক পুঁতে দিতে হবে। এইবার হস্তিদন্তচূর্ণ ও শঙ্খচূর্ণ দিয়ে একটি অষ্টদল পদ্ম আঁকতে হবে বেদীর উপরে। পদ্মের প্রতিটি দলে একটি করে গজমুক্তা বসাতে হবে। এইবার সাধক স্নান করে শুচি হয়ে শ্বেত পট্টবস্ত্র পরিধান করে ধূপদীপ ও যথোপযুক্ত উপকরণ সহযোগে দেবীর আরাধনা করবেন। শেষে 'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং। আং হ্রীং ক্রৌং। ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং।' বীজমন্ত্রটি অষ্টাদশ অযুতবার জপ করতে হবে এবং এর দশাংশ বার হোম করতে হবে। এইরকম মাসাধিক কাল করলে দেবী প্রসন্না হয়ে বর দেবেন।

এরপর কোন একটি সুলক্ষণযুক্ত হস্তীকে যথোপযুক্তভাবে সজ্জিত করে দেবীমূর্তির সামনে এনে তার কানে দশ লক্ষ বার উপরোক্ত বীজমন্ত্র আবৃত্তি কবলে হস্তী সাধকের ভাষা বুঝতে পারবে, আর দেবীর বরে সাধক হাতির ভাষা বুঝতে পারবেন। এই হস্তী সাধকের বশ হবে।

ঘোটক সিদ্ধি

গজসিদ্ধির মত 'ঘোটক সিদ্ধি প্রাণী সিদ্ধি পর্যায়ের মন্ত্রসাধনা। গরুর মত ঘোড়াও মানুষেব উপকারী জন্তু এবং মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গে অঙ্গে এই জন্তুটির অবদান জড়িয়ে আছে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করে তখন তাদেব একমাত্র বাহন ছিল ঘোড়া। বস্তুতঃ এই দ্রুতগামী জন্তুটির জন্যই অনার্যদের পর্যুদস্ত করা তাদের পক্ষে অনেকাংশে সহজ হয়েছিল। সেই প্রাচীনকাল থেকে এই জন্তুটি যুদ্ধক্ষেত্রে, যানবাহন হিসাবে, মাল পবিবহনের ক্ষেত্রে মানুষের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সেক্ষেত্রে এই জন্তুটি ভাষা যদি বুঝতে পারা যায় এবং তাকে যদি আমাদেব ভাষা বোঝানো যায়, তাহলে কত সমস্যাব যে সমাধান কবা হয় এবং মানুষেব জীবনে যে কি বিবাট পরিবর্তন আনা যায়, তা কল্পনা করা যায় না।

গজসিদ্ধির মত ঘোটক সিদ্ধি কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ।

সাধককে প্রথমে বিধিমতে সূর্যপূজা করতে হবে। এই সূর্যপূজা সারাদিন চলবে। সূর্যোদয়েব সঙ্গে শুরু ও সূর্যাস্তে শেষ করতে হবে। পূজাব সময় সপ্তাশ্ববাহন সূর্যদেবের মৃন্ময় মূর্তি সামনে বাখতে হবে। পূজার পরদিন একটি লাল রেশমেব কাপড়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

(১) এক ভরি সোনা, দুই ভরি রূপা, ও তিন ভরি তামা।
(২) পুষ্যা নক্ষত্রে ও অমৃতযোগে সংগ্রহ করা রক্ত করবীর মূল।
(৩) কৃষ্ণ সর্পের পুচ্ছ ও কৃকলাশের পুচ্ছ।
(৪) রবিবার কৃত্তিকা নক্ষত্রে সংগ্রহ করা শ্বেত আকন্দের মূল।
শুভ নক্ষত্রে উত্তোলন করা ধুতুরার মূল ও অপামার্গের মূল।
(৬) পাঁচ রতি শোধন করা সূর্যকান্তমণি।
(৭) পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্ব বৃক্ষস্থিত গুলঞ্চলতা।
(৮) মঘা নক্ষত্রে বহুবারক বৃক্ষের পরগাছা।
(৯) হস্তা নক্ষত্রে শেফালিকা বৃক্ষের পরগাছা ও যজ্ঞ ডুমুর বৃক্ষের পরগাছা।
(১০) ঘোটকের লেজের লোম, দেবধান্য, মধুপর্ক, নাভিশঙ্খ।

এই বার এই দ্রব্যগুলিতে "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং। হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট স্বাহা।"—মন্ত্রটি চতুর্দশ নিযুতবার জপ করতে হবে। জপের শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি একুশবার পাঠ করে জলের ছিটা দিতে হবে।

ওঁ হ্রীং মহাদেবের আজ্ঞা সূর্য দেবের আজ্ঞা
কালী তারা মহাবিদ্যার বর।
ঘোটকের মুখে ফোটে স্বর।
সাত কাটি আট কাটি
ইন্দ্রের ঘোড়ার পিঠে জোড় কাঠি॥
গুড় গুড় ঢাক বাজে।
ঘোড়ার মুখে বোল সাজে।

সিদ্ধিগুরু শ্রীশ্রীকালী সেবকের আজ্ঞা।
সূর্যদেবের আজ্ঞা॥"

এইবার মন্ত্রপূত দ্রব্যগুলি লাল কাপড়ে বেঁধে কোন অশ্বের গলায় বেঁধে বাখতে হবে এবং তার পিঠে সওয়াব হয়ে কোন নির্জন বনমধ্যে গিয়ে তাব কানে কানে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত কবতে হবে। এইভাবে বৎসরাধিককাল কবলে ঘোটক মানুষেব ভাষা বুঝতে পারবে এবং ঘোটকেব মুখের শব্দ সাধক বুঝতে পাববে। এইভাবে ঘোটককে বশ কবতে পাবলে যে কোন দুর্গম স্থানে তার সাহায্যে যাওয়া যাবে।

উপবোক্ত মন্ত্রটি দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়া গুণিনেব মুখ থেকে সংগ্রহ কবা হয়েছে।

মন্ত্রটি অসংলগ্ন। কি যে বলা হয়েছে তার মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রটি কখনও পবীক্ষা কবে দেখা হয়নি। এই মন্ত্রদ্বাবা এবং এই প্রক্রিয়াব সাহায্যে উদ্দিষ্ট বিষয়ে সাফল্য লাভ কবা যাবে কিনা, সে বিষয়ে গুণিন নিশ্চয়তা দিতে পাবেননি। তিনি অন্যস্থান থেকে সংগ্রহ কবেছেন মাত্র। তবে এই গুণিন বিশ্বাস করেন নিষ্ঠাভবে প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঠিকঠিকভাবে মন্ত্রসাধন করলে ফল হতে বাধ্য।

'মূষিক সিদ্ধি''

গরু, হাতি, ঘোড়ার তুলনায় মূষিক তথা ইঁদুব অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণী— বলা যায় ইতর প্রাণী। তবুও ইঁদুবকে নিয়ে আমাদেব দেশেব কবি, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও চিন্তার অন্ত নেই। ইঁদুব গণেশঠাকুবেব বাহন, আব গণেশ ঠাকুব হলেন সর্বসিদ্ধিদাতা দেবতা, এদিক দিয়ে ইঁদুরের যেমন খ্যাতি আছে, তেমনি এই ছোট প্রাণীটি তাব চতুরতা আব বুদ্ধি নিযে মানুষের মনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিস্ময়কব স্থান অধিকাব কবে আছে। প্রাচীনকাল থেকে আবম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যে, গল্পে, নীতিকথায়, তত্ত্বকথায় মূষিকেব একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সহজিয়া সাধকদের চর্যাপদে মূষিককে যেমন তত্ত্বরূপকে ব্যবহাব কবা হয়েছে, তেমনি হিতোপদেশ, কথামালার গল্পে ইঁদুবেব বুদ্ধি উদাহবণস্থল। সে জালবদ্ধ পশুবাজ সিংহকে জাল কেটে মুক্ত করে দিয়ে জগতে ক্ষুদ্রপ্রাণীর উপযোগিতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

ইঁদুরের যেমন বুদ্ধি ও গুণপনা আছে তেমনি দুষ্টবুদ্ধিও কম নেই। সে মাঠেব শস্য নষ্ট করে, ঘরের জিনিসপত্র চুরি কবে, আসবাব, বইপত্র কেটে নষ্ট কবে দেয়। ইঁদুবেব অত্যাচাবে গৃহস্থ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তবুও মানুষ ইঁদুরকে ভালবাসে। শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত—সকল স্তরের মানুষের কল্পনায় ইঁদুর রসসিক্ত হয়ে আছে। শিশুপাঠ্য কাহিনী থেকে আরম্ভ করে মননশীল রচনাতেও ইঁদুর তথা মূষিকেব স্থান আছে।

এই মূষিকের ভাষা কি? এরা পরস্পরের মধ্যে কিচ কিচ শব্দ করে যে ভাবেব আদান প্রদান ঘটায় তাতে এরা কি বলে। বিড়াল, কুকুর থেকে আরম্ভ করে মানুষের প্রতি এদের মনোভাব কি রূপ? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার জন্য এরা সত্যিই কি কোন পরিকল্পনা করে, না তা শুধু মানুষের কল্পনা—এই সব জানার আগ্রহ মানুষের প্রবল। আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কোন পথ দেখাতে পারেনি। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা থেমে থাকতে চায় না। তাই অলৌকিক শক্তি কিংবা অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা এই ব্যাপারে পথিকৃৎ। তাঁরা তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের এই কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কিছু সাধনপ্রক্রিয়া ও মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি যথাযথভাবে অনুশীলন

ও প্রয়োগ করলে এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করা যায়। আমাদের প্রাচীন তন্ত্র-শাস্ত্রে এই বিষয়ে নানারকম নির্দেশ আছে। সিদ্ধতন্ত্রে এগুলিকে গুপ্তবিদ্যা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে কথোপকথনকালে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে কিছু গুপ্ত বিষয় বর্ণনা করেছিলেন—মূষিক সিদ্ধি সেই সকল গুপ্ত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম।

মূষিক সিদ্ধি বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রে যে সাধন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে তার সঙ্গে স্বকপোলকল্পিত কিছু প্রক্রিয়া জুড়ে দিয়ে আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনগণ নূতন করে মূষিক সিদ্ধি সাধন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন। সেইসঙ্গে কিছু মন্ত্র ও তৈরী করেছেন তাঁরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ধরনের মন্ত্র ও সাধনপ্রক্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে।

মূষিক সিদ্ধি সাধন প্রক্রিয়া

সাধনা আরম্ভ করার পূর্বদিন সাধককে উপবাসে থাকতে হবে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে নানাপ্রকার ধর্মকথা শ্রবণ করা ও নানা শাস্ত্র সমালোচনার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হবে। এছাড়া যথাবিধি গণেশ দেবতার পূজা, শিবস্তোত্র পাঠ ও দুর্গাস্তব করতে হবে। পরদিন প্রভাতে স্নানাদি সমাপন করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে 'নদীতীরে গমন করে নির্জনে নানাবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ক্রিয়াগুলি হল—

১। নদীতীরে মাটি দিয়ে দুই হাত দেড়হাত পরিমিত স্থানে উচ্চ বেদী নির্মাণ করতে হবে। বেদীর উপর মাটি ও ছাই দিয়ে একটি প্রমাণ সাইজের মূষিক মূর্তি তৈরী করতে হবে।

২। মূর্তির চতুর্দিকে ধানের শীষ বা শুকনো ঝরা ধান, পঞ্চরত্ন, কিছু গমের দানা, একটুকরো গজদন্ত, কয়েকটি কড়ি ও কিছু ইঁদুর মাটি রাখতে হবে।

৩। এই বার পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করা সুদর্শনার মূল, কিংবা রবিবারে চিত্রা নক্ষত্রে সংগ্রহ করা যষ্ঠী মধুর মূল একটি তামার পাত্রে এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে সংগ্রহ করা অর্জুন গাছের শিকড় কিংবা হস্তা নক্ষত্রে চাঁপানটে গাছের শিকড় রূপার পাত্রে রাখতে হবে। এইবার ভূর্জপত্রে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দিয়ে চতুষ্কোন ঘর কেটে চারটি বীজমন্ত্র লিখতে হবে। সেগুলি হল—'ক্রীং দ্রীং ক্রিং ষ্ট্রীং"—একে যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রটি একটি তামার মাদুলিতে ধারণ করে "ওঁ শ্রীং শ্রীং ক্রীং ষ্ট্রীং মূষিকশব্দবিদ্রবেৎ গিরিরাজ নমঃ।" মন্ত্রটি এক মনে চতুর্দশ লক্ষ বার জপ করতে হবে। জপের শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি একুশ বার সুরসহযোগে আবৃত্তি করে তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে—

ইঁদুর ইঁদুর ইঁদুরমাটি
ইঁদুরের দাঁত পরিপাটি।
সেই দাঁতে শব্দ করে।
নর বানরের মাথা নড়ে।
শঙ্খের পুত শঙ্খের বোটি
হীরের দাঁতে কাটাকাটি।
ইঁদুর তোরে বাঁধি আপন।
তোর মুখে হোক কথার বপন॥
কার আজ্ঞা—
ঠাকুর গণেশ দেবাদিদের মহাদেবের আজ্ঞা॥

মন্ত্র পাঠ শেষ হয়ে গেলে উচ্চবেদীর উপরে স্থাপিত মূষিক মূর্তিটিকে ভেঙে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে ছড়িয়ে থাকা দ্রব্যগুলি নিয়ে কোনো ইঁদুরের গর্তে দিয়ে আসতে হবে। এরূপ করলে গর্ত থেকে ইঁদুর বেরিয়ে এসে শব্দ করবে এবং সাধক তার ভাষা বুঝতে পারবেন।

'মূষিক সিদ্ধি' সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধকের যেমন ইঁদুরের শব্দে ভাষার জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইঁদুরের শব্দের ভাষা বুঝতে পারেন, সেইসঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরও সাধকের বশ হয়ে যায়। তখন সে নানারকম ধনরত্ন বহন করে এনে সাধককে দেয়। নানরাকম শস্যে গৃহ পরিপূর্ণ করে তোলে এবং গিরিরাজ প্রসাদে ও সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রসাদে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

"ভেক-সিদ্ধি"

মূষিকের মত ভেককেও ইতরপ্রাণীর পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই ভেককে ঘিরেই কবিমনের উল্লাস স্ফুরিত হয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিগণ এবং আধুনিককালের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু কবির কাব্যে দাদুরি কবিকল্পনার উৎসারে বিচিত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শিশুপাঠ্য কাহিনীতে নীতিকথার গল্পে ভেক আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

বর্ষার মাঠে ভেক তথা ব্যাঙের ডাক মানুষের মনে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। বর্ষার সজল মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, বারি পতনের শব্দ সেই সঙ্গে সঙ্গে ভেকের রব মিলে মিশে যেন প্রকৃতির সঙ্গীত সভার ঐক্যতান শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার আগমনে ভেকের এই উল্লাস কেন? সেই উল্লাসধ্বনির কি কোন ভাষা আছে? বিজ্ঞানীরা বলবেন প্রজননের কথা, কবিরা নানা বিচিত্র কল্পনা উপহার দেবেন, কিন্তু উল্লাসধ্বনির প্রকৃত ভাষাগত অর্থ কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। মানুষের এই অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্রশক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এবং 'ভেকসিদ্ধি' নামে এক প্রকার মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভেকসিদ্ধি সম্পর্কিত কোন বাংলা মন্ত্র পাওয়া যায়নি। তবে এই ধরনের মন্ত্রের অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওঝা-গুণিনদের মুখ থেকে কিছু বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে—

প্রথমে বিধিমতে দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী পার্বতীর পূজা করতে হবে। তারপর কোন নদীতে কিংবা বৃহৎ জলাশয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় "ওঁ হ্রীং ক্রীং বিচিত্ররূপে ভেক সিদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা" মন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। এরূপ মাসাধিককাল করলে দেবী পার্বতী প্রসন্না হয়ে সাধককে বর দেবেন এবং দিব্যশক্তি প্রদান করবেন। সেই শক্তিবলে সাধক ভেকের রবের অর্থ সম্যক বুঝতে পারবেন।

ওঝা গুণিনদের ধারণা—ভেকের ডাকের অনেক তাৎপর্য আছে। ভেক কেবল প্রজনন ঋতুতে মিলনের জন্য চীৎকার করে না। ভেকের রবের মধ্যে অনেক সময় আসন্ন বিপদের সংকেত ধ্বনিত হয়। তাছাড়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ভেকের রবে থাকে। তাই এদের ভাষা বুঝতে পারলে অনেক কিছু জানতে পারা যায় যেগুলি মানব জীবনের উপকারে লাগে। এছাড়া ভেক নাকি ধনরত্নের সন্ধান দিতে পারে।

ভেক সিদ্ধির মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে এমন কোন সাধকগুণিনের সন্ধান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পাওয়া যায়নি। তবে অনেকে এই সম্পর্কে আশাবাদী ও বিশ্বাসী। তাঁদের কথায় মন্ত্রশক্তির সাফল্যের পিছনে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজন—সেগুলি কেউ যথাযথ পালন করে না বলেই মন্ত্রের শক্তি আজকাল দেখা যায় না। বিশ্বাস, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য—এই গুণগুলি অধিকাংশ

গুণিন-তান্ত্রিকের মধ্যে নেই বলেই মন্ত্র তাদের কাছে সফল হয় না। তাই মূষিক সিদ্ধি কি ভেক সিদ্ধি চিরকাল মন্ত্রের খাতায় লেখা থাকবে, মানুষের জীবনে তার প্রয়োগ সফলতা লক্ষ্য করা যাবে না।

"কৃকলাশ সিদ্ধি"

কৃকলাশ-সিদ্ধি : 'কৃকলাশ' শব্দের অর্থ কাঁকলাস, গিরিগিটি, বহুরূপী। এই কাঁকলাস বা গিরগিটি ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও লোকে একে বেশ ভয় করে। কারণ এই প্রাণীটি তন্ত্র-মন্ত্রের সাধকদের খুব কাজে লাগে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'ঢোলসমুদ্র' নামে এক ধরনের গুণিনী প্রক্রিয়া করা হয়, যার দ্বাবা মানুষের খুব ক্ষতি করা যায়। এই ঢোল সমুদ্র প্রক্রিয়ায় একটি নূতন হাঁড়িব মধ্যে একটি কাঁকলাসকে রেখে নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়কলাপ করা যায, তাতে কাঁকলাসটির শরীর ফুলে ফেঁপে ওঠে—শেষ পর্যন্ত ফুলে 'ঢোল' হয়ে যায়। কাঁকলাসের শবীর যত ফোলে, উদ্দিষ্ট শত্রুর শরীরও তত ফুলে যায়—শেষে তার মৃত্যু ঘটে। মোটামুটিভাবে বলা যায় হিংসা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে অপাকৃত উপায়ে শত্রুর প্রাণহানি ঘটানো হয় 'ঢোল সমুদ্র' নামক গুণিনী প্রক্রিয়ায়, আর এতে প্রধান বস্তুটি হল কৃকলাশ, এছাড়া কাঁকলাসকে মানুষ অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক বলে ভাবে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় এক প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে। কাঁকলাস বা গিরগিটি বুকের রক্ত শোষণ করে, এরা ডাইনীদের সহচর বা সহায়ক। তাই এখানকার মানুষ আজও গিরগিটি দেখলে বুকে থুতু দিয়ে উচ্ছিষ্ট করে, যাতে গিরগিটি দূর থেকে রক্ত শোষণ না করতে পারে। তবে এই সংস্কার এখানকার লেখাপড়া না জানা, কিংবা অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত। সবচেয়ে বড় কথা গিরগিটিরা বর্ণচোরা বা বহুরূপী হয়, এরা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় এবং এদের গলার কাছে রক্তের মত লাল রং এদের চেহারাকে বীভৎস করে তোলে। আর তাতেই এদের দেখলে মানুষের অজান্তে ভয়ের শিহরণ জাগে।

এই বীভৎস প্রাণীটিকে যেমন তান্ত্রিক গুণিনগণ তাঁদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন। তেমনি এক বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কৃকলাশ সিদ্ধ হয়ে প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করেন। কৃকলাশসিদ্ধ তান্ত্রিকগণ সর্বজ্ঞ হন এবং দুঃখ বা শোক জয় করার শক্তি লাভ করেন। তাছাড়া যে দেবীকে তুষ্ট করে সিদ্ধা হন, সেই দেবীর প্রসাদে পার্থিব-অপার্থিব সুখ সম্পদ ভোগ করেন। এছাড়া কৃকলাশ সিদ্ধ সাধক অজাতশত্রু এবং সর্বজন মনোহর হয়ে থাকেন। পার্থিব অপার্থিব নানাবিধ জটিল তত্ত্বে তাঁর অধিকার জন্মায়। জগতে তিনি গুণী এবং সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

কৃকলাশ-সিদ্ধিসাধনা বেশ কঠিন এবং জটিল সাধনা। লোকালয়ে এই সাধনা করা যায় না। নির্জন শ্মশানে বসে সাধনা করতে হয়। এই সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দ্বিভূজা করালবদনা, তালতরুসমজঙ্ঘাসম্পন্না, ভীম কায়া, অগ্নিনেত্রা মুক্তকেশী দেবী চর্চিকা। হেমন্তকাল কিংবা বসন্তকাল এই সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সাধনা শুরু করাই বিধি।

প্রথমে নির্জন শ্মশানে কোন পরিত্যক্ত চিতার উপর বসে চর্চিকা দেবীর ধ্যান করতে হবে। ধ্যান শেষে শ্মশানের মাটিতে একটি ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র এঁকে তাতে একটি পেরেক পুঁতে দিতে হবে। ঐ পেরেকে একটি কৃকলাশকে বেঁধে রাখতে হবে। এখন পঞ্চগব্যদ্বারা ঐ কৃকলাশকে স্নান করাতে হবে। স্নান করানোর পর সাধককে চর্চিকাদেবীকে উদ্দেশ্য করে নিম্নলিখিত মন্ত্র দশ লক্ষ বার জপ করতে হবে। মন্ত্রটি হল—"ওঁ হ্রীং চর্চিচকে চর্চিচকে কৃকলাসং বোধয় বোধয় স্বাহা।" জপের শেষে খদির কাষ্ঠের ধুনি জ্বালিয়ে তাতে শরীরে উত্তাপ দিতে হবে। এইরকম

করলে দেবী তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হবেন। সাধককে মনোমত বরদান করবেন। এইভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কৃকলাশের স্বর বুঝতে সক্ষম হবেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কৃকলাশ সিদ্ধির কোন মন্ত্র পাওয়া যায় নি। তবে প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুণিনদের কাছ থেকে সবিশেষ জানা গিয়েছে। তবে এই সাধনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গুণিন বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এক জন বলেন—বিধিমতে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করলেই কৃকলাশ সিদ্ধি লাভ করা যায়। কারণ দেবী চণ্ডীকে এই সব প্রাণীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মানা হয়—গুণিনদের এই সংস্কার প্রচলিত আছে।

কৃকলাশ ছাড়াও অন্যান্য তির্যক প্রাণী তথা ইতর প্রাণীদের নিয়েও সাধনা করার নিয়ম গুণিন-তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন—কুক্কুট, হংসী, মার্জার, ছাগ, মেষ প্রভৃতি প্রাণীদের নিয়ে সাধনা করার পদ্ধতি আমাদের দেশে চলে আসছে। এই সাধনায় যেমন উক্ত প্রাণীদের ভাষা বোঝা যায় তেমনি এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সন্তুষ্ট করে যশ, অর্থ, ভোগ-সুখ, জ্ঞান এবং পরমার্থ লাভ করা যায়।

ওঝা-গুণিনগণ ও তান্ত্রিকগণের কাছ থেকে আর একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের কোঙ্কন অঞ্চলে এইরূপ গুপ্তবিদ্যা বা গুপ্তমন্ত্রের প্রচলন আছে। যেগুলিকে কোঙ্কনী বা কোঙ্কনা বিদ্যা বলা হয়ে থাকে। "ওঁ লং লং ক্লীং ক্লীং স্বাহা"। মন্ত্রটি কোঙ্কনী বিদ্যাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনগণ অনেকে কোঙ্কনী বিদ্যার ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই বিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন নি। মোট কথা তাঁদের বক্তব্য হল প্রাণী সাধনায় অনেকে কোঙ্কনী বিদ্যার ব্যবহার করেন। যেমন ছাগ সাধনায় কোঙ্কনী বিদ্যার মন্ত্র-ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে বহু ওঝা-গুণিনদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর অনেক তান্ত্রিক সাধকদেরও দেখা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে গৃহস্থ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, অনেকে আবার মন্ত্রতন্ত্রকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ আবার প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। সেখানে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ এবং কিছু কিছু ধর্মচর্চাও করা হয়। সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত মন্ত্র নিয়ে পয়সা উপার্জন করা যায় এমন মন্ত্রের চর্চা হয়। এছাড়া মানুষের বিপদে আপদে যে মন্ত্রগুলির প্রয়োজন হয়, সেগুলির ব্যবহার হয় বেশি। সেখানে পশু-পক্ষীদের ভাষা বোঝবার জন্য সাধনা কিংবা মন্ত্রচর্চায় উৎসাহ এবং সময় কারোর নেই। মন্ত্র-তন্ত্র চর্চাকে বিদ্যা হিসাবে কেউ এখানে গ্রহণ করে না। অলৌকিক বিষয় এবং অপ্রাকৃত রহস্যগুলির সমাধানের জন্য যেসব মন্ত্রের সৃষ্টি সেগুলি সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ দিনের পর দিন কমে আসছে। কারণরূপে দেখা যায় (১) প্রকৃত তান্ত্রিক-গুণিনদের সংখ্যা বর্তমানে ভীষণ কম, যাঁরা আছেন তাঁরা তন্ত্র-মন্ত্র চর্চায় আজকাল উৎসাহী নন। (২) মানুষ রহস্য চর্চা করার পরিবর্তে নিজেদের সংসার পালনে বেশী আগ্রহী। এছাড়া বাঁচার রসদ সংগ্রহ করতে বর্তমানে যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মানুষের রহস্য চর্চা করার সময় ও ইচ্ছা থাকে না। (৩) ওঝা-গুণিনরা প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির জন্য মন্ত্রচর্চায় বেশি আগ্রহী। (৪) মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দ্রব্যগুণের ব্যবহার করা হয়, সেগুলি আজকাল দুষ্প্রাপ্য এবং যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলিও যথার্থভাবে কার্যকরী নয়। (৫) সবচেয়ে বড় কারণ হল—অসাধু, ঠগ, জালিয়াৎ এবং নকল তান্ত্রিক গুণিন—যাঁরা কথার জালে মুগ্ধ করে মানুষ ঠকায়—তাঁদের প্রাচুর্য।

বহু ব্যবহারে জীর্ণ হলেও কথাটি আবার উত্থাপন করতে হচ্ছে, সে কথাটি হল—জগৎ ও জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তিভূমি হল মানুষের বিশ্বাস। মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাসের উপর ভর করে মন্ত্র-তন্ত্রের ধারা আজও চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান কালে মানুষের মন থেকে বিশ্বাস ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই মন্ত্র-তন্ত্রের উপর মানুষের নির্ভরতা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ড, অসাধু, ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিকদের জালিয়াতি মানুষের মনকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। মানুষও তাই মন্ত্র-তন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার উপরে সন্দিহান হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র কি নেই বা তার ক্রিয়াশীলতা কি নষ্ট হয়ে গেছে? এসবের উত্তর পেতে গেলে আরো অনুসন্ধান চাই, আরো গবেষণা করে দেখতে হবে মূল রহস্য টা কি? প্রকৃত গুণিন তান্ত্রিকদের খুঁজে বের করতে হবে, আসল মন্ত্র ও তার যথাযথ প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে হবে। এসব করার পরেও যদি মন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা না পাওয়া যায়, তখন একে অসার বলে প্রতিপন্ন করা যাবে। এর আগে পর্যন্ত আমরা জোর গলায় বলতে পারি না মন্ত্রতন্ত্র বলে কিছু নেই।